যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

গবেষক

রাজদীপ দত্ত

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক (ড.) দেবশ্রী দত্তরায়

অধ্যাপক

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

'সাহিত্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ' submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Professor Debashree Dattaray, Department of Comparative Literature, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Candidate :

Dated : Dated :

Sahitya Samalochak Rabindranath

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet	594 words — 2%
2	www.rljdmcdavpselibrary.com Internet	430 words — 1%
3	bichitra.jdvu.ac.in Internet	310 words — 1%
4	jshc.org Internet	162 words — 1%
5	ia801504.us.archive.org Internet	107 words — < 1%
6	www.bartleby.com Internet	80 words — < 1%
7	Ghosh, Peu. "Displacement of Lhotshampas: Human Rights and Security Implications.", Jadavpur University (India), 2020 ProQuest	62 words — < 1%
8	ecommons.udayton.edu Internet	62 words — < 1%
9	qspace.library.queensu.ca Internet	62 words — < 1%

10	ia902902.us.archive.org Internet	57 words	< 1%
11	shodh.inflibnet.ac.in:8080 Internet	57 words	< 1%
12	strategicstudyindia.blogspot.ro Internet	42 words	< 1%
13	ttxvn.blogspot.com Internet	42 words	< 1%
14	bn.wikisource.org Internet	39 words	< 1%
15	Sturmer, Anna M. "Conduct as exemplified and implied in Shakespeare's plays", Proquest, 2012. ProQuest	26 words	< 1%
16	edit.elte.hu Internet	26 words	< 1%
17	vdoc.pub Internet	26 words	< 1%
18	ia600201.us.archive.org Internet	25 words	< 1%
19	muse.jhu.edu Internet	25 words	< 1%
20	www.scribd.com Internet	25 words	< 1%
21	Giuseppe Flora. "Tagore and Italy: Facing History and Politics", University of Toronto Quarterly, 2008	24 words	< 1%

Crossref

22 www.gutenberg.org
Internet
23 words — < 1%

23 www.tdx.cat
Internet
18 words — < 1%

24 ia902701.us.archive.org
Internet
17 words — < 1%

25 e-pao.net
Internet
16 words — < 1%

26 www.unigoa.ac.in
Internet
15 words — < 1%

27 geoffscaplehorn.com
Internet
14 words — < 1%

28 web.nchu.edu.tw
Internet
14 words — < 1%

29 www60.homepage.villanova.edu
Internet
14 words — < 1%

30 DAVID THISTLEWOOD. "Processdominance: Developmental Drawing in Adolescent Creativity", Journal of Art & Design Education, 1982
Crossref
13 words — < 1%

31 Supriya Chaudhuri. " The Nation and Its Fictions: History and Allegory in Tagore's ", South Asia: Journal of South Asian Studies, 2012
Crossref
12 words — < 1%

32 ia600701.us.archive.org
Internet
12 words — < 1%

33	repositorium.sdum.uminho.pt Internet	12 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES	ON	EXCLUDE SOURCES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	ON	EXCLUDE MATCHES	< 12 WORDS

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র ও বহুব্যাপ্ত প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার বিদেশি সাহিত্যও মূলত ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এবং এর পঠন-প্রতিক্রিয়ায় লিখিত হয়েছে সমালোচনামূলক নানা প্রবন্ধ। শুধু প্রবন্ধই নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিত চিঠিপত্র, লিখিত অভিভাষণ, মৌখিক বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকাতে গ্রন্থ-সমালোচনা অথবা নানাজনের বইয়ে লেখা 'ভূমিকা'—এই সব কিছুই একত্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে তাঁর বিপুল সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। যোগ্য সমালোচকের হাতে সমালোচনাও 'শিল্প' হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি সত্য। তাঁর মতো যুগন্ধর কবির হাতে সাহিত্যের সমালোচনাও হয়ে উঠেছে 'সাহিত্য'। রবীন্দ্রনাথের লেখা অধিকাংশ সমালোচনাকেই তাই 'সমালোচনাসাহিত্য' বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা নিয়ে বেশ কিছু ভালো কাজ আছে। কিন্তু প্রায়োগিক বা ফলিত সমালোচনামূলক লেখাসমূহকে ঘিরে সামগ্রিক কাজ খুব বেশি হয়নি। তাঁর লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি আমার নিজের বেশ পছন্দের। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে এই ক্ষেত্রটি আমি আমার গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি।

শ্রীনিকেতন গঠনে এলমহার্স্টের অবদান বিষয়ে এম.ফিল করার পর যখন রবীন্দ্রনাথ বিষয়েই পিএইচ.ডি করব বলে মনস্থির করি, তখন আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন অধ্যাপক স্যমন্তক দাস। সাক্ষাৎকার পর্ব শেষে মনোনীত হওয়ার পর তিনিই আমার তত্ত্বাবধায়ক হন। এই সন্দর্ভের সিংহভাগই তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত। কিন্তু ২০২২ সালের জুলাই মাসে ওঁর আকস্মিক প্রয়াণ আমাদের শোকবিধ্বস্ত করে দেয়। এই কাজ শেষ হতে দেখলে তিনি হয়তো সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কিন্তু সে সুযোগ হল না। ওঁর স্মৃতির প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এরপর আমার তত্ত্বাবধায়ক হন অধ্যাপক দেবশ্রী দত্তরায়। আমার গবেষণা কাজের সমস্ত বাধা তিনি নিজে হাতে দূর করে দিয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা আমি পেয়েছি। অধ্যাপক দত্তরায়ের প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের আরও তিনজন সম্মাননীয় অধ্যাপক আমাকে নানা সময়ে পরামর্শ

দিয়েছেন। এঁরা হলেন অধ্যাপক কুণাল চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অভীক মজুমদার ও অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ ও অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণার প্রথম দুই বছর আমি তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে স্টেট ফেলো পদে নিযুক্ত থেকে বৃত্তি লাভ করেছি। পরে চাকরিতে যোগ দেওয়ায় বৃত্তি ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রথম দুই বছর স্টেট জেআরএফ স্কিমে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বিভাগের কাছে ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। ওই দুই বছর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে কেটেছে আমার জীবনের অন্যতম সেরা সময়। লিখতে গিয়ে সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ছে।

প্রয়োজনীয় বইপত্র ও পত্রপত্রিকার জন্য আমি মূলত নির্ভর করেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের ওপর। যাদবপুরের বাইরে যে দুটি গ্রন্থাগার অনবরত ব্যবহার করেছি সে দুটি হল রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরি, গোলপার্ক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার। গবেষণার প্রয়োজনে দুবার যেতে হয়েছে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে। সেখানকার আর্কাইভ ও লাগোয়া গ্রন্থাগারটিও ব্যবহার করেছি। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

ব্যক্তিভিত্তিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রথমেই মনে পড়ছে আমার সতীর্থ ও দিদি অনিন্দিতা মণ্ডলের নাম। প্রশান্ত পালের ‘রবিজীবনী’র মতো অমূল্য গ্রন্থের নয়টি খণ্ডই তিনি আমাকে নিঃশর্তে দান করেছেন। তাঁর এই স্নেহের ঋণ আমি চিরদিন মনে রাখব। টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউটের শিক্ষকবৃন্দ ও সতীর্থরাও আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে দিদি বনানী মল্লিকের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করছি। অধ্যাপক শ্রীলা বসুর সঙ্গে গবেষণার বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি।

শেষে শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাঁকে, যাঁর জন্য এই গবেষণা, যাঁকে ভালোবেসে আমার বাংলা পড়তে আসা আর যাঁর প্রেরণায় নিরন্তর পথ চলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘আপনাকে দীপ করি জ্বালো/আপনার যাত্রাপথে আপনাকেই দিতে হবে আলো’। এই গবেষণার প্রতি পংক্তিতে তাঁর হাত ধরেই এগিয়েছি আবার প্রয়োজনে তাঁর সমালোচনাও করেছি—সেই স্পর্ধাও তো তাঁরই দেওয়া।

সূচিপত্র

ভূমিকা—	1
প্রথম অধ্যায় : প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা--	7
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	28
ক) প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্য-সমালোচনা ও রবীন্দ্রচিন্তায় এর উত্তরাধিকার—	29
খ) সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	48
তৃতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	172
চতুর্থ অধ্যায় : বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	232
ক) প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	233
খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	281
পঞ্চম অধ্যায় : বিদেশি সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ—	379
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার : রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার সামগ্রিকতা—	456
পরিশিষ্ট-১ –	483
পরিশিষ্ট-২ –	487
গ্রন্থপঞ্জি—	489

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ যেমন রসস্রষ্টা, তেমনই রসভোক্তা। ভোক্তার মন নিয়ে বিশ্বের নানা ধরণের সাহিত্য তিনি যে শুধু পড়েছেন তাই-ই নয়, সেই সব সাহিত্য পঠনের পাঠ-প্রতিক্রিয়া ও আনন্দ-বেদনাকে নিজের মতো করে প্রকাশ করেছেন। এইভাবেই তৈরি হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাধর্মী বিচিত্র সব লেখা। মাত্র পনেরো বছর বয়সে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী' (১৮৭৬ খ্রিঃ) প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনাধর্মী লেখালেখির সূত্রপাত, যা চলেছে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমালোচনা করেছেন নানা ভাবে, নানা রূপে। কখনও তাঁর মাধ্যম হয়েছে প্রবন্ধ, কখনও চিঠিপত্র আবার কখনও মৌখিক অভিভাষণ। এগুলির মধ্যে অনেক লেখাই রম্যতা ও প্রসাদগুণে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছে। যেগুলিকে অনায়াসেই 'সমালোচনাসাহিত্য' হিসেবে চিহ্নিত করা চলে। অর্থাৎ শিল্পের আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কলমে শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে শিল্প।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্য-তত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছু ভালো বইপত্র আছে। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ', বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব', অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখাসমূহ নিয়ে সামগ্রিক গবেষণার অভাব আছে বলেই মনে হয়। সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' ও পিনাকী ভাদুড়ির 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' এই দিক থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ কিন্তু তার মধ্যেও সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পরিচয় উঠে আসেনি। সেই দিকগুলো বিবেচনায় রেখেই আমরা বর্তমান গবেষণার পরিকল্পনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ দেশ-বিদেশের নানা ধরণের সাহিত্য পড়েছেন ও তার ভিত্তিতে সেগুলি সমালোচনা করেছেন। ফলে তাঁর সমালোচনা বিচিত্র সাহিত্যবর্গকে আশ্রয় করেছে। যেমন বাংলার লোকজ সাহিত্য, ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য, পুরনো ও তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য এবং ইংরেজি, ইতালীয়, ফ্রেঞ্চ, জার্মানসহ নানা বিদেশি সাহিত্য বিষয়েও তাঁর নানা লেখা ও মন্তব্যাদি পাওয়া যায়। এই বিচিত্র ও বিপুল সমালোচনাধর্মী লেখালেখির অনেক অংশই আজও গ্রন্থভুক্ত বা

রচনাবলীবদ্ধ হয়নি। যেমন–কবি কালিদাস রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি কোনও গ্রন্থে এমনকি পত্রিকাতেও বেরোয়নি, সেটি দেখবার একমাত্র উপায় রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা। আবার ইংরেজ কবি শেলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটি শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অভিভাষণ, যা পরে 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও (শ্রাবণ, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থভুক্ত হয়নি। নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত এই সব লেখাগুলিকে সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা আমাদের গবেষণার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয়ত, এইসব সমালোচনামূলক লেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্ধারণ করাও আমাদের এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাতে বদল এসেছে একাধিক। এই পরিবর্তন তাঁর সমালোচনাতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে চেয়েছি।

চতুর্থত, আমাদের দেশে এবং প্রতীচ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যে তত্ত্বরূপ ও ধারা তৈরি হয়ে উঠেছে, সেই ধারার মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার কোনও সংযোগ আছে কিনা অথবা কোথায় এবং কতটুকু সংযোগ আছে তাও আমরা বিচার করে দেখেছি।

রবীন্দ্রনাথের বিপুল পরিমাণ সমালোচনামূলক লেখাকে সময়কালের ক্রমানুযায়ী না সাজিয়ে আমরা বিষয়ভিত্তিতে বর্গীকরণ করেছি। যেমন লোকসাহিত্য সমালোচনা, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা, বাংলা সাহিত্য সমালোচনা ও বিদেশি সাহিত্য সমালোচনা। আমাদের মনে হয়েছে এভাবে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণের দ্বারা আলোচনা করলে তুলনামূলক বিশ্লেষণের রূপরেখাটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছভাবে ধরা পড়বে।

আমাদের সন্দর্ভটিকে সর্বমোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল:

প্রথম অধ্যায়ে প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতিজগতের এই নতুন বিদ্যা, যার পারিভাষিক নাম 'সাহিত্যসমালোচনা' ; তা লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মূলত রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এবং সেকালের

নানা পত্রপত্রিকায় সাহিত্যসমালোচনার যে ধারা গড়ে উঠেছিল, তার একটি সম্যক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সম্বন্ধে। এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ। প্রথম ভাগে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার নানা সিদ্ধান্তগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সাহিত্যভাবনায় কীভাবে গ্রহণ করেছেন, তা আলোচিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় উপবিভাগটিতে ফলিত সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা স্থান পেয়েছে। উপনিষদকে আমরা সাহিত্য বলেই মনে করি, তাই উপনিষদ দিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। ধম্মপদ প্রাকৃত ভাষায় লেখা হলেও এর সঙ্গে সংস্কৃতের নিবিড় যোগ আছে। ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'কে রবীন্দ্রনাথ দুটি মাত্রায় বিচার করেছেন। এক, সাহিত্যের দিক আর দুই, সমাজেতিহাসের দিক। সাহিত্যের দিক থেকে রসের নিত্যতার সূত্রে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সঙ্গে এর সম্পৃক্তির কথা আর সমাজেতিহাসের দিক থেকে কৃষিআশ্রয়ী আর্যসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও সেইসঙ্গে জাতিসংঘাত ও জাতিসমন্বয়ের কথা প্রধান হয়েছে। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে 'মেঘদূত' একটি পরিপূর্ণ ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা, কুমারসম্ভবের সৌন্দর্যকে কল্যাণবোধের মাপকাঠিতে বিচার করা হয়েছে। 'শকুন্তলা'য় একদিকে বঙ্কিমবিরোধ ও অপরদিকে শকুন্তলার প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ও পুরুষতন্ত্রের দ্বারা সেখান থেকে উচ্ছিন্নতার যে ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তাকে এই সময়ে দাঁড়িয়ে ইকোফেমিনিজমের আলোয় পাঠ করা সম্ভব। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তুলনামূলক রীতিআশ্রয়ী ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে লোকসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ। বাইশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম লোকসাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'বাউলের গান'। এরপর বাউলের তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন ও বলেছেন। সেগুলোর বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য বিশ্বের সামনে সংকীর্ণ জাতীয়তাপ্রসূত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামিতার বিকল্প হিসেবে বৈশ্বিক একতার আদর্শ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পাঠকের কাছে তুলে ধরা। জাতীয় জীবনের সন্ধিলগ্নে দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পের একজন সিরিয়াস সংগ্রাহক হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সমালোচনা এসেছে তারই বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে। ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ ও প্রবচন, পল্লিগীতি, কারুশিল্প—লোকসাহিত্যের এই প্রতিটি সংরূপের সংগ্রহ, সংকলন, সমালোচনা-লিখন ও প্রকাশের সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে ছিলেন। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসাই তাঁর এই কাজের প্রত্যক্ষ প্রেরণা।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ। প্রাগাধুনিক পর্যায়ে মূলত বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের সমালোচনা। বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনার নানা বৈচিত্র্য। একদিকে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' এর সম্পাদকীয় ক্রুটির বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা অপরদিকে বৈষ্ণব পদে ব্যবহৃত 'নিছনি', 'পঁহু' শব্দের ব্যুৎপত্তির অনুসন্ধানী আলোচনা। মঙ্গলকাব্যকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই শিব বনাম শক্তির সংঘাত হিসেবে দেখেছেন, যার যৌক্তিকতা নিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলেছি।

আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি সুবিশাল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন থেকে শুরু করে ত্রিশের দশকের আধুনিক কবি ও গদ্যলেখকদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় সকলেই রবীন্দ্র-সমালোচনার আওতাভুক্ত। ব্যক্তিগত চিঠি, গ্রন্থ-সমালোচনা, অভিভাষণ নানা ফর্মে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক লেখাগুলিকে আমরা এই পর্যায়ে যথাসাধ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। আধুনিক কবি ও গদ্যলেখকদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যরুচির অমিল সমালোচনায় উঠে এসেছে। জগদীশ গুপ্ত বা শরৎচন্দ্রের সমালোচনা বিষয়েও নানা প্রশ্ন বা আপত্তি জাগা স্বাভাবিক।

পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরেজিসহ বিদেশি সাহিত্য সমালোচনার বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে আমেদাবাদে বসবাসকালে বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস লিখবেন এই সংকল্প নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন দুটি প্রবন্ধ, 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য' ও 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য'। টমাস চ্যাটার্টন, টেনিসনের কবিতা, শেলি ও ইয়েটসকে নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা রয়েছে। শেকসপিয়র ও অন্যান্য ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের সম্পর্কেও তাঁর বিক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। 'আধুনিক কাব্য' রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা, যেখানে 'বার্নস', 'ওরিক জনস', 'এমি লোয়েল', 'এজরা পাউন্ড, 'টি এস এলিয়ট', 'এডওয়ার্ড রবিনসন' ও চীনা কবি 'লী পো' এর কবিতা অনুবাদসহ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইংরেজি কবিতা বিষয়ে তাঁর আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

ইতালিও কবি দান্তে ও পেত্রার্কার জীবনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’তে প্রকাশ করেন দুটি প্রবন্ধ ; ‘বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য’, ‘পিত্রার্কা ও লরা’। উভয় কবির কাব্যরচনার প্রেরণা হিসেবে যে প্রেম ক্রিয়াশীল বলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন তা ইতালির প্রাচীন ত্রুবাদুর প্রেমেরই অনুরূপ।

জার্মান মহাকবি গেটের জীবনে দান্তে ও পেত্রার্কীয় প্রেমের বিপরীত আদর্শ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেকান্ত প্রেমজীবন নিয়ে লেখা ‘গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ’ প্রবন্ধটি। এছাড়াও ছিন্নপত্রাবলীর একাধিক চিঠিতে গেটে প্রসঙ্গ আছে। রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বসাহিত্য’ ভাবনা গেটের ‘Weltliteratur’ এর অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ফরাসি সাহিত্য পড়েছেন মূলত ইংরেজি ভাষাতেই। Joseph Joubert এর aphoristic স্টাইলে লেখা পঁসেগুলি ও Amiel’s এর ‘জার্নাল ইনটাইম’ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ আছে। এমিল জোলা ও থিয়োফেল গোতিয়ের উপন্যাস ‘মাদমোয়াজেল দ্য মোঁপা’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন আছে।

এছাড়াও ১৩০১ বঙ্গাব্দের ‘সাধনা’য় প্রকাশিত ‘সাহিত্যের গৌরব’ প্রবন্ধে হাঙ্গেরিয়ান লেখক মৌরিয়স য়োকাই ও পোলিশ লেখক জোসেফ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্কির দুটি উপন্যাস যথাক্রমে ‘Eyes like the Sea’ ও ‘The Jew’ নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। ঐ দুই লেখকের লেখকজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে সে দেশে যে জাতীয় উৎসব হয়েছিল, তার সঙ্গে আমাদের দেশে প্রতিতুলনা করে ব্যথিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি উপসংহার। রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার সামগ্রিকতাকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। গবেষণা পরিক্রমা শেষে এই পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য সমালোচনার মূল সূত্র ও আমাদের সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করেছি। ‘রসের সমগ্রতা’, ‘রূপের অভিনবত্ব’ আর ‘আনন্দবাদ’ সাহিত্যের কাছে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মূল অন্বিষ্ট। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনার বদল ও সমকালীন নানা সাহিত্যবিতর্কগুলির ছাপ সমালোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমালোচনার ধারাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রসমালোচনার যোগ কোথায় ও কতটুকু তাও আমরা দেখিয়েছি এই পরিচ্ছেদে।

অধ্যায়গুলির শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ একাধিক বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। এই ভূমিকাগুলি সরাসরি সাহিত্য সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা না হলেও এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার পরিচয় নিশ্চয়ই রয়ে গেছে এই বিবেচনায় সেইসব রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকাগুলির একটি তালিকা প্রকাশকালসহ পরিশিষ্টে দেওয়া হল। আর সবশেষে রইল গ্রন্থপঞ্জি।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা যেহেতু নানা ভাষার সাহিত্যকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, তাই এগুলির সম্মিলিত আলোচনার দ্বারা তুলনামূলক চর্চার একটি প্রেক্ষিত তৈরি হয়ে ওঠে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যভাবুকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সমালোচকসত্তার প্রতিতুলনাও এখানে রয়েছে। এই সব কারণে অভিসন্দর্ভটির নামকরণে 'তুলনামূলক বিশ্লেষণ' কথাটি রাখা হয়েছে।

আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের রচনা ও উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য রচনাবলী অথবা বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যখন যে গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে, অন্ত্যটীকায় তার বিবরণ যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অন্ত্যটীকা ও গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে *MLA Handbook for Writers of Research Papers* বইয়ের সপ্তম সংস্করণটিকে মোটামুটিভাবে মান্য করা হয়েছে। তবে বাঙালি ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখের ক্ষেত্রে পদবী আগে বসানোর ইউরোপীয় রীতিটিকে আমরা সচেতনভাবেই বর্জন করেছি। বানানের ক্ষেত্রে সর্বদাই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গবেষণা দেশ-বিদেশের সুবিস্তীর্ণ রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার অঙ্গনে যদি কিছুমাত্র অবদান রাখতে পারে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

প্রথম অধ্যায় : প্রাক-রবীন্দ্রযুগে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার উদ্ভব ও বিকাশের ধারা

রসতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারপ্রণালী বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের বিষয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃতিজগতের এই নতুন বিদ্যা, যার পারিভাষিক নাম 'সাহিত্যসমালোচনা' ; সেটি লাভ করেছিল। উনিশ শতকের পূর্বে প্রাগাধুনিক যুগে বাংলায় যে সাহিত্য সৃজিত হয়েছিল সেটি মূলত সুর-তাল-লয় সহযোগে সংগীতনির্ভর এবং প্রত্যক্ষভাবে দেবমাহাত্ম্য প্রচার ও পরোক্ষভাবে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। রসসাহিত্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যশাকাঙ্ক্ষী হয়ে প্রাগাধুনিক যুগের কোনো কবিই কোনো কাব্য রচনা করেননি। তাই রসের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃজিত সাহিত্যের বিচার বা পরিচয়দানের কোনো উপলক্ষ্যই তখন তৈরি হয়নি। তবে প্রাচীন বাংলা তথা ভারতে জ্ঞানচর্চার একটি বিশেষ ধারা হিসেবে 'অলংকার শাস্ত্র' এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বহমান ছিল, যদিও তা মূলত সাহিত্যের তত্ত্ব, সংরূপ, বিচার ও পাঠকের মনে সাহিত্যপাঠের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছে, ফলিত সমালোচনা নিয়ে নয়।

উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে যখন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যসমালোচনার অঙ্গনে পদার্পণ করেন, তখন বাংলায় ফলিত সাহিত্যসমালোচনার চল শুরু হয়েছে। রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এবং সেকালের নানা পত্রপত্রিকায় অন্যতম কলাম হিসেবে সাহিত্যসমালোচনার একটি ধারা গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবপুষ্ট সেইসব সমালোচনা কখনো ক্লাসিক, কখনো রোমান্টিক, কখনো ক্লাসিক-রোমান্টিকে মিশ্রিত। এই ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে সমালোচনা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করার পূর্বে রবীন্দ্র পূর্ববর্তীকালে বাংলা সমালোচনার জগৎ কেমন ছিল, তার একটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির কোনো Political History উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত ছিল না। উনিশ শতকের সবচেয়ে ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তি বঙ্কিম এ নিয়ে প্রভূত আক্ষেপ করেছেন। যেখানে রাজনৈতিক ইতিহাসই নেই, সেখানে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা বা সেগুলির সমালোচনা করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে 'বাংলা সাহিত্য সমালোচনা' নামক সংরূপটি গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের হাতে, যাঁরা সরাসরিভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনাও যে সাহিত্যচর্চার একটি বিশেষ সংরূপ, উনিশ শতকের আগে বাঙালির তা জানা ছিল না। পাশ্চাত্য ধাঁচে উনিশ শতকের বাংলায় সাহিত্য সমালোচনার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল, তার আদর্শগত ধারা মূলত দুটি। ক্লাসিক সাহিত্যবিচার পদ্ধতি ও রোমান্টিক সাহিত্যবিচার পদ্ধতি। ইউরোপের ভাব-সমুদ্র মন্থন করা এই দুটি ঢেউ সেদিন সাহিত্যমোদী বাঙালির মনোভূমিকে সবচেয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই প্রাসঙ্গিক হবে বিবেচনা করেই আমরা ইউরোপীয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক সমালোচনা পদ্ধতির মূল সূত্রগুলি উল্লেখ করলাম।

ক্লাসিকপন্থী সাহিত্যতত্ত্ব/সাহিত্যবিচার প্রণালীর লক্ষণগুলি নিম্নরূপ :

ক. সাহিত্য হল জগৎ সংসারের শিল্পিত অনুকরণ। শিল্পী জগতের দিকে চেয়ে যা দেখে, জগতের চরিত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাই দিয়েই সাহিত্য রচনা করে।

খ. সাহিত্য একটি বিশেষ নির্মাণপদ্ধতি। সাহিত্যিকের সচেতন মন বহির্বিশ্ব থেকে পাওয়া উপাদানকে কয়েকটি বিশেষ tools (যেমন অলংকার, ছন্দ, অলংকৃত বাক্য, কল্পনাশক্তি) ব্যবহার করে একটি বিশিষ্ট রূপ দেন। তাই ক্লাসিকাল মতে সাহিত্য হল কবি বা লেখকের সচেতন মনের একটি বিশিষ্ট নির্মাণপদ্ধতি।

গ. ক্লাসিক মতে, সাহিত্যের লক্ষ্য সত্যপ্রচার করা। এটি যে সবসময় ঘটনার সত্য হবে, তা নয় কিন্তু ঘটনার অন্তর্নিহিত মর্মসত্য হবে। সাহিত্যিককে হতে হবে মোটের ওপর বাস্তববাদী।

ঘ. সাহিত্যের সঙ্গে সমাজকল্যাণ ও নীতির প্রশ্নটি সব সময়ে জড়িয়ে থাকবে। সাহিত্য কখনোই অকল্যাণকর অথচ সুন্দর—এমনটা হবে না। সাহিত্যের কাজ নীতি ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা করা।

রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব/সাহিত্যবিচারপ্রণালী ক্লাসিসিজমের পুরো বিপরীত। এর মুখ্য লক্ষণগুলি নিম্নরূপ :

ক. এই মতে সাহিত্য সচেতন মনের নির্মাণ নয়, অবচেতন মনের সৃষ্টি। লেখক অন্তরের তাগিদ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

খ. সাহিত্য অনুকরণ নয়। তা শিল্পীমনের subjective আত্মপ্রকাশ। সৃষ্ট সাহিত্যে সাহিত্যিক নিজেকেই উন্মোচন করেন।

গ. রোমান্টিকদের বাস্তববাদী হওয়ার কোনো দায় নেই, কারণ তাঁরা বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য(অনুভূতির সত্য) পৃথক বলে মনে করেন। তাঁদের কাছে সাহিত্যের সত্য বাস্তব সত্য অপেক্ষাও অধিকতর সত্য।

ঘ. সাহিত্যের সঙ্গে সমাজকল্যাণ ও নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। সাহিত্য হবে দেশ-কাল-নীতি-নিয়ম নিরপেক্ষ। সমাজের চোখে অসুন্দর, অকল্যাণকর হয়েও একটি কাব্য বা নাটক আর্টের বিচারে সুন্দর হতেই পারে। উত্তর-রোমান্টিক পর্বে এমিল জোলা অথবা বালজাকের লেখাতেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়।

সাহিত্য সমালোচনার আদিপর্বে উনিশ শতকের বাঙালি সমালোচকেরা মূলত এই দুই ধারার সাহিত্য আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিচার প্রণালীর মধ্যে এই দুই ধারার মিশ্রণ দেখা যাবে। বঙ্কিমের উত্তরসূরী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিচার প্রণালীও মোটের ওপর রোমান্টিক কিন্তু পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনায় অন্যান্য ভাবোপদান মিশে গিয়ে এর জটিলতা বৃদ্ধি করেছে।

প্রাগাধুনিক বাংলার কিছু কিছু পুথিসাহিত্যে তরল ও বিচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সমালোচনার দু'একটি আভাস অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এর কারণ সেকালের বাংলার টোল ও চতুষ্পাঠীগুলিতে স্মৃতি-ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-ব্যাকরণ ও অলংকারের চর্চাও ব্যাপকভাবে হতো। বিশেষ করে বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণঃ' গ্রন্থটির সঙ্গে শিক্ষিতজনমাত্রেই পরিচিত ছিলেন। তাই যারাই একটু আধটু সংস্কৃত লেখাপড়া শিখেছিলেন, তারা প্রত্যেকেই পূর্ববর্তী কবিদের শব্দপ্রয়োগের

ভ্রান্তি, অলংকারের দোষ ও ছন্দের বৈলক্ষণ্য দেখিয়ে কিছু তির্যক মন্তব্য করেছিলেন। এই মন্তব্যগুলিকে আধুনিক অর্থে সাহিত্যসমালোচনা বলা যাবে না বরং এগুলি সেইসব কবিদের অশিক্ষিতপটু সাহিত্যবিচারপ্রণালীর বাহ্য প্রকাশ মাত্র, এর বেশি তার আর কোনো মূল্য নেই। মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের এই অনুবর্তন চলেছিল। অকিঞ্চিৎকর হলেও ইতিহাসের কালক্রম রক্ষা করার প্রয়োজনে নিচে তার একটি বিবরণ দেওয়া হল।

ক। অলংকারশাস্ত্রের অনুবর্তন ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর প্রতিফলন

মনসামঙ্গল ধারার প্রাচীন কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যরচনার পশ্চাতে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা ১. দেবীর আদেশ পেয়ে দেবীমাহাত্ম্যজ্ঞাপন ২. পূর্ববর্তী কবি কানা হরিদত্তের রচনার অসার্থকতা প্রদর্শন। আপাতত দ্বিতীয় কারণটিই আমাদের বিচার্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে বিজয়গুপ্ত টিপিকাল দেহাত্মবাদী আলংকারিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কানা হরিদত্তের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন –

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে
জোড়াগাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।।
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর
এক গাইতে আর গায় নাই মিত্রাক্ষর।
গীতে মতি নাহিক মিছে লাফফাল
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।[১]

কথার অসঙ্গতি, মিত্রাক্ষরহীনতা, গীতে অমতিত্ব- গুপ্তকবি হরিদত্তের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগগুলি এনেছেন, এগুলি সবটাই কাব্যদেহের অবয়বসংস্থানগত আলংকারিক দোষ। যা কাব্যের সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ ব্যাপার ; আভ্যন্তরীণ রসসমালোচনা কবির চেতনার মধ্যেই ছিল না। ব্যাকরণ ও অলংকারের আবর্ত সেকালের শিক্ষিতজনের চেতনাকে কেমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার প্রমাণ আছে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে যথাক্রমে শ্রীমন্ত ও লাউসেনের বাল্যশিক্ষার বিবরণে। শ্রীমন্তের পাঠ্যতালিকার মধ্যে রয়েছে মম্মট ভট্টের 'কাব্যপ্রকাশ', বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণঃ', বামনের 'কাব্যালঙ্কারবৃত্তি' ও দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'।[২] স্বয়ং চৈতন্য অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের গঙ্গামহিমাবিষয়ক শ্লোকে অলংকারের দোষ দেখিয়ে মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ ও ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।[৩] চৈতন্যের নির্দেশে তার ভাবপরিকর বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা বিশেষত রূপগোস্বামী প্রণীত 'উজ্জ্বলনীলমণি', 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থদ্বয়ে যে নব্যবৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন, তাও মুখ্যত প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের ওপরেই আধারিত। অলংকারশাস্ত্রনিরপেক্ষ রসসমালোচনার নতুন কোনো সূত্র তখনও দুর্লক্ষ্য ছিল। এরূপ অনুবর্তনের পরম্পরায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বৈপ্লবিক ব্যতিক্রম আনলেন। রীতিবাদী অলংকারশাস্ত্রের বাগর্থবহুল কৃত্রিম ভাষা পরিত্যাগ করে তিনি 'লোক বুঝাবার জন্য' ও 'প্রসাদগুণ' আনার জন্য কাব্যে 'যাবনীমিশাল' ভাষা প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হলেন না –

পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবার পারি
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।[৪]

কাব্যের প্রকৃত আবেদন যে ভাষায় নয়, ভাবে – তাও নাগরিক বৈদগ্ধ্যে পরিশীলিতরুচি কবির দৃষ্টি এড়ায়নি –

প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে

যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।[৫]

কথাটি যদিও রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী'র প্রতিধ্বনি (ভাষা জা হোদু সা হোদু) তবুও ভাষা অপেক্ষা ভাব বা কাব্যের বিষয় যে কবির কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সে কথা তাঁর বক্তব্যে চাপা থাকে না। প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রের অনুবর্তনের ধারায় ভারতচন্দ্র তাই আংশিক হলেও ব্যতিক্রমী মর্যাদার অধিকারী।

খ। বাংলা সমালোচনার ঊষালগ্নঃ উনিশ শতক

উনিশ শতকে পাশ্চাত্যপ্রভাবে বাংলায় যে সার্বিক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, তার ফলে সাহিত্যচিন্তার জগতেও আমূল পরিবর্তন এল। রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের রচনায় এবং সংবাদপ্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ, বিবিধার্থ সংগ্রহ সর্বোপরি বঙ্গদর্শনের পাতায় সাহিত্যসমালোচনার নতুন আদর্শ দেখা দিল। ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৫৩-৫৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এ 'প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত' প্রকাশ করেন। ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্তের মতো প্রাচীন কবি এবং রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, রাম বসু, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রচনার পেছনে ঈশ্বরগুপ্তের ঐতিহ্যানুসন্ধান ও সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধ – এ দুয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও সংগ্রহ-সম্পাদনার মাঝে বিচারশক্তির পরিচয় যে একেবারে অনুপস্থিত, তা নয়। 'নৌতনমঙ্গল' এর কবি ভারতচন্দ্রের দৈবপ্রভাবমুক্ত রাজসভার প্রতিবেশটি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে, সেকথা তিনি বলেছেন –

> পদ্যের দ্বারা ইহার পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, পরিশ্রম এবং যত্নের ব্যাপারে যত প্রকাশ পাইয়াছে, দৈবশক্তির পরিচয় তত প্রকাশ পায় নাই, ফলতঃ যে পর্যন্ত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও সাধারণ নহে।[৬]

বাংলা সাহিত্যসমালোচনার আদিযুগের ইতিহাস লিখতে হলে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। ১৮৫২ খৃস্টাব্দের ১৩ই মে বীটন সোসাইটির অধিবেশনে তিনি 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করেন। পরে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ রচনা করার একটি আশু উদ্দেশ্য ছিল। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বীটন সমাজের অধিবেশনে কোনো কোনো সভ্য বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা দেখান। সেই সভায় কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন যে বাঙালিরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীন থাকায় তাদের মধ্যে প্রকৃত কবি কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। এই মতের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি উক্ত সভাতেই একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের নাম 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' [৭] এই প্রবন্ধে সাহিত্যবিষয়ক কতকগুলি মৌল সূত্রকে রঙ্গলাল তুলে এনেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ-

১। পরাধীন দেশে প্রকৃত কবির জন্ম সম্ভব কিনা, প্রতিপক্ষের এই আপত্তি তীব্রভাবে খণ্ডন করেছেন রঙ্গলাল। বিশ্বসাহিত্য থেকে উদাহরণ চয়ন করে এনে তিনি দেখিয়েছেন হোমর, ভার্জিল, ভর্তৃহরি, শিলহন, সুরদাস, তুলসীদাস, জয়দেব- এরা সকলেই পরাধীন দেশের নাগরিক ছিলেন, তবুও তাঁরা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কারণ কবিরা অন্তরে স্বাধীন ; তাঁদের সাধনা বহির্প্রভাব নিরপেক্ষ। এই কথাটি তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন।

২। প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই তিনি কাব্যরচনার জন্য উন্নত কাব্যভাষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন –

> কোন পরম জ্ঞানী গ্রন্থকার (খুব সম্ভবত মেকলে) কহেন, In order that poetry may flourish in a country, it's inhabitants must be gifted with a lively imagination, a delicate and correct ear. Poetry requires a figurative, melodious, rich and abundant language ; varied in its construction and capable of expressing everything, a language whose various ways, enable the poet to blend his primitive colours, and to produce from the mixture, an infinity of new and appropriate shades.[৮]

এই ইংরেজি উদ্ধৃতি তুলে রঙ্গলাল প্রশ্ন তুলেছেন বাংলা ভাষায় কবিতা রচনার উপযোগী এইসব গুণ আছে কিনা! এরপর নিজেই এই সন্দেহের নিরসন করে বলেছেন কোমলতা, মিষ্টতা, শব্দসম্ভার, অলংকার, শব্দচিত্র বাংলাভাষার মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা দান করবে।

৩। এই প্রসঙ্গেই রঙ্গলাল প্রাচীন বাংলা কাব্যের দৃষ্টান্ত এনে দেখিয়েছেন ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রেম ও সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়েছে। এর তুল্য দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে তিনি শেকসপীয়রের নাটকের কাব্যগুণ আলোচনা করেছেন। ওথেলো, হ্যামলেট প্রভৃতি নাটক এবং 'ভীনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস' ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ উৎকলন করে তিনি সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

৪। কাব্যের মৌলিকত্ব নির্ধারণ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন অপর কবির কাছ থেকে ভাবগ্রহণ করলেই কোনো কবির মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। পরিগ্রহণ করে নবসৃজনই মৌলিকতার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্তস্থল। এ প্রসঙ্গে রঙ্গলাল লিখেছেন –

> অনেকে কহেন রায়গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃশ্যমান না হয়, মহাকবি বারজিলের এবং মিল্টনের কি এই দোষ নাই?[৯]

৫। সহজাত কবিত্বশক্তি যে বিদ্যানিরপেক্ষ একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার তাও রঙ্গলাল প্রকাশ করেছেন। বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রেই যে সুকবি হন না ; কবিত্বশক্তি যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিভা, রঙ্গলাল একথাও বলেছেন-

> একথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেও যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপীয়র অপেক্ষা বেন জনসন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন।[১০]

৬। বাঙালি মাতৃভাষা অথবা বিদেশি ভাষার মধ্যে কোনটিকে সাহিত্যরচনার ভাষা হিসেবে বরণ করে নেবে, এ বিষয়ে রঙ্গলালের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি সেই ইংরেজিপ্রবল যুগে দাঁড়িয়েও উচ্চকণ্ঠে সাহিত্যরচনায় মাতৃভাষার সপক্ষতা করেছেন –

> আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শষ্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী ফসল ফলাইতে চান অথচ বিবেচনা করেন না, যেরূপ বকুলবৃক্ষে আম্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্তৃক ইংরাজি কবিতা অথবা ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়। যদি বলেন বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যেসকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই ? উত্তর- হইয়াছে, হইবেক না কেন, অশ্বতর শব্দের আগে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই?[১১]

এই সুরেই প্রবন্ধের শেষে বাঙালি সুধীমণ্ডলীকে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে কবি বলেছেন-

> হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন। উর্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক। অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন। দ্বেষ প্রভৃতি জঙ্গলকণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ত্বরায় সুশষ্যলাভ হইবেক।[১২]

রঙ্গলালের এই আহ্বান যে উত্তরকাল ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দেয়নি উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতিতেই তার প্রমাণ আছে।

১৮৫৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত ‘পদ্মিনী উপাখ্যান কাব্যের ভূমিকায় রঙ্গলাল মূলত দুটি কথা বলেছেন-

প্রথমত, “এক্ষণে কাব্য কি?- এবং তদালোচনার ফল কি? ...... সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে ইহার (অর্থাৎ কবিতার) যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা- কাব্যম রসাত্মকং বাক্যম। এই স্বল্পবাক্যে কবিতা কলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহৎ গ্রন্থবিশেষের মর্ম ব্যক্ত হইয়াছে।”[১৩]

দ্বিতীয়ত, "ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।"[১৪]

দেখা যাচ্ছে বিশ্বনাথের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে রঙ্গলাল রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ রস বা সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই কাব্যের মূল বিষয় বলে মনে করেছেন এবং সেইসঙ্গে ক্লাসিক যুগের প্র্যাগম্যাটিক শিল্পবিচারকদের মতো ব্রীড়াশূন্য আদিরসভিত্তিক কবিতার পরিমণ্ডল থেকে বাংলা কবিতাকে বের করে আনতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের সূচনালগ্নে যখন সাহিত্যবিচারে কোনো বিজ্ঞানসম্মত মাণদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন রঙ্গলাল সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং সেই সৌন্দর্যকে সুরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা ভিক্টোরিয় নীতিবাদী সাহিত্যবিচারেরই একটি দেশীয় রূপ।

বাংলা সমালোচনার প্রথম যুগে কাব্যপ্রণেতা ও কাব্যরসিক মধুসূদন দত্তের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পাশ্চাত্যের বিশেষত রোমান্টিক সাহিত্যসমালোচনার সঙ্গে তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে। বন্ধু গৌরদাস বসাক ও রাজনারায়ণ রায়কে তিনি যেসব চিঠি লিখেছিলেন তা ব্যবহারিক অর্থে সাহিত্যসমালোচনা নয় ঠিকই কিন্তু সেগুলির মধ্যে দিয়ে মধুসূদনের সাহিত্যবিচারসম্পর্কিত নানা খণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সমালোচনার অনুকূলে তিনি কবিমনের অনুপ্রেরণাশক্তিকেই কাব্যপ্রণয়নের মূল চাবিকাঠি রূপে বর্ণনা করেছিলেন "The words come unsought, floating in the stream of inspiration"[১৫] । নিজের কবিত্বশক্তি বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "I have tendency in the lyrical way"[১৬] সমসাময়িক কবি রঙ্গলালের কবিত্ব সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় – "He (রঙ্গলাল) reads Byron, scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest school of poetry except, perhaps Byron now and then I like wordsworth better."[১৭] দৈবপ্রতিভার অধিকারী মিলটন সম্পর্কেও তাঁর অভিমত বেশ চমকপ্রদ-

He has glorious name but few readers.... We acknowledge him to belong to a far superior order of beings ; but we never feel for him... He is the deep roar of lion in the silent solitude of the forest.[১৮]

সাহিত্যবোধের দিক থেকে মধুসূদনের সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ যখন তিনি ঘোষণা করলেন সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র বিশেষত সাহিত্যদর্পণধৃত সূত্রানুসারে তিনি মহাকাব্য রচনা করবেন না। “I shall not allow myself to be bound down by dicta of Mr Viswanath of the Sahitya Darpan.”[১৯] এই বৈপ্লবিক পদক্ষেপ তাঁর সাহিত্যসম্পর্কিত চিন্তাভাবনাতেও প্রতিফলিত। তাই কাব্যে ‘Lofty passion’ ও ‘Stern reality of life’ এর কথা তুলে তিনি দেশীয় ঐতিহ্যবিরোধী এক নতুন আদর্শকেই সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

মধুসূদনের সমসাময়িককালে যে দুজন গদ্যকারের সাহিত্যসমালোচনা উল্লেখনীয় তাঁরা হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম ভাগে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা থেকে বোঝা যায় তিনি সাহিত্যে রস ও সৌন্দর্যের চেয়ে নীতিবাদ ও চিত্তশুদ্ধিকেই বড়ো করে দেখেছেন। শকুন্তলার সঙ্গে উত্তরচরিতের তুলনা করে তিনি কালিদাস অপেক্ষা ভবভূতিকেই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যসমালোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তখন সাহিত্যে চিত্তশুদ্ধি ও নীতিবাদের ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল ছিল।

বিদ্যাসাগর মূলত সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করে সাহিত্যবিচারে অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। তিনি ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’ ও স্ব সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় যে সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে তাঁর সাহিত্যবিচারপ্রণালীর মূল সূত্রটি ধরা পড়ে। মধুসূদনের মতো তিনিও পূর্ববর্তী সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রীদের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। এমনকি তাদের মতামতেও খুব বেশি মূল্য দেননি। রঘুবংশের সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য –

রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায় সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত

হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমন সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃতভাষার সর্বপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।[২০]

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রীরা স্বভাবোক্তি অলংকারকে নিকৃষ্ট বলে মনে করতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতে, কালিদাসের কাব্যের যে অংশগুলিতে 'স্বভাবোক্তি অলংকার' ও 'স্বভাবানুযায়ী বর্ণনা' রয়েছে সেই স্থানগুলিতেই কবিত্বের মাধুর্য সর্বাপেক্ষা বেশি ফুটেছে। এছাড়াও সংস্কৃত কবিদের সম্পর্কে তাঁর একটি প্রধান অভিযোগ, সংস্কৃত কবিরা তাঁদের কাব্যে মধুর এবং ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন, জীবনের গভীর, গম্ভীর বিষয়ে তা দিতে পারেননি। -

নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতাপুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেমন হৃদয়গ্রাহিণী ; যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।[২১]

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে উনিশ শতকের সাময়িকপত্রে সাহিত্যসমালোচনার দৃষ্টান্তগুলি বিচার করা যেতে পারে। উনিশ শতকের সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকপত্রগুলি হল সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এর পাতায় প্রাচীন কবিওয়ালাদের রচনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তত্ত্ববোধিনী ছিল মূলত ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক পত্রিকা, ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। এখানে মূলত তত্ত্ব ও দর্শন নিয়ে আলোচনা থাকত, তবুও গৌণভাবে হলেও এই পত্রিকায় সাহিত্যসমালোচনার স্থান ছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত ও ভার্ণাকুলার লিটারেচর সোসাইটি প্রকাশিত মাসিক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এর পাতায় খুব গুরুত্বসহকারে সাহিত্যসমালোচনা প্রকাশিত হতো। সমালোচনার কলামগুলিতে নামবিহীন লেখক বিদ্যাসাগর, প্যাঁরীচাঁদ, রামনারায়ণ, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ বহু গ্রন্থকারেরা সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা লিখতেন। এইসব নামবিহীন কলামগুলির লেখক কে তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন তবে নাট্যকার মনোমোহন বসু তাঁর 'মধ্যস্থ' নামক সাময়িকপত্রে লিখে গেছেন –

মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনিই বিবিধার্থ সংগ্রহে ইহার (সমালোচনার) প্রথম পথ প্রদর্শন করেন।[২২]

কালীপ্রসন্ন বিবিধার্থ সংগ্রহের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রথম ছয় পর্ব (কার্তিক ১৭৭১ শক থেকে চৈত্র ১৭৮১ শক পর্যন্ত) রাজেন্দ্রলাল সম্পাদক ছিলেন। সপ্তম পর্ব থেকে এর সম্পাদক হন কালীপ্রসন্ন। তাই ধরেই নেওয়া হয় নামহীন কলামগুলির মধ্যে কিছু কলাম নিশ্চিতভাবেই কালীপ্রসন্নের রচনা। পাশ্চাত্যরীতিতে শৈলী বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যসৌন্দর্য উপলব্ধি করার ধারা এই পত্রিকাতেই প্রথম শুরু হয়। রাজেন্দ্রলাল নিজে ছিলেন মুখ্যত ঐতিহাসিক। তাই তাঁর কৃত সাহিত্যসমালোচনায় ঐতিহাসিক পটভূমি সর্বদাই দেখা গেছে। তাঁর কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের সমালোচনায় তিনি সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সাহিত্যবিশ্লেষণের ধারা বাংলায় রাজেন্দ্রলালই প্রথম শুরু করেন।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যসমালোচনাকে যথার্থ শিল্পের স্তরে উন্নীত করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে যেমন প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয়েছে, ঠিক তেমন আধুনিক অর্থে সাহিত্যসমালোচনা বলতে যা বোঝায়, তাও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি। আধুনিক বাংলা সমালোচনার পথরেখা নির্মাণ করতে হয়েছে তাঁকে ; তাই তাঁর চিন্তার আলোড়ন সবচেয়ে বেশি, তাঁর মানসদ্বন্দ্ব সর্বব্যাপক। এই দ্বন্দ্ব বঙ্কিমের যুগদ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবুদ্ধি আর প্রাচ্য ধর্মবুদ্ধি ; পাশ্চাত্য আধুনিকত্ব ও সনাতনী হিন্দুত্বের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার থেকেই গড়ে উঠেছে তার সমালোচক মনের দ্বন্দ্ব। সাহিত্য সমালোচনার আদর্শ তিনি নিয়েছিলেন ইউরোপীয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক ধারা থেকে, কিন্তু সেইসঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন নিজস্ব ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শ। তাই তাঁর সমালোচনার মধ্যে একপ্রকার অসম মিশ্রণ ও আপাত স্ববিরোধিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষয়টা বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সমালোচনার লক্ষণগুলি চিনে নিতে হবে –

১। সাহিত্য কী, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্লাসিকপন্থী বলে থাকেন সাহিত্য একটি নির্মাণ, ভাষা দিয়ে নির্মিত একটি বস্তু। এই বস্তু প্রকৃতির বা জগতের অনুকরণে তৈরি। এর কাজ স্বভাবের অনুকরণ করা, জগতের রূপ ও সত্যের অনুকরণ করা। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রী বিরোধ করে বলবেন সাহিত্য অনুকরণ নয়, তা সৃষ্টি। সাহিত্যিক তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরিস্থিত ভাবকে প্রকাশ করেন ও সেইসূত্রে নিজেকেও প্রকাশ করেন।

২। ক্লাসিকপন্থীর মতে, সাহিত্যের লক্ষ্য সত্য আর এই সত্য বাস্তব সত্য। পক্ষান্তরে রোমান্টিকেরা সাহিত্যের লক্ষ্য হিসেবে প্রচলিত অর্থের বাস্তব সত্যকে মানবেন না। সাহিত্যের সত্য তাঁদের কাছে গভীরতর সত্য, উচ্চতর সত্য। একে তাঁরা বলে থাকেন কল্পনার সত্য, সাহিত্যিকের মনোভূমি থেকেই যার সৃষ্টি।

৩। ক্লাসিকপন্থী বলবেন সমাজের হিতাহিত দেখা সাহিত্যকারের কাজ। সাহিত্যিকের রচনা সমাজের পক্ষে শুভ ও কল্যাণকর হবে। এবিষয়ে রোমান্টিকদের মধ্যে দ্বিধা দেখা যায়। কেউ বলেন, সাহিত্যের লক্ষণ সুন্দর, তা সমাজ নিরপেক্ষ। সমাজের কল্যাণের জন্য লেখনী ধারণ সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নয়। আবার রোমান্টিকদের মধ্যে অপরদল বলেন সাহিত্যের সৌন্দর্যসৃষ্টি কখনোই অকল্যাণকর হতে পারে না। সুন্দর মাত্রেই কল্যাণকর।

এখন বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা এই দুই ধারার অসম মিশ্রণ লক্ষ করব। কখনো তিনি রোমান্টিক সৃষ্টিবাদী, কখনো তিনি গোঁড়া অনুকরণবাদী, আবার কখনো এ দুয়ের মিশ্রণে বিশ্বাসী। পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিকতার একটি ধারাও তাঁর সাহিত্যবিচারে প্রবল। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টা বোঝা যাবে। ১৮৮৫ সালে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিম সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রশংসা করেছেন এবং দেখিয়েছেন ঈশ্বর গুপ্ত যতখানি ব্যঙ্গপ্রবণ কবি, সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ততখানি পটু নন-

> মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।[২৩]

এই প্রবন্ধে তিনি রোমান্টিক ধারা অনুসরণে সৌন্দর্যসৃষ্টিকে বড়ো করে দেখেছেন অথচ সেই একই বছর ১৮৮৫ সালে পৌষ মাসে লেখা 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি ক্লাসিকপন্থীদের মতো অনুকরণবাদী-

> যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যের অনুরক্ত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না।[২৪]

আবার এর কিছুকাল পরে ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’ প্রবন্ধের তিন নম্বর সূত্রে দেখব বঙ্কিম লিখেছেন –

> যদি এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।[২৫]

খেয়াল করলে দেখা যাবে শুধু মঙ্গলসাধনের কথা বলেই বঙ্কিম এখানে নিরস্ত হলেন না, সেইসঙ্গে অথবা দিয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টির কথাটিও জুড়ে দিলেন। যা তাঁর মানসিক দোলাচলবৃত্তির প্রমাণ।

সেইসঙ্গে বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন মানুষের যাবতীয় বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, সেটাই অনুশীলনধর্ম। কাব্য বা সাহিত্য সেই বৃহৎ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। “সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। .... সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।”[২৬]

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সাহিত্যের নান্দনিকতাকে সমন্বিত করার একটি চেষ্টা বঙ্কিমের মধ্যে প্রথমাবধি লক্ষ করা যায়। ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ‘উত্তরচরিত’ প্রবন্ধেও এর লক্ষণ আছে। উত্তরচরিতের একটি অংশ উদ্ধৃত করলাম-

> কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নয় – কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন – চিত্তশুদ্ধি জনন। .... তাহারা (কবিরা) সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।[২৭]

বঙ্কিমের প্রভাবে এই আধ্যাত্মিক ও নীতিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যবিচারের এক ধারা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়স পর্যন্ত যা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বঙ্কিমের সমসাময়িক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা এই ধারাটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে আরো একটি ধারার জন্ম দেন, তা হল তুলনামূলক সাহিত্যসমালোচনা। 'প্রকৃত ও অপ্রকৃত' ও 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' এই ধারার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'প্রকৃত ও অপ্রকৃত' তে তিনি মূলত কালিদাসের কুমারসম্ভব ও মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট এর তুলনামূলক বিচার করেছেন ও 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' তে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত পার্থক্যের কারণে শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার চরিত্র বৈশিষ্টের তুলনা করে দেখিয়েছেন উভয়ের মধ্যে কত অমিল। এই ধারা সমসাময়িককালেও অনুসৃত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কালিদাস ও শেক্সপীয়র' প্রভৃতি রচনা এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়।

গ. রবীন্দ্রনাথের শৈশবাস্থায় ঠাকুর বাড়িতে সাহিত্য সমালোচনার পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন বাংলাদেশের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথচলা তখন সবে শুরু হয়েছে মাত্র। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অনূদিত ও মৌলিক নানা গদ্যগ্রন্থ, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', রামনারায়ণ তর্করত্ন-মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাটক, রঙ্গলাল ও মধুসূদনের নতুন ধারার কাব্য বাংলা সাহিত্য জগতেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

ঠাকুর পরিবারে সেই সময়ে ইউরোপীয় সাহিত্যচর্চার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। শেক্‌সপীয়ার, ওয়াল্টার স্কট প্রমুখ ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি কাব্য সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদগুলিও চর্চিত হত। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীরা যেমন—বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু—এঁদের প্রত্যেকেরই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত ছিল। এইসব মিলে রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই এই বাড়ির আবহাওয়ায় সাহিত্য সম্ভোগের পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

সাত বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যের দ্বারা দাশুরায়ের পাঁচালি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত হন। কিশোরীবাবু সরল পয়ারের মৃদুমন্দ গতিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তেন না। রবীন্দ্রনাথের কথায় "তার গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের ঝরণা সুর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে উঠছে যেন জলের নিচেকার নুড়ির আওয়াজ"[২৮]। 'জীবনস্মৃতি'তে ছেলেবেলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ-অভিজ্ঞতার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে— "অন্তঃপুরের বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন"[২৯]। সাত বছর বয়সে রামায়ণ পাঠরত কবির পাঠ্য-বইএর সঙ্গে অশ্রুনিমগ্ন 'সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যতা' তাঁর পরিণত বয়সের সমালোচক সত্তাকে অনেকখানি তৈরি করে দিয়েছিল বলে মনে হয়।

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে তাঁর ছোটোবেলায় বাংলা সাহিত্যের কলেবর ছিল কৃশ। হাতের কাছে পাঠ্য-অপাঠ্য যা বই পেতেন, তাইই গোগ্রাসে পড়তেন তিনি। একটু বড়ো বয়সে শুরু হয় ইংরেজি ও সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা। ইংরেজি সাহিত্যের রীতিমতো চর্চা ছিল ঠাকুরবাড়িতে। শেকস্-পীয়ারের নাটক ভেঙে সত্যেন্দ্রনাথ নাটক রচনা করতেন। ১৮৬৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ শেকস্-পীয়ারের Cymbeline অবলম্বনে 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' রচনা করেন।[৩০](পৃষ্ঠা-৮৪)। রবীন্দ্রনাথের যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন তিনি ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যই একাজে তাকে অনুপ্রাণিত করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে জানিয়েছেন--

> ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি[জ্ঞানচন্দ্র] কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।[৩১]

ম্যাকবেথ অনুবাদের দুটি বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশ এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের প্রথম অংশ অবিশ্বাস্য দক্ষতায় অনূদিত

হয়েছে। শুধু ম্যাকবেথ অনুবাদই নয়, কালিদাসের ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যও এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ আংশিক অনুবাদ করেন, ‘মালতী পুঁথি’তে যার সাক্ষ্য পাওয়া যায়[৩২] । ম্যাকবেথের পাশাপাশি কুমারসম্ভব কাব্যও বাংলায় অর্থ করে রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়েছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাই এই অনুবাদের পেছনেও জ্ঞানচন্দ্রের অনুপ্রেরণা স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেন প্রশান্ত পাল।[৩৩] অর্থাৎ জ্ঞানচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রাক-কৈশোরেই তার সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের মহাকবি শেকস্-পীয়ার ও সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের পরিচয় করিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ‘মালতী পুঁথি’র যে পৃষ্ঠায় এই অনুবাদের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে ঠিক সেই পৃষ্ঠায় বা তার আগে পরে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদও পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি হল ইংরেজ কবি Byron এর ‘Childe Harold’s Pilgrimage’ কাব্যগ্রন্থের একটি স্তবক অবলম্বনে অনূদিত বারো লাইনের একটি কবিতা। এছাড়াও অন্য পৃষ্ঠাতে আরো কতকগুলি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যার চারটে কবিতা Thomas Moore এর লেখা ‘Irish Melodies’ কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া এবং অন্যটা বায়রণের আর একটি কবিতার অনুবাদ[৩৪]।

আমরা এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করলাম রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স পর্যন্ত সাহিত্যচর্চার একটি রূপরেখা তুলে ধরার জন্য। মাতৃভাষার সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের নিবিড় চর্চার দ্বারা রসসাহিত্যের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সমালোচক মনটিও সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। যার পরিণতিতে সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

তথ্যসূত্র

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পা), *বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল,* অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২০০৯, পৃ-৮০।

২. দেবেশ কুমার আচার্য (সম্পা), *কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল(২য় খণ্ড),* সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ১৪০৭ ব, পৃ-৯৭।

৩. সুকুমার সেন (সম্পা), *চৈতন্য ভাগবত (আদিলীলা),* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪, পৃ-৪৬।

৪. সুনীল কুমার ওঝা (সম্পা), *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২, পৃ-১৬১।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ-১৬১।

৬. ভবতোষ দত্ত (সম্পা), *ঈশ্বর গুপ্ত রচিত প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮৯ ব, পৃ-৯৭।

৭. সুদীপ বসু (সম্পা), *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০১০, পৃ-৯৭।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ-৪৭।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ-৭৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃ-৮০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ-৭৯।

১২. পূর্বোক্ত, পৃ-৭৮।

১৩. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকা অংশ', *পদ্মিনী উপাখ্যান,* এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৬ ব, পৃ-১।

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ-১।

১৫. ক্ষেত্র গুপ্ত(সম্পা), *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী,* গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৭০, পৃ-১২৮।

১৬ পূর্বোক্ত, পৃ-১৫১।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৭।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ-১৫১।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩১।

২০. দেবকুমার বসু(সম্পা), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ-১৫।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

২২. ‘মধ্যস্থ’ পত্রিকা, ২৫শে জৈষ্ঠ্য, ১২৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ-৯৭।

২৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব’, *বঙ্কিম রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, জুন ২০১৬, পৃ-৪৮।

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘ধর্ম ও সাহিত্য’, *বঙ্কিম রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ২০১৫ পৃ-১১।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ-১২।

২৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘উত্তরচরিত’, *বঙ্কিম রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-৬১২-১৩।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০ পৃ-৪৫৯।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ-১৭।

৩০. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ-৮৪।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পূর্বোক্ত, খণ্ড-১৭, পৃ-৬৪-৬৫।

৩২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, ১ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৪।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৪।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতবর্ষে মূলত তিনটি ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য বিস্তারলাভ করেছিল। প্রথমটি ইন্দো-ইউরোপীয় যা প্রধানত বৈদিক ও পরে সংস্কৃত সাহিত্যের বাহন হয়। দ্বিতীয়, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য, প্রাচীন তামিল সাহিত্যে যার নিদর্শন মেলে আর তৃতীয়ত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী, ভারতে বসবাসকারী জনজাতিদের মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে যার নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনায় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রথম ধারাটি অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয়জাত সংস্কৃত। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ও জনজাতিদের সাহিত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেভাবে কোনও আলোচনা করেননি। তাই রবীন্দ্রনাথকৃত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যই বুঝব।

বৈদিক সাহিত্যের অংশভুক্ত উপনিষদ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা সকলেই জানেন। অবশ্য আমরা এখানে দর্শন হিসেবে নয়, সাহিত্য হিসেবে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে কীভাবে বিচার করেছেন, তার আলোচনাই করব। পরবর্তীতে রচিত সংস্কৃত কাব্য, নাট্য বিশেষত কালিদাসের রচিত কাব্য এবং নাট্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু সৃজনশীল সাহিত্যধারার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার কাঠামো গড়ে উঠেছিল। অলংকারবাদ, রীতিবাদ, ধ্বনিবাদ, রসবাদ প্রভৃতি নানারকম তত্ত্বের জন্ম হয়েছিল। ভরত, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের মতো সাহিত্যভাবুকদের আবির্ভাব ঘটেছিল। দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনার এই ধারাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেইসঙ্গে এই সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান সিদ্ধান্ত 'আনন্দবাদ' সংস্কৃত সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের থেকেই পাওয়া। এই কথা বিবেচনায় রেখে আমরা এই অধ্যায়টিকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করেছি। প্রথম অংশে রইল সংস্কৃত সাহিত্যভাবনার উত্তরাধিকার কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে প্রভাবিত করেছে তার আলোচনা আর দ্বিতীয় উপবিভাগে রইল সংস্কৃত সাহিত্যের ফলিত সমালোচনা।

ক) প্রাচীন ভারতীয় (সংস্কৃত) সাহিত্য-সমালোচনা ও রবীন্দ্রচিন্তায় এর উত্তরাধিকার

ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শন অনুযায়ী পাঁচটি সত্তা নিয়ে মানুষের চেতনা গঠিত। এগুলি হল – ক। অন্নময় সত্তা খ। প্রাণময় সত্তা গ। মনোময় সত্তা ঘ। বিজ্ঞানময় সত্তা ও ঙ। আনন্দময় সত্তা।[১] এদের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রাণধারণ ও দিনানুদৈনিক জীবন অতিবাহনের জন্য আবশ্যক কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য শেষের দুটিও বিশেষ প্রয়োজন। এর মধ্যে বিজ্ঞানময় সত্তা মানুষের মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দেয় আর আনন্দময় সত্তার উদবোধনে মানুষ এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত শ্রী ও সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে চায়। তাই এই আনন্দময় সত্তা থেকেই যাবতীয় সুকুমার শিল্পকলার প্রেরণা। শিল্প মাত্রেই অনুকরণাত্মক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

> বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র ও সেই গানই সাহিত্য।[২]

অর্থাৎ বিশ্বের বাঁশি মানুষের অন্তরে যে সুর বাজাচ্ছে, মানুষ নিজের ভাষায় ও ভঙ্গিতে সেই সুরটিকেই পুনরায় প্রকাশ করার চেষ্টা করে। অনুকরণের দ্বারাই হোক বা অন্তরের প্রেরণাতেই হোক মানুষ যা সৃষ্টি করল, তাকে দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে পড়ে – 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া' – মানুষ ভাবে আমি যা সৃষ্টি করলাম, সে বস্তুটি কী? এর স্বরূপ কী? কীভাবে, কোন্ অনির্বচনীয় প্রেরণায় এটি সৃষ্টি হয়ে উঠল? এই মূল জিজ্ঞাসা থেকেই সারা বিশ্বে তৈরি হয়ে উঠেছে এক বিদ্যায়তনিক ধারা, যার পারিভাষিক নাম 'নন্দনতত্ত্ব'।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মণীষীরাও সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের উপাদান, এর রম্যতার রহস্য, উপভোক্তাদের মনে সাহিত্যরসপ্রবাহের পদ্ধতি – এগুলি নিয়ে ভেবেছেন। তবে প্রাচীন ভারতবর্ষের মণীষীগণ কর্তৃক 'সাহিত্য' শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়নি। 'কাব্য' ও 'নাট্য' এই দুই

শব্দবন্ধ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে 'কাব্য' শব্দটি কবিতা, নাটক ও কথাসাহিত্যের যাবতীয় শিল্পরূপকেই বুঝিয়েছে।

সাহিত্য বা কাব্য কী? এর লক্ষণ কী? কোন্ গুণে সাধারণ লৌকিক বাক্য 'রসাত্মক বাক্য' বা 'কাব্য' হয়ে ওঠে? এটা এক থাকের প্রশ্ন। আর এক থাকের প্রশ্ন হল, কাব্য ও নাট্য কীভাবে ও কোন্ পদ্ধতিতে সহৃদয় উপভোক্তার মনে ক্রিয়া ক'রে তার মনে আনন্দ সঞ্চার করে? অর্থাৎ কাব্য বা নাট্য কীভাবে তার উপভোক্তার মনে সাড়া জাগায়? সাহিত্য সমালোচনার প্রেক্ষাপটকে জানতে এই দু'ধরণের প্রশ্নের উত্তর খোঁজা অতি আবশ্যক। প্রথমোক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় কাব্যের দেহাত্মবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'রীতি', 'গুণ', 'অলংকার' পার হয়ে শেষপর্যন্ত ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায়, অর্থাৎ 'ধ্বনিপ্রস্থান'এ আর দ্বিতীয়োক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায় 'রসপ্রস্থান'এ। সাহিত্য সমালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মূল উপাদান ও সূত্রগুলি আমরা এই দুই প্রস্থান থেকে কীভাবে পেতে পারি, তা নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে আলোচনা করব, অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় এর কী প্রভাব পড়েছে, তা আলোচনা করব।

প্রাথমিক পর্যায়ে আলংকারিকেরা মনে করতেন কাব্যবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে দুটি উপাদান পাওয়া যায়। শব্দ এবং অর্থ। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য শব্দ ও অর্থের সহযোগ ঘটিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করেন। তাই আলংকারিক ভামহ কাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন – "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্" ।পরবর্তীকালে আচার্য রুদ্রটও ভামহের মতকে সমর্থন করে বলেছেন "শব্দার্থৌ কাব্যম্"। শব্দ ও অর্থের মধ্যেকার এই সম্বন্ধকে নামান্তরে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বলা হয়ে থাকে। অনেকসময় দেখা যায় বাচক শব্দ অপেক্ষা বাচ্য অর্থ বেশি মনোহারী আবার এর বিপরীতে এও লক্ষ করা যায় যেখানে বাচক শব্দ রমণীয় ও মনোহারী অথচ বাচ্য অর্থ তার তুলনায় ন্যূন। বাচ্য ও বাচকের তুল্যচমৎকৃতিই শ্রেষ্ঠ কাব্যের গুণ বলে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বিবেচিত হয়। কালিদাসের 'মেঘদূতম', 'রঘুবংশম', 'কুমারসম্ভবম' শীর্ষক কাব্যগুলি এই তুল্যচমৎকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

পরবর্তীকালের আলংকারিক ভামহ, উদ্ভট, রুদ্রট ও আচার্য দন্ডী অলংকারকে কাব্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যাবিধায়ক ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। অলংকারবাদীদের অভিমত উল্লেখ করে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন –

বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে যেমন অনুপ্রাসে সাজিয়ে সুন্দর করা যায়, অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়, কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, তা এই অলংকারের জন্য[৩]

দেহাত্মবাদী আলংকারিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ‘বামন’। তাঁর ‘কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি’(সূত্র ১-২)তে তিনি কাব্যের ক্ষেত্রে অলংকারের গ্রাহ্যতা প্রতিপাদন করেছেন – “কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ” কিন্তু সেইসঙ্গে বামন আরো দুধাপ এগিয়ে ‘রীতি’ এবং ‘গুণ’ এর কথাও এনেছেন। অলংকারের যথাযথ অবয়বসংস্থানকেই ইনি ‘রীতি’(বা আধুনিককালে একটু স্থূল করে নিয়ে যাকে বলা যেতে পারে Style) নামে অভিহিত করতে চান। কাব্যদেহে যথেচ্ছভাবে অলংকার পরালেই তা মনোহারী হয় না। ঠিক জায়গায় ঠিক অলংকারটি প্রয়োজন। কাব্যদেহে অলংকারের নির্দোষ অবয়বসংস্থানকেই বামন ‘রীতি’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে তাই হল কাব্যের আত্মা – “রীতিরাত্মা কাব্যস্য”(কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ২/৬)। বামনের মতে কাব্য অলংকারের দ্বারা গ্রাহ্য হয়। ‘রীতি’র সহযোগে কাব্যের আত্মা জেগে ওঠে কিন্তু কাব্যের অস্তিত্বের জন্য যে সৌন্দর্যের আবশ্যক তাকে বামন ‘গুণ’ নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। ‘অলংকার’ ও ‘রীতি’ একযোগে কাব্যদেহে এই ‘গুণ’কে উৎপন্ন করে দেয়। সুতরাং অলংকার অনিত্য, গুণ নিত্য। ‘অলংকার’ কাব্যশরীরে শব্দার্থের ধর্ম ; ‘গুণ’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ‘রীতি’র ধর্ম।

লক্ষ করলে দেখা যাবে দেহাত্মবাদী আলংকারিকেরা অলংকার, রীতি, গুণ প্রভৃতির কথা বলে কাব্যের বহিরঙ্গ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। এগুলি সবই শৈলীর বিষয় কিন্তু কবিপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশকে নির্দিষ্ট কতকগুলি শৈলীর বন্ধনে বাঁধা চলে না। তাই পরবর্তীকালে দেহাত্মবাদী কাব্যসঙ্গগঠনের দোষ দেখিয়ে তার থেকে উন্নত ভাববাদী ধ্বনিপ্রস্থান গড়ে উঠেছে। ধ্বনিপ্রস্থানের জনক আচার্য আনন্দবর্ধন। তাঁর মতে ‘ব্যঙ্গ’ বা ‘ব্যঞ্জনা’ হচ্ছে সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার দ্বারা সাধারণ লৌকিক বাক্য কাব্য হয়ে উঠতে পারে। ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনাবৃত্তি সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রস সঞ্চারিত করে দেয় বলেই কাব্য সামাজিকের কাছে রমণীয় হয়ে ওঠে। এই মানসিক প্রক্রিয়া কীভাবে সংসাধিত হয়, তার বর্ণনা দিয়েছেন আনন্দবর্ধন তাঁর “ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থে। ধ্বনিকারের মতে, কাব্যের অর্থ দ্বিবিধ – বাচ্য-অর্থ ও প্রতীয়মান-অর্থ। প্রতীয়মান অর্থ যেখানে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায় সেখানেই বাক্য উৎকৃষ্ট কাব্যের দিকে অগ্রসর

হয় আর প্রতীয়মান অর্থ যেখানে বাচ্যার্থের দ্বারা মন্দীভূত হয়ে পড়ে অর্থাৎ প্রতীয়মান অর্থকে ছাপিয়ে বাচ্যার্থ যেখানে বড়ো হয়ে ওঠে, সেই কাব্য নিকৃষ্টশ্রেণির। পরিভাষায় এর নাম ‘গুণীভূতব্যঙ্গ’।

আনন্দবর্ধন তাঁর ‘ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থে প্রচুর উদাহরণ সাজিয়ে দেখিয়েছেন প্রতীয়মান ব্যঙ্গার্থ কীভাবে বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্যলক্ষণ তৈরি করে। প্রতীয়মান অর্থেরও ত্রিবিধ ভাগ করেছেন আনন্দবর্ধন – যথা বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি।(আনন্দবর্ধনের মতে প্রতীয়মান ব্যঙ্গার্থই ধ্বনি)। কিন্তু এই তিন ধ্বনিরও মাত্রাভেদ আছে। বস্তু ও অলংকারধ্বনিকে অভিধার দ্বারাও প্রকাশ করা যায় কিন্তু রসধ্বনি কখনোই অভিধার দ্বারা প্রকাশ্য নয়, এটি সর্বদাই ব্যঞ্জনাবৃত্তিগম্য। আনন্দবর্ধন তাই ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে ‘রসধ্বনি’কেই শ্রেষ্ঠ বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘রসধ্বনি’ কথাটি আনন্দবর্ধন সরাসরি বলেননি, বলেছেন অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের ‘ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থের একটি টীকাভাষ্য লেখেন, যা ‘লোচনটীকা’ নামে পরিচিত। সেখানেই তিনি ব্যবহার করেন ‘রসধ্বনি’ শব্দবন্ধটি। তিনি এও বললেন রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা আর ভাবধ্বনি, বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি প্রাণমাত্র।(রসধ্বনেঃ এব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতম্ আত্মত্বম ; বস্তুলঙ্কারধ্বনেঃ অপি জীবিতত্বম।) অভিনবগুপ্ত আরো বলেছেন বস্তু(অর্থাৎ কাব্যের বিষয়বস্তু) ও অলংকারের সুসহযোগে ধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তাদের ধ্বনিত্ব আপেক্ষিক। এরা সহৃদয় সামাজিকের মনে রসের প্রতীতি জাগিয়ে তুলতে পারে না, তাই কাব্য উপভোক্তার পূর্ণ আত্মতৃপ্তি রসধ্বনিতেই সম্ভব হয়। সুতরাং রসধ্বনিই হল সত্যকার ধ্বনি ; এটিই কাব্যের মুখ্য আত্মা।

এই অপূর্ব ধ্বনিপ্রস্থান গড়ে তুলে আচার্য আনন্দবর্ধন পূর্বজদের গুণ, রীতি ও অলংকারবাদকেও ধ্বনিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন এই বলে যে কাব্যে রসধ্বনি থেকে পৃথক গুণালংকারাদি অঙ্গগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। এরা সম্পূর্ণরূপে রসপরতন্ত্র। যেমন প্রাণশক্তি আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে, তেমনি কাব্যাত্মভূত রস নিজেকে প্রকাশ করার প্রয়োজনে গুণ, রীতি, অলংকার প্রভৃতি অঙ্গের সৃষ্টি করে। কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য রস ; এটাই উপেয়। শব্দ-বাচ্য-ছন্দ-অলংকার-রীতি এসবই এতে পৌঁছানোর উপায়মাত্র।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা দেখাব আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের হাতে তৈরি হয়ে ওঠা এই ধ্বনিবাদ তথা ব্যঞ্জনাবৃত্তির কত গভীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ ও কাব্যবিচার প্রণালীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু তার আগে সংক্ষেপে 'রসপ্রস্থান'এর আলোচনা সেরে নেওয়াও জরুরি। রসপ্রস্থানে প্রবেশ করার ভূমিকা স্বরূপ আরো একটি বিষয় স্মরণ করে নিতে চাই যে 'রসধ্বনি' কথাটি তৈরি করে আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বনিপ্রস্থানের সঙ্গে ভরতপ্রণীত রসপ্রস্থানের একটি অচ্ছেদ্য সেতুসম্ভব সম্বন্ধ তৈরি করলেন। ভরত তাঁর সুবিখ্যাত রসসূত্রে (বিভাবানুভাবব্যাভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ) 'রস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু এই রসের স্বরূপ কী অথবা সহৃদয় উপভোক্তার নাটক আস্বাদনে এই রস কীভাবে কাজ করে, তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। দ্বিতীয়ত 'রসনিষ্পত্তিঃ' শব্দটি ভরত ব্যবহার করলেও এই নিষ্পত্তি কীভাবে ঘটে, তা তিনি জানাননি। তৃতীয়ত, আরো একটি প্রশ্ন ভরত উহ্য রেখেছেন ; রসস্ফূরণের আধার কে? রস নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ নাকি সহৃদয় দর্শকনিষ্ঠ --- তাও ভরত স্পষ্ট করে বলেননি। ফলে নাত্যশাস্ত্রের পরবর্তী টীকাকারগণ যথা উদ্ভট, লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং স্বয়ং অভিনবগুপ্ত নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সূচিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন, যার দ্বারা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র।

উদ্ভট, লোল্লটসহ প্রত্যেক টীকাকারের রসভাষ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা যাব না ; এ স্থানে তার প্রয়োজনও নেই তবে আমরা অভিনবগুপ্তের রসভাষ্যকেই একটু বিস্তৃত আকারে আলোচনা করব। এর দুটি কারণ। প্রথমত, পূর্বজদের মতকে স্বীকার-অস্বীকারের দ্বারা সমীকৃত করে অভিনবগুপ্ত রসসূত্রের খুব নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা পরবর্তীকালের সকল আলংকারিকই শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কাব্য ও নাটকের উপভোক্তা যে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় রস উপভোগ করেন অভিনবগুপ্ত তারও খুব নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যচিন্তার অভিনব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অভিনবগুপ্তের রসব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার সাদৃশ্যের একটি মুখ্য কারণ হল অভিনবগুপ্ত বেদান্তদর্শনের আলোকে রসসূত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধও অনেকাংশেই বেদান্ত তথা উপনিষদ দ্বারা প্রভাবিত। অভিনবগুপ্তের শৈব-প্রত্যভিজ্ঞা বেদান্তদর্শনেরই একটি শাখামাত্র। তাই এঁদের চিন্তার উৎসভূমি এক হওয়ায় বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও সাধর্ম লক্ষ করা যায়।

অভিনবগুপ্তের মতবাদ পাওয়া যায় তাঁর লেখা নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য 'অভিনবভারতী'তে। রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলেন, প্রত্যেক সামাজিকের মনেই সূক্ষ্মভাবে কয়েকটি চিত্তবৃত্তি বর্তমান থাকে। এগুলি তাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অ সংস্কার থেকে মনের মধ্যে গড়ে ওঠে, এগুলির নাম স্থায়িভাব। অভিনয় দর্শন বা কাব্য পাঠকালে কাব্য বা নাটকান্তর্গত বিভাবাদির স্থায়িভাবের অনুরূপ স্থায়িভাব দর্শক ও পাঠকের মনেও অভিব্যক্ত হয় কিন্তু এই অভিব্যক্তি হয় সাধারণ আকারে। অর্থাৎ অভিনয়কারী নট-নটী এবং অভিনয়দর্শনকারী সামাজিক উভয়েই তাদের অন্তে্র অভিব্যক্ত স্থায়িভাবকে নিজের বলে মনে করেন না আবার নিজের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলেও মনে করতে পারেন না। অভিনয়কারী নট-নটী এবং অভিনয়দর্শনকারী দর্শক উভয়েই বিভাবাদির সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট কি সম্বন্ধবিশিষ্ট নন—এমন কোনো জ্ঞান আর তাদের থাকে না। সহৃদয় সামাজিকের অনুভূতির জগৎ তখন কতকটা এইরকম –

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ

তদাস্বাদে বিভাবাদে পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে।"[৪]

এরই নাম সাধারণীকরণ। এই সাধারণীকরণের ফলে ভোক্তা বিভাবাদির সঙ্গে মানসিক সম্বন্ধ অনুভব করেন না অর্থাৎ তখন তার অহংবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবস্থাকে অভিনবগুপ্ত বলেছেন 'পরিমিত প্রমাতৃত্ব বোধবিলুপ্তি'। এই বিলোপনের সঙ্গ সঙ্গে দর্শক-পাঠকের মন ঊর্ধ্বতর সত্তাচৈতন্যের ভূমিতে উঠে যায় এবং তার মন বাহ্য বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে কাব্যার্থে তন্ময় হয়ে পড়ে। মনের এই স্থির ও চাঞ্চল্যরহিত অবস্থায় আত্মচৈতন্যের আনন্দাংশের অজ্ঞান আবরণ দূরীভূত হয়ে আত্মার আনন্দরূপ স্ফূরিত হয়। আত্মার এই আনন্দই রস এবং আত্মচৈতন্যের আবরণভঙ্গজনিত আনন্দাঙ্গশের প্রকাশসাধনই কাব্যের লক্ষ্য বলে স্বীকার করেছেন অভিনবগুপ্ত। প্রদীপের আবরণ দূরীভূত হলে সে যেমন সমীপস্থ পদার্থকে প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়, তেমনই অজ্ঞানের আবরণ ভঙ্গ করে আত্মচৈতন্য রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবকে প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়।

অভিনবগুপ্তের মতে নাটকের পাশাপাশি কাব্যের ক্ষেত্রেও রসাভিব্যক্তির সমীকরণ একই নিয়মানুযায়ী হয়। দর্শক মনে স্থায়ি চর্বণার দ্বারা রসের স্ফূরণ ঘটলে তবেই সে বিগলিতবেদ্যান্তর অ-লৌকিক আনন্দ লাভ করে। কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। শব্দ এবং অর্থের সহযোগে কাব্যের বিভাব ও অনুভাব পাঠকহৃদয়ে সঞ্চিত 'বাসনা' বা সংস্কাররূপ স্থায়ি ও তার

সহযোগী সঞ্চারীকে রঞ্জিত করে। বিভাবানুভাবে রঞ্জিত পাঠকের অন্তরের এই স্থায়ি তার স্ব-সংবিৎ এর আবরণভঙ্গ ঘটিয়ে তাকে দান করে রসানন্দ। যে শ্রেণির ধ্বনিকাব্য কাব্য পাঠকের মনে এরূপ রসের প্রতীতি ঘটায়, তাকেই অভিনবগুপ্ত বলেছেন 'রসধ্বনি'। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অভিনবগুপ্তের মতে, পাঠকমনে সঞ্চিত স্থায়িভাবের চর্বণার দ্বারাই রসানন্দের স্ফূরণ ঘটে, কী কাব্যে কী নাটকে!

অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য কয়েকটি সিদ্ধান্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত চিত্তে রসোদ্রেকের শর্ত হিসেবে অভিনবগুপ্ত সাধারণীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। স্থায়িভাবসমূহ সাধারণ আকারে প্রতীত না হলে করুণ রসের অভিনয় দেখে দর্শকের মন শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে, ভয়ানক রসের অভিনয় দেখে ভীত হবে, রতির অভিনয় দেখে লজ্জিত হবে কিন্তু সাধারণীকরণের ফলেই রঙ্গপ্রেক্ষকের অহংমুক্ত মন বিশুদ্ধ রসানন্দকে অনুভব করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অভিনবগুপ্ত 'আনন্দ'কেই মুখ্য কাব্যফল হিসেবে স্বীকার করেছেন। পূর্বে মনে করা হত কাব্যের মুখ্য ফল আত্মপ্রকাশ ; আনন্দলাভ গৌণ ফলমাত্র। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বেও আমরা তাঁর এ সংক্রান্ত মতের বিবর্তন দেখতে পাব। প্রথমদিকে তিনিও আত্মপ্রকাশকেই কবিত্বের মূল ধর্ম বলে মনে করতেন কিন্তু পরবর্তীকালে কাব্য বা সাহিত্যের মুখ্য ফল যে আনন্দ – এই সিদ্ধান্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন।

তৃতীয়ত, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত উভয়েই সিদ্ধান্ত করেন, রসের প্রকৃত আশ্রয় সহৃদয় সামাজিকের মনোভূমি অর্থাৎ রস নায়কনিষ্ঠ নয়, তা শৃদয় সামাজিকের মননিষ্ঠ।

এই সিদ্ধান্তগুলির অনুরূপ প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে আমরা খুঁজে পাব। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা দেখব পাশ্চাত্য আলংকারিকদের সিদ্ধান্তও অনেকাংশে অভিনবগুপ্তের রসভাষ্যের মতকেই প্রতিষ্ঠিত করছে। বুচার অ্যারিস্টটলের 'The Poetics' গ্রন্থের যে টীকাভাষ্য রচনা করেন – 'Aristotle's Theory Of Poetry And Fine Art' নামে, সেখানেও কাব্যের মুখ্য ফল যে আনন্দলাভ, তা তিনি স্পষ্ট করেছেন –

> The object of all poetry, as of all the fine arts, is to produce an emotional delight, a pure and elevated pleasure[৫]

দর্শকমনেই যে রসানন্দের প্রকৃত স্ফূরণ ঘটে, তাও তিনি স্বীকার করেছেন –

> Aristotle's theory has regard to the pleasure, not of the maker, but of the 'spectator' who contemplates the finished product. Thus while the pleasures of philosophy are for him who philosophises – for the intellectual act is an end in itself – the pleasure for art are not for the artist, but for those who enjoy what he creates.[৬]

সাধারণীকরণের দ্বারা অহংমুক্ত চিত্তে রসানন্দের স্ফূরণের যে কথা অভিনবগুপ্ত বলেছেন, সে প্রসঙ্গেও পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত সমরূপ –

> The spectator is lifted out of himself. He becomes one with the tragic sufferer and through him with humanity at large[৭]

(২)

এখন আমরা পর্যালোচনা করে দেখব প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের মূল সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলির রিকথ কীভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাহিত্যভাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রীরা অধিকাংশই ছিলেন কাব্যের ভোক্তা ও সমালোচক। তারা কেউ কবি নন। তাই দেখি রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে কবিপ্রতিভার দু'রকম শ্রেণি কল্পনা করেছেন। কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। কারয়িত্রী প্রতিভা সৃজনশীল কবির আর ভাবয়িত্রী প্রতিভা অনুভবিৎসু সমালোচকের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেহেতু একইসঙ্গে কবি ও সমালোচক, কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী উভয় প্রতিভার অধিকারী, তাই তিনি সমালোচনার মধ্যেও সৃজনশক্তির আনন্দকে পেতে চেয়েছিলেন। 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> আমাদের দেশে যেভাবে সমালোচনা হয়, তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা

> ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যেকোনো লোকের মতমাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই – তার কারণ আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই।[৮]

অর্থাৎ ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ আসলে বোঝাতে চাইছেন সাহিত্য সৃজনের অভিজ্ঞতা আছে যাঁর, সেই-ই সৃজিত সাহিত্যের সবচেয়ে উপযুক্ত বিচারক। সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত নন, এমন ব্যক্তির সাহিত্য সমালোচনা ব্যর্থ। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রেও আমরা সেই একই কথার সমর্থন পাই। আলংকারিকদের মতে, সমালোচককে তো বটেই এমনকি কাব্য বা নাত্যের উপভোক্তাকেও 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী' হতে হবে। অর্থাৎ সৃজন আনন্দের যথার্থ অংশীদার হতে হবে। বলা বাহুল্য এই সৃজনের আনন্দ শুধু কবির নয়, পাঠকেরও। ঠিক যেমন গান জিনিসটি একাকী গায়কের নয়, শ্রোতারও।

প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রীরা 'সাহিত্য' শব্দটিকে শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব – এই অর্থেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে যে 'সহিত' শব্দটি রয়েছে, তা কেবল শব্দ ও অর্থের সহিতত্ব – এই ছিল তাঁদের মত। যেমনটি বলেছেন আচার্য 'ভামহ'। 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্' অর্থাৎ 'সহিতৌ' শব্দটি এখানে শব্দ ও অর্থের সমন্বয়কে বোঝাচ্ছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' শব্দটিকে এমন টেকনিকাল অর্থে ব্যবহার না করে এক বৃহত্তর সম্মিলন অর্থে বুঝিয়েছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য খুব স্পষ্ট।

> সাহিত্য শব্দটার কোনো ধাতুগত অর্থব্যাখ্যা কোনো অলংকারশাস্ত্রে আছে কি না জানি না। ঐ শব্দটার যখন প্রথম উদ্ভাবনা হয়েছিল তখন ঠিক কী রূপে হয়েছিল, তা নিশ্চিত বলবার মতো বিদ্যা আমার নেই কিন্তু আমি যাকে সাহিত্য বলে থাকি তার সঙ্গে ঐ শব্দটার অর্থের মিল করে যদি দেখাই, তবে তাতে বোধ করি দোষ হবে না।সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে। এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হচ্ছে হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য[৯]

তবে রবীন্দ্রনাথ কথিত এই নৈকট্য বা সম্মিলনের ইঙ্গিত সাহিত্য শব্দের তাৎপর্যরূপে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রীদের অভিপ্রেত ছিল না – একথা বলা যায় না কেননা অভিনবগুপ্ত তাঁর সাহিত্যগুরু আচার্য ভট্টতৌত প্রণীত 'কাব্যকৌতুক'এর একটি শ্লোকাংশ উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, যেখানে কবি, নায়ক ও সহৃদয় কাব্যভোক্তার 'সমান অনুভবের' কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কবি তাঁর রচনাশক্তির দ্বারা শ্রোতা/পাঠক ও নায়কের (আধুনিক ভাষায় চরিত্র) মধ্যে একটা অনুভবসমতার বলয় তৈরি করেন। একজনের শোক-হর্ষ-ক্রোধ-বিস্ময় খুব সহজেই দেশগত ও কালগত দূরত্বকে সরিয়ে দিয়ে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ধ্বনিকার 'আনন্দবর্ধন' সহজেই বলেছেন –

"ভাবানচেতনানপি চেতনবৎ চেতনানচেতনবৎ

সম্ভাবয়তি যথেষ্টাং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।"[১০]

চেতন ও অচেতনের মিলনসম্ভাব্যতার কথা তুলে এই শ্লোকে আনন্দবর্ধন আসলে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'নৈকট্য' বা 'সম্মিলন' কবির রচনাশক্তির মধ্যে দিয়ে কীভাবে জাগ্রত হয়, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যবিচার পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান হচ্ছে অলংকারপ্রস্থান। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যমীমাংসকেরা খুবই বৃহৎ এবং ব্যাপকভাবে 'অলংকার' শব্দটিকে ব্যাবহার করতেন। তাদের কাছে 'অলংকার' শব্দটি সার্বিক সৌন্দর্যবোধ ও নন্দনতত্ত্বের সমার্থক শব্দ বলে প্রতীত হয়েছিল। সাহিত্য, নাটক, শিল্প—এই সবকিছুই যেহেতু বৃহৎ অর্থে সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের পর্যায়ভুক্ত, তাই প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব বৃহত্তর অর্থে 'অলংকারশাস্ত্র' নামে অভিহিত হতো। আচার্য বামন তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্রে' স্পষ্টই বলেছেন – "কাব্যংগ্রাহ্যমলংকারাৎ। সৌন্দর্যমলংকারঃ"। অর্থাৎ কাব্য অলংকারের দ্বারাই গ্রাহ্য হয় এবং সৌন্দর্যই হল অলংকার। এখন 'অলংকার' কাকে বলে বা কাব্যে অলংকারের প্রয়োজনীয়তা কী – এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে অতিশয়োক্তি এবং অত্যুক্তিই অলংকারের ধরম অর্থাৎ সাদামাটা কথাকে বাড়িয়ে বলাই অলংকারের ধর্ম। 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়। সেই অত্যুক্তি যখন বলে 'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' তখন মন বলে এই মিথ্যা কথার চেয়ে সত্য কথা আর হতে পারে না। রসের অত্যুক্তিতে যখন ধ্বনিত হয় 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল' তখন মন বলে, যে হৃদয়ের মধ্যে প্রিয়তমকে অনুভব করি সেই হৃদয়ে যুগযুগান্তরের কোনো সীমাচিহ্ন পাওয়া যায় না। এই অনুভূতিকে অসম্ভব অত্যুক্তি ছাড়া আর কী দিয়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে। রসসৃষ্টির সঙ্গে রূপসৃষ্টির এই প্রভেদ ; রূপ আপন সীমা রক্ষা করেই সত্যের আসন পায়, আর রস সেই আসন পায় বাস্তবকে অনায়াসে উপেক্ষা করে।[১১]

সাহিত্যে এই অত্যুক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ পুত্রশোকাতুরা মায়ের ক্রন্দনের প্রসঙ্গ এনেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় মা যখন সশব্দ বিলাপে পল্লির নিদ্রাতন্দ্রা দূর করে দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তা নয়, পুত্রশোকের গৌরবকেও প্রকাশ করতে চায়। নিজের কাছে সুখ-দুঃখ প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় না, পরের কাছে তা প্রমাণ করতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোকপ্রমাণের জন্য তার চেয়ে সুর চড়িয়ে না দিলে চলে না। অর্থাৎ সাহিত্যকারের আত্মগত সুখ-দুঃখ ও ভাবোচ্ছ্বাসকে সর্বজনীন করে তুলতে হলে ঠিক যেমনটি তেমনটি বললে চলে না, শিল্পের সংযম রক্ষা করেও সুর চড়িয়ে দিতে হয় কারণ রচনাকারের কাছে যা প্রত্যক্ষ, অপরের কাছে তা তত প্রত্যক্ষ নয়। রচনাকার তার প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অপরের কাছেও সমান প্রত্যক্ষ করে তোলার চেষ্টা করেন। এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধ ভাষা-ভঙ্গির নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাইরে কৃত্রিম হয়ে অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হয়ে ওঠে।[১২]

এখানে রবীন্দ্রনাথ যাকে "ছন্দোবদ্ধ ভাষা-ভঙ্গির নানাপ্রকার কলবল" বলেছেন, তারই একটি প্রাথমিক উপাদান হল অলংকার। এই অলংকারের গুণে একটি রচনা রসের অভিমুখে অগ্রসর হয়।

রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্যেই আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ অতিশয়োক্তিকেই সকল অলংকার বা বাগবিকল্পের ভিত্তিভূমি বলে মনে করেছিলেন। যেমন আচার্য দন্ডী বলেছেন –

"অলংকারান্তরাণামপ্যেকমাহুঃ পরায়ণম

বাগীশমহিতামুক্তিমিমামতিশয়াহ্বয়াম"[১৩]

এবং সকল অলংকারই শেষাবধি রসেই পর্যবসিত হয়। 'প্রায়ঃ সর্বোহপ্যলংকারো রসমর্থে নিষিঞ্চতি।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সাধারণ শব্দ ও অর্থকে আটপৌরে না রেখে তাকে সাজে-সজ্জায় সাজিয়ে দিলে, তা সাহিত্যের শ্রেণিতে উন্নীত হয়। এই সাজটাই হল অলংকার। সুতরাং সাহিত্যে শব্দ এবং অর্থ কখনোই অলংকারবর্জিত হতে পারে না ; অলংকার সংযুক্ত হয়েই তা রসের অভিমুখে অগ্রসর হয়। প্রাচীন আচার্যগণের মতের সঙ্গে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সারকথা হল বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে রসের গুণে। ভরতমুনি থেকে শুরু করে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, মহিমভট্ট প্রমুখ সকলেই কাব্যে রসের সর্বাতিশায়িতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মতকে একসূত্রে গেঁথে 'সাহিত্যদর্পণ'এর পাতায় বিশ্বনাথ জানালেন – "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। রবীন্দ্রনাথ কাব্যের লক্ষণ হিসেবে রসের সর্বাতিশায়িতার সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেছেন। 'সাহিত্যের পথে' বই এর উৎসর্গপত্রে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –".....আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"[১৪]

কিন্তু এই পত্রেই তিনি রসের ধারণা এবং সৌন্দর্যের ধারণাকে পৃথক করেছেন। বাস্তবজীবনে যা অসুন্দর, এমনকি ক্লেশকর, আর্টের ক্ষেত্রে তা চূড়ান্তভাবে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন রসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ সৌন্দর্যের নয়, আনন্দের। ক্ষেত্রবিশেষে অসুন্দরও আনন্দ দেয় এবং যা আনন্দ দেয় তাই-ই শিল্প, তাই-ই আর্ট, তাই-ই রস। তাঁর পূর্বের সঙ্গে বর্তমানের এই সিদ্ধান্তবদলের কথা ঐ পত্রেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন –

> একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না – সাহিত্যের সৌন্দর্যকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারায় ধরা গেল না।

> তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম, তাই সোজা করে বলা দরকার। বলতুম সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার, বস্তুত বলা চাই যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[১৫]

অর্থাৎ সুন্দরের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গেই রসের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ; এটাই রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় রসপ্রস্থানে রসকে 'সত্তার আনন্দময় চর্বণা'ই বলা হয়েছে। বেদান্তদর্শনের অনুরূপে অভিনবগুপ্ত আত্মার আনন্দভঙ্গজনিত আনন্দকেই রস বলেছেন। 'রসগঙ্গাধর' বইতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ চৈতন্যের রসস্বরূপতা বোঝানোর জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দবল্লী' থেকে 'রসো বৈ সঃ' – এই শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধার করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমনই কাব্য বা সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হিসেবে চৈতন্যের আনন্দময়তার কথাকেই উদ্ধৃত করেছেন। 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেঃ রসো বৈ সঃ , রস হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।[১৬]

রস একটি মানসিক অবস্থা। তার আশ্রয় সহৃদয় সামজিকের মনোজগৎ। অর্থাৎ রস সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিমানুষের অনুভববেদ্য। অভিনবগুপ্ত লিখেছেন –

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদাবিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ" (কারিকা ১/১)

অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে দর্পণের মতো নির্মল মনের অধিকারী সহৃদয়ের সুকাব্যপাঠজনিত চিত্তের অনুভূতিবিশেষের নামই 'রস'। রবীন্দ্রনাথও রসকে সহৃদয়ের 'অনুভববেদ্য' বলে প্রাচীন আচার্যদেরই প্রতিধ্বনি করেছেন –

> অনুভূতির বাইরে রসের কোনো অর্থই নেই, রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না, এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা।[১৭]

অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথ রসকে কেবল অনুভববেদ্য বলছেন না, তাকে আত্মপ্রকাশরূপেও ব্যাখ্যা করছেন। সেইসঙ্গে এও জানাচ্ছেন শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মানুষ আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় বলেই, তা মানুষের কাছে এত প্রিয়।

> মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায় – শিল্পীর শিল্পে, কবির কাব্যে মানুষের সেই জন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে-সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত, তবে সে শিল্পসাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।[১৮]

রসের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি সমস্যার খুব সুন্দর নিরসন করেছেন ; তা হল করুণ, ভয়ানক ও বীভৎস রসও কীভাবে পাঠক ও শ্রোতার মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে? প্রাচীন আলংকারিকেরা এর উত্তর দিয়েছেন, সে কথায় পরে আসছি ; প্রথমেই দেখি রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কী বলছেন? রবীন্দ্রনাথের মতে, সুন্দর-অসুন্দর নির্বিশেষে অনুভূতিমাত্রেই আনন্দময়, যদি তার সঙ্গে ভোক্তার নিরাসক্ত দূরত্ব বজায় থাকে। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> দুঃশাসনের হাতে কৌরবসভায় দ্রৌপদীর যে অসম্মান ঘটেছিল, তদনুরূপ ঘটনা যদি পাড়ায় ঘটে, তা হলে তাকে আমরা মানবভাগ্যের বিরাট শোকাবহ লীলার অঙ্গরূপে বড়ো করে দেখতে পারি নে। নিত্য ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র সীমায় বিচ্ছিন্ন একটা অন্যায় ব্যাপার বলেই তাকে জানি, সে একটা পুলিশ কেস রূপেই আমাদের চোখে পড়ে – ঘৃণার সঙ্গে, ধিক্কারের সঙ্গে, প্রাত্যহিক সংবাদ-আবর্জনার মধ্যে তাকে ঝেঁটিয়ে ফেলি। মহাভারতের খান্ডববনদাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে দূরে গেছে – সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্বতকে, সরোবরকে। কিন্তু যদি খবর পাই অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শষ্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশু-পক্ষী, তবে সেটা আমাদের কারুণ্য অধিকার করে চিত্তকে পীড়িত করে। ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয়, তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।[১৯]

এই একই সুরে 'রূপকার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মানুষের সর্বপ্রকার অনুভূতিই আনন্দময়। দুঃখের, বেদনার, ভয়ের সবটাই ; যদি না তার সঙ্গে ব্যক্তিগত অনিষ্টের আশঙ্কা এসে জোড়ে। দুঃখের অনুভূতিও পরিণামে আনন্দদায়ক হতে পারে যদি সেই দুঃখের অনুভূতি থেকে আমার 'অহং' মুক্ত থাকে। সেই কারণেই পয়সা দিয়ে কথক ডেকে সীতার বনবাসের কাহিনি আমরা শুনি। ঘরের পাশে যদি খুন হয় অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা পুলিশ ডেকে বসি কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নেয় সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই বলেই বেদনার তীব্রতা আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে। হ্যামলেট নাটকের গভীর নৈরাশ্য ও বেদনার মধ্যে দিয়েই তার পূর্ণ সার্থকতা কিন্তু ওই নাটকের দুঃখভাব কমিয়ে যদি সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের ঘটনা দিয়ে তাকে ভরিয়ে তোলা যেত, তাহলে তা নাটক হিসেবে নিতান্তই ব্যর্থ হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দুঃখ-বেদনা বা ভয়ের অনুভূতি মানুষের রসাস্বাদে কোনোরকম বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কারণ সাহিত্যে বা আর্টে দুঃখ বা ভয়ের অনুভূতিকে মানুষ লীলা হিসেবেই দেখে, প্রত্যক্ষ হিসেবে নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য –

> দুঃখের তীব্র অনুভূতিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে – সেই ভূমৈব সুখম। মানুষ বাস্তব জগতে ভয়-দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয় ; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হত তবে বুক যেত ফেটে।[২০]

ট্র্যাজিক অনুভূতির পরিণামী আনন্দের কারণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাকে ব্যক্তিগত অহংমুক্ত নিরাসক্ত দৃষ্টি বলেছেন, প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রীরা তাকেই 'সাধারণীকরণ' নাম দিয়েছিলেন। এই সাধারণীকরণকেই আধুনিক পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকেরা 'Aesthetic Distancing' এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সাধারণীকরণের বিষয় প্রথম প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা করেন অভিনবগুপ্তের পূর্বসূরী আচার্য ভট্টনায়ক। তিনি ভরতপ্রণীত রসোদ্বধনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে

গিয়ে নাট্য ও কাব্যের বিভাবাদি সহৃদয় সামাজিকের কাছে আত্মগত বা ব্যক্তিগত না হয়ে সাধারণ আকারে প্রতীত হয় বলেছেন। এই অবস্থায় বিভাবাদি সহৃদয় সামাজিকের কাছে 'সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার-পরিহার নিয়মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। অহংবিবিক্ত নিরাসক্তি নিয়ে তখন উপভোক্তা ভোক্তব্য শিল্পকে উপভোগ করে। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ 'সাহিত্যদর্পণ'এ লিখেছেন –

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ

তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে"[২১]

এই অপরিচ্ছিন্ন সাধারণীকরণের দ্বারাই শোক, ভয় বা জুগুপ্সার অনুভূতিগুলিও পরিণামে আনন্দময় রসানুভূতির প্রস্রবণ খুলে দেয়।

কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ব্যঞ্জনা' ব্যাপারকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যা প্রাচীন ধ্বনিবাদী আলংকারিকদের সিদ্ধান্তের অনুকূল। আচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে 'ব্যঙ্গ' বা 'ব্যঞ্জনা'কেই কাব্যের প্রাণ বা আত্মা বলে নির্দেশ করেছেন। 'বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি ও রসধ্বনি' এই ত্রিবিধ ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনিকেই অভিনবগুপ্ত শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। রস তাঁর মতে 'পরম ব্যঙ্গ'। "স এষ পরমো ব্যঙ্গ"। অভিনবগুপ্ত 'রসধ্বনি' শব্দটি প্রয়োগ করে কার্যত ধ্বনি ও রসকে একসূত্রে মিলিয়ে দেন এবং সিদ্ধান্ত করেন, সেই ধ্বনিই শ্রেষ্ঠ, রস যার আত্মা। এখন ধ্বনিবাদীদের এই ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ কী? ধ্বন্যালোককার আনন্দবর্ধন লিখছেন –

"শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে

বেদ্যতে সহি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম"[২২]

অর্থাৎ কাব্যের যা সার অর্থ, কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন।

শ্রেষ্ঠ কাব্য শব্দার্থে বা বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মের নামই ধ্বনি। আবার 'ধ্বন্যালোক' উদ্ধৃত করি –

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ

ব্যঙক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সুরিভিঃ কথিতঃ”[২৩]

অর্থাৎ যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন। এই ধ্বনি ব্যঙ্গই হচ্ছে কাব্যের আত্মা, কাব্যের সারতম বস্তু।

এই ব্যঙ্গ বা ব্যঞ্জনাকে রবীন্দ্রনাথ ছবির ক্ষেত্রে ‘বর্ণিকাভঙ্গ’ বলেছেন এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেই অনির্বচনীয়তা বলেছেন। ‘ছন্দ’ গ্রন্থের সূচনাতেই ‘ছন্দের অর্থ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি –

> শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি বা বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়েও আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি, তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয়, তখন তাকেই আমরা বলি রস।[২৪]

আবার ‘তথ্য ও সত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

> কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান-নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই ছন্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে।[২৫]

এইভাবে শব্দের ‘অনির্বচনীয়তা’, ‘অসীমতা’ প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ধ্বনিবাদীদের সিদ্ধান্তেরই আধুনিক ভাষ্যরূপ রচনা করেছেন।

এইভাবে বিশ্লেষণ করে মোটামুটি এটাই প্রতিপন্ন হল প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রীদের সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক অধিকাংশ সিদ্ধান্তকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সাহিত্যভাবনা ও সাহিত্যবিচারের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যজিজ্ঞাসার উত্তরাধিকার এভাবেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

তথ্যসূত্র

১. গম্ভীরানন্দ(স্বামী), 'ভূমিকা অংশ', *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬ ব, পৃ-২।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২৪৭।

৩. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, *কাব্যজিজ্ঞাসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৪১৭, পৃ-১০।

৪. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮(নূতন সংস্করণ), পৃ-৬৭।

৫. Butcher Samuel Henry, *Aristotle's Theory Of Poetry And Fine Art,* Macmillan and co Ltd, London, 1907, page-99.

৬. তদেব, page-127.

৭. তদেব, page-132.

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী,* পত্রসংখ্যা ২০৩ [সোমবার, ১৮ই মার্চ, ১৮৯৫], বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৬৭, পৃ-২৬৭।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ-১৪৩।

১০. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত, চতুর্থোদ্যোতঃ, ৪/৫ কারিকা, *আনন্দবর্ধনকৃত 'ধ্বন্যালোকঃ,* এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৩৬৪ ব, পৃ-২৪৬।

১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ' প্রবন্ধ, *সাহিত্যের স্বরূপ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৫০, পৃ-৫৫।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধ, *সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২৫৩।

১৩. ডঃ জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, 'দণ্ডী অধ্যায়', *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬, পৃ-৭৪।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ-১০।

১৫. তদেব, পৃ-৮।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধ, *সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২৬৮।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যতত্ত্ব', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ-১২৪।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধ, *সঞ্চয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৫১২।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ-১৫০।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা' অংশ, *সাহিত্যের পথে,* তদেব, পৃ-৮।

২১. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃত সাহিত্যদর্পণঃ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭০।

২২. শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়(সম্পা), কারিকা-১/৭, *ধ্বন্যালোকঃ,* , শ্রী বিদ্যুৎকিরণ মুখোপাধ্যায় চন্দননগর কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭১।

২৩. তদেব, কারিকা-১/১৩, পৃ-৮৩।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দের অর্থ', *ছন্দ, রবীন্দ্র রচনাবলী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২১শ খণ্ড, পৃ-২৯৫।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তথ্য ও সত্য', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চৈত্র ১৩৫২, পৃ-৫৫।

খ) সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য জটিল ও দুরবগাহী। তথাপি বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যরসে নিষ্ণাত ছিলেন। কিছুটা পারিবারিক আবহাওয়া ও কিছুটা তৎকালপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে বাল্যকাল থেকেই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর সংস্কৃতানুশীলনের খবর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। 'নানা বিদ্যার আয়োজন' অধ্যায়ে তিনি স্মরণ করেছেন 'হেরম্ব তত্ত্বরত্ন' মহাশয়কে যিনি সংস্কৃত শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁদের 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' থেকে শুরু করে মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ করাতেন।[১] তবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত সংস্কৃত শিক্ষা শুরু হয় রামসর্বস্ব পণ্ডিত ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের হাত ধরে। ব্যাকরণ পড়তে অনিচ্ছুক রবীন্দ্রনাথকে রামসর্বস্ব পণ্ডিত বাংলায় অর্থ করে শকুন্তলা পড়াতেন। আর জ্ঞানচন্দ্র পড়াতেন 'কুমারসম্ভব'। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"ইস্কুলের পড়ায় যখন তিনি(জ্ঞানচন্দ্র) কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে পারিলেন না, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন। আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন।"[২] 'জীবনস্মৃতি'র বর্জিত পাণ্ডুলিপি থেকে আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরো জানিয়েছেন কুমারসম্ভবের "তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।"[৩]। বোঝা যায় এই সময় থেকেই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষত কালিদাসের কাব্যের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত হন। এর একটি পরোক্ষ প্রমাণও এই দেখা যায় যে 'ভারতী' পত্রিকায় (১২৮৪ এর মাঘ সংখ্যা) কুমারসম্ভব ৩য় সর্গের অনুবাদ প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'তে এই অনুবাদ এবং শকুন্তলা নাটকের শেষ শ্লোকের অনুবাদ পাওয়া গেছে।[৪] অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে 'কুমারসম্ভব' কাব্য পাঠের একটি চমৎকার পাঠস্মৃতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন। উক্ত কাব্যের প্রথম সর্গের ১৫ সংখ্যক শ্লোকটি নিম্নরূপ—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং

বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ

যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-

রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ[৫]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল ‘মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর’ এবং ‘কম্পিতদেবদারু’ এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল ; সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ-অন্বেষণ-তৎপর কিরাতের মাথায় যে-ময়ুরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে, এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিতে লাগিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।[৬]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাল্যকাল থেকেই খণ্ডতা, বিচ্ছিন্নতা, চুলচেরা বিশ্লেষনী রীতির প্রতি তিনি প্রতিকূল ছিলেন। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও বিশ্লেষণ অপেক্ষা সংশ্লেষণধর্মী সামগ্রিকতার প্রতিই তিনি অধিক আস্থা রেখেছিলেন।

সংস্কৃত অনুশীলনের এই পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক আবহাওয়া। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—“আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর আর সাধকদের সাধনা আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।”[৭]

বস্তুত মহর্ষির প্রবর্তনায় সে যুগে একমাত্র ঠাকুর পরিবারেই উপনিষদ আশ্রিত বৈদিক সাহিত্যের চর্চা দেখা যায়। পরিবারের অনুকূল আবহাওয়ায় শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সে কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছেন—“আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব...তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ

আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার মূর্তি সম্যক উপাদানে গড়ে ওঠে নি।"[৮]

বৈদিক যুগের এই তপোবনভিত্তিক জীবনাদর্শ রবীন্দ্র মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে তপোবনের যে নির্মল কল্যাণময় রূপটি রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল, তা তিনি পেয়েছিলেন মুখ্যত কালিদাসের কাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলা থেকেই বাড়িতে মাঘোৎসব সহ যেসব উৎসব পালিত হতে দেখেছিলেন, সেগুলির সঙ্গে বৈদিক সংস্কারের ছিল নিবিড় যোগ। রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের সময় বেদান্তবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি বৈদিক মন্ত্র থেকে নিজেই উপনয়নের অনুষ্ঠান সংকলন করে নেন। উপনয়নের আগে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আরো দুই সহাধ্যায়ীকে মহর্ষি সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করতে হয়। এরপর বৈদিক নিয়ম সানুপুঙ্খ অনুসরণ করে হয় উপনয়ন। এই উপনয়ন উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ 'গায়ত্রী' মন্ত্রের সঙ্গে বিশেষ রূপে পরিচিত হন। নব-উপনীত বালক রবীন্দ্রনাথকে গায়ত্রী মন্ত্র কত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, 'জীবনস্মৃতি'তে তার বর্ণনা আছে—"আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না।...আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"[৯]

অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র ও সংস্কারের প্রতি তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের যে এক বুদ্ধির অগোচর হৃদয়াবেগ ছিল, প্রাচীন সাহিত্য বিচার ও রসোপলব্ধির ক্ষেত্রেও আমরা তাঁর মনের সেই শ্রদ্ধাবিনত ভাবটিই দেখতে পাব। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—"পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার কাছে প্রকৃত সমালোচনা"[১০]। প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কেন এমন কথা বলেন, তা খুব সহজেই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঠাকুরবাড়িতে সে সময় যে এক স্বাদেশিকতার চর্চা ছিল, তার সঙ্গেও ওতপ্রোত হয়েছিল বৈদিক সংস্কৃতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'স্বাদেশিকের সভা'। ঠনঠনের একটি গলির মধ্যে পোড়ো বাড়িতে এই সভা বসত। রবীন্দ্রনাথ

তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই সভার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র কিন্তু এই সভার কার্যবিবরণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে—

> আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তগাগার হইতে লাল-রেশমে জড়ানো বেদ-মন্ত্রের একখানা পুঁথি এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতে প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্। সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর তবে সভার কার্য্য(অর্থাৎ কিনা গল্পগুজব) আরম্ভ হইত।[১১]

এই 'সঞ্জীবনী' সভার কার্যবিবরণীর মধ্যে যতই ছেলেমানুষী আড়ম্বর থাকুক না কেন, স্বদেশমন্ত্রের প্রতীক হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ঐতিহ্যকে এঁরা লালন করেছিল নিজ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।

এই ভাবে বাল্যকাল থেকে কিশোর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির প্রাকপৌরাণিক বৈদিক আবহাওয়ার মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছেলেন, যা উত্তরকালে তাঁকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী করে তুলেছিল।

উপনিষদ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও চিন্তায় উপনিষদের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। উপনিষদ ছিল তাঁর আত্মার খাদ্য-পানীয় স্বরূপ এবং তাঁর যাবতীয় দার্শনিক চিন্তার মূল ভিত্তিভূমি। হেমন্তবালা দেবীকে একটি পত্রে এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদ-বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল করা। যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার।[১২]

কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে উপনিষদের প্রভাব নিরূপণ বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য নয়। সে বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচক সত্তার বিশ্লেষণ করতে বসে আমরা এক্ষেত্রে সাহিত্য-শিল্প ও সৌন্দর্যদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি কেমন ভাবে উপনিষদ দ্বারা অনুস্যূত হয়েছে অর্থাৎ উপনিষদের মন্ত্রগুলিকে সাহিত্য ও শিল্পের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে কাজে লাগিয়েছেন, সেটুকুই আলোচনা করব। সেই আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের প্রতিগ্রহণ কেমন করে ঘটেছে, তার মাত্রাগুলি বিচার করার প্রয়োজন আছে।

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ পাঠ এবং উপনিষদের স্বরূপকে নিজের জীবনে গ্রহণ করার মধ্যে ছিল এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত বিশিষ্টতা। সত্য বটে পিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের সর্বাত্মক প্রভাব উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অথবা ঔপনিষদিক কল্যাণবোধ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের কবিসাধন ও জীবনসাধনার এক কেন্দ্রীয় ধ্রুবপদ তবুও সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করেছিলেন 'খণ্ডিত রূপে'। বিচ্ছিন্নভাবে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক এবং শ্লোকাংশ তাঁর জীবনের পাথেয় হয়েছে কিন্তু সেই কতগুলি বিচ্ছিন্ন শ্লোক ছাড়া উপনিষদ তার অখণ্ড সমগ্রতায় কখনও রবীন্দ্রমানসে ধরা দেয়নি। এর কারণ—বৈদিক উপনিষদগুলির(ভারতবর্ষে লিখিত প্রায় ৩৫০-৪০০ উপনিষদের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে উপনিষদের রূপকৃতিটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে আকবর বাদশাহের রাজসভায় 'আল্লাহ উপনিষদ' রচিত হয়েছিল বলে শ্রতি আছে। তাই এ কথা স্পষ্টভাবেই বলা দরকার যে 'ঈষোপনিষদ' থেকে 'মাণ্ডুক্য-উপনিষদ' পর্যন্ত ১৭ বা ১৮টি উপনিষদ বৈদিক। বাকিগুলি অর্বাচীন) চিন্তায় কোনোও কেন্দ্রীয় সংহতি ছিল না। এগুলি ছিল একপ্রকার ছদ্মদর্শন। পরবর্তীকালে ঋষি বাদরায়ন 'ব্রহ্মসূত্র' নাম দিয়ে উপনিষদের এক কেন্দ্রীয় দর্শনপ্রস্থান নির্মাণ করেন, আরও পরবর্তীকালে এই ব্রহ্মসূত্রের টীকাভাষ্যকে কেন্দ্র করে উপনিষদ ব্যাখ্যার নতুন নতুন প্রস্থান তৈরি হয়ে ওঠে। যেমন শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ', রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', নিম্বার্কের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', বল্লভাচার্যের 'দ্বৈতবাদ' প্রভৃতি। যেগুলিকে সামগ্রিকভাবে আমরা চিনি 'ভারতীয় বেদান্তদর্শন' নামে। উপনিষদ ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদের পাশাপাশি যে দ্বৈতবাদী বিভিন্ন প্রস্থান তৈরি হয়েছিল তার ঐতিহাসিক কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না।...বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।[১৩]

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে গ্রহণ করেছেন খণ্ডিতভাবে, তাঁর মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। উদাহরণ বাহুল্য ত্যাগ করে আমরা আপাতত ছান্দোগ্য উপনিষদকে ধরে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ছান্দোগ্যের 'নাল্পে সুখমস্তি' বা 'সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম'এর মতো শ্লোক রবীন্দ্রজীবনে ধ্রুবপদ হয়ে আছে একথা যেমন সত্য আবার এই ছান্দোগ্যেরই ৫নং অধ্যায়ের ১০ নং খণ্ডের ১-৬ নম্বর শ্লোকে যা বলা আছে, তার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়—

> তাহাদের মধ্যে যাহাদের ইহলোকে অর্জিত শুভকর্মফল অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করেন আবার যাহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল অবশিষ্ট আছে, তাহারা কুক্কুটযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করে[১৪]

এইভাবে একদিকে যে উপনিষদ 'সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম'এর কথা প্রচার করছে, সেই একই বই আবার ব্রাহ্মণযোনির সঙ্গে কুক্কুটযোনির বৈপরীত্য বিচার করে জাতিভেদের পোষকতা করছে। স্বাভাবিকভাবেই ছান্দোগ্যের এই দ্বিতীয়োক্ত বক্তব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ নীরব থেকেছেন। স্ববিরোধে ভরা ঔপনিষদিক তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ আপন মনোধর্মের অনুকূলে নির্বাচন করে নিয়েছেন।

এ তো গেল আহরণের দিক। উপনিষদ ব্যাখ্যার প্রশ্নেও রবীন্দ্রনাথ এক স্বতন্ত্র অভিমুখ নির্মাণ করেছিলেন। পরিণত বয়সের বিভিন্ন লেখায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের যেসব স্বকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, তা অনেকক্ষেত্রেই উপনিষদের ধ্রুপদী ব্যাখ্যার সঙ্গে মেলে না। উপনিষদের শুষ্ক, কঠোর, দার্শনিক তত্ত্বোপদেশ রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের ছোঁয়ায়

আনন্দরসধারায় প্লাবিত। উপনিষদে যা ছিল কঠোর কৃচ্ছ্রতা, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তাতে যুক্ত হয় শ্রী ও লাবণ্যের প্রলেপ। যেমন ধরা যাক, বৃহদারণ্যক উপনিষদের সেই বিখ্যাত শ্লোকটি 'যেনাহং নামৃতা স্যাম, কিমহং তেন কুর্যাম'(যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব, তা নিয়ে আমি করব?)। এই শ্লোকটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা এইরূপ—"মৈত্রেয়ী তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে একথা বলেননি বরং সেই চিরন্তন অমৃতাকে লাভ করার জন্য স্ত্রী-কণ্ঠের যে ব্যাকুল কান্না, তারই অন্তস্থল থেকে উঠে এসেছে মৈত্রেয়ীর এই সকাতর উক্তি।"[১৫]

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

> উপনিষদের সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রী-কণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।...মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে, উপনিষদে নানা দিকে নানা ভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।[১৬]

অর্থাৎ কেবল পুরুষের জ্ঞানের পথে নয়, শ্রীময়ীর অন্তহীন ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়ে উপনিষদ বর্ণিত সেই পরম প্রেয়কে লাভ করবার দিকনির্দেশ রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ ব্যাখ্যার এক নতুন ভুবনকে নির্মাণ করে দেয়।

উপনিষদ যাকে অপার্থিব, ধ্যানলোকের বস্তু বলে মনে করে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই প্রত্যক্ষ করেন এই চিরচেনা পৃথিবীর ধূলায় ধূলায়, ঘাসে ঘাসে। 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী'র একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"সেই অমৃতের স্বাদ পৃথিবীতে যে একেবারে পাইনি, তা নয়। যদি না পেতুম, তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না, আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।"[১৭]

আমরা যারা মর্ত্যমানুষ, স্থূল অনুভূতিসম্পন্ন, আমরাও আমাদের প্রতিদিনের ক্লেদাক্ত জীবনের মধ্যে মধ্যে সেই অমৃতের স্পর্শ অনুভব না করে পারি না। ঘনঘোর বর্ষার মেঘসমারোহের মধ্যে, শরতের শুভ্র নীলাকাশ আর কাশের হিল্লোলের মধ্যে, প্রথম বসন্তের পাতা ঝরানো দক্ষিণ হাওয়ায় অথবা গভীর নিশীথের সঙ্গীবিহীন রাতচরা পাখির করুণ গানে, সেই অমৃতের,

সেই বিরাটত্বের এক চকিত স্পর্শ অনুভব করে, আমরা আমাদের সমস্ত তুচ্ছতা ও দীনতাকে ভুলে গিয়ে সেই বিরাট ছত্রছায়ের তলদেশে নতজানু হতে চাই। মানুষের অন্তরের এই শ্রী, সুন্দরের কাছে পৌঁছানোর এই যে ব্যক্তিগত ব্যাকুল কান্না, এই-ই হল রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম। ঔপনিষদিক ঈশত্ব অপেক্ষা যা স্বতন্ত্র আবার ঔপনিষদিক ঐশ্বরিক ধারণার মূলগত সত্যও এই।

ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখলেন রবীন্দ্রনাথ—

> কবি বলেন, তিনি তো অনেক চেষ্টা করেছেন। তত্ত্বকথা মেনে নেবেন বলে পোড়ো বাড়ির শূন্য ঘরে, গুহার গহ্বরে অন্ধকারে ভূতপ্রেতেরও সন্ধান করে ফিরেছেন, কিন্তু না পেলেন কারো দেখা, না পেলেন কারো সাড়া। অবশেষে একদিন বসন্তে যখন দক্ষিণ হাওয়ার আন্দোলনে বনে বনে প্রাণের গোপন বাণী জাগবে জাগবে করছে, এমন সময় হঠাৎ তার অন্তরের মধ্যে এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্পর্শ নেমে এল, মুহূর্তে তার সংশয় ঘুচে গেল। শাস্ত্রের মধ্যে যাকে খুঁজে পাননি, তিনি হঠাৎ চিত্তের মধ্যে ধরা দিলেন।[১৮]

অর্থাৎ উপনিষদ কথিত ব্রহ্মোপলব্ধি কোনো শুষ্ক বিষয় নয়, সেখানে গভীরভাবে মিশে আছে বিষয়ীর আত্মতা। আর এই আত্মতার গুণেই উপনিষদের তত্ত্ব নতুন ব্যাখ্যা লাভ করে রবীন্দ্রনাথের চেতনায় কারণ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন—"আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই, সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না...ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা।"[১৯]

এইভাবেই ব্যক্তিগত আত্মসাধনায় ও বৃহত্তর জীবনসাধনায় উপনিষদ ও তার থেকে প্রাপ্ত জীবনবোধের এক মৌলিক ভাষ্য নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথ, যে মৌলিকতা তাঁর মানসস্বাতন্ত্র্যের আলোকবৃত্ত থেকেই জাগ্রত। এখন আমাদের বিচার্য, এই আত্মস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ঔপনিষদিক চেতনা রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্য ও সৌন্দর্যচেতনাকে কতখানি নির্মাণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচক সত্তার উদঘাটনে এই বিচার জরুরি। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে ঔপনিষদিক আর্ষ উপলব্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। 'সত্য', 'জ্ঞান', 'অনন্ত', 'অমৃত', 'রস', 'লীলা', 'আনন্দ', 'অদ্বৈত', 'ভূমা' –ইত্যাকার ঔপনিষদিক শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারমূলক আলোচনায় বারেবারে প্রযুক্ত হয়েছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পরব্রহ্ম যেমন এই বিশ্ব প্রপঞ্চের স্রষ্টা, সেইরূপ কবি বা শিল্পী কাব্য-চিত্র-ভাস্কর্য বা সংগীতরূপ

কলাসমূহের সৃষ্টিকর্তারূপে কবি ও শিল্পী বিশ্বস্রষ্টা বিধাতারই প্রতিভূ। অলংকারশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ

যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ধতে।।[২০]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্পসমালোচনামূলক প্রবন্ধে বিধাতার সঙ্গে কবি ও শিল্পীর এবং বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে কাব্য ও শিল্পসৃষ্টির সাজাত্য সম্পর্ক বারেবারে কথিত হয়েছে। 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

> ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত ; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।[২১]

রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের প্রকাশতত্ত্বকেও শিল্প ও সাহিত্যস্রষ্টার প্রকাশমাহাত্ম্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্ম 'স্বপ্রকাশ' স্বরূপ ; এই নিখিল বিশ্ব তাঁরই প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্ম যেমন নিজেকেও প্রকাশ করেন, তেমনই ব্রহ্মাতিরিক্ত যাবতীয় জাগতিক দৃশ্যপ্রপঞ্চকেও নিজ প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত করছেন। তাই উপনিষদ বলছেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'[২২]

সেই 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পরব্রহ্মকে উপনিষদের ঋষিগণ 'আবিঃ'রূপে আবাহন করেছেন— "আবিরাবীর্ম এধি"। আবিঃ প্রকাশেরই পারিভাষিক শব্দমাত্র। রবীন্দ্রনাথ যেমন সেই

প্রকাশস্বরূপ সত্যকে বারবার নিজের জীবনে আহ্বান জানিয়েছেন তেমনি যথার্থ শিল্প ও সাহিত্যের উৎস রূপে এই পরম প্রকাশকেই চিহ্নিত করেছেন—"আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ।"[২৩]

কবিতা, সংগীত, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পও স্রষ্টা কবি বা শিল্পীর আত্মপ্রকাশ মাত্র। সেইরূপ বিশ্বসৃষ্টিও বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বররূপ শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। সেই পরমেশ্বর সকল কবি ও শিল্পীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর রচিত বিশ্বও সকল কাব্য ও শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই ভাবনার সঙ্গে প্লেটোর ইমিটেশন তত্ত্বের যতই মিল থাকুক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এই চেতনা লাভ করেছেন উপনিষদের সূত্রে। 'পঞ্চভূত'এর অন্তর্গত 'গদ্য ও পদ্য' শীর্ষক আলোচনায় ঈশ্বরের বিশ্বরচনার সঙ্গে কবির কাব্য রচনার তুলনা করে লিখেছেন—

> ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম, সৌন্দর্য, মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকেও গুণপনা দেখাইতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ, বর্ণ এবং গন্ধ বহু যত্নে বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন, তাহাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করিতে তাঁহাকে যে কেমন সুনির্দিষ্ট সুসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাব প্রকাশ করিতে মানুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের মধ্যে সংগীত আনিতে হয়, ছন্দ আনিতে হয়, সৌন্দর্য আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। ইহাকে যদি কৃত্রিমতা বল, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম।[২৪]

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন্দনতত্ত্বের ভাবনায় সাহিত্যসৃষ্টিকে ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রকাশের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন এবং তাঁর সাহিত্যবিষয়ক চিন্তার একটি মূল তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছেন।

উপনিষদের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় এই দৃশ্যমান জগৎ যেমন ব্রহ্মের বিশেষ প্রকাশ, তেমনই এই জগৎসৃষ্টি তাঁর 'লীলা'ও বটে। লীলা বলতে বোঝায় অপ্রয়োজনের আনন্দ। শিশু যেমন তার মনের খেয়ালে খেলাঘর তৈরি করে আবার তা ভেঙে দেয় তেমনই এই জগৎপ্রপঞ্চ ঈশ্বরের হাতে ভাঙা-গড়ার লীলামাত্র। শঙ্করের অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যায় এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা ও মায়া মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র সৎস্বরূপ, জগৎ ব্রহ্মের বিকার। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা মনে করেন

পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা বা মায়ার কার্য নয়। ব্রহ্মই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। জগৎ ব্রহ্মের 'বিকার' বা 'বিবর্ত' নয়, তা ব্রহ্মের 'পরিণাম'। এই জগৎসৃষ্টি ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের লীলা। এই লীলা অহেতুক, নিষ্প্রয়োজন। আমাদের ব্যাবহারিক জীবন যেমন কোনো না কোনো প্রবৃত্তির অভাবপূরণ অথবা প্রয়োজনসাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, পরমেশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিরূপ লীলার তেমন কোনো হেতুবিষয়ক লক্ষ্য নেই। 'শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ'এ বলা হয়েছে, যথা—

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি

কালং তথাঅন্যে পরিমুহ্যমানাঃ

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে

যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বচক্রম্[২৫]

এই শ্লোকে বিশ্বসৃষ্টির প্রবৃত্তিকে পরমেশ্বরের 'স্বভাব'রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। যা লীলারই নামান্তর। কবি বা শিল্পীর দ্বারা যাবতীয় রূপসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ লীলার সঙ্গে তুলনা করেছেন— "অন্তরের অহেতুক আনন্দকে বাহিরে প্রত্যক্ষগোচর করার দ্বারা তাকে পর্যাপ্তি দান করবার যে চেষ্টা তাকে খেলা না বলে লীলা বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে আমাদের রূপসৃষ্টি করবার বৃত্তি ; প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি নয়।..."[২৬]

এই বিশ্ব যেমন লীলাময়ের সীমাহীন আনন্দ থেকে উদ্ভূত, ঠিক তেমনই কবি বা শিল্পী সৃষ্টির মুহূর্তে আংশিক হলেও জগৎস্রষ্টা পরব্রহ্মের সঙ্গে সারূপ্য অনুভব করে থাকেন। সেই মুহূর্তে পরব্রহ্মের মতো তিনিও 'লীলাময় স্রষ্টা'। সেই সৃষ্টির মুহূর্তে যে অপরিমিত আনন্দ তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে রাখে, তাকে আর অন্তরের মধ্যে নিরুদ্ধ করে রাখা সম্ভবপর হয় না, সাহিত্য বা শিল্প হল সেই আত্মানন্দেরই উচ্ছলনমাত্র। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ আরো একদিক থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন—"সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।"[২৭]

সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিশ্বস্রষ্টা যেমন নিজেকেই খুঁজে পান, শিল্পী মানুষও তেমনি নিজ সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আত্মানন্দকেই খুঁজে পান। তাই ঈশ্বর যেমন লীলাময়, মানুষও তেমনি লীলাময়।

কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি যদি ঈশ্বরীয় জগৎসৃষ্টিরূপ লীলার অনুরূপ হয়, তবে প্রশ্ন আসে লীলাময়ের জগৎলীলায় এত দুঃখ কেন? শোক, বিষাদ, বিচ্ছেদ কেন? ঔপনিষদিক দর্শনে এর উত্তর এইরকম পাওয়া যায় যে, এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ লীলার মূলে আছে পরিপূর্ণ ও নিরতিশয় আনন্দ, জাগতিক অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই সৃষ্টি হয়নি। তবুও যে এই বিশ্বসৃষ্টি সাংসারিক জীবের ব্যাবহারিক প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে, এটা নেহাৎই একটি আনুষঙ্গিক, কাকতালীয় ব্যাপার। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের সুখ-দুঃখ, শোক-হর্ষ, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত ইত্যাদি দ্বন্দ্বের কোনো অস্তিত্ব নেই ; একটি অখণ্ড, সীমাহীন, অনন্ত আনন্দ-পারাবারের মধ্যে সব বিরোধ এবং দ্বন্দ্ব সমীভূত হয়ে আছে। এইসব বিরোধ ও বৈচিত্র্য সেই অনন্ত আনন্দ-সমুদ্রেরই ঢেউ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন—

> এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই...উপনিষদ ইহার উত্তর দিয়াছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই-বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেই-বা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ তো আছেই, কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না।[২৮]

জগৎস্রষ্টার আনন্দময় বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপে কবি-শিল্পীও সৃষ্টিক্ষণে এক অপার, অনির্বচনীয়, লোকাতীত আনন্দ অনুভব করে থাকেন, যে আনন্দের প্রভায় সুন্দর-অসুন্দর, রম্য-জুগুপ্সিত নির্বিশেষে সকলই উদ্ভাসিত হয়ে যায়। সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির এই পরম রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করে আচার্য ধনঞ্জয় বলেছেন—

রম্যং জুগুপ্সিতমুদারমথাপি নীচম্

উগ্রং প্রমাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।

যদ্ বাঅপ্যবস্তু কবি-ভাবকভাব্যমানং

তন্নাস্তি যন্ন রসভাবমুপৈতি লোকে।।[২৯]

শিল্প বা সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও এর প্রতিরূপমাত্র। লৌকিক দৃষ্টিতে যা অত্যন্ত তুচ্ছ ও কুৎসিত পদার্থ, তা যখন শিল্পে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তা সেই পরমতত্ত্বেরই প্রকাশ মাত্র কারণ তা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত। তৈত্তিরীয় উপনিষদের যে মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বারেবারে উদ্ধৃত করেছেন, তা তাঁর সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রেও সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি

আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ।।[৩০]

লৌকিক জগতের বস্তু যখন অ-লৌকিক শিল্পে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বিভাবাদিতে রূপায়িত হয়, তখন তা কেবলই আনন্দের আকর। লৌকিক জগতের শোক-দুঃখ, বিষাদ তাতে আর অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি সহৃদয় সামাজিকেরও কাব্যপাঠ বা অভিনয় দর্শনের কালে যে অনুভূতি জন্মায়, তাও পরিপূর্ণ আনন্দময়। তার মধ্যেও দুঃখ-বেদনা বা শোকের চিহ্নমাত্রও থাকতে পারে না। বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণঃ'এ বিষয়টি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন—

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্

কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোইপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।

তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা।

অশ্রুপাতাদয়স্তদ্‌বদ্ দ্রুতত্বাচ্চেতসো মতাঃ[৩১]

সাহিত্যে দুঃখের বর্ণনা অথবা ট্র্যাজিক কাব্যও কেমন ভাবে পরিণামে আনন্দের আকর হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক ; কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে—সেই ভূমৈব সুখম্[৩২]

উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্মই পরম রস—রসতম এবং ব্রহ্মের সঙ্গে সাযুজ্যলাভেই সেই পরম রস বা আনন্দের অনুভূতি সম্ভবপর হয়ে থাকে। সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও কবি বা শিল্পী সেই পরম তত্ত্বের সান্নিধ্যলাভ করে থাকেন। শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির আনন্দ ব্রহ্মস্বাদের আনন্দের তুলনায় ন্যূন নয়। এমনকি কবির সাহিত্য অথবা শিল্পের যারা ভোক্তা, তারাও কাব্য উপভোগের এক তন্ময় মুহূর্তে ব্রহ্মস্বাদের সমতুল আনন্দে পরিপ্লুত হয়। আচার্য অভিনবগুপ্ত, 'রসগঙ্গাধর'কার জগন্নাথ ও অন্যান্য আলংকারিকেরাও মনে করেন, রসাস্বাদ অজ্ঞানআবরণশূন্য আত্মচৈতন্যের স্বরূপ সাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। মানুষের আত্মচৈতন্য অপরিমিত সত্তা, অপরিমিত জ্ঞান বা চৈতন্য এবং অপরিমিত আনন্দের আকর। সত্ত্বগুণের উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অজ্ঞান আবরণ অপাবৃত হলে আমাদের যথার্থ স্বরূপভূত আনন্দের উৎসমুখ খুলে যায়। সামাজিকের হৃদয়ে আত্মার আবরণভঙ্গজনিত রসাস্বাদ ব্রহ্মপ্রাপ্তির রসাস্বাদের সমতুল। বিশ্বনাথ কবিরাজ রসের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে 'সাহিত্যদর্পণঃ'এ বলেছেন—

সত্ত্বোদ্রেকাখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।

বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।।

লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।

স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ।।[৩৩]

আলংকারিকদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে রবীন্দ্রচিন্তার একরূপতা উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ করা যায়। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যাশাখার সাহায্যে আমরা দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম জ্ঞান আহরণ করে থাকি, কিন্তু কেবলমাত্র কাব্য অথবা চারুশিল্পগুলির মধ্যে দিয়েই আমাদের আত্মচৈতন্যের আনন্দ-সাক্ষাৎকার ঘটে থাকে। তাই একমাত্র কাব্য বা শিল্পের মধ্যে দিয়েই উপনিষদবর্ণিত সেই রসঘন আনন্দকে লাভ করা যায়। তাই রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি—

> সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণ-পরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেঃ রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। তিনিই রস ; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।[৩৪]

শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সাহিত্যের সিদ্ধান্তেরই পোষকতা করেছেন। সেক্ষেত্রে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' এর অন্তর্ভুক্ত "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"[৩৫] শ্লোকটি নানাক্ষেত্রে উদ্ধার করেছেন। কবি বা শিল্পী সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আত্মচৈতন্যের আবরণভঙ্গ ঘটিয়ে মানবের বিশুদ্ধ স্বরূপটিকে উদঘাটন করেন। আত্মচৈতন্যের স্বরূপ আবিষ্কারজনিত আত্মোপলব্ধিই সকল শিল্প ও সাহিত্যের পরম লক্ষ্য। ঋষি বা যোগীগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার দ্বারা যে পরম তত্ত্বকে উপলব্ধি করেন, কবি ও শিল্পীরা তাঁদের শিল্প সাধনার মধ্য দিয়ে সেই একই উপলব্ধিতে পৌঁছোন। সৃষ্টির সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষের মধ্যেই এই আত্মসাক্ষাৎকার তথা আত্মোপলব্ধির স্পৃহা দেখা যায়। এই আত্মোপলব্ধিতেই মানুষের জীবন ও সত্তার পরিপূর্ণ সার্থকতা। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'এর ঋষি একেই 'আত্মসংস্কৃতি' বলে নির্দেশ করেছেন। সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে দিয়েই মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মসংস্কৃতির অনুশীলন সম্ভব বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত—

> আমাদের পেট ভরাবার জন্যে—জীবনযাত্রার অভাব মোচন করবার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা ; মানুষের শূন্য ভরাবার জন্যে, তার মনের মানুষকে নানা রসে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আছে তার তার সাহিত্য তার শিল্প। মানুষের ইতিহাসে এর স্থান কী বৃহৎ, এর পরিমাণ কী প্রভূত। সভ্যতার কোনো প্রলয়-ভূমিকম্পে যদি এর বিলোপ সম্ভব হয় তবে মানুষের ইতিহাসে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা কালো মরুভূমির মতো ব্যাপ্ত হয়ে যাবে। তার কৃষ্টির ক্ষেত্র আছে তার চাষে বাসে আপিসে কারখানায় ; তার সংস্কৃতির ক্ষেত্র সাহিত্যে—এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলছে, সে আপনিই হয়ে উঠছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাই বলেছেন : "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।[৩৬]

অন্যান্য জীবগণের তুলনায় মানুষের স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে শিল্পসাহিত্যের চর্চার মধ্যে দিয়ে সে নিজেকে ক্রমশই সংস্কৃত করে তুলছে। আর এর দ্বারা সে আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠছে। বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত। কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।[৩৭]

এইভাবে আমরা দেখলাম উপনিষদে তথা বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত নানা সিদ্ধান্ত ও শ্লোকোক্তিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পের নানাবিধ ব্যাখ্যায় কেমন করে কাজে লাগিয়েছেন। এর মধ্যে দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের ব্যাখ্যাতা বা সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা ও নান্দনিক বোধের একটি বিশেষ মাত্রা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

রামায়ণ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ

ভারতীয় ঐতিহ্যের স্তম্ভরূপে আদিকবির রামায়ণ রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন ধরে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রবীন্দ্রসৃষ্টির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। রামায়ণের কাহিনি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সব রসসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র মতো নাটক অথবা 'ভাষা ও ছন্দ', 'পুরস্কার' বা 'অহল্যার প্রতি'র মতো কবিতা, সে সব নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না। আমাদের অন্বিষ্ট কেবল তাঁর সেইসব লেখা যেখানে তিনি আদিকবির এই অমর সৃষ্টিকে ব্যাখ্যার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পটে এই মহাকাব্যের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করেছেন এবং আপন বোধ ও বিশ্লেষণী শক্তির দ্বারা এর অন্তর্নিহিত মূল সত্য উদঘাটন করে বৃহত্তর পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ

রামায়ণ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব বিচার করাই আমাদের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আমাদের মূল আকর অবশ্যই ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থভুক্ত ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধ এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবন ধরে লিখিত অজস্র প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত নিবন্ধে উল্লিখিত রামায়ণ ব্যাখ্যার অংশসমূহ।

ছেলেবেলায় ভৃত্যরাজকতন্ত্রের ঘেরাটোপের মধ্যে যে সব বই নিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়, সেগুলির মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রধান। মাতৃভাষায় রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ আর জনৈক ভৃত্যের মুখে গণ্ডিডিঙোনো সীতার দুর্দশার কাহিনি শুনে অতি শিশুকালেই রামকথার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ‘জীবনস্মৃতি’তে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সেই সাক্ষ্য। যেমন—“গণ্ডি পার হইয়া সীতার কী সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এইজন্য গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশ্বাসীর মতো উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।” অথবা ‘শিক্ষারম্ভ’ অধ্যায়ের সেই চেনা বর্ণনাটি—

> রামায়ণ পড়ার একটি দিনের ছবি স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।...দিদিমা, আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাট-ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।।[৩৮]

জীবনের অপরাহ্নবেলার কাব্য ‘আকাশপ্রদীপ’এর ‘যাত্রাপথ’ কবিতায় ছেলেবেলার সেই রামায়ণ পাঠের স্মৃতি আরো সজীবতা নিয়ে ধরা পড়েছে—

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সে বটতলাতে ছাপা,

দিদিমায়ের বালিশতলায় চাপা।

আলগা মলিন পাতাগুলি, দাগি তাহার মলাট

দিদিমায়ের মতোই যেন বলি-পড়া ললাট।

মায়ের ঘরের চৌকাঠেতে বারান্দার এক কোণে

দিন-ফুরানো ক্ষীণ আলোতে পড়েছি একমনে।

অনেক কথা হয়নি তখন বোঝা,

যেটুকু তার বুঝেছিলাম মোট কথাটা সোজা—

ভালোমন্দে লড়াই অনিঃশেষ,

প্রকাণ্ড তার ভালোবাসা, প্রচণ্ড তার দ্বেষ।

বিপরীতের মল্লযুদ্ধ ইতিহাসের রূপ

সামনে এল, রইনু বসে চুপ।[৩৯]

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরে আর একটু বড়ো বয়সে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। উপনয়নের পর মহর্ষির সঙ্গে তিনি কিছুকাল ডালহৌসি পাহাড়ে কাটিয়েছিলেন, সেই সময় মহর্ষির তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসাগর সংকলিত 'ঋজুপাঠ'এ অনুষ্টুভ ছন্দে মূল বাল্মীকি রামায়ণের অংশবিশেষ পাঠ করেন তিনি। পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়া না গেলেও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'তে উদ্ধৃত শ্লোক ও 'ভারতী' পত্রিকায় মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় তিনি যেভাবে মূল রামায়ণের শ্লোক ব্যবহার করে প্রতিতুলনা করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে অল্প বয়সের মধ্যেই তিনি বাল্মীকি রামায়ণ অধিগত করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের চিরায়ত ঐতিহ্যরূপে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল বাল্য-কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল। নানা প্রসঙ্গ ও আলোচনায় তিনি বিশেষভাবে রামায়ণের আদর্শ, চরিত্র, পটভূমিকা ও রূপক সম্পর্কে অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত 'রামায়ণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা লেখবার বাহ্য প্রেরণায় প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল কিন্তু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ চিন্তার সারাৎসার ধরা পড়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের মতো রচনা, যা সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় চিত্তে গ্রথিত হয়ে এ দেশের আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে, তার বিচারপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিৎ, এর

ঐতিহ্যগত মূল্য নির্ণয়ই বা কীভাবে করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই ভেবেছেন। যে কোনো সাধারণ গ্রন্থকে যেভাবে বাজার-দর যাচাই করে তৌল করা হয়, রামায়ণ-মহাভারতের মতো রচনা সে পদ্ধতিতে বিচার্য হতে পারে না। শুধুমাত্র নিজস্ব ভালো লাগা-মন্দ লাগার সাপেক্ষে নয়, জাতির যুগমানসের প্রেক্ষাপটে রেখে এ জাতীয় সাহিত্যকে বিচার করতে হবে।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি মহাকাব্যের লক্ষণ ও এদেশীয় মহাকাব্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য এপিকের ভাবগত অমিল নিয়ে কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, মহাকাব্য হল সেই শ্রেণির সৃষ্টি যার মধ্যে দিয়ে "একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।"[৪০] সুতরাং এই রচনা কোনও ব্যক্তিবিশেষের নয়, তা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমগ্র জাতিরই সামগ্রী, জাহ্নবী-হিমাচলের মতো তা সমগ্র ভারতের সম্পত্তি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারও নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশ্যে নামকরণমাত্র।"[৪১] ব্যাস-বাল্মীকির নামের অন্তরালে বসে কত স্বল্প শক্তিধর রচনাকার, লিপিকার ও কথককুল হাজার হাজার বছর ধরে নিজেদের রচনাকে এর মধ্যে বিন্যস্ত করে দিয়েছেন, তার হিসেব নেই। তাছাড়া ব্যাস-বাল্মীকির নামও তো রূপকের ছদ্মবেশ। বল্মীকস্তূপে যিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনিই বাল্মীকি, কৃষ্ণবর্ণের যে ব্যক্তি দ্বীপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং বেদ বিন্যস্ত করেছিলেন, তিনিই কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আখ্যান এই সব রচনার মূল চরিত্র হলেও আখ্যানই এর সর্বস্ব নয়। এর আখ্যান-কাঠামোর মধ্যে ঐতিহাসিক কাঠামোর কঙ্কাল খুঁজলে পাওয়া যাবে কিন্তু তার সঙ্গে ধর্ম-সমাজ-স্মৃতি-পুরাণ-দর্শনের নানা শাখা-প্রশাখা সব মিলেমিশে গিয়ে এই মহাকাব্য সমস্ত জাতির আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিস্তারের মহাভাষ্যে পরিণত হয়েছে।

রামায়ণ ও মহাভারতকে ইউরোপীয় এপিক বা কাব্যের আদর্শে বিচার করা চলবে না, কেননা ইউরোপীয় এপিকের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারতের গোত্রগত অমিল। রামায়ণের মধ্যে যেমন করে ভারতবর্ষের মর্মবাণী ধরা পড়েছে, তেমনই ইলিয়াড-ওডিসি-ঈনিডের কাব্যকার হোমার-ভার্জিল-তাসো বা দান্তের কাব্যে প্রাচীন ইওরোপের অন্তর্বাণী নিশ্চয়ই ধরা পড়েছিল। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত যেমন ভারতীয়ের কাছে শুদ্ধ কাব্যমাত্র নয়, তা প্রত্যেক ভারতীয়ের জীবনের মর্মমূলে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে, ইউরোপীয় মহাকাব্যগুলি সেভাবে কিন্তু আজ আর সেখানকার মানুষদের

মর্মমূলে শিকড় গেঁড়ে নেই, তারা অতিকায় জন্তুর মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুধু তাদের মৃত শরীরের কঙ্কাল-কাঠামোটুকু আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্যের মধ্যে কোথাও কোথাও আত্মগোপন করে আছে মাত্র। হোমার-ভার্জিল এখনও বেঁচে আছেন কেবল ইউরোপীয় সাহিত্যে, জীবনের আদর্শ থেকে তারা অন্তর্হিত হয়েছে। ভারতীয় জীবনে রাম-লক্ষ্মণ এখনও যেভাবে প্রাতঃস্মরণীয়, একজন পশ্চিমা নাগরিক কী সেইভাবে হোমার-ভার্জিলের চরিত্রগুলিকে স্মরণ করেন? এর কারণ রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে যেভাবে ভারতের ধর্ম-অধ্যাত্মিকতা-নীতি-সদাচার-মূল্যবোধ-কর্তব্যনিষ্ঠাসহ জীবনধারণের সার্বিক আদর্শ সংলগ্ন হয়ে গেছে, ইউরোপীয় মহাকাব্যগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় মনের সেই যোগসূত্র তেমন ভাবে আর নেই। সেগুলি পাশ্চাত্যের কাছে ক্লাসিকাল সাহিত্য মাত্র ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দেশের ধন নহে—তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী"[৪২]। তাই পাশ্চাত্য এপিকের ছাঁচে ফেলে রামায়ণ-মহাভারতকে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়, এর জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র মাপকাঠি।

হোমারের ইলিয়াড-ওডিসির পরে মোটামুটি ভার্জিল থেকেই ইউরোপে মহাকাব্য রচনার নতুন যুগের প্রবর্তন হয়, ইনি হোমারের আদর্শেই ঈনিড লেখেন। ঈনিড মহাকাব্য বটে কিন্তু হোমারের তুলনায় তার শ্রেণি আলাদা। একে Epic Of Art বলা যেতে পারে। ভার্জিলের পর দান্তে, তাসো, স্পেন্সার, মিলটন থেকে টমাস হার্ডির মতো কবিরা প্রাচীন ইতিহাস ও উপাদানকে অবলম্বন করে শিল্পকলামণ্ডিত মহাকাব্য রচনা করেন। এগুলির আবেদন রসিক বোদ্ধার কাছে, সর্বজনীন জনচিত্তে নয়। আমাদের দেশেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে কালিদাস, অশ্বঘোষ, ভারবি, ভট্টি, কুমারদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষের মতো কবিরা পূর্বতন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। এগুলিকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বলা যেতে পারে। রসিকচিত্তের কাছেই এর আবেদন। কিন্তু তবুও এইসব মহাকাব্য কখনোই রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে এক পংক্তিভুক্ত হতে পারবে না। কারণ জাতীয় জীবনের বৃহত্তর হৃদস্পন্দনকে এইসব শখের মহাকাব্য ততখানি স্পর্শ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ হোমারকে ব্যাস-বাল্মীকির মতো আর্ষ কবি বলে মেনেছেন, তাঁর কথায় ভারতবর্ষে যেমন রামায়ণ-মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে তেমনি ইলিয়ড এনিড ছিল। তারা সমস্ত গ্রিস ও রোমের 'হৃৎপদ্মসম্ভব' ও 'হৃৎপদ্মবাসী' ছিল। কবি হোমার ও ভার্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেছিলেন। একথা বলেও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে ঐ কাব্যগুলির প্রতিতুলনার ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ রেখে বলেছিলেন—"আমরা বিদেশি, আমরা

নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রিস ও রোম তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।"[৪৩]

ইউরোপকে মধ্যযুগে খ্রিস্টান আদর্শ যেভাবে গ্রাস করে রেখেছিল তাতে হেলেনীয় পেগান হোমার ইউরোপীয় জীবনের মর্মমূল থেকে অনেকটাই দূরে সরে যান কিন্তু রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় জনচিত্ত থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে, মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর।"[৪৪]

ভারতের জাতীয় জীবনে এই দুই কাব্য নিছক মহাকাব্য নয়, তা ইতিহাসও বটে। এই ইতিহাস ঘটনাবলীর ইতিহাসমাত্র নয়, কারণ ঘটনাবলীর ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট সময়ধারাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে ; রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ভারতবর্ষের যা সাধনা, আরাধনা ও সংকল্প, তারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে শক্ত ভিত্তিতে গ্রথিত হয়ে আছে। অন্য ইতিহাস কালে কালে পরিবর্তিত হয়ে গেছে কিন্তু ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্তার সঙ্গে মিশে যাওয়ায় রামায়ণ-মহাভারতে বিধৃত ইতিহাসের কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে নি। সুতরাং যে মহাগ্রন্থ দেশের ভূতলজঠর থেকে উত্থিত হয়ে দেশকে আশ্রয় দান করেছে, তাকে সাধারণ কাব্য সমালোচনার আদর্শে 'ভালো লাগল' অথবা 'ভালো লাগল না' বলে বিচার করা অমূলক। সুতরাং বিচার নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে এই কাব্যের মহত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। সমালোচনার ছাঁচে ফেলে কাটাছেঁড়া করে নয়, বিস্ময়মিশ্রিত ভক্তির দ্বারাই এই কাব্যকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণের মতো আর্ষ মহাকাব্যের আলোচনা যেন পূজা, আর সমালোচক যেন সেই পূজার পুরোহিত। তাই 'পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই' প্রকৃত সমালোচনা। বলা বাহুল্য, কাব্য সমালোচনার এই আদর্শ আজকের পাঠকের কাছে অভিপ্রেত হবে না। তবুও রবীন্দ্রনাথ কেন এমন কথা বলেছেন তার যুক্তি খুব পরিষ্কার—প্রথমত, রামায়ণ রবীন্দ্রনাথের কাছে নিছক কাব্য বা ইতিহাস নয়। তার চেয়েও বেশি কিছু। রামায়ণের সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বছরের হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হয়ে আসছে। তাই তাঁর কথায়—"আমি যতবড়ো সমালোচকই হই না কেন, একটি সমগ্র দেশের ইতিহাস-প্রভাবিত

সমস্ত কালের বিচারের নিকট যদি আমার শির নত না হয় তবে সেই ঔদ্ধত্য লজ্জারই বিষয়।”[৪৫] দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, আধুনিক কালে সাহিত্য-সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা, কারণ সাহিত্য এখন ‘হাটের জিনিস’, সাহিত্যের বাজার-মূল্যের কোনো উপযোগিতা নেই, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন না, কিন্তু রামায়ণের মতো কাব্যকে বাজার-দর-যাচাই করা সমালোচনার ছাঁচে ফেলে বিচার করতে তিনি রাজি নন। এই আর্ষ মহাকাব্য শুধু একজন কবির রচনা বলে পরিচিত নয়, এতে বহু যুগের বহু মনের ধারা এসে মিশ্রিত হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।”[৪৬] এমন ক্ষেত্রে গ্রন্থের দোষ-গুণ নির্ণয় বাহুল্যমাত্র। রামায়ণের মতো যে মহাগ্রন্থ সমগ্র জাতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ ও ধারণ করে থাকে তা নিন্দা-প্রশংসা, বিতর্ক-বিশ্লেষণের বাইরে চলে গিয়ে নিত্যকালের কাব্যে পরিণত হয়েছে। তাই ভক্তিমিশ্রিত আবেগ নিয়ে রসানন্দ ভোগই এমন কাব্যের যথার্থ সমালোচনা।

রামায়ণ কীভাবে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে, কীভাবে যুগের পর যুগ ধরে তা ভারতীয় জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে, এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অভূতপূর্ব এবং তা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। Weber কি Winternitz এর মতো ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কখনোই রামায়ণকে বিশ্লেষণ করে দেখেননি। তাঁরা রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিক ও রূপক ব্যাখ্যা নিয়ে সর্বাধিক বুদ্ধিব্যয় করেছেন অথচ রামায়ণের সর্বকালীনতা ও সর্বজনীনতা নিয়ে, ভারতীয় জীবনকে রামায়ণ কেমন করে গঠন করে তুলেছে, সে সব নিয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারেননি। এর কারণ সম্ভবত ভারতীয় জীবন এবং এদেশের সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতাহীনতা। এই মহাকাব্যকে তাঁরা এপিকের কোঠায় ফেলে বিচার করতে চেয়েছেন, সেই বিচারের মাপকাঠি হয়েছে পাশ্চাত্যের Heroic Epic , হোমারের দুখানি পৌরাণিক মহাকাব্য এবং অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস গ্রন্থের মহাকাব্য বিচারের সূত্র। পাশ্চাত্য এপিক উত্তেজনাময় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পূর্ণ। স্থির, শান্ত কল্যাণাশ্রিত জীবনাদর্শ সেখানে ততখানি স্বীকৃতি পায়নি। হোমার শুধু যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার কথাতেই তাঁর দুই মহাকাব্য পূর্ণ করেছেন। বিশেষ করে ইলিয়াড সম্পর্কে একথা তো বলাই যায়। যুদ্ধ, শত্রুসৈন্যের হুংকার, মানুষের দানবীয়তা, নির্মমতা ও বীভৎসতাকেই এই

কাব্য দেখিয়েছে। আর্ত-নিপীড়িতের নিষ্ফল কান্নার তলায় জীবনের মহৎ, স্নিগ্ধ কারুণ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার আদর্শ চাপা পড়ে গেছে। এদিক থেকে ভারতীয় মহাকাব্য দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত। শুধুমাত্র যুদ্ধঘটনাই রামায়ণে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। রামায়ণের মূল কথাটা দাঁড়িয়ে আছে তার গার্হস্থ্য জীবনের বনিয়াদের ওপর। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই দেখিয়েছেন—"রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামীস্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।"[৪৭]

রামায়ণে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি থাকলেও এই যুদ্ধঘটনার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাম-সীতার দাম্পত্য প্রেম ও রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহকে উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। তাই এ কাব্যে যতই বাহ্য ঘটনার আড়ম্বর থাক না কেন, রামায়ণ আসলে গৃহজীবনের কাব্য। রামায়ণে পারিবারিক ও মানবিক সম্পর্কগুলিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা লাভ করেছে। সে জন্য লঙ্কাকাণ্ডে এই মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটতে পারে না। রাবণবধ ও সীতা উদ্ধারের পরেও 'উত্তরকাণ্ড'এর করুণার অশ্রুজলটুকু বাকি থেকে যায়। এই উত্তরকাণ্ডই প্রমাণ করে রামায়ণ তথাকথিত Heroic Epic নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু। উত্তরকাণ্ড আদৌ বাল্মীকিরচিত নাকি তা পরবর্তী সমাজ-অধিমানসের প্রক্ষেপ, সে বিচার রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র করেছেন কিন্তু সমাজজীবনের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পারিবারিক সম্পর্ক, হৃদয়ধর্ম ও কর্তব্যবোধের টানাপোড়েন উত্তরকাণ্ডের মধ্যে দিয়েই রামায়ণে মহাকাব্যের লক্ষণকে ফুটিয়ে তুলেছে। বিশেষত "পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।"[৪৮]

ভারতবাসীর মনে রামায়ণের অপরিসীম গুরুত্বের সবচেয়ে প্রধান কারণ, রামায়ণ ভারতবাসীর মনে চারিত্র ও গার্হস্থ্য ধর্মকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। গৃহাশ্রম ভারতীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমেরই কাব্য।তাই শুধুমাত্র গল্পরসের জন্যই নয়, দেশকালনিরপেক্ষ মানুষের ঘরের কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলেই সর্বদেশে সর্বকালে এই কাহিনি সমাদর লাভ করেছে। মানুষ প্রধানত গৃহবাসী জীব, গৃহ সন্ধানই তাকে আরণ্যক জীবন থেকে সভ্যতার পথে টেনে এনেছে। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের যুগে সংঘারাম স্থাপিত হলে সনাতন ধর্মের ভিত্তি যে গৃহস্থাশ্রম,

তা সাময়িকভাবে বিপন্ন হয়। তারপর আবার ভারতীয় সভ্যতা পুনর্গঠনের সময়ে রামায়ণই ভারতবাসীর মনে স্থায়ি প্রভাব বিস্তার করেছিল কারণ গার্হস্থ্যধর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাকে ধর্মের মহত্তর আদর্শের ওপর স্থাপন করবার প্রেরণা ভারতবাসী লাভ করেছিল মূলত রামায়ণের সূত্রে। ভারতীয় জীবনে রামায়ণের এই মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।"[৪৯]

রামায়ণ যেমন গৃহস্থাশ্রমের কাব্য, তেমনি এই মহাকাব্যের চরিত্রগুলিও মানব বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ। মনুষ্যত্বের মহিমাই রামায়ণের মহিমা। বাল্মীকি রামকে একইসঙ্গে 'বিষ্ণুর অবতার' ও 'নরকুলচন্দ্রমা' বলেছেন। একথার অর্থ সম্ভবত এই যে, বাল্মীকি রামকে এঁকেছেন নরদেবতার আদর্শে। রাম মানবীমাতার গর্ভজাত অথচ তাঁর মধ্যে এমন এমন সব গুণাবলী আছে, যা দেবতাদের মধ্যেও দেখা যায় না। রামচন্দ্রের এই পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং নারদ বলেছেন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্‌গুণৈর্‌যুতম্

শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্ যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।[৫০]

(অর্থাৎ এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না, তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এইসকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।)

অতএব রাম নরদেবতা অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ। রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।"[৫১]

মানবচরিত্রের সর্বোচ্চ মহত্ত্ব শুধু রামকে কেন্দ্র করেই নয়, অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েও সবিশেষ ফুটে উঠেছে। রামের সত্যপরায়ণতার পাশাপাশি লক্ষ্মণ-ভরতের সৌভ্রাত্র, সীতার পাতিব্রত্য ও হনুমানের প্রভুভক্তি পরিপূর্ণ মানবত্বের আদর্শকে তুলে ধরেছে। রামায়ণের চরিত্র ও সম্পর্কগুলির অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে দুঃখদহনের মধ্য দিয়ে। ধর্ম ও আদর্শের জন্য আত্মত্যাগই রামায়ণকে মহত্ত্ব দিয়েছে। মানব রামচন্দ্র মানবত্বের আদর্শরূপেই রামায়ণে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু সেই মানব-আদর্শ কালক্রমে অবতারত্বে পর্যবসিত হয়েছে। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"রামচন্দ্রের পুজ্যস্মৃতি ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া

আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল।"[৫২] সব মিলিয়ে রামায়ণে ভারতবর্ষের চারিত্র্যধর্ম ও গৃহধর্মের এমন এক অখণ্ড সুষমা ও পরিপূর্ণতার আদর্শ আছে যে দেশ-কাল-আচার-আচরণের বহু পরিবর্তন হলেও রামায়ণ ভারতবাসীর জীবনে নিত্যকালীন রূপে জীবন্ত হয়ে আছে।

'সাহিত্যসৃষ্টি' বা 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে ইতিহাসের পটে রেখে বিচার করতে চেয়েছেন। রামায়ণের গল্প-কাহিনির মূলে আছে এদেশের জাতিসংঘাত ও জাতিসমন্বয়ের ইতিহাস। 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যায়। আর্যদের ভারত অধিকারের আগে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদের নির্জিত করে এই দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। ভারতের দক্ষিণাংশই ছিল তাদের কেন্দ্রভূমি এবং সেখানকার কোনো দুর্গম সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে দ্রাবিড় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হয়ে উঠে রাজ্য স্থাপন করেছিল। স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁরা সুদক্ষ ছিল। মন্দির নির্মাণে তারা কতখানি দক্ষ ছিল, দক্ষিণ ভারতের অনবদ্য মন্দির-স্থাপত্যগুলি আজও সেই চিহ্ন বহন করে চলেছে। স্বর্ণলঙ্কাপুরীর কল্পনার ভিত্তি বোধহয় এতটুকুই। এই দ্রাবিড়ীয়রা আর্যদের কাছে সহজে হার মানেনি। তারা আর্যদের যজ্ঞে ব্যাঘাত ঘটাত, চাষের ব্যাঘাত করত, কুলপতিরা অরণ্য কেটে যে যে আশ্রম স্থাপন করতেন, সেই আশ্রমগুলিতেও তারা উৎপাত করত। গোরু তখন ধন বলে আর কৃষি পবিত্র কাজরূপে সমাজে গণ্য হত। জনক ছিলেন সে যুগের সম্মানিত রাজর্ষি। কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে চাষ করতেন। এই চাষের লাঙল দিয়েই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করে নিচ্ছিলেন। লাঙলের মুখেই অরণ্য বিদীর্ণ হয়ে কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল। রাক্ষসরূপে কল্পিত দ্রাবিড়েরা কৃষির এই ব্যাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। এই উপদ্রবকে দূর করার জন্য আর্যসমাজে একপর্বে উদ্যোগ শুরু হল। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র সুলক্ষণ দেখে রামচন্দ্রকেই যোগ্য পাত্ররূপে নির্বাচন করলেন। বিশ্বামিত্র রামকে অনার্যপরাভবব্রতে দীক্ষিত করে তাঁকে জনকের পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। সেখানে রাম হরধনুভঙ্গে সফল হওয়ায় জনক বুঝলেন কৃষিপ্রসারের মধ্যে দিয়ে আর্যসভ্যতা বিস্তারের ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী রামচন্দ্রই। এদিকে আর্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যে দ্বন্দ্ব ছিল, সেখানে রাম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম গ্রহণ করে ক্ষত্রদ্বেষী পরশুরামকে পরাজিত করেন। এর ফলেই যৌবরাজ্যে অভিষেকের মুখে তাঁর নির্বাসন দণ্ড হয়েছিল। তবুও রামচন্দ্র নিজ ব্রত পালনের জন্য এই নির্বাসন মেনে নেন এবং ভরতের ওপর রাজ্যভার দিয়ে

মহৎ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য বনে গমন করেন। ভরদ্বাজ, অগস্ত্য প্রমুখ যে সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্যসভ্যতা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে কুটির বেঁধে তপোবন গড়েছিলেন, রামচন্দ্র একের পর এক সেইসব ঋষিদের আশ্রমে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অনার্যদমনের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং আরো দক্ষিণে গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করে বানর সেনাপতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। বানরদের বশ করে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে সৈন্য গড়ে তিনি সাগর পাড়ের অনার্য দ্রাবিড় আধিপত্য ভেঙে দেন। তবে তিনি কখনই সাম্রাজ্যবাদীর মতো পররাজ্য অধিগ্রহণ করেননি। লঙ্কেশকে বিনষ্ট করার পর বিভীষণকে তিনি নিজের বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে লঙ্কার সিংহাসনে বসান এবং সুগ্রীবকে রাজা করে বানরসৈন্যদের রাজ্য ফিরিয়ে দেন। এইভাবে রামচন্দ্র নিজেকে অনার্যদের মিত্র বলে প্রতিপন্ন করে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের মিলনসেতু রচনা করেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। এরই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্যদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হয়ে হিন্দুজাতি রচনা করে এবং হিন্দুধর্মে উভয় জাতির আচার-বিচার ও পুজোপদ্ধতি মিশে গিয়ে ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। রামচন্দ্রের এই মহৎ কীর্তি পরবর্তীকালে নানান কিংবদন্তী ও গল্পকথাকে আশ্রয় করে রামকে জনমানসে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠা করে।

‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ নামের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ আরো ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে তিনি সীতাতত্ত্বকেও ব্যাখ্যা করেন। ক্ষত্রিয় রাজা জনক ছিলেন একইসঙ্গে রাজা এবং ঋষি। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা যুগপৎ অনুশীলন করছিলেন। তাঁর ব্রতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল শৈব আরণ্যকেরা। তখন জনক ঘোষণা করেছিলেন—

> শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন।...রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনারেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।[৫৩]

তাই দেখি হলচালনের অযোগ্য যে অহল্যা ভূমি, যাকে দক্ষিণাপথে অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম অভিশপ্ত বলে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই কঠিন প্রস্তরময় অহল্যা ভূমিকেও

রামচন্দ্র সজীব করে তুলতে পেরেছিলেন। রাবণবধের দ্বারা রাম কৃষিসভ্যতাকে অনার্যদের প্রতিরোধ থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং আর্যধর্মকে অনার্য শৈবধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে যখন আর্য ও অনার্য সভ্যতার মধ্যে সমন্বয় ঘটে তখন আর্যধর্ম ও শৈবধর্মের মধ্যেও সমন্বয় ঘটেছিল। তাই দেখি এক পর্যায়ের যজ্ঞবিরোধী শিব পরবর্তীকালে যজ্ঞেশ্বর বলে স্বীকৃত ও মহেশ্বর বলে পূজিত হলেন। আর কৃষিসম্পদের অন্যতমা দেবতা অন্নপূর্ণা তাঁরই গৃহিণী বলে স্বীকার্য হলেন।

রামচন্দ্র আর্য-অনার্য বিভেদ ঘুচিয়ে প্রেমের মন্ত্রে ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধেছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রভুর বাহুবল নয়, বরং প্রেম এবং ক্ষমার অস্ত্রেই তিনি অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন। ক্ষত্রদ্বেষী পরশুরামকে নির্জিত করেও তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন। নিজ ব্রতসাধনের উদ্দেশ্যে গুহক চণ্ডালরাজের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করেন, কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য বানরসৈন্যদের রাজা সুগ্রীবকে প্রেমের ধর্মে বশ করে তাকে নিজ সহায়তাকার্যে দীক্ষিত করেন এবং বিভীষণের সঙ্গেও বন্ধুতার যোগে সীতা অর্থাৎ কৃষিবিদ্যা হরণকারী অপশক্তিকে পরাস্ত করেন। হৃদয়ধর্মে মিলনসাধন করাতে পেরেছিলেন বলেই রামচন্দ্রের সেদিনের সেই সাধনা ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য ও স্থায়ি হয়ে উঠতে পেরেছিল।

রামায়ণকে রবীন্দ্রনাথ যে কত সূক্ষ্ম ও সতর্ক ইতিহাসবোধ নিয়ে বিচার করেছিলেন তার প্রমাণ, তিনি উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলে মতপ্রকাশ করেন। কারণ উত্তরকাণ্ডের মধ্যে তিনি রামায়ণের মূল আদর্শের বিচ্যুতি পরিলক্ষণ করেন, দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাত একমাত্র উত্তরকাণ্ডের মধ্যেই প্রবল হয়ে উঠেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন, যে-রামচন্দ্র একদিন চণ্ডালকেও মিত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকাণ্ডে তিনিই শূদ্র-তপস্বীর দণ্ডদাতা। আবার যে সীতাকে রক্ষা করার তাঁর সারা জীবনের এত তপস্যা, সেই সীতাকেই তিনি লোকোপবাদের ভয়ে পরিত্যাগ করেন। এমনকি পাতালপ্রবেশের পূর্বে সীতার প্রতি তাঁর যে অপমানসূচক ঔদাসীন্য তার সঙ্গেও আপামর রামকথার কোনো সাদৃশ্য নেই। আসলে উত্তরকাণ্ডের রাম পরিবর্তিত সমাজমানসের হাতে তৈরি। সমাজে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং সমন্বয়-পরবর্তীকালে ফের সমাজে ব্রাহ্মণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের অনুকূলে রামকথাকে পুনর্গঠন করা হয়—“রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লয়া গিয়াছিলেন...সে কথাটা মরিয়া গিয়াছে এবং

ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক।”[৫৪] ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন—

> উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে...সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধাবাঁধি দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নি পরীক্ষার যে প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা এই সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।[৫৫]

রামায়ণের অন্য যেসব প্রাচীন ভারতীয় উৎস পাওয়া যায়, তাতেও প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতামত বিচারসহ। যেমন—মহাভারতের বনপর্বে যে রামকাহিনি বিবৃত হয়েছে অথবা বৌদ্ধ পালিসাহিত্যে যে ‘দশরথজাতক’এর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় বারো বছর বনবাস যাপনের পর সীতাসহ রাম অযোধ্যায় ফিরে আসছেন, এবং রামের রাজ্যাভিষেকের মধ্যে দিয়ে এই কাহিনির সমাপ্তি। সীতা বিসর্জনের কোনো উল্লেখ এখানে নেই। অতএব উত্তরকাণ্ড পরবর্তী যুগে মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

রামায়ণকে রূপক হিসেবে বিশ্লেষণের চেষ্টা পাশ্চাত্য গবেষকদের একটি অংশের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ করা যায়। Weber, Jacobi, Winternitz প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকগণ মূলত ‘সীতা’(furrow) কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ করে রামায়ণকে কৃষি ও আর্যসভ্যতা বিস্তারের রূপক কাহিনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বহু মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন। তাঁদের যুক্তিও একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়ার মতো নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে উত্তরকালে পাশ্চাত্য গবেষণার এই ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। অবশ্য সীতা যে রূপক, তার ইঙ্গিত ঋকবেদেই পাওয়া যাবে। ঋকবেদে সীতাকে কর্ষিত ক্ষেত্রের দেবীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[টীকা]। সেখানে কর্ষিত ভূমির দেবী সীতা এবং বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র-পর্জন্য কর্তৃক অনাবৃষ্টি-দৈত্যদের নিগৃহীত করার বর্ণনা আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ঋক-বৈদিক যুগের ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের সংঘাত পরবর্তীকালে রাম-রাবণের কাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থভুক্ত ‘রামায়ণ’ প্রবন্ধটি লেখেন, তখন রামায়ণকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক-রূপকের আবরণ উন্মোচন তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রামকথার বিন্যাস করেন, যা আরো পল্লবিত হয় ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’ নামক প্রবন্ধটি লেখার সময়। এই সময় থেকেই রামায়ণের রূপক বিশ্লেষণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মন আকৃষ্ট হয়। এরপর তিনি যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় ভারত পরিভ্রমণ করেন, তখন সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর প্রতিফলন দেখে এবং সেখানকার রামায়ণের বিশেষ বিশেষত্ব সম্পর্কে(দ্বীপময় ভারত সহ শ্যামদেশীয় রামায়ণে রাম-সীতা ভ্রাতা-ভগিনীরূপে উল্লিখিত হয়েছে) সচেতন হয়ে রামায়ণের রূপক তাৎপর্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে কৌতূহলী হন। ‘জাভা যাত্রীর পত্র’এ রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, রাম-সীতার ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্ককে যদি সত্যমূলক বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে কয়েকটা মস্ত মিল লক্ষ করা যাবে। দুটি কাহিনির মূলে দুটি বিবাহ ; এবং দুটি বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসঙ্গত। ভাই-বোনের বিবাহের নজির বৌদ্ধ-ইতিহাসে থাকলেও হিন্দু সংস্কৃতিতে তা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। অন্যদিকে মহাভারতের কাহিনিতেও এক স্ত্রীকে পাঁচ ভাইয়ে মিলে বিয়ে করাটাও তেমনি অদ্ভুত এবং অশাস্ত্রীয়। দ্বিতীয় মিল দুই বিবাহেরই গোড়ায় অস্ত্রপরীক্ষা, অস্ত্রপরীক্ষায় সফল হলে তবেই কন্যালাভ। তৃতীয়ত, দুটি কন্যাই মানবীগর্ভজাত নয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, লাঙলের মুখে উত্থিতা আর যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতা। চতুর্থ মিল, উভয় কাব্যেই বিবাহের পর নায়কের রাজ্যচ্যুতি ও সস্ত্রীক বনগমন। পঞ্চমত, উভয় কাব্যেরই মোটিফ শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও যুদ্ধঘটনায় এর প্রতিশোধ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের ভাবগত মিল দেখিয়েছেন। তিনি অনুমান করেছেন ভারতীয় সমাজ-অধিমানসের এক বিশেষ স্তর থেকে এক যুগের প্রতিচ্ছবি এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। রামায়ণের মধ্যে ভারত-সভ্যতার প্রচ্ছন্ন রূপক রবীন্দ্রনাথ উন্মোচন করেছেন জাভাযাত্রীর পত্রে—

> রামায়ণের রূপকটি খুব স্পষ্ট। কৃত্রিম হলবিদারণ রেখাকে যদি কোন রূপ দিতেই হয় তবে তাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যেতে পারে। শষ্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম রাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শষ্যও তো পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুসারে উভয়ে ভাই-বোন, আর পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ। হরধনুর্ভঙ্গের মধ্যেই রামায়ণের মূল অর্থ। বস্তুত সমস্তটাই হরধনুর্ভঙ্গের ব্যাপার—সীতাকে গ্রহণ, রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্য।

> আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজ হয়নি; তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত, অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।[৫৬]

বলা বাহুল্য, জাভানী রামকথাকে ভারতীয় রামকথার সঙ্গে মেলাতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ এভাবে রূপক বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সমস্তটাই 'হরধনুর্ভঙ্গের ব্যাপার' বলে রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার মধ্যে বস্তুগত ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে। শিবের ধনু যিনি ভাঙতে পারবেন শৈব আরণ্যকদের সঙ্গে লড়াই কৃষির বিস্তারের মধ্যে দিয়ে আর্যসভ্যতা প্রসারের তিনিই উপযুক্ত অধিকারী। রাজর্ষি জনক কৃষিবিস্তারের একজন উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর এই ব্রতে যিনি তাঁকে সাহায্য করবেন, তাঁকেই তিনি আপন ভূমিজ-সম্পদ অর্থাৎ সীতাকে তুলে দেবেন। তাই হরধনুর্ভঙ্গের রূপক উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ এতখানি জোর দিয়েছেন।

রাম কর্তৃক সীতা বিসর্জনের ঘটনাকেও রবীন্দ্রনাথ রূপকের আশ্রয়ে ব্যাখ্যা করেছেন—

> কৃষির ক্ষেত্র দু-রকম করে নষ্ট হতে পারে—এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রাম-সীতার বিচ্ছেদ ঘটল তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিত সীতার গর্ভে যে যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব ও কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের অর্থ জানাই আছে। কুশঘাস একবার জন্মালে ফসলের ক্ষেতকে যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে অনেকটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তা হলে কবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কী হতে পারে, একথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।[৫৭]

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই সুচিন্তিত অভিমত পণ্ডিতদের দ্বারা অগ্রাহ্য তো হয়ইনি, বরং রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সমাজ-ঐতিহাসিক দিক থেকে রামায়ণের এক অন্যতর তাৎপর্যকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। বস্তুতপক্ষে, রামায়ণ যে দুই বিসদৃশ সভ্যতার দ্বন্দ্বমূলক রূপক, রবীন্দ্রনাথের মনে এই চিন্তা খুব গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। বিষয়টি নিয়ে তিনি যে তাঁর বন্ধুমহলে মাঝে মাঝে চর্চাও করে থাকেন, সে-কথাও তিনি খোলাখুলি জানিয়েছেন, 'রক্তকরবী'

নাটকের প্রস্তাবনায়—“কর্ষণ-জীবী এবং আকর্ষণ-জীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি।”[৫৮] ধনগর্বী যন্ত্রসভ্যতা যেমন ক্রমে ক্রমে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিনির্ভর সংস্কৃতিকে অজগরের মতো গ্রাস করে নিচ্ছে, তার পরিণাম তিনি দেখিয়েছেন ‘রক্তকরবী’ নাটকে। নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতা কেমন করে গ্রামকে এবং গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিসম্পদকে ধ্বংস করে ফেলছে, তা বোঝাতে গিয়েই কবি পুনরায় রামায়ণ প্রসঙ্গ এনেছেন এবং বিশ শতকের এই সমস্যার সঙ্গে রামায়ণের সমস্যাকে মিলিয়ে দেখেছেন—

> কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লিকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তাছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা?...কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল কুটির ছেড়ে চাষিরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন।[৫৯]

আত্মপ্রসন্ন কৃষিজীবী সভ্যতার সঙ্গে প্রধর্ষী ঐশ্বর্যলোলুপ ধনতন্ত্রের যে সংঘাত, তা কেমন করে সারা পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ শিল্পের আশ্রয়ে তা দেখিয়েছেন। ত্রেতাযুগে এই সমস্যা সমন্বয়ের দ্বারা মীমাংসা করেছিলেন রামচন্দ্র, সে জন্যই তিনি অবতার বলে পূজ্য। আধুনিককালে এই সমস্যার মীমাংসা করবে কে?

‘রক্তকরবী’র অনেক আগে লেখা ‘পঞ্চভূত’এ ক্ষিতির মুখে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের একরকম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাঠককে শুনিয়েছেন। পঞ্চভূত রম্যরচনা, এখানে কৃত্রিম চরিত্রের মুখে যে সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে, তা যে পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, তা মনে করা অনুচিৎ। তবুও রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের এরূপ ব্যাখ্যা অভিনব। সেজন্যই এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

‘ক্ষিতি’র কথায়—রাজা রামচন্দ্র প্রেম নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করে এনে নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরম সুখে বাস করছিলেন। এমন সময় কতকগুলো ধর্মশাস্ত্র দল বেঁধে এসে এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করে দিল। সীতা যেহেতু অনিত্য পদার্থের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন, সুতরাং রামচন্দ্রের উচিৎ সীতাকে পরিত্যাগ করা। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থেকেও যে দেবাংশজাতা রাজকুমারী সীতাকে কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি, সে কথা কে প্রমাণ করবে? সে কথা প্রমাণ করার নৈসর্গিক উপায় অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু সেই অগ্নিপরীক্ষার অগ্নি সীতাকে নষ্ট না করে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। তবুও শাস্ত্রের কানাকানি রামচন্দ্রের কাছে বড়ো হল। তিনি প্রেমকে মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত করে দিলেন। ইতোমধ্যে মহাকবি বাল্মীকি ও তাঁর শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থেকে অনাথিনী সীতা কুশ এবং লব, কাব্য ও ললিতকলা নামক যুগল সন্তান প্রসব করলেন। বলা বাহুল্য রামায়ণের এ একেবারেই বৈদান্তিক ব্যাখ্যা। তবে এরূপ ব্যাখ্যার অভিনবত্ব আছে।[৬০]

রামায়ণ নিয়ে দেশি-বিদেশি বহু মণীষী বহুবিধ আলোচনা করেছেন। কিন্তু সেইসব আলোচনার মাঝেও রামায়ণের রবীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখ্যা নানা দিক থেকেই চিন্তার অভিনবত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্বকে তুলে ধরতে পেরেছে। তাই রামায়ণের রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনা আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

মহাভারত ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ

রামায়ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন সুগভীর ও বিপুল আলোচনা করেছেন, মহাভারত নিয়ে তাঁর আলোচনা তেমন বিপুল নয়। তবে মহাভারতকে ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রেখে রবীন্দ্রনাথ তার যে সমাজ-ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন, তার মূল্য অপরিসীম। এছাড়াও সামান্য পরিসরে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকার কবির চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতা ও এর রূপকার্থ বিশ্লেষণ করে ভারতীয় জীবনে এই মহাকাব্যের মূল্য পরিমাপ করেছেন।

পাশ্চাত্য Heroic Epic এর ছাঁচের বাইরে গিয়ে ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যটি মহাভারতে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। পঞ্চপাণ্ডবের যুদ্ধজয় ও সিংহাসনারোহণেই এই কাব্য পরিসমাপ্ত হয়নি। অর্জিত রাজ্যসুখ ত্যাগ করে

মহাপ্রস্থানেই এই কাব্যের পরিণতি। সংঘর্ষমুখর রক্তাক্ত জয়পরাজয়ের শেষ পরিণাম নির্বেদ ও বৈরাগ্য। চরম প্রাপ্তির পর পরম ত্যাগ। মহাকাব্যের এই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন—

> মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য রাগদ্বেষ হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।[৬১]

'কালান্তর'এর অপর একটি প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন। এই মহাকাব্যের আখ্যানভাগের অধিকাংশই যুদ্ধঘটনার দ্বারা অধিকৃত, কিন্তু যুদ্ধেই এর চরম পরিণাম রচিত হয়নি। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমভাবে এখানে বর্ণিত হয়নি। বরং জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন, এ কাব্যের এটাই চরম নির্দেশ।[টীকা]তাই আলংকারিক মতে বীররস নয়, শান্তরসই মহাভারতের মূল অঙ্গীরস। মহাভারতীয় এই শান্তরসের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুবিশ্রুত 'পুরস্কার' কবিতায় কাব্যের ছন্দে তুলে ধরেছেন। তার অংশবিশেষ উদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি,
সে আজি কাহার তাহাও না জানি—
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিকো আর।[৬২]

ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্য, ভোগ এবং ত্যাগ, সফলতা এবং নির্বেদ একইসঙ্গে ভারতীয় মহাকাব্যে দেখা যায়। ভারতীয়ত্বের এই বৈশিষ্ট্যই তার অতীত এবং ভবিষ্যৎকে একটি বিশেষ ঐক্যসূত্রে গেঁথেছে। তার প্রভাব সূক্ষ্ম হলেও সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য ও সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।"[৬৩]

ইতিহাসের দিক থেকে মহাভারতের মূল্য রবীন্দ্রনাথ সুচিন্তিতভাবে পরীক্ষা করেছেন। মহাভারত কাব্যকেই তিনি ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের যথার্থ প্রামাণিক ইতিহাস হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে—"আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।"[৬৪] 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে আর্যসমাজের গণ্ডির মধ্যে যখন বহু সংখ্যক দেশি-বিদেশি অনার্য এসে উপস্থিত হল, তখন ধর্মে-কর্মে আর্যসমাজের সর্বত্র এক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অদ্ভুত অসংগতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে আর্যসমাজকে একটি সুনির্দিষ্ট অনুশাসনের মধ্যে বাঁধবার প্রয়োজন অনুভূত হল। আর্যসমাজের যে সূত্রগুলি বিচ্ছিন্ন ও স্খলিত হয়ে পড়েছিল, সেগুলি সংগ্রহ করা দেশের প্রধান কাজ হল। ব্যাস নামের আড়ালে আর্যসমাজের প্রধান কাজ হল এই ছিন্ন সূত্রগুলিকে গ্রন্থন করা। ব্যাস কোনো একক ব্যক্তি নন, তিনি এই সমাজেরই একটি শক্তি, যিনি আর্যসমাজের স্থির প্রতিষ্ঠাবিন্দু অন্বেষণ করতে গিয়ে বেদ সংগ্রহ ও বিভাগ করলেন। তাঁর আরেকটি কাজ হল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যুগ যুগ লালিত কাহিনি ও জনশ্রুতিগুলিকে তিনি এক করলেন। সেইসঙ্গে আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক, চারিত্রনীতি এই সব কিছুকেই এক করে একটা জাতির সমগ্রতার একটা বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করলেন, এরই নাম মহাভারত।

মহাভারতের মধ্যে গভীরভাবে সমাজদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংগ্রাম-সংঘর্ষ ও হানাহানিতে মুখরিত বহুধাবিভক্ত ভারতভূমিকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনগত ঐক্যের মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবদের সে কাজের উপযুক্ত বলে মনে করে তিনি তাদের

আনুকূল্য করেছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ, শিশুপাল এবং দুর্যোধনাদি কৌরবেরা পাণ্ডবদের ভারতেশ্বর হওয়াকে সুদৃষ্টিতে দেখেননি। তাঁরা কৃষ্ণপক্ষীয়গণের বিপক্ষতা করেছিলেন। ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রনেতা হিসেবে কৃষ্ণ বেদবিহিত কাম্যকর্মবাদী ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিস্পর্ধী হিসেবে নিজ প্রচারিত ভক্তিমূলক ভাগবতধর্ম প্রচার করেছিলেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে কৃষ্ণ সমর্থক ক্ষত্রিয়দের বিরোধ বেঁধেছিল। মহাভারতের যুদ্ধ এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যদি শুধুমাত্র পারিবারিক রাজনীতি ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বঘটিত যুদ্ধ হত, তবে সারা ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ তাতে এতটা সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন না। ক্ষত্রিয়রাও যে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন, এমন নয়। জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রমুখেরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পক্ষপাতীরূপে শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় ক্ষত্রিয়দের শত্রু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও কৌশলে, কখনও পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে তাদের দমন করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে[অর্থাৎ জরাসন্ধকে] শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করিয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়।[৬৫]

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের ভূমিকা নিয়েছিলেন, এই ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর প্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত বলেই প্রমাণ করেছেন। মহাভারতীয় যুদ্ধঘটনার নেপথ্যে যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধ ক্রিয়াশীল ছিল, তার আরো কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যুদ্ধে কৃষ্ণ তথা পাণ্ডববিরোধী কুরুপক্ষের সেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ আর তার দুই সহযোগী কৃপ ও অশ্বত্থামা দুজনেই ব্রাহ্মণ। দ্রোণ ছিলেন ক্ষত্রদ্বেষী ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য আবার ক্ষত্রিয় দ্রুপদের সঙ্গে দ্রোণের বিরোধ ছিল বলে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষ নিয়েছিলেন।

এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সংঘাতের মূলে ছিল ধর্মীয় আদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্ব। শ্রীকৃষ্ণ বেদবিরোধী ভাগবতধর্ম প্রচারের দ্বারা বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্যমতের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই তত্ত্বগত আদর্শের ভিন্নতাও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মতে মতবাদ নিয়ে যুদ্ধ, তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ, তা রাজ্যলাভের যুদ্ধের চেয়ে অনেক গভীর। এই প্রসঙ্গে 'জাভা যাত্রীর পত্র'এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ভারতবর্ষে একটা দ্বন্দ্ব ছিল অরণ্যের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের, আর একটা দ্বন্দ্ব বেদের ধর্মের সঙ্গে কৃষ্ণের ধর্মের। লঙ্কা ছিল অনার্য শক্তির পুরী, সেইখানে আর্যের হল জয়; কুরুক্ষেত্র ছিল কৃষ্ণবিরোধী কৌরবের ক্ষেত্র। সেইখানে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডব জয়ী হলেন। সব ইতিহাসেই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ। প্রজা বেড়ে যায়, তখন খাদ্য নিয়ে স্থান নিয়ে টানাটানি পড়ে, তখন নব নব ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রসারিত করতে হয়। চিত্তের প্রসার বেড়ে যায়, তখন যারা সংকীর্ণ প্রথাকে আঁকড়ে থাকে তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধে যারা সত্যকে প্রশান্ত ও গভীরভাবে গ্রহণ করতে চায়। একসময়ে ভারতবর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়েছিল; একপক্ষে বেদমন্ত্রকেই ব্রহ্ম বলতেন। অন্যপক্ষে ব্রহ্মকে পরমাত্মা বলে জেনেছিলেন।[৬৬]

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূলে যে ধর্মীয় সংঘাত, তা ছিল মূলত কাম্যকর্মবাদী বেদবিহিত ধর্মের সঙ্গে জ্ঞানাত্মক নিষ্কাম ব্রহ্মবাদের লড়াই। বলা বাহুল্য, জ্ঞানাত্মক নিষ্কাম মত কৃষ্ণপ্রচারিত। শ্রীমদভগবতগীতা কৃষ্ণোক্ত ভাগবতধর্মের মূল দার্শনিক ভিত্তি। বহুধাবিভক্ত ভারতভূমিকে একটি শাসনগত ঐক্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা এবং বৈদিক কাম্যকর্মবাদী মন্ত্রবিদ্যার স্থানে নিষ্কাম জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধির দিশানির্দেশ। যুগাবতার হিসেবে এই দুই রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক কীর্তির অধিনেতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতের মহারণ্যে শ্রীকৃষ্ণের এই দুই ভূমিকাকে যথার্থভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রামায়ণের মতো মহাভারতেরও রূপক ধর্ম রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। পরিমাণে স্বল্প হলেও মহাভারতে রূপকার্থ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। রূপকের আবরণ মোচন করে মূল সত্যকে তুলে আনা মহাকাব্য ব্যাখ্যার নতুন দিগন্তকে অনেকক্ষেত্রে খুলে দিতে পারে। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধটির ইংরেজি মর্মানুবাদ 'A Vision of India's History'তে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

ও দ্রৌপদীর বিবাহ। মূল মহাভারতে রয়েছে, দ্রৌপদীকে বিবাহের শর্ত হিসেবে লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে যেখানে শূন্যে ঘূর্ণমান একটি চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে লক্ষ্যটি স্থির করে রাখা হয়েছে এবং নিচে রক্ষিত একটি জলাধারে সেটির প্রতিবিম্ব পড়েছে। প্রতিযোগীকে প্রতিবিম্ব দেখে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। এই কাহিনিটির তত্ত্বব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ 'A Vision of India's History' তে লেখেন—

> This trial is obviously of a spiritual nature. The fixed centre of Truth in the heart of the revolving wheel of the world (*samsara*) is reflected in the depth of our own being, which can be reached by the one-pointed concentration of Yoga.[৬৭]

মহাভারতের এই রূপকটি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় ছিল। 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীতে তিনি এই রূপকটিকেই ধর্মাদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন—

> একটি চাকা কেবলই ঘুরছে, তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেননি, বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়।[৬৮]

পঞ্চপাণ্ডব সম্মিলিতভাবে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেছিল, এটি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় ও নিন্দনীয় কথা। এ থেকে অনেক পাশ্চাত্য গবেষকগণ স্থির সিদ্ধান্ত করেন, এরূপ বর্বর বিবাহপ্রথা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল[টীকা]। কেউ কেউ আবার এও বলেন, যেসব পার্বত্য উপজাতির মধ্যে এই ধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল, পাণ্ডবেরা সেই জাতীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহব্যাপারকে সম্পূর্ণ রূপকার্থে ব্যাখ্যা করেছেন—

> As a matter of fact, it was a sacred rite of ideal polyandry which came to be shared by all the brothers. Krishna is the impersonation of the truth taught by Krishna himself, which had some association with the sun-worship which was the original meaning of Vishnu-

worship. It is related in the epic that in the vessel carried by Krishna food would become inexhaustible when she invoked the Sun to help her. This must refer to the unlimited spiritual food ready for all guests who chose to come and enjoy it.[৬৯]

দ্রৌপদী মাতৃযোনিভূতা নয়, যজ্ঞাগ্নিসমুদ্ভূতা। তাই রবীন্দ্রনাথ দ্রৌপদীকে সম্পূর্ণ মানবী ভাবে না দেখে তত্ত্বাকারে দেখেছেন—"এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল।"[৭০]

মহাভারতের সাহিত্যগুণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা করেননি, তবে মহাভারতের চরিত্রচিত্রণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'সাহিত্যের স্বরূপ' পুস্তিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। মহাভারতে যেসব চরিত্র নির্ভেজাল নীতিপরায়ণ এবং নির্ভেজাল মন্দ, তার তুলনায় দোষে-গুণে মিশ্রিত, আলো-ছায়ায় চঞ্চল, দ্বন্দ্বমুখর চরিত্রগুলোই এ কালের পাঠককে বেশি আকর্ষণ করে। ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানেন, অধর্মের পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবুও কিছুতেই নিজের দোলায়িত মনকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেননি। পরিণামে "এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিক্‌ভ্রান্ত অন্ধ চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।"[৭১]

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি'তে চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্যের চরিত্রদের সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন। রামায়ণের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেছেন—"রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি ; তাই চুপিচুপি বলছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড়ো। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানতেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্মণকে ভালোবাসেন।"[৭২] অর্থাৎ সাহিত্যে চরিত্রনীতি অনেকসময় সামাজিক ন্যায়-নীতির ওপরেও বড়ো হয়ে ওঠে। সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্য যে সবসময় এক নয়, এই ধারণাতেও রবীন্দ্রনাথ ততদিনে স্থিরপ্রজ্ঞ হয়ে গিয়েছেন।[৭৩]

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ মহাভারতের যুধিষ্ঠির আর ভীম এই দুই চরিত্রের তুলনামূলক বিচার করেছেন—

> চরিত্রনীতিবিলাসী ঐতিহাসিক তাঁর মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সদ্‌গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাঁড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের উপর ধরে রেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না ; আর চরিত্রচিত্রবিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্যকথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে।[৭৪]

মহাভারতের চরিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের সৃজন কল্পনাকে যে নানাভাবে উদবেজিত করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মহাভারত-আশ্রয়ী নাট্যকাব্যগুলোতে। ‘বিদায়-অভিশাপ’, ‘গান্ধারীর আবেদন’ কিংবা ‘কর্ণকুন্তী-সংবাদ’ ভালো-মন্দের আলোছায়ায় দোলায়িত চরিত্রগুলোই রবীন্দ্রকল্পনায় নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

গীতা ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ

মহাভারতের একটি অচ্ছেদ্য অংশ হল ভগবতগীতা। ‘ভীষ্মপর্ব’এ আঠারোটি অধ্যায় জুড়ে এটি বিন্যস্ত হয়েছে। ভগবতগীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কিনা এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে তর্ক আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনুষঙ্গ বিচার করে গীতাকে মূল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তাঁর মতে—

> কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে ; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল।[৭৫]

এই অংশে গীতার মতো মহাগ্রন্থ রবীন্দ্রমননে কেমনভাবে বিশ্লেষিত ও আস্বাদিত হয়েছে, আমরা তারই আলোচনা করব।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা তথা প্রাচ্য দর্শনপ্রস্থানের প্রায় এক কেন্দ্রীয় ধ্রুবপদ হল শ্রীমদভগবতগীতা। ভারতীয় সংস্কৃতির নানা বিরুদ্ধ ভাবকে একত্রে বিধৃত করে এর মহত্তম অভিপ্রায়কে নিত্যকালের ভাষায় গেঁথে রেখেছে গীতা ; আর সেকারণেই গীতা কোনো সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। জ্ঞানী-অজ্ঞান, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই নিজের নিজের বুদ্ধি আর যোগ্যতা অনুসারে গীতার ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। তাই দেখি গীতার শ্লোকে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র ও বৌদ্ধ মতবাদ অবিরোধে মিলে যায়। শঙ্করাচার্য প্রণীত গীতার সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী ভাষ্যরচনার পাশাপাশি দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা নিজ নিজ মতের অনুকূল করে গীতার ব্যাখ্যা করেন। আধুনিককালেও সে ধারা অব্যাহত। এ সম্পর্কে 'The Discovery of India' গ্রন্থে সুন্দর মন্তব্য করেছেন পণ্ডিত জওহরলাল—

> Even the leaders of thought and action of the present day—Tilak, Aurobinda Ghose, Gandhi—have written on it, each giving his own interpretation Gandhiji bases his firm belief in non-violence, others justify violence and warfare for a righteous cause[৭৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লববাদী ও অহিংসবাদী উভয়েই নিজের নিজের মতবাদের স্বপক্ষে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন গীতাকে। বিশেষত বিশ শতকের গোড়ার দিকে চরমপন্থী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠছে, তখন এর উৎসাহী সমর্থকেরা গীতার কর্মবাদ এবং শত্রুসংহার ধর্মকেই শ্রেয় বলে মনে করেছিল—এই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান কেমন ছিল, কেন তিনি গীতা ব্যাখ্যায় যুগপ্রবণতার সম্পূর্ণ সপক্ষতা করতে পারেননি—সেটা একটু তলিয়ে ভাবা দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা উগ্র হয়ে ওঠে মূলত দুটি পরস্পরবিরোধী ক্ষেত্রকে কেন্দ্রে রেখে। প্রথমত খ্রিস্টান মিশনারি প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম এবং রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম ; এই দুই এর প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এই নব্য হিন্দু প্রচারকদের সবচেয়ে বড়ো সহায় হয় গীতা। দ্বিতীয়ত সমগ্র জাতি যখন বৈদেশিক শক্তির শাসনে মৃতপ্রায়, তখন 'অনুশীলন সমিতি'র ভাবাদর্শ, বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' এবং সেই সঙ্গে সেই গ্রন্থেই রচিত 'বন্দেমাতরম' বিপ্লবসংগীত একদল শিক্ষিত তরুণ মনকে বুঝিয়েছিল যে এই বিরুদ্ধ পরিবেশে সমগ্র দেশটিই দেবকীনন্দন কৃষ্ণের

কারাগার এবং গীতার শত্রুসংহার বৃত্তিই এর থেকে মুক্তির উপায়। বলা বাহুল্য, এই দুই ক্ষেত্রের অনেকটাই আবেগে উগ্র, প্রগতিবিরোধী এবং শিক্ষিত মনের অনুপযোগী। রবীন্দ্রনাথ কোনোভাবেই এর সম্পূর্ণ পোষকতা করতে পারেননি।

বিশেষত গীতাকে সামনে রেখে হিন্দুত্ব পুনরুত্থানের যে হুযুগ উঠেছিল, তাদের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছিলেন যে হার্বাড স্পেনসার, ওয়েবস্টার কী বিডডিগার সবই আছে গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে। এই ধরণের ব্যাখ্যায় স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের বিরাগ জন্মেছিল। সমসময়ে রচিত তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'ধর্মপ্রচারক', 'হিং-টিং-ছট' প্রভৃতি কবিতায় এর বিরুদ্ধে কটাক্ষ আছে আর গীতার প্রতি অন্ধ ভক্তিকে রবীন্দ্রনাথ যে কী চোখে দেখতেন তার পরিচয় আছে তাঁর রচিত 'মুক্তির উপায়' নাটিকায়, যেখানে গুরুভক্ত ফকিরের সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী বলেছে—"দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার ওপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা ধোওয়া জলে ওই বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধ্যে চান করে তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে।"[৭৭]

সেইসঙ্গে অনুশীলন সমিতির যে বিপ্লবাত্মক জাতীয়তাবাদী অবস্থান ; তারও সম্পূর্ণ পোষকতা রবীন্দ্রনাথ করতে পারেননি। 'দেশমাতৃকার বন্ধনমোচন'—এই উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, তা পূরণ করতে গিয়ে চণ্ডনীতির আশ্রয়গ্রহণ ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ। এখানে বঙ্কিমের জাতীয়তার ধারণার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মেলাতে পারেননি। 'ধর্মতত্ত্ব' বই-এ বঙ্কিম লিখেছিলেন—"যুদ্ধমাত্র পাপ নহে। আত্মরক্ষার্থ ও স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।"[৭৮] এর সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য।...ফলকে ইতিহাসে যতই লোভনীয় বলে প্রচার করুক না কেন—সেরূপ কোনও ফললাভ করার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব, এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না।"[৭৯] উনিশ শতক গীতাকে যেভাবে পড়তে চায় বা ব্যবহার করতে চায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এভাবে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নৈতিক আপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন গীতা বহু স্ববিরোধী উক্তিতে ভরা। এর কোনো শ্লোকের 'শাশ্বত সত্যের' সঙ্গে পরের শ্লোকের 'সমসাময়িকতার ক্ষণিক প্রয়োজন' যেন বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশের বিরোধ'—যা গীতায় অজস্র পরিমাণে রয়েছে। যেমন গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭ নম্বর শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 'হতো বা প্রাপস্যসি

স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম’ বলে যুদ্ধে বিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করছেন, আবার ঠিক এর পরের শ্লোকেই স্থৈর্য ও নিষ্কামতার আদর্শ বর্ণনা করে বলছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ

ততো যুদ্ধায় যুদ্ধস্য নৈবং পাপংবাপ্স্যসি[৮০]

সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকের সুখ-দুঃখ, লাভালাভ, জয়-পরাজয়কে সমভাবে গ্রহণ করার যে নিত্য আদর্শ তার সঙ্গে পূর্বের রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তির লোভে যে কর্মের নির্দেশ রয়েছে, তার অনিবার্য বিরোধ ঘটেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—গীতার আদিরূপটি উপনিষদের সমকালেই রচিত বা উদ্ভূত হয়েছিল, কারণ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত যেসব নিত্যকালের উপদেশ, তারই অনুরণন পাওয়া যায় ‘ছান্দোগ্য উপনিষদ’এর মধ্যে। গীতা যেভাবে আত্মার অবিনশ্বরত্বের কথা বলে, ছান্দোগ্য উপনিষদ সেভাবেই বলেন—“In the final hour, one should take refuge in these three thoughts—You are the indestructible, you are the unshaken, you are the very essence of life...”[৮১]

পরবর্তীকালে যখন দেশে যুদ্ধনীতি অপরিহার্য হয়ে পড়ল, তখন যুদ্ধবিমুখ রাজন্যবর্গের দুর্বল চিত্তকে সংহত করার প্রয়োজনে পূর্বের আত্মার অবিনশ্বরত্বের ব্যাখ্যাকে নতুন দেশ-কালের পটে প্রয়োগ করা হয়। ঐতিহাসিক প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন, অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পর থেকেই উপর্যুপরি ভারত আক্রমণ ঘটে, তখনই অশোকের হিংসাবিরোধী মনোভাবকে অতিক্রম করে যুদ্ধে প্রবর্তনা দেওয়ার তথা ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এরই কাছাকাছি কোনো সময়ে গীতার সর্বশেষ রূপটি গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ সেকারণে যথার্থই অনুভব করেছেন—

> গীতার মধ্যে কোনও একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই এর নিত্য অংশের সঙ্গে ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। কোনও একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনও একটা সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সেরকম একটা টানাটানি আছে।[৮২]

আধুনিককালেও যে গীতার এই ধরণের ‘দার্শনিক চাতুরি’কে কাজে লাগিয়ে নানা অধর্ম হয়ে চলেছে, রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাপারে অবহিত ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। এ

বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ রয়েছে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে, যেখানে ঝুটো দেশসেবী সন্দীপের শিক্ষায় শিক্ষিত অমূল্য নিজেদের জুলুমবাজির সমর্থনে বলেছে—"গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? একে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়।"[৮৩] আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না, সুতরাং মানুষকে হত্যা করার পেছনে কোনো গ্লানিবোধ থাকা উচিৎ নয়—গীতার এই ধরণের অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, পৌরুষ কেবলমাত্র হননকার্যে দক্ষতার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, ক্ষমা এবং ত্যাগেও পৌরুষের পরীক্ষা হয়। গীতায় অর্জুন কখনোই ক্লীব নয়, বরং তাঁর অবস্থানটাই অনেক বেশি মানবিক ও ধার্মিক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বোপদেশ যেন একটা উড়ো-জাহাজ—"অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বাকে, মরেই বা কে, কেই বা আপন, কেই বা পর। বাস্তবকে আবৃত করার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের ওপর মার নামে, তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"[৮৪]

নিছক সাহিত্য হিসেবেও যে রবীন্দ্রনাথ গীতাকে ত্রুটিহীন বলে মনে করতেন তাও নয়। যে পটভূমিতে গীতা রচিত বলে কথিত আছে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, সেখানে যুদ্ধকে থমকে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা বাস্তবতার সীমাকে লঙ্ঘন করে যায়—"যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন, তখন সমস্ত ভগবতগীতা অবহিত হয়ে শ্রবণ করতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।" 'প্রাচীন সাহিত্য' বইএর 'কাদম্বরীচিত্র' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ যুক্তিসংগতভাবেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। সেকারণেই তাঁর মনে হয়, গীতা আদ্যন্ত এক সাময়িক প্রয়োজনের রচনা; সাহিত্যিক অভিপ্রায় এর মধ্যে খুব বড়ো নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই যে খানিকটা দার্শনিকভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে ; এমনও বলা যেতে পারে মূল মহাভারতে এটা ছিল না, পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল।"[৮৫]

এতক্ষণ মূলত গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথাগুলোই আলোচনা করলাম কিন্তু গীতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র বিরূপতা ছিল না। বস্তুত গীতার যে অসাধারণ ঐক্যশক্তি সংকীর্ণ দেশকালের ঊর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সমস্ত বিরুদ্ধতাকে আত্মসাৎ করে সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে বারংবার অভিনন্দিত করেছেন। এগুলি ছাড়াও গীতার 'স্বধর্মতত্ত্ব', 'যজ্ঞতত্ত্ব' এবং নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আকর্ষণ ছিল। গীতার স্বধর্মতত্ত্বের বিখ্যাত শ্লোক—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, পরধর্মো ভয়াবহঃ"(৩/৩৫) রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শ্লোক। এই শ্লোকের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমর্থন রবীন্দ্রসাহিত্যে ভুরি ভুরি ছড়ানো রয়েছে। যেমন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে আধ্যাত্মিক ধর্ম উপলব্ধির প্রসঙ্গে শচীশ বলেছে—"আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন। যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ"[৮৬]

গীতার 'যজ্ঞতত্ত্ব'ও রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বিষয়। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র' প্রভৃতি শ্লোকে কৃষ্ণ স্পষ্টতই যজ্ঞ করার বিধি দিয়েছেন এবং পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে যজ্ঞের ফললাভের ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে যজ্ঞ বলতে বৈদিক হোম-যজ্ঞাদির কথা বলা হয়নি, তা নিশ্চিত—কিন্তু এই যজ্ঞের স্বরূপ কী তা গীতার একটি বহু আলোচিত সমস্যা। শঙ্করাচার্য, শ্রীধর স্বামী এবং বঙ্কিমচন্দ্রও যজ্ঞ বলতে ঈশ্বরকেই বুঝিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনূদিত গীতায় জানিয়েছেন, সকাম নয়, নিষ্কাম দেবপ্রীতির জন্যই যজ্ঞ করার নির্দেশ দিয়েছেন গীতা। কিন্তু যজ্ঞতত্ত্বের এক অভিনব ও সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা বোধহয় রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন, তাঁর 'জাভা যাত্রীর পত্র'এ—

> মানুষের চাইবার অন্তহীন শক্তি যখন সংকীর্ণ পথে আপন ধারাকে প্রবাহিত করতে যাবে, তখনই কূল ভাঙে, তখনই বিনাশের বন্যা দুর্দম হয়ে ওঠে—যেখানে তার সাধনা সকলের জন্য, সেখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়, এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন, এর দ্বারাই লোকরক্ষা।[৮৭]

আর গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর অর্থে মানবপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম কর্মের অর্থ করেছিলেন জনহিতকর কার্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষ যখন কর্তব্যবুদ্ধির পরিবর্তে প্রেমের প্রেরণায় চালিত হয়, তখন সেই কর্মের মধ্যে

বন্ধনের দুঃখ থাকে না, থাকে মুক্তির আনন্দ। এই প্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কর্মই রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় নিষ্কাম কর্ম। 'সাধনা' বক্তৃতামালার একটি বক্তৃতায় ব্যক্ত হয়েছে সে কথা—"Our true freedom is not the freedom from action but freedom in action which can only be attained in the work of love."[৮৮]

সুতরাং গীতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল মিশ্র প্রকৃতির। গীতার বাণীকে যেখানে সংকীর্ণ স্বার্থে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। উনিশ শতক তার জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে গীতাকে যেভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছে, তার সম্পূর্ণ পোষকতা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ, পক্ষান্তরে গীতার যেসব খণ্ডিত শ্লোকগুলিকে তিনি মানবতা তথা মানবমুক্তির পথপ্রদর্শক বলে মনে করেছেন, বিভিন্ন সময়ের লেখালেখিতে, বক্তৃতায়তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ; স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের গীতা মূল্যায়ন যে সমসময়ের তুলনারহিত মৌলিকত্বে ভাস্বর—একথা স্বীকার করতেই হবে।

বৌদ্ধধর্মমত ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ: প্রসঙ্গ ধম্মপদ

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন অকুণ্ঠিতভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন। করুণাঘন বুদ্ধের 'মহাশক্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম' ও সেইসঙ্গে শ্রেয়োনীতি ও জগৎকল্যাণের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশ-বিদেশের বৌদ্ধতীর্থগুলি তিনি শ্রদ্ধান্বিত মনে পর্যটন করেন। বুদ্ধের সাধনস্থল বুদ্ধগয়ার মহিমা প্রত্যক্ষ করার জন্য দুবার (১৩১১ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দে) বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করেন। তথ্য হিসেবে জানা যায়, অপৌত্তলিক, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনে যে সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন, তার মধ্যে একমাত্র বুদ্ধগয়াতেই বুদ্ধপাদপীঠতলে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হন।[৮৯] পরিণত জীবনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি"[৯০]। রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে বৌদ্ধ আদর্শ ও সংস্কৃতি স্বাভাবিক জারণক্রিয়ায় মিশে গিয়েছিল। সুধাংশু বিমল বড়ুয়া 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

করেছেন। তাই আমরা বর্তমানে সেই প্রসঙ্গ পরিহার করে বৌদ্ধগ্রন্থের সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করব।

সকলেই জানেন, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের কিছু অংশ ক্লাসিকাল সংস্কৃত ভাষায় ও কিছু অংশ পালি-প্রাকৃতে লিখিত। বৌদ্ধ-গ্রন্থাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র 'ধম্মপদ' বইটিকে কেন্দ্র করে একটি সারগর্ভ আলোচনা করেন। অতএব এই আলোচনাটিকে কেন্দ্রে রেখেই আমরা রবীন্দ্রনাথকৃত বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করব। আলোচ্য 'ধম্মপদং' গ্রন্থটি পালি ভাষায় লিখিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মূল ধর্মগ্রন্থ তিনটি। এদের একত্রে বলা হয় ত্রিপিটক। সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক একত্রে ত্রিপিটক। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অল্পকাল পরেই বুদ্ধের বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ একটি মহাসঙ্গীতিতে মিলিত হন। ওই ধর্মসঙ্গীতিতে আনন্দ স্থবির যে সকল বুদ্ধবাণী আবৃত্তি করেন, সেগুলিই 'সুত্তপিটক' আখ্যা লাভ করে। দীঘঘনিকায়, মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অংগুত্তরনিকায় ও খুদ্দনিকায়—এই পাঁচভাগে সুত্তপিটক বিভক্ত। সবশেষ ভাগ খুদ্দনিকায় আবার পনেরোখানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমষ্টি। এই পনেরোটি গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়টির নাম 'ধম্মপদ'। পালি 'ধম্মপদ' বইটি ২৬টি বর্গে বিভক্ত, মোট গাথার সংখ্যা ৪২৩। এই সংক্ষিপ্ততম গাথাগুলির মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতম রূপটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে। একারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বইটি আলাদা করে মূল্য পেয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমৃদ্ধ ভাষাতেই ধম্মপদের অনুবাদ রয়েছে। চারুচন্দ্র বসু ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ধম্মপদের মূল অন্বয়, সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাংলা অনুবাদ করেন। বাংলা ভাষাতে সম্ভবত এটাই প্রথম ধম্মপদের অনুবাদ। আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের 'ধম্মপদং' প্রবন্ধটি চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদ গ্রন্থের পরিচয় দান উপলক্ষেই লিখিত। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে (১৩১২ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যা)। এরপর সেই বছরই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরের বছর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থেও প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এই প্রবন্ধ লিখিত হবার তিন বছর আগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে বাংলা ভাষায় প্রথম ধম্মপদের আলোচনা করেন।

'ধম্মপদ'এর অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে 'ধম্ম' অর্থে নির্বাণ আর 'পদ' অর্থে পদক্ষেপ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে পদক্ষেপগুলি মানুষকে ক্রমশই নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়, তাকেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে 'ধম্মপদ'। তবুও

ধম্মপদগুলি নিবিড়ভাবে অনুশীলন করলে দেখা যায় নির্বাণ অপেক্ষা শীলানুগত, সংযত, পবিত্র জীবন গঠনের উপরেই এখানে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'শীল'এর লক্ষ্য 'মেত্তি ভাবনা'— ছোটো-বড়ো, ভালো-মন্দ, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলের জন্য হৃদয়ে আনন্দময় প্রেমকে জাগ্রত করা, সকল প্রাণীর সুখ ও মঙ্গল কামনা করা, ব্রহ্মের অপরিমিত মানসকে বিশ্বের সর্বত্র অনুভব করা। এই মৈত্রীভাবনাকে সার্থক করে তোলবার জন্যই শীল গ্রহণ ও শীল সাধনার প্রয়োজন। এই শীলানুগত পবিত্র জীবন গড়ে তোলাই ধম্মপদের উপদেশ। তাকেই বলা হয়েছে 'নির্বাণ'। এই 'নির্বাণ' মানুষকে শূন্যতার অভিমুখে ঠেলে দেয় না, তাকে পূর্ণতার পথেই পরিচালিত করে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম কথা তারা ঠিক বলে না।...প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধন প্রণালীও বলে দিয়েছেন। এতো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—'মৈত্রীভাবনা'[৯১]

'মেত্তিভাবনা'র এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে গেলে প্রয়োজন ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সদভাবের দ্বারা, কৃপণকে দানের দ্বারা এবং মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করবার জন্য সর্বতোমুখী কর্মোদ্যম ও পুরুষকারের উজ্জীবন। হৃদয়কে পদ্মের মতো বিকশিত করবার জন্য সর্বভাবে কায়িক ও মানসিক সৎ উদ্যমের নামই 'শীল-সাধনা'। এই পথেই প্রাণে মহৎ প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেম সকল ধর্মের ভিত্তিভূমি, সকল ধর্মের সার। শীলানুসরণকারী মানবের পক্ষে নির্বাণ লাভের পথ সহজ হয়ে যায়। শীল-গ্রহণের সার্থকতা বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপণের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই, যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে ; শীল আমাদের চলবার সম্বল"[৯২] শীলানুগত জীবন মানুষকে যে মৈত্রীভাবনায় উন্নীত করতে পারে, তাই-ই যে মানবমুক্তির প্রধান পাথেয়, এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। বৌদ্ধধর্মের এই মহান দিকটি ব্যাখ্যা করে 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি(বুদ্ধদেব) আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে—এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।[৯৩]

এ প্রসঙ্গে এই কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীর ভাব বুদ্ধের মৈত্রীসাধনার দ্বারা অনেকখানি সঞ্জীবিত হয়েছিল। বুদ্ধের করুণা ও মৈত্রীর আদর্শ বর্তমান বিশ্ববাসীর কাছে পরম আশা ও আশ্বাস নিয়ে আসতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ ‘ধম্মপদ’এর প্রচারে ও প্রসারে এতখানি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

‘প্রাচীন সাহিত্য’ বই এর সবকটি প্রবন্ধই কম-বেশি নিখাদ সাহিত্যসমালোচনামূলক ; ধম্মপদ ঠিক তেমনটা নয়। এখানে সাহিত্য সংলগ্নতা বেশ কম, বিপরীতে যুক্তি-চিন্তা ও তথ্যভার অধিক। অতীতকালের ভারতবাসীর ধর্ম-কর্ম ও সামাজিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও সেইসঙ্গে কর্ম ও সাধনা সম্পর্কে ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের মৌলিক প্রভেদ দেখানোই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। তবুও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটিকে ‘প্রাচীন সাহিত্য’ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন কারণ ‘ধম্মপদ’ ধর্মগ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ও রচনার গুণে পালি সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন ভারতে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সাহিত্যের খুব একটা ভেদরেখা ছিল না। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সেইসব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যেগুলিকে সাধারণভাবে আমরা ‘ধর্মশাস্ত্র’ বলি। তাই প্রাচীন ভারতের হৃদস্পন্দনটিকে উপলব্ধি করবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্য ও নাট্যাবলীর পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম ও ধম্মপদের প্রাধান্যকেও সমানভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এই প্রবন্ধের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস ভারতের মূল ইতিহাস নয়। তবে কোন্ যোগসূত্রে ভারতীয় ইতিহাস সহস্রাধিক বছর ধরে সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে? ভারতবর্ষীয় সভ্যতার কেন্দ্রীয় ধ্রুবপদ কী? রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এককথায় এর উত্তর ‘ধর্ম’। এই জায়গাতেই ভারতীয়

আদর্শের সঙ্গে ইউরোপীয় আদর্শের মূলগত তফাৎ। “য়ুরোপীয় নেশন-গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে।”[৯৪] ভারতবর্ষে ধর্মসাধনার পন্থাটি বিভিন্ন কিন্তু এর চরম লক্ষ্যটি অভিন্ন। ‘গীতা’য় যেমন ভারতের বহুকালের অধ্যাত্মচিন্তা একটি সংহত মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে, ‘ধম্মপদ’এও তেমনি ভারতবাসীর অধ্যাত্ম-চিন্তা বুদ্ধবাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে ধম্মপদে উদ্রিক্ত শ্লোকের অনুরূপ অনেক শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে আছে বলে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের যে আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, প্রাচীন গ্রন্থগুলির শ্লোকের মিল দেখে এটাই বোঝা যায় এইসব ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেক দিন থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। “আমাদের দেশ এমনি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বুদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দিক হইতে আকর্ষণ করিয়া, আপনার করিয়া, সুসম্বন্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন; যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া মানবের ব্যবহারযোগ্য করিয়া গেছেন।”[৯৫]

ভারতবর্ষীয় জীবনে তত্ত্বগত পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, এর মূলে রয়েছে এক গভীর ঐক্য। সেই ঐক্য ধর্মের ঐক্য। বেদান্তী, দ্বৈতবাদী, যোগী অথবা ভক্তিমার্গের সাধক সকলের ধর্মের মূল লক্ষ্য বাসনা নিবৃত্তির দ্বারা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। এ দেশের সকল ধর্মই মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে, কর্মকে বন্ধন নয়, মুক্তির উপায় করে তুলতে। সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করার উপায়। তাই ভারতীয় আদর্শে “কর্মমাত্রেরই চরম লক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম।”[৯৬] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের গভীরভাবে প্রতিতুলনা করেছেন। ভারতীয়দের মতো ইউরোপ কর্মকে কর্ম থেকে মুক্তির সোপান করেনি, বরং কর্মকেই লক্ষ্য করেছে। এইজন্য ইউরোপে কর্মসংগ্রামের অন্ত নেই। কৃতকার্য হওয়াই সেখানে সকলের উদ্দেশ্য। ইউরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস। আর সেজন্যই ইউরোপ কর্ম করা সম্বন্ধে স্বাধীনতা চেয়েছে। ভারতবর্ষও স্বাধীনতা চেয়েছে কিন্তু তা কর্ম থেকে স্বাধীনতা। কারণ সাংসারিক ও বস্তুগত কর্ম মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এক বাসনা জাল থেকে আরেক বাসনা জালে ক্রমশই জড়াতে থাকে। বাসনার তাড়নায় চিরজীবন অন্তবিহীন কর্ম করে যাওয়ার অবিরাম দাসত্ব থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই ভারতবাসীর কর্মসাধনার উদ্দেশ্যই

হল কর্মকে নিজের জীবনে জয়ী না করে কর্মের উপরে জয়ী হওয়া। কর্মের মধ্যেও ভারতবর্ষ মুক্তির সুরটিকে অবারিত রাখতে চেয়েছে।

> আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী ভিক্ষুকের গান হইতে তত্ত্বজ্ঞানীদের শাস্ত্রব্যাখ্যা পর্যন্ত, সর্বত্রই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যন্ত সকলেই বলিতেছে, আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি, বুদ্ধিপূর্বক মুক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্য, সংসারের অন্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া পড়িবার জন্য। সংস্কৃত ভাষায় 'ভব' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'হওয়া'। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। য়ুরোপ খুব করিয়া হইতে চায় ; আমরা একেবারেই না হইতে চাই।[৯৭]

ভারতবর্ষীয় মনের এই সার্বিক আসক্তিহীনতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতির পরিপন্থী হলেও, বাসনাতাড়িত মরণ-যন্ত্রনাক্লিষ্ট বিশ্বকে অমৃতের সন্ধান যে একদিন ভারতবাসীই দিবে এবং সেদিন যে তার পার্থিব পরাজয়ের সকল গ্লানি এক মুহূর্তেই জয়তিলক হয়ে উঠবে, সে কথাও রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন। স্বার্থলোভী কর্মজালে আনখশির ডুবতে চাওয়ার প্রবণতা ইউরোপকে কী ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তা উদঘাটন করে দেখিয়েছেন প্রায় সমকালে লেখা 'ঐতিহাসিক চিত্র' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন—

> ভারতবর্ষ প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—য়ুরোপ প্রবৃত্তিকে লালন করিয়া আত্মহত্যার উদ্‌যোগ করিতেছে। নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আমাদের আসক্তি ছিল না বলিয়া বিদেশীর নিকট আমরা দেশকে বিসর্জন দিয়াছি—নিজদেশ ও পরদেশের প্রতি আসক্তি সযত্নে পোষণ করিয়া য়ুরোপ আজ কোন্‌ রক্তসমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অস্ত্রেশস্ত্রে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া তাহার এ কী বিকট মূর্তি![৯৮]

তাই রবীন্দ্রনাথ সগর্বে বলছেন, পৃথিবীতে আজ সকল দেশই যখন বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্মের দৌরাত্ম্যকে তখন ভারতবর্ষ যদি জড়ভাবে নয়, জাগ্রত সচেতনভাবে বাসনা-বন্ধন থেকে মুক্তির আদর্শকে, শান্তির জয়পতাকাকে এই পৃথিবীব্যাপী রক্তাক্ত বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে অবিচলিত দৃঢ় হাতে ধারণ করে মরতেও পারত, তবে অন্য সকলে তাকে যত ধিক্কারই দিক না কেন, মৃত্যু তাকে কখনোই অপমানিত করত না। ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় জীবনাদর্শের এই মৌলিক পার্থক্যের কারণে ইউরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতীয় ইতিহাস রচনার চেষ্টা

কতখানি ব্যর্থ হবে, রবীন্দ্রনাথ তাও দেখিয়েছেন। ভারতের এই মূলগত ইতিহাস, ভারতবাসীর এই মৌলিক জীবনসত্যের বহু উপকরণ বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ আছে। তাই বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা ও অনুশীলনে রবীন্দ্রনাথের এতখানি আগ্রহ। যে বৌদ্ধশাস্ত্রের সঠিক পরিচয়ের অভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস কানা হয়ে আছে, সেই অভাব মেটানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ জন-কয়েক তরুণ যুবাকে চেয়েছেন, যারা বৌদ্ধশাস্ত্রের মর্ম উদ্ধার করে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস উদঘাটন করতে সাহায্য করবেন। এরপর চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদ সম্পর্কে দু-চারটি খুঁটিনাটি মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছেন।

এই প্রবন্ধটি সরাসরি সাহিত্য সমালোচনামূলক না হলেও রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত মণীষার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রবন্ধটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ উপলক্ষ্যে রচিত হলেও ভারতবর্ষীয় জীবনে ধর্মের মূল সত্য কেমন করে ধরা পড়েছে। বাসনা-বিহীন কর্মই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে ভারতবর্ষীয় জীবনে যুগ যুগ ধরে অনুশীলিত হয়ে ইউরোপীয় মনোধর্মের সঙ্গে কোথায় এর পার্থক্য রচিত হয়েছে এবং সেই পার্থক্যের ফল উভয় জাতির জীবনে কেমনভাবে রূপায়িত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ বিশ্লেষণে তা আমাদের দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ইমপ্রেশনিস্ট লক্ষণ স্থানে স্থানে ফুটে উঠে প্রবন্ধটির মধ্যে ব্যক্তিক রস সঞ্চারিত করেছে।

কালিদাস সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

উপনিষদ যতখানি গভীর ও পরিব্যপ্তভাবে রবীন্দ্রনাথের চেতনার জগৎকে নির্মাণ করেছিল, কালিদাসের কাব্য ও নাট্য ঠিক ততখানি গভীরভাবেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পবোধকে জারিত করেছিল। তাঁর শিল্পরসভোগবৃত্তিও কালিদাসের দ্বারা প্রভাবিত ও পুনর্গঠিত হয়েছিল গভীরভাবে। শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত—এই তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশ বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছিলেন, যা নানা মাত্রায় স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত। ব্যাস-বাল্মীকি ছাড়া ভারতের ক্লাসিক সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রমনে সর্বদা পুরোভাগে থেকেছেন কালিদাস। ফলে তাঁর কালিদাস পাঠের অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব কোথায়, এই পর্বে সেটাই আমাদের পর্যালোচনার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কালিদাসকে যেভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে তা ছিল কিছুটা ব্যতিক্রমী। ব্রিটিশ উপনিবেশায়নের ফলস্বরূপ উনিশ শতকের নব-শিক্ষিত সাহিত্যোৎসাহী তরুণেরা গ্রীক ক্লাসিক, শেকসপিয়র-স্কট-ডিকেন্স ও শেলি-কীটস-ওয়াডসওয়ার্থের যতখানি গুণানুরাগী ছিলেন, কালিদাসের কাব্যের ততখানি ভক্ত ছিলেন না। হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' এর আখ্যাপত্রে 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি' বলে শেকসপিয়রকে সম্বোধন করেছিলেন। শুধু হেমচন্দ্র নন, হেম-নবীন-মধু-বঙ্কিম সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা খাটে। সে যুগের হিন্দু কলেজের তরুণ যুবাদের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—

> হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও... বলিতে লাগিলেন যে- এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।[৯৯]

এই সময়ে অবশ্য বিদ্যাসাগর অথবা চন্দ্রনাথ বসুর মতো দু'একজন প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবী ছিলেন, যাঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের মোহে কালিদাসকে অবজ্ঞা করেননি বরং বেশ কিছু ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন। যেমন বিদ্যাসাগর শেকসপিয়রের ভক্ত পাঠক হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের সাহিত্যমঞ্চে কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছিলেন, 'পুরাতন প্রসঙ্গ'এ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তা জানিয়েছেন। সে যাই হোক, উনিশ শতকের পর্বে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকালে কালিদাস সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান অনেকখানি বদলে যায়। এই বদলের দুটি কারণ নির্দিষ্ট করে বলা যায়। প্রথমত, বেশ কিছু ইংরেজ ও জার্মান পণ্ডিতদের Indology চর্চার তাগিদে বিশেষত ম্যাক্সমুলার, উইনটারনিৎস প্রমুখ গবেষকদের কল্যাণে সারা পৃথিবীর মণীষা নতুন করে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়। অন্যদিকে এই সময় থেকেই উপনিবেশ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসারের ফলে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবনত হওয়ার একটি তাগিদ তৈরি হয়েছিল। সেই সঙ্গে 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ব (বড়ো অর্থে ভারতীয়ত্ব) পুনর্জাগরণের এক নতুন স্রোত সমাজে

দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রবল প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলার সাহিত্যমহলে কালিদাসেরও নতুন প্রতিষ্ঠা ও চর্চা সূচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত অধ্যয়ন বিশেষত কালিদাস চর্চা এই প্রেক্ষাপটেই শুরু হয়েছিল। এই চর্চার একটি অনুপ্রেরণা তিনি নিজের পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর দুই ভাই, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। অন্য ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন কালিদাসের বিখ্যাত নাটকগুলি। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করেন 'কুমারসম্ভব' নাটকের অংশবিশেষ। এছাড়াও কালিদাসের একাধিক কাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। শিশুবয়স থেকেই চর্চায়-ভাবে-সুরে কালিদাস যেভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লীন সত্তায় মিশে গিয়েছিলেন, মাত্রাগত হেরফের সত্ত্বেও তা শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনে অব্যাহত ছিল।

কালিদাসের কাব্যাদির মধ্যে মেঘদূতের প্রভাব রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবলতর। মেঘদূতের মূল কথাটা বিরহ। কুবেরের অভিশাপে যক্ষকে এক বৎসরের জন্য অলকা ছেড়ে নববধূর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে রামগিরি পর্বতে নির্বাসন যাপন করতে হয়। তার নির্বাসনের আটমাস অতিক্রান্ত হলে বর্ষাগমে পর্বত সানুদেশে জলভারাবনত মেঘপুঞ্জ দেখে যক্ষের প্রিয়ামিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং আবেগ-আর্তির প্রাবল্যে সে মেঘকে চেতন বস্তু বলে মনে করে তার নবপরিণীতা বধূর কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য মেঘকে অনুরোধ করে। তার নির্বাসন কাল শেষ হতে আর মাত্র চারটি মাস বাকি, শরৎ পূর্ণিমায় তাদের পুনর্মিলন হবে, এই বার্তা প্রিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে মেঘকে অনুরোধ করে। সেই প্রসঙ্গে সে মেঘকে রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত পথের দিশা বলে দেয় (পূর্বমেঘ) এবং পরবর্তী খণ্ডে অলকাপুরী ও নিজ প্রিয়ার সৌন্দর্যচিত্র অঙ্কন করে (উত্তরমেঘ)। এই যৎসামান্য কাহিনিকে অবলম্বন করে বিরহী হৃদয়ের বিলাপময় ভাবোচ্ছ্বাসের কাব্যরূপ মেঘদূত নামে যুগ যুগ ধরে কাব্যরসিকদের তৃপ্তি দিয়ে চলেছে। এই কাব্যের বিষয় ও বক্তব্য সম্পূর্ণ মৌলিক। কেউ কেউ বলেন, কালিদাস এই কাব্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন রামায়ণ থেকে। সীতার কাছে হনুমানকে দূতরূপে প্রেরণের ঘটনাই হয়তো কালিদাসকে এই খণ্ডকাব্যটি লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল। কালিদাসের রচনার গুণে সংস্কৃত সাহিত্যে দূতকাব্য এত জনপ্রিয় হয়েছিল মেঘদূত রচনার পরে পরে অন্তত ৫০টি এ ধরণের দূতকাব্য লেখা হয়েছিল। যেমন ধোয়ীর 'পবনদূত', লক্ষ্মীদাসের 'শুকসন্দেশ', বাসুদেব আচার্যের 'ভ্রমরসন্দেশ', রূপ গোস্বামীর 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবদূত', কৃষ্ণরাম সার্বভৌমের 'পদাঙ্কদূত'—এমন আরো বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়, মেঘদূতের মূল কথাই হল বিরহ। এই বিরহ দ্বিমাত্রিক। প্রথম, নরনারীর বিচ্ছেদজনিত প্রেমজ বিরহ আর দ্বিতীয়ত সুদূর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কালগত বিরহ। মেঘদূত সমালোচনার এই দ্বিতীয় মাত্রাটি রবীন্দ্রনাথের একান্তই মৌলিক আবিষ্কার। বাংলা ভাষায় মেঘদূত সমালোচনার ইতিহাসে কালগত বিরহের সূত্রটিকে প্রথম প্রতিষ্ঠা দেন রবীন্দ্রনাথ। মেঘদূত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগে পণ্ডিতেরা যা আলোচনা করেছেন, তাতে বিশেষভাবে জোর পড়েছে কালিদাসের কাব্যকৌশলের ওপর। কাব্যের আঙ্গিক, বিবরণ, আলঙ্কারিকতা, ঐশ্বর্য এবং আভিজাত্যই সেখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। রসবিশ্লেষণ অপেক্ষাও রস পরিবেশনের মার্জিত ও কার্যকর ভঙ্গি মেঘদূত সমালোচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। যেমন, ১৮১৩ সালে উইলসন মেঘদূতের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সেই বই এর ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের বাগাড়ম্বর, আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং বিবরণের অমিতাচার থেকে এই কাব্য স্পষ্টতই ব্যতিক্রম।[১০০] কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম যুগের কবি। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি ও সচলতা যখন ক্রমশই কমে আসছে, কালিদাসের উৎকৃষ্ট রচনাগুলি সেই সময়ের।[১০১] এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম মেঘদূত। এ কাব্যের বিবরণ সূক্ষ্ম, সরল ও মার্জিত। লম্বা যৌগিক শব্দ, অলঙ্কারবাহুল্য আর কৃত্রিম শ্লেষ থেকেও তা মুক্ত। "kalidasa is noted for simplicity, directness, clarity, elegance and felicity of expression"[১০২] এই সরল ভাষাতেই তিনি বর্ণনা করেছেন কাল্পনিক দেবনিবাস অলকা আর বাস্তব নগর উজ্জয়িনী। বর্ণনা করেছেন ভারতবর্ষের বিশাল ভূগোল আর প্রকৃতিকে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' শীর্ষক সমালোচনাটি লিখিত হওয়ার পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তিন সংখ্যা ধরে মেঘদূতের রসভাষ্য লেখেন, পরে যেটি 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় বাংলা ভাষায় রসাস্বাদী সাহিত্য সমালোচনার ধারায় এটিই প্রথম মেঘদূতের পূর্ণাঙ্গ রসব্যাখ্যা। আস্বাদনধর্মী রসব্যাখ্যা হলেও কোথাও কোথাও হরপ্রসাদের লেখনী নীতিবাদী সমাজতত্ত্বের অভিমুখে পরিচালিত হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে কুবেরের শাপগ্রস্থতাকে মিলিয়ে দিয়ে কিছুটা বঙ্কিমের আদর্শেই হরপ্রসাদ সমাজনীতির মানদণ্ডে এই কাব্যকে তৌল করতে চেয়েছেন। এ কালের আলোচকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যের ভাব, ভাষা, শব্দপ্রয়োগ ও পরিবেশনকলা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করে জানিয়েছেন, "কামের এই বিশ্বরূপ পৃথিবীর অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি।"[১০৩]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনা মোটের ওপর আস্বাদনধর্মী। কাব্যকলার শরীরী বিভঙ্গ নিয়ে কাটাছেঁড়া তাঁর স্বভাবের অনুকূল নয়, তা আমরা জানি। বরং শব্দ ও উপকরণ বিন্যাসের বাইরে গিয়ে শিল্পের যে এক বিমূর্ত ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে, তা চিহ্নিত করাই রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মেঘদূত কাব্যের শরীরী প্রতিমার ব্যাপারে তিনি যে উদাসীন ছিলেন, তা বলা যায় না। মেঘদূতের ছন্দ ও শব্দের ধ্বনিগৌরবকে তিনি আলোচনার মধ্যে এনেছেন। বলেছেন, "মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এ কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু।"[১০৪] 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে তিনি মেঘদূতের সামগ্রিক গঠনশৈলী বিচার করেছেন রঘুবংশ কাব্যের সঙ্গে তুলনা করে—"মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত।... রঘুবংশ কাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মতো তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই।"[১০৫] এই দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করে রবীন্দ্রনাথের আস্বাদনরীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বস্তুধর্মীও বটে।

মেঘদূত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ একটিই, যেটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' বইএর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এই প্রবন্ধটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের নানা সময়ে কালিদাসের মেঘদূতকে উপলক্ষ্য করে একাধিক লেখা লিখেছেন, যেগুলির মধ্যে থেকে এই কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের নানা মাত্রা বুঝতে পারা যাবে। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে কালিদাস ও কালিদাসের কাব্যকে উপলক্ষ্য করে একাধিক কবিতা রয়েছে। যেমন 'ঋতুসংহার', 'মেঘদূত', 'কালিদাসের প্রতি' ও 'মানসলোক'। 'ঋতুসংহার' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে বন্দনা করেছেন দুটি সম্বোধনে। প্রথম, তিনি প্রকৃতির কবি আর দ্বিতীয় তিনি যৌবনের কবি। ছয়টি ঋতুর বর্ণাঢ্যতায় শৃঙ্গাররসের কবি কালিদাস প্রেয়সী-সান্নিধ্যে কল্পকুঞ্জবনে লীলাবিলাসে অভিষিক্ত, এই ভাবে কালিদাসকে বর্ণনা করা হয়েছে। 'কালিদাসের প্রতি' ও 'মানসলোক' কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে বর্ণনা করেছেন কৈলাস অধিপতি মহেশের আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবিরূপে। কৈলাস শিখরে উমাপতির বন্দনা গাইতেন যিনি তিনিই উজ্জয়িনীতে এসে বিক্রমাদিত্যের রাজসভার বীণাবাদক হয়েছেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সে কাল চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। তবুও কালিদাস চিরকালীন মহিমায় জগৎবাসীর মনে অক্ষয় হয়ে আছেন। 'মেঘদূত' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সরাসরি বক্তব্য বিরহখণ্ডিত প্রেমেই প্রেমের যথার্থতা উপলব্ধি সম্ভব। নবপরিণীতা যক্ষের মিলনসর্বস্ব উপভোগের মাঝখানে প্রভুশাপ কঠোরভাবে নেমে এসে যখন বিচ্ছেদ ঘনিয়ে তুলল,

তখন সেই বিচ্ছেদদহনের শুভ্র আলোকে প্রেম নব মহিমায় বিকশিত হল। চতুর্দশপদী কবিতায় এই যে ভাবটি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন, তা রবীন্দ্রচেতনার একটি অন্যতম 'স্থায়ি ভাব'। প্রেমের এই বিশিষ্ট ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ অনেকাংশেই লাভ করেছেন কালিদাসের আরও বিশেষভাবে বললে 'মেঘদূত' কাব্য থেকেই।

রবীন্দ্রচেতনায় মেঘদূত আলোচনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটিকে। কবিতাটি ১৮৯০ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে অর্থাৎ সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি রচিত হওয়ার দেড় বছর আগে লেখা। 'মেঘদূত' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতার রসভাষ্য রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। 'মেঘদূত' কবিতাটিতেই রবীন্দ্রনাথ বিরহের একটি মাত্রা হিসেবে 'কালগত বিরহের' উল্লেখ করেছেন। যদিও তারও আগে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি সর্বপ্রথম এই বিষয়টি পরিহাসের ছলে উল্লেখ করেন।

> —আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আসতুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুনলেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;-- চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য ; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদের সকলেরই উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে...[১০৬]

কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত ছবির মতো এইসব জনপদ, নদী-গিরির সঙ্গে একালের এক অসেতুসম্ভব দূরত্ব বা ব্যবধান তৈরি হয়েছে যা একালের কবিকে 'কামনার মোক্ষধাম অলকায়' পৌঁছতে দেয় না। অথবা হয়তো সেই 'অলকা' বাস্তবে কোথাও নেই। 'মানসসরসীতীরে' অনন্তবিরহশয়ানে শুয়ে আছে সেই মানসসুন্দরী। যার কাছে সশরীরে উপনীত হওয়া যায় না, কামনার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে যাকে ছুঁতে পারা যায় মাত্র! এই নিষ্ঠুর দূরতিক্রমী ব্যবধানের ওপার থেকে কবি কেবলই ভাসিয়ে দেন নিজের বিলাপোক্তি—

কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?

কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে ব্যর্থ মনোরথ?

কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?

সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,

মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,

রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে

জগতের নদী গিরি সকলের শেষে![১০৭]

এই 'মেঘদূত' কবিতারই গদ্যভাষ্য 'মেঘদূত' নামের প্রবন্ধটি। বক্তব্যবিষয়ও প্রায় একই। স্বল্পায়তন প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে কালিদাসের কালের সঙ্গে একালের সেতুবিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা নিয়ে। রামগিরি থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে জীবনস্রোত মন্দাক্রান্তা ছন্দের তালে প্রবাহিত হত, সেখান থেকে আমরা চিরকালের জন্য নির্বাসিত হয়েছি। কালিদাসের সময়ের দেশ-কাল-পাত্র কিছুই তো আজ নেই তবুও একালের ইতর কলকাকলি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি রেবা-শিপ্রা-অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজছেন। কিন্তু সেখান থেকে তো আমরা চিরনির্বাসিত! একমাত্র মেঘের সঙ্গী হয়ে ও কালিদাসের শ্লোক সম্বল করে আমরা রামগিরি থেকে অলকা পর্যন্ত মানস ভ্রমণ করতে পারি। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে দিয়েই সেকালের জীবনযাত্রার কিছু কিছু কাল্পনিক স্বাদ আমরা একালেও পেতে পারি। হর্ম্যবাতায়নে পুরবধূদের কেশসংস্কার, নিশীথরাত্রে ভবনশিখরে সুপ্ত পারাবত, সুষুপ্ত নির্জন রাজপথ এবং সেই অন্ধকার পথে কম্পিত হৃদয়ে অভিসারিকার নিঃশব্দ যাত্রা কবিকে কালিদাসের কালে টেনে নিয়ে গেছে। তাঁর বাসনা যেন মূর্তি ধারণ করে সেই অভিসারিকার পায়ের কাছে 'নিকষে কনকরেখার মতো' শুধু একটু আলো জ্বালতে চেয়েছে। প্রবন্ধের এই অংশে তাঁর ব্যক্তিগত রসোপভোগ কালিদাসের কবিত্বসংস্কারের দ্বারা গ্রস্থ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে যক্ষের বিরহবেদনাকে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ তত্ত্বে সর্বজনীন করে তুলেছেন।

বসন্তে জীবজগৎ মত্ত হয়, সে আপন চাঞ্চল্যে ও যৌবনের উল্লাসে বন্ধনের সীমা ভেঙে অপ্রাপণীয়কে পেতে চায়। কিন্তু বর্ষা উল্লাসমুখর নয়, সে বাইরে ডাক দেয় না। সে আপন পরিধির মধ্যেই নিজ অন্তরকে শূন্যতায় ভরে তোলে, মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয় অকারণ বেদনা।[১০৮] গিরিসানুদেশে পুঞ্জিত জলভারে বিনত মেঘ যেমন করে যক্ষের একাকীত্বের বেদনাকে নিঃসীম করে তুলেছে। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার মাঝখানে অনন্ত বিরহের অশান্ত কল্লোল।

তবে এই ব্যবধান একদিন দূর হবে, একদিন প্রিয়ার সঙ্গে যক্ষ মিলিত হবে এই আশাটুকু বুকে নিয়ে বিরহভারাতুর যক্ষ দিন গোনে এবং যক্ষপ্রিয়াও বিরহশয়নে কলামাত্রশেষ চন্দ্রের মতো বিশীর্ণ কান্তিতে প্রিয়তমের জন্য অপেক্ষা করে। যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়ার ব্যক্তিগত বিরহবেদনাকে রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের বিরহ বেদনায় উত্তরিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছেন ম্যাথু আর্নল্ডের বিখ্যাত 'Isolation' নামের সনেটটির প্রসঙ্গ। ম্যাথু আর্নল্ড উদ্দিষ্ট কবিতায় দেখিয়েছেন আমরা কালসমুদ্রে দ্বীপের মতো একাকী বাস করছি। চারদিকে কুলহীন সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। আমরা কেউ কারো সান্নিধ্য পাচ্ছি না। মনে হয় আমরা যেন কোন্ এক সুদূর অতীতে এক মহাদেশের এক মাটির উপরেই ছিলাম, তারপরে না জানি কার অভিশাপে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমরা প্রত্যেকেই যেন বিরহী যক্ষ, নির্জন গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখে চেয়ে অলকাপুরীর মণিহর্ম্যে শায়িতা শেষ চন্দ্রকলার মতো ক্ষীণাংশু বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করছি। শুধুমাত্র স্মরণের পথে তাকে উপলব্ধি করা আর বাসনার সোনা গলিয়ে তার মূর্তি নির্মাণ করা ছাড়া আমাদের আর কী-ই বা করার আছে? প্লেটোর 'সিম্পোসিয়াম'এর মতো আমরা কেবলই আমাদের হারানো অর্ধেককে খুঁজে বেড়াচ্ছি। 'সিম্পোসিয়াম' সংলাপে এরিস্টোফেনিস এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে, আদিযুগে মানুষ ছিল পূর্ণবৃত্ত জীব। তাদের চার হাত, চার পা, দুই মুখ ও এক মাথা। তাদের লিঙ্গ ছিল তিন পর্যায়ের ; যুগল পুরুষ, যুগলনারী ও যুগল নারীপুরুষ। তারা প্রত্যেকেই ছিল প্রচণ্ড শক্তিধর। তাদের শক্তিমত্তায় ভীত হয়ে জিউস প্রত্যেক মানুষকে উপর থেকে নিচে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে দু-টুকরো করে দিলেন। সেই থেকে মানুষ তার আদিসত্তার অর্ধাংশ মাত্র। সে প্রাণপণে তার বাকি অর্ধেককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই হারানো অর্ধেকের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়ে মানুষের মনে জেগে থাকে এক অসীম বিরহবোধ। কালিদাসের যক্ষ মানব অন্তরের সেই অসীম বিরহের প্রতীক মাত্র। বৈষ্ণব কবি বলরামদাসের পদ উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তোমায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'"[১০৯]। আমাদের যে মানসী মনের কল্পলোকে নির্বাসিত হয়ে আছে, নববর্ষার মেঘসম্মিলনে আমরা তাকেই বাইরে এনে জাগর সত্তায় পেতে চাই। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় না। মানসসরোবরের অগম পারে যে রয়েছে, এই ধূলিমলিন পৃথিবীতে তাকে ধরা-ছোঁয়া সম্ভব নয়। কারণ "মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে!"[১১০]

ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনার একটি সার্থক দৃষ্টান্ত হল এই 'মেঘদূত' নামক সমালোচনাটি। কালিদাসের মূল কাব্যের ভাব-ভাষা, ছন্দ-অলংকৃতির মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল মূল কাব্যটিকে উপলক্ষ্য করে নিজের হৃদয়ভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনায়। মেঘদূত কাব্যটিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারতবর্ষের শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে ডুব দিয়েছেন। সেকালের সঙ্গে বর্তমান কালের যে এক অসেতুসম্ভব দূরত্ব রয়ে গেছে তার জন্য ব্যথিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি এও কল্পনা করেছেন, এ কাব্য আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্জীবনের রূপক। এরিস্টোফেনিস কথিত সিম্পোসিয়াম সংলাপের মতো আমাদের হারানো অর্ধেকের জন্য বিরহযন্ত্রণা বিরহী যক্ষের মতো আমরা নিরন্তর ভোগ করছি। নববর্ষার মেঘ সেই ব্যথাকে আরো গভীর করে তোলে। কিন্তু প্রাপণীয়াকে পাওয়া আর ঘটে ওঠে না। যে মানসী অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্যলোকে নির্বাসিতা, বাস্তব পৃথিবীতে তাকে পাওয়া যায় না। অথচ পাওয়ার ব্যাকুলতাটুকু নিত্য জেগে থাকে। এই অপ্রাপ্তির বিষণ্ণতাই এই ছোটো প্রবন্ধটির ভাবসম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনাটি আকারে ছোটো হলেও মৌলিকত্বে ন্যূন নয়। উনিশ শতকের অপরাপর 'মেঘদূত' সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের মতো করে এ কাব্যকে 'বিরহপ্রধান' হিসেবে চিহ্নিত করতে চাননি। বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার রীতি মেনে তাঁরা যথারীতি খণ্ডকাব্যের গুণ ও লক্ষণ, 'খণ্ডকাব্য' হিসেবে মেঘদূতের সার্থকতা, নমস্ক্রিয়া, বস্তুনির্দেশ, বিপ্রলম্ভ ও শৃঙ্গার রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা, ছন্দ ও ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রভৃতি বিচার করে এই কাব্যকে বিরহের আধারে সম্ভোগাখ্য প্রেমের কাহিনি বলতে চেয়েছেন। যেমন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'মেঘদূত' সমালোচনা। তাঁর মতে মেঘদূত যক্ষ দম্পতির বিরহকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও আসলে এটি সম্ভোগ রসেরই কাব্য। বিরহ এখানে বিলাসে পরিণত হয়েছে এবং যক্ষের বিরহ তার কামনার আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে তাকে প্রবলতর ও উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। যে সম্ভোগপ্রবৃত্তি শুধু মানুষকে নয় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকেই বিমূঢ় করে রেখেছে, বিরহকে উপলক্ষ্যমাত্র করে সেই সম্ভোগ কল্পনার লীলাবিলাসই গোটা কাব্যে বিলসিত। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ প্রকাশের তিন মাস পূর্বে ১২৯৮ সালের ভাদ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর 'মেঘদূত' সমালোচনায় লেখেন—

> যক্ষের আকাঙ্ক্ষা প্রণয়িনীর শারীরিক সৌন্দর্য লইয়া ; যক্ষের অলকা-বর্ণনা একজন বিলাসীর কাল্পনিক স্বপ্নভূমির কাহিনী মাত্র। সেজন্য আমরা কালিদাসকে কোনও দোষ দিতে পারি না। কালিদাস প্রথমে যক্ষের দেবত্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে মানুষ করিয়া আঁকিয়াছেন এবং সুন্দর ও সরল ভাষায়, সত্য সত্য মানুষের বিরহের মধ্যে কতখানি শারীরিক সৌন্দর্যতৃষ্ণা বর্তমান তাহা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা মানুষের প্রেম হইতে শারীরিক সৌন্দর্য লালসা একেবারে বাদ দিয়া একটা অতি উচ্চ রকম মানসজাত (ideal) ভালোবাসা নির্মাণ করেন, তাঁহাদের সহিত এক্ষেত্রে কালিদাসের খুব অল্প সহানুভূতি।[১১১]

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিষ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর মেঘদূত সমালোচনায় প্রভুশাপে যক্ষের নির্বাসনকে সমাজনীতির দিক দিয়ে আলোচনা করে এ কাব্যের নৈতিক দৃষ্টিকোণটিকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন, সে বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এ কালের সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিদগ্ধ অধ্যাপক-গবেষক উনিশ শতকীয় সমালোচনার প্রতিধ্বনি করে এ কাব্যকে সম্ভোগাখ্য বিরহের কাব্যই বলেছেন। তাঁর নাম বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়—

> কালিদাস প্রধানত সম্ভোগের কবি।... বাসনাকে তিনি কোনও মতে রুদ্ধ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার সম্ভোগের চিত্র বিরহের চিত্র অপেক্ষা শতগুণে উজ্জ্বল। মেঘদূত কাব্য যদিও যক্ষ দম্পতির বিরহকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত—তথাপি বিরহে ইহার পর্যাবসান হয় নাই—এই কাব্যে বিরহের মুখ্য উদ্দেশ্য কামনার বহ্নিতে ইন্ধন দান—তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলা। মেঘদূতের প্রতিটি বর্ণনার মধ্যে এই উদ্দাম ভোগ-লালসার ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত।[১১২]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত'এর মধ্যে অনন্ত বিরহেরই মহিমময় মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মিলনে নয়, বিরহেই যে প্রেমের পূর্ণ সার্থকতা, এই কবিত্বসংস্কার রবীন্দ্রনাথের চেতনায় প্রথম যৌবন থেকেই খুব দৃঢ় হয়ে ছিল। যেমন ওঁর জীবনের প্রথম পর্বের একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

...মিলনে আছিলে বাঁধা

শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা,

আজ বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,

তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।[১১৩]

যে প্রেম আত্মসুখের দ্বারা খণ্ডিত, ব্যক্তিগত ভোগসীমায় আবদ্ধ তা কখনোই পরিপূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছোতে পারে না। যক্ষের প্রেম মিলনের ভোগসীমায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়েছিল বলেই প্রভুশাপে তাকে বারিত হতে হল। অবশেষে বিরহের অগ্নিদহনের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষিত হয়ে তবে সে নিস্তার পেল। কালিদাসের এই কবিত্বসংস্কার রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর মেঘদূত ব্যাখ্যায় প্রভুশাপের দ্বারা বারিত যক্ষের বিরহতাপদগ্ধ প্রেমের উজ্জ্বল রূপটি সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন, 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ৩৮ সংখ্যক কবিতা—

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের

বদ্ধ ছিল আপনাতেই

পদ্মকুঁড়ির মতো।

যেদিন সংকীর্ণ সংসারে

একান্ত ছিল তোমার প্রেয়সী

যুগলের নির্জন উৎসবে,

সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,

শ্রাবণের মেঘমালা

যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে

আপনারি আলিঙ্গনের আচ্ছাদনে।

এমন সময় প্রভুর শাপ এল

বর হয়ে,

কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।

খুলে গেল প্রেমের আপনাতে বাঁধা

পাপড়িগুলি,

সে-প্রেম নিজের পূর্ণরূপের দেখা পেল

বিশ্বের মাঝখানে।[১১৪]

যে বিশ্ববিমুখ প্রেম আপনাতে আপনি বদ্ধ, তার মধ্যে সৌন্দর্য নেই, সম্পূর্ণতাও নেই। যে প্রেম মঙ্গলের দ্বারা বিশ্বযোগে সম্পৃক্ত, তাই সুন্দর, তাই-ই সার্থক। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কালিদাসের কাব্যেও সুন্দর মঙ্গলের সঙ্গে একত্রে অবিরোধে অবস্থান করছে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত উল্লেখ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, "সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।"[১১৫] তাই মেঘদূত কাব্যে মেঘপথের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ কেবল কালিদাসের সৌন্দর্যবুদ্ধির পরিচয় পাননি তাঁর মঙ্গলবোধেরও প্রকাশ লক্ষ করেছেন। লিখেছেন—

> কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাহার হাতযশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে; বিশেষত, উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিণা বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু, কবি প্রথম আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন—সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে—সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে। সে যে সমস্ত পথটার নদী গিরি কাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছলছল করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধলোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরও জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্তা প্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।[১১৬]

'মেঘদূত' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ইতস্তত ছড়ানো আরও কয়েকটি গদ্য লেখা আছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'লিপিকা'র মেঘদূত শিরোনামাঙ্কিত লেখাটি। কার্তিক ১৩২৬ বঙ্গাব্দে লেখা এই রচনাটিতেও মেঘদূতের প্রেক্ষাপটে প্রধান হয়ে উঠেছে বিরহ। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

মিলনের বাঁশি মানুষের পুরো রূপটাকে দেখাতে পারে না। কাছে থাকা হচ্ছে আধখানা, দূরে যাওয়া আর আধখানা। সেই আধখানা দূরের জন্যই মানুষের ব্যাকুলতা। কিন্তু এই ব্যাকুলতা মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ? দিনের শেষে কাজের থেকে বেরিয়ে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন, তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র! ওকে আবার নতুন করে খুঁজে পাওয়া যাবে কোন্ কুলহারা কামনার ধারে! নববর্ষার দিনে মন ব্যথিয়ে উঠে এই কথাটিই জানতে চায়। সেই কুলহারা কামনার উদ্দেশে মেঘকেই দূত করে পাঠাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অনন্ত সৌন্দর্যমাঝে একাকিনী যিনি, নববর্ষার মেঘলা দিনে যার কল্পনা আমাদের ব্যথিত করে, সেখানে পৌঁছনো কি কখনও সম্ভব? এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয় 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' নামক কবিতাটি। এই কবিতাটির ভাব-চিত্র-ভাষার সঙ্গে মেঘদূত কাব্যের সাদৃশ্য অতি গভীর। গোটা কবিতাটি জুড়েই কালিদাসের দেশ-কাল জীবন্ত হয়ে আছে। লোধ্ররেণুচর্চিত মুখে, লীলাপদ্ম হাতে, কর্ণমূলে কুন্দকলি ও কুরুবক মাথায়, নীবীবন্ধে রক্তাম্বর বাঁধা তনুদেহে, চরণে নূপুরখানি বাজিয়ে ও হাতে দীপশিখা নিয়ে প্রার্থিত যে মালবিকা সামনে এসে দাঁড়াল তার সঙ্গে আশা-উজ্জ্বল মিলনের শত আয়োজন একটি দীর্ঘশ্বাসের মতোই অনন্তের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—

> আমাদের মনে পড়ে গেল যে কবিতাটির নাম 'স্বপ্ন'—স্বপ্ন বাস্তব নয়, পরাবাস্তব, যে স্বপ্ন থেকে কোনোদিনই আমরা সম্পূর্ণরূপে জেগে উঠতে পারব না।... এই অন্ধকার শুধু রাত্রির নয়—বিরহের, বিস্মরণের, এক অনাদি ও অনন্ত বিরহের। এই তৃষ্ণা এমন যা কোনোদিন মিটবে না, এই প্রিয়া এমন যে স্পর্শমাত্রে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে।[১১৭]

'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থে দুটি গদ্যনিবন্ধ আছে—'নববর্ষা' ও 'বাজে কথা'। এই দুটি রচনার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ব্যাখ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। 'নববর্ষা' ১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রচিত হয়। এই প্রবন্ধের মূল কথা হল, বর্ষার মেঘ যখন সহসা চেনা পৃথিবীর ওপর অচেনার আভাষ ঘনিয়ে তোলে, তখন আমরা প্রতিদিনের কর্মপাশ থেকে ক্ষণেকের জন্য মুক্তি পাই। আকাশে নববর্ষার সমাগম মেঘদূত কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আমাদের হৃদয়কে উৎসুক করে তোলে, অপ্রাপণীয়কে পাওয়ার জন্য মনে ব্যাকুলতা সঞ্চার করে। নববর্ষার মধ্যে যে বেদনার সুর আছে, তা মেঘদূত কাব্যে একশো বিশটি শ্লোকযুক্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

এই কাব্যে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।"[১১৮] প্রাবন্ধিক তাঁর অনুপম ভাষায় 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ'এরও রসগ্রাহী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পূর্বমেঘে আমাদের সংসারের বাঁধনে বাঁধা মন বাইরের দিকে ছুটে বেড়াতে চায় আর উত্তরমেঘে সেই বাঞ্ছনীয় লোকে উত্তরণ। পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সঙ্গে সৌন্দর্যের পরিচয় আর উত্তরমেঘে সেই একের সঙ্গে আনন্দের মিলন। মেঘ এসে বাইরে যাত্রা করবার জন্য আহ্বান করে, তাই-ই পূর্বমেঘের গান, এবং যাত্রার অবসানে চির মিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাই-ই উত্তরমেঘের সংবাদ। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ মিলিয়ে এই কাব্যের যে গাঠনিক শিল্পচাতুর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন, পরবর্তীকালের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতটিকে আরও পরিস্ফূট করে লিখেছেন—

> মেঘদূতে যক্ষের বিরহ একটা অছিলা মাত্র ; কবির আসল উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয় কয়েকটি ভূ-দৃশ্যের আর তারপর তাঁর ভূ-স্বর্গের চিত্ররচনা। পূর্বমেঘে যে-সব নদী, নগর ও পর্বত আমরা পরপর দেখে যাচ্ছি তারা সকলেই সুন্দর, তবু তারাও সুন্দরতমের ভূমিকায় কাজ করছে; এই পার্থিব সৌন্দর্যের শেষপ্রান্তে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে অলকা এলদোরাদো, সব পেয়েছির দেশ, এবং এক তিলোত্তমা নারী, কবির মানস প্রতিমা, যাকে দেখবার জন্য—আমরা দেখা মাত্র বুঝতে পারি—কবি এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছিলেন। কাব্যটির গড়ন যেন পিরামিডের মতো, তার পাদদেশে ভৌগোলিক বিবরণ, মধ্যভাগে অলকা আর তার চূড়ায় অধিষ্ঠিত এক নারী মূর্তি।[১১৯]

'বাজে কথা' প্রবন্ধেও মেঘদূত প্রসঙ্গ এসেছে একটু ভিন্নভাবে। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, যা কেজো ব্যাপার নয়, দৈনন্দিন প্রয়োজনের দ্বারা যা মলিন নয়, তাই-ই সারস্বত সৃষ্টিকর্মের মূল উপাদান। অর্থাৎ আর পাঁচজন বিষয়ী লোক যাকে 'বাজে কথা' বলে সেইগুলিই হচ্ছে যথার্থ সারস্বত সৃষ্টি। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি মেঘদূতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—

> সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে। কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট

ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনই ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছু নাই।... ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ এমন উজ্জ্বল।[১২০]

সাহিত্যতত্ত্বমূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টি হয় অপ্রয়োজনের আনন্দ থেকে। মেঘদূত রচনার পিছনে কোনো বস্তুগত উদ্দেশ্য কেউ খুঁজে পাবেন না। প্রিয়াবিরহের যে তূরীয় পর্যায়ে চেতন-অচেতনের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়, সেই "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণা-শ্চেতনাচেতনেষু" অবস্থায় বিরহী যক্ষের প্রলাপোক্তি এই মেঘদূত। অথচ এই প্রলাপই কবির রচনাগুণে সহৃদয় পাঠকের মনকে ব্যাকুল বেদনায় ভরিয়ে তোলে, কাব্যের দিক থেকে এটুকুই এর সার্থকতা। বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন—"একদিক থেকে বলা যায় 'মেঘদূত' কোনো আধুনিক উপন্যাসের মতো, যাতে প্লট বলে কিছু নেই, কিংবা যেটুকু আছে তার পরিণাম গ্রন্থারম্ভেই বলে দিয়ে লেখক আমাদের ধরে রাখেন শুধু শিল্পিতার চাতুরীতে।"[১২১]

মেঘদূতের মতোই কালিয়াদসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক রবীন্দ্রমননে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন এই তিনিখানি গ্রন্থই যথার্থভাবে কালিদাস-প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। প্রকরণের দিক থেকে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা পৃথক হলেও রবীন্দ্রনাথ এদের মর্মগত ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কালিদাসকৃত এই দুই পৃথক সাহিত্যকীর্তির ভাবসাদৃশ্য দেখানো ও তার মধ্যে দিয়ে কালিদাসের বিশেষ মনোভঙ্গিটিকে পাঠকের দরবারে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য। তাই তিনি একত্রে এদের আলোচনা করেছেন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' শিরোনামে।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ 'আলোচনা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় পঠিত হয় এবং ঐ বছরই পৌষের 'বঙ্গদর্শন'(নবপর্যায়)এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ভারতীয় জীবনের যেটি শাশ্বত আদর্শ তাকেই কালিদাস কেমন করে এই দুইখানি অমর সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত করেছেন তা উদঘাটন করে দেখানোই এই প্রবন্ধে তাঁর লক্ষ্য। স্মরণে রাখতে হবে এই প্রবন্ধ যে সময়ে লেখা তখন রবীন্দ্রনাথের মন প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবস্মৃতিতে অভিষিক্ত। তপোবনকেন্দ্রিক ভারতীয় সভ্যতা তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছে। এই সময়ে তাঁর কাব্যজীবনে 'নৈবেদ্য' পর্ব আর কর্মজীবনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার কাল। প্রাচীন ভারতের হৃদস্পন্দনকে তিনি এককালে লাভ করছেন উপনিষদের শ্লোকে এবং

অবশ্যই কালিদাসের কাব্যে। কালিদাসের কাব্যে তিনি শাশ্বত ভারতবর্ষের মূল্যবোধকে আবিষ্কার করছেন এই সময়ে। সেই মূল্যবোধ সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সমন্বয়ের কথা বলে। আত্মগত সুখকে সমষ্টিগত কল্যাণের মধ্যে মিলিয়ে দিতে চায়। কালিদাসের কাব্য ও নাটক সেই সমন্বয়ের প্রতিমূর্তিস্বরূপ। এমনই একটি চিন্তাসূত্র থেকে প্রসূত হয়েছে এই প্রবন্ধটি।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের কাহিনির যথার্থ উৎস তিনটি। রামায়ণের আদিপর্বের ৩৭তম পর্বাধ্যায়, মহাভারতের বনপর্বের ২২৫ তম পর্বাধ্যায় এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'(১ম সর্গ শ্লোক ৬০-৬১ ও ১৩শ সর্গ শ্লোক-১৬)। এছাড়াও অর্বাচীনকালের বহু পুরাণ ও উপপুরাণে এই কাহিনি আছে যার মধ্যে অনেকগুলিই কালিদাসের কাব্যরচনার পরবর্তীকালে লিখিত হওয়া সম্ভব। এই কাব্যের কাহিনিবিন্যাস ও সর্গসংখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এই কাব্যের যে মুদ্রিত সংস্করণ প্রচারিত হয়েছে, তাতে সতেরোটি সর্গ আছে। এর মধ্যে ১-৭ সর্গ যে কালিদাসেরই রচনা এ বিষয়ে কারও সংশয় নেই। অষ্টম সর্গে পার্বতী-পরমেশ্বরের দাম্পত্যলীলা বর্ণিত হয়েছে বলে ছুৎমার্গীরা 'পিত্রোঃ সম্ভোগ বর্ণনমত্যন্তমনুচিতম' সিদ্ধান্ত করে এই সর্গ কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু ৯-১৭ সর্গের রচনারীতি ও ভাষা আগের অংশের থেকে নিকৃষ্ট। এই দুই অংশ একই হাতের রচনা বলে মনে হয় না। এই কাব্যের যে সমস্ত সংস্কৃত পুথি পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই ৮ম সর্গে শেষ হয়েছে। ১৭ সর্গে সমাপ্ত পুথির সংখ্যা হাতে গোনা। এসব থেকে অনুমান করা যায় প্রথম থেকে অষ্টম সর্গ কালিদাসের রচনা এবং পরবর্তী অংশ সম্ভবত কালিদাসের নামে প্রক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত এমনটাই বিশ্বাস ছিল। তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর লেখা একটি কবিতায় যেখানে কালিদাস পার্বতী-শঙ্করের লীলাবিলাস গাইতে গাইতে পার্বতীর শরমভরা নয়ন ইঙ্গিতে অসমাপ্ত অবস্থাতেই নিজের গান সমাপ্ত করেছেন।

কভু স্মিতহাসে

কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস

অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস

দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে

ব্যাকুল শরমখানি নয়নিমেষে

নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে

সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।[১২২]

‘কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’(প্রকাশ ১৯০১) প্রকাশিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষায় কালিদাসের কাব্য-নাটকাদি সমালোচনার একটি পরিসর তৈরি হয়ে উঠেছিল, যার মূল ঋত্বিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা পড়েই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি পাঠক-সমাজ নতুন করে কালিদাসের সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। তাঁর কালিদাসের সঙ্গে শেকসপিয়রের তুলনামূলক আলোচনা রীতি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি নতুন দিক খুলে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় কালিদাস চর্চা করেছেন চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখেরা। চন্দ্রনাথ বসুর সমালোচনার একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে হিন্দু ভারতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে স্বভাবতই তিনি হিন্দু আদর্শ ও মূল্যবোধের অনুসন্ধান করেছেন। পক্ষান্তরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কালিদাসকে ‘সৌন্দর্য’ ও ‘সম্ভোগ’এর কবি হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এর সমর্থনে আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি সুবিখ্যাত প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তাঁর কথায়—

> কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভালো করিয়া খুলিবে এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মতো ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার।...তিনি স্বভাবশোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।[১২৩]

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী সমালোচকদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি কালিদাসকে শুধুই সৌন্দর্যের আর সম্ভোগের কবি বলে স্বীকার করেননি। সৌন্দর্যভোগের বিপুল সমারোহের মধ্যেও কালিদাস অপূর্ব কৌশলে ভোগবিরতির দীপ্ত মহিমাকেও নিয়ত জাগিয়ে রেখেছেন। রামায়ণ-মহাভারতে যেমন প্রবল কর্মের উন্মাদনা আর প্রাপ্তির আতিশয্যের মধ্যেও নির্বেদ এবং বৈরাগ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে আছে তেমনি কালিদাসের কাব্যে সৌন্দর্য ও ভোগস্পৃহা একটি সংযত, সামঞ্জস্যপূর্ণ কল্যাণবোধের সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম প্রাপ্তি নয়। তার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে

রয়ে গেছে। এ কাব্যের সমস্ত শৌর্য-বীর্য, রাগ-দ্বেষ, হিংসা-প্রতিহিংসা, প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে মহাপ্রস্থানের ভৈরব সংগীত শোনা যায়। রামায়ণেও তাই। পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়, যে সিদ্ধি করায়ত্ত তাও স্খলিত হয়ে পড়ে, সবকিছুরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগ ও দুঃখের মধ্যেই কর্মের মহত্ত্ব এবং পৌরুষের প্রভাব উজ্জ্বল হয়ে জেগে আছে। মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম ও বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যেতে পারে। তাঁর কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হয়ে যায় না, তাকে অতিক্রম করে তবে কবি ক্ষান্ত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কালিদাস কাব্য ও নাট্য রচনায় আধুনিক আদর্শ অনুসরণ করেননি বা করা সম্ভব ছিল না। এ কালের একজন নাট্যকার বিচ্ছেদদহনের মধ্যেই শকুন্তলা নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাতেন। দুষ্মন্ত যখন ধীবরের কাছ থেকে আংটি পেয়ে শকুন্তলার প্রকৃত পরিচয় পেলেন তখন শকুন্তলা আর তার কাছে নেই। ফলে পূর্বকথা স্মরণ করে রাজা যখন বিলাপ করছেন, তখন তার সেই অনুতপ্ত বিলাপের মধ্যেই একালের নাট্যকার নাটকের যবনিকা ফেলতেন। কারণ নাটকের প্রথমে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, ৫ম অঙ্কের এই নিদারুণ বিষফলই তার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু কালিদাস এখানে থামেননি, পরিণামে তিনি মিলন দেখিয়েছেন। মিলন হওয়ার সহজ কোনো পথ ছিল না। বাহ্য উপায়ে এবং দৈবানুগ্রহের সাহায্য নিয়ে এই মিলন তাঁকে ঘটিয়ে তুলতে হয়েছে। কুমারসম্ভবেও তাই। যেখানে মহাদেবের আনুকূল্য লাভে ব্যর্থ হয়ে উমা নিজের রূপের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন, সেখানেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা এ কালের কাব্যে প্রথাসিদ্ধ। এর পরে উমার সঙ্গে মহাদেবের পরিণয়, দাম্পত্যজীবন ও পুত্রোৎপত্তির বর্ণনা অনাবশ্যক এবং কাব্যের পক্ষে অনুপযোগী। কিন্তু তবুও কালিদাস প্রথাসিদ্ধির পথে না হেঁটে কুমারের জন্ম পর্যন্ত কাব্যকে এগিয়ে দিয়েছেন। কারণ বসন্তের পুষ্পশোভার সৌন্দর্য দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য নয়, সেই সৌন্দর্যের মঙ্গলময় পরিণাম যে 'ফল', তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। 'ফল' ফলানোই তো যেকোনো সৌন্দর্য বিকাশের চরম পরিণাম। 'চিত্রাঙ্গদা'য় বিষয়টিকে আরও সরাসরি প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ—'ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাল/তখন প্রকাশ পায় ফল।' চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কুমারসম্ভব কাব্যের একটি ভাবগত সাদৃশ্য এদিক থেকে অবশ্যই রয়েছে। অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের উন্মত্ত সৌন্দর্যকে কালিদাস অস্বীকার করেননি, সেই প্রেমকে তিনি মঙ্গল ও বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে একাসনে মিলিত করেছেন। কামপ্রবৃত্তির আতপ্ত আবেগে যে মিলন,

মদন যে মিলনের ঘটকালি করে, তা অচিরেই অভিশাপগ্রস্থ হয়ে পড়ে। লালসার তাপে পীড়িত আত্মসর্বস্ব প্রেমের মূল শাশ্বত সৌন্দর্যের রসপ্রবাহ থেকে বঞ্চিত হয়ে আপনিই শুকিয়ে যায়। এ রূপ মিলন আপাত সুখকর হলেও পরিণামে ভয়ঙ্কর অশান্তি ও বিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় এই প্রেম যথাক্রমে ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত ও ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল। পক্ষান্তরে যে মিলনকামনা নিজেকে কর্তব্যবিমুখ, দীন ও সঙ্কুচিত না করে প্রিয়মিলনকে সমাজহিত ও কল্যাণবোধের অনুকূল করে তোলে, সেই মিলনকামনাই সার্থক ও শুভফলপ্রদ। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলা' উভয়ক্ষেত্রেই মদনপীড়িত মিলনকে অভিশপ্ত করে কালিদাস বিরহ ক্লেশতাপিত নায়ক-নায়িকাকে দুঃখ তপস্যার ভিতর দিয়ে শুভ পরিণামে পৌঁছে দিয়েছেন। সেই মিলন বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে এক উদার সামঞ্জস্যে মিলিত হয়ে যায়—"সমস্ত বিশ্ব এই শুভ মিলনের আমন্ত্রণে প্রসন্নমুখে যোগদান করিয়া ইহাকে সুসম্পন্ন করিয়া দেয়—কোথাও কোন বিরোধের লেশমাত্র সম্ভাবনাও থাকে না।"[১২৪] কালিদাসের কাব্য-নাট্যে প্রেমের সঙ্গে মঙ্গল ও কল্যাণের এই সামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন এই প্রবন্ধে।

কালিদাসের এই দুটি রচনাতেই নর-নারীর মিলনের কথা অতি উজ্জ্বলভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কাম নর-নারীর জীবনে অনাহুতভাবে প্রবেশ করে তার অভ্যস্থ জীবনযাত্রা থেকে সরিয়ে প্রবৃত্তির মধ্যে নিমগ্ন করে। অন্ধ প্রবৃত্তির প্রাবল্যে তখন ভালো-মন্দ, সংযম-অসংযম সমস্ত বিবেচনাবোধ এক নিমেষে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং আদিম রিপুর তীব্র শায়ক তাদের উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রবৃত্তিতাড়িত প্রেমের অপ্রতিহত রূপকে কালিদাস পরিস্ফূট করেছেন কিন্তু তাকে চরম বলে মূল্য দেননি। প্রেমের ভোগলালসার উদ্দামতাকে তিনি প্রেমের মঙ্গলমাধুর্যময় রূপের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়েছেন। উমা বসন্তপুষ্পের আভরণে সজ্জিত হয়ে যখন ধ্যানরত মহাদেবের কাছে গিয়েছিলেন তখন তার বাহ্য রূপের কতই না বৈচিত্র্য ও আয়োজন। এই আয়োজনের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে কামনার উদবেজন। কামই এই মিলনের ঋত্বিক ও পুরোহিত। এই কামনালিপ্ত প্রেমের প্রবলতা কতখানি কালিদাস তা দেখিয়েছেন। যতিশ্রেষ্ঠ ও ধ্যানীশ্রেষ্ঠ মহাদেবও কামনার এই অনুচিত আক্রমণে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। স্থৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে গিয়ে উমার 'পক্ক বিম্বফলতুল্য অধরৌষ্ঠের' ওপর তাঁর ত্রিনয়নের দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সংযত করলেন এবং যে কারণে তাঁর মনে তপস্বিজনবিরোধী বিকারের অনুপ্রবেশ ঘটল, সে-কারণের প্রতি নির্মম ক্রোধে চেয়ে দেখলেন। সেই নির্মল পরিশুদ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মদনভষ্মের

এই তাৎপর্য। গৌরীও ভগ্নমনোরথ ও অবমানিতা হয়ে সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। বুঝলেন বাহ্য সৌন্দর্যের অসারতা। তখন তিনি রূপের কলা-কৌশল ত্যাগ করলেন এবং তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সুকঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা প্রাণেশকে জয় করতে চাইলেন। এবার উমার প্রেমতপস্যা সার্থক হল। মদনের সহায়তায় ইন্দ্রিয় বিকার ঘটিয়ে যে প্রেম অবমানিত হয়েছিল, তপস্যার পবিত্র দীপ্তিতে এবার সেই প্রেম যথার্থ কল্যাণমণ্ডিত হল। গৌরীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে শঙ্কর বলতে বাধ্য হলেন—'আজ থেকে আমি তোমার দাস হলাম, তুমি তপস্যার দ্বারা আমাকে কিনেছো।'(কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ) এই প্রেম তপশ্চর্যা আর পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বিশ্বলোকের মাঝে এই মিলনের আর কোনো প্রতিকূলতা রইল না। এই মিলনের ঘটক স্বয়ং দেবর্ষি অঙ্গিরা, মুনি-ঋষি, দেব-দেবীরা এই বরযাত্রায় শোভাযাত্রী। এই মিলন কল্যাণপ্রদ কিন্তু কামনাবর্জিত নয়। যে-প্রেম ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত মদন সেখানে ভৃত্যমাত্র। এই মিলনকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাবের মিলন' বলেছেন। উমা ভাবের চক্ষে মহেশ্বরকে দেখেছেন—'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃস্থিতম'—অর্থাৎ উমার মন মহেশের প্রতি ভাবরসে আকৃষ্ট হয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি বিলোচন কি ত্রিলোচন, তাঁর পরিধানে গজাজিন নাকি দুকূলবসন, গায়ে চিতাভস্ম নাকি হরিচন্দনের অনুলেপ, এ সবের খবর উমার কাছে অর্থহীন ("বিভূষণোদ্ভাসি পিণদ্ধভোগি বা গজাজিনাবলম্বি দুকূলধারী বা/কপালি বা স্যাদথবেন্দু শিখরং ন বিশ্বমূর্তেরবধার্যতে বপুঃ" (৫ম সর্গ, কুমারসম্ভব)। অর্থাৎ শান্তির মধ্যেই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা, বিরোধের মধ্যে নয়। তবুও যে মদনপীড়নের মধ্যে দিয়ে সেই সৌন্দর্য প্রবৃত্তির প্রাবল্যে একবার ঘুলিয়ে উঠেছিল তা কেবল এই পরিণত সৌন্দর্যের প্রশান্তিকে গাঢ়তর করে দেখানোর জন্য, উমার স্থিরশুভ্র মঙ্গলমূর্তিকে উদভ্রান্ত সৌন্দর্যের তুলনায় উজ্জ্বলতর করে তোলবার জন্য।

উমা-মহেশ্বরের মঙ্গলমিলন আরও একটি বিশ্বহিতের পূর্বভূমিকা। কুমারজন্মের মধ্যে দিয়েই সেই বিশ্বহিত সুসম্পন্ন হবে কারণ আসন্ন কুমারই অসুরনিধন করে অপহৃত স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। সেই মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিয়েই এই মঙ্গলমিলন। তাই তার মধ্যে এতখানি পবিত্রতা। বিবাহের দিনে গৌরীর যে বেশবাসের বর্ণনা দিয়েছেন কালিদাস, তার মধ্যে দিয়ে গৌরীর আসন্ন মাতৃত্বের মঙ্গলশোভা পরিস্ফূট হচ্ছে। কালিদাস বলেছেন, বিবাহের দিনে গৌরী যখন নির্মলগাত্রী হয়ে পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করলেন তখন বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার ন্যায় বিরাজ করতে লাগলেন। রবীন্দ্রচিন্তায় শরৎ

দাম্পত্যের ঋতু। গৌরী নিজের বিবাহসজ্জার মধ্যে সেই মোহহীন মঙ্গলদাম্পত্যকেই বরণ করে নিয়েছেন। সেই মঙ্গলদাম্পত্যের পূর্ণ ফল কুমারের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ মনুর উক্তি—'প্রজানার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ'—উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন জননীপদ আমাদের দেশের নারীর প্রধান পদ, সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পবিত্র মঙ্গলব্যাপার। সন্তানকে জন্ম দেন বলেই নারীরা মহাভাগা, পূজনীয়া ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপা। কুমারসম্ভব কাব্য গোটাটাই তাই রবীন্দ্রনাথের বিচারে কুমারজন্মরূপ মহৎ ব্যাপারের উপযুক্ত ভূমিকা। মদন গোপনে শরনিক্ষেপ করে ধৈর্যবাঁধ ভেঙে যে মিলন ঘটিয়ে থাকে তা পুত্রজন্মের যোগ্য নয় কারণ সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। সেজন্য কবি মদনকে ভস্মীভূত করে গৌরীকে দিয়ে তপশ্চরণ করিয়েছেন। তাই কালিদাস যখন প্রবৃত্তির চাঞ্চল্যের জায়গায় ধ্রুবনিষ্ঠার একাগ্রতা, সৌন্দর্যমোহের জায়গায় কল্যাণের কমনীয়দ্যুতি এবং বসন্তবিহ্বল বনভূমির জায়গায় আনন্দনিমগ্ন বিশ্বলোককে দাঁড় করিয়েছেন, তখনই প্রকৃত কুমারজন্মের সূচনা হয়েছে। কুমারজন্মকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতেই কালিদাস মদনরূপ প্রবৃত্তির উদ্দামতা ও রূপের কলা-কৌশল ও ইন্দ্রিয়জ বিকারকে ভস্মসাৎ করেছেন।

কুমারসম্ভবের এই চিত্রের পাশে তিনি শকুন্তলাকে স্থাপন করে এই উভয় রচনার ভাবগত সাদৃশ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। শকুন্তলাতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গোপন মিলনের কামনারুণ আবেগকে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করেও কালিদাস তাকেই চরম মূল্য দেননি। শকুন্তলার জননীত্বেই তাঁর পরম সার্থকতাকে চিহ্নিত করেছেন। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'এ তপোবনস্থিত শকুন্তলার দুই মূর্তি। প্রথমটি ঋষি কণ্বের আশ্রমে মাদকতাময়ী প্রকৃতির পটভূমিকায় যৌবনচঞ্চল দুই নরনারীর গোপন মিলন। সে মিলনে কামই পুরোহিত, কামই সম্প্রদাতা। সেই কামোন্মত্ত প্রেম প্রিয়জন ছাড়া আর সবকিছুই বিস্মৃত হয়। আতিথ্যধর্ম, লোকধর্ম এসব তার কাছে কোনো গুরুত্বই পায় না। সমস্ত বিশ্বনীতিকেই সে আপনার প্রতিকূল করে তোলে আর তাই সেই প্রেমের ওপর অনিবার্যভাবেই নেমে আসে ঋষির অভিশাপ। এর পাশাপাশি কালিদাস নাটকের অন্তিমে দেখিয়েছেন আরেকটি তপোবনের ছবি। ঋষি মরীচির তপোবন। সেখানে ভরত-জননী শকুন্তলার সঙ্গে অনুতাপদগ্ধ দুষ্মন্তের সার্থক ও সম্পূর্ণ মিলন ঘটেছে। কারণ এই মিলনের মাঝখানে রয়েছে এক চপল সুন্দর বালক। আদিরসে যার সূচনা, বাৎসল্যে তার পরিসমাপ্তি। কামনা-রাগে রক্তিম প্রেয়সীকে চিনতে দুষ্মন্ত ভুল করেছিলেন বটে কিন্তু নিজ পুত্রের জননীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। আপন পুত্রের জননীকে দেখে

দুষ্মন্ত তাঁর কাছে নতজানু হয়ে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন, শকুন্তলাও বিগলিত হৃদয়ে তাকে ক্ষমা করলেন, তার লজ্জা, অপমান সবই দূর হয়ে গেল। প্রেম যখন প্রবল আবেগরূপে আবির্ভূত হয়ে ঔচিত্যানৌচিত্য ও ধর্মাধর্মবোধ বিলুপ্ত করে দেয়, কালিদাস সেই প্রেমের বিপুল শক্তির চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু তার জয়ধ্বনি করতে পারেননি। কালিদাস আরও দেখিয়েছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ নরনারীকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মীভূত হয়ে যায়। আবার সেই প্রেমই যখন তার সমস্ত উদ্দামতা বিসর্জন দিয়ে শুচিস্নিগ্ধ হয়ে বিশ্বনীতির অনুকূলে আত্মপ্রকাশ করে, নারীকে জননীত্বের পূর্ণতায় ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করে, তখনই তা সার্থক ও কল্যাণপ্রদ হয়। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকৃত এই দুটি গ্রন্থের Thematic তুলনা করে দেখিয়েছেন উভয়গ্রন্থেই প্রেয়সীর জননীরূপকেই কালিদাস বৃহত্তর কল্যাণবোধের আনুকূল্যে জয়মাল্য দিয়েছেন। দেখিয়েছেন, প্রেমের উদ্দামতায় যার সূচনা, স্নেহ-বাৎসল্যের কল্যাণে তার পরিসমাপ্তি। গ্যয়ঠে শকুন্তলা সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, ‘কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল একত্রে দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে’ ; কথাটি কুমারসম্ভবের ক্ষেত্রেও খাটে।

‘শকুন্তলা’ ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে পুরোপুরি নতুন কিছু এমনটা বলা সমীচীন হবে না কারণ রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ লেখবার নূন্যাধিক ২০ বছর আগে চন্দ্রনাথ বসু শকুন্তলা সমালোচনায় এই কথাগুলি একইভাবে ব্যক্ত করেছেন। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থ’ নামক প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্তব্য ও উৎকর্ষ বুঝিয়াও দুষ্মন্ত-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন। অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। উহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, উহা যদি সামাজিক কর্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে উহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।... পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই কথার অর্থ এই যে, প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটি প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন।[১২৫]

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে কালিদাসের এই দুটি রচনা বিচারে রবীন্দ্রনাথ সমাজনীতিকেই বড়ো করে দেখেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত Prudery র সীমায় পৌঁছে গেছে, এ কথাও সত্য। কারণ আর্টের সৌন্দর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন ধারণার সঙ্গে মিশে আছে শুভত্ববোধ ও কল্যাণবোধ। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণের যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত(পৌষ ১৩১৩) 'সৌন্দর্যবোধ' নামক প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলছেন, প্রবৃত্তির উদ্দামতা মানুষকে নিখিলের প্রবাহ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে আপন আবর্তের চারদিকে ঘুরিয়ে মারে। এই উন্মত্ততার মধ্যেও একদল লোক সৌন্দর্য দেখে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'স্বভাবের বিকৃতি'। এমনকি এ প্রসঙ্গে তিনি এও বলেছেন, "আমার মনে হয় য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব, যাহার কোনো পরিণাম নেই, যাহার কোথাও শান্তি নাই, তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে।"[১২৬] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলে মেনে নিতে রাজি নন। তাঁর মতে, "সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই ; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।"[১২৭] এইখানে সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযমের একটি গভীরতর যোগের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন কিন্তু সেইসঙ্গে এও জানিয়েছেন—

> এ কথা ধর্মনীতিপ্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না ; আনন্দের দিক হইতে যাহাকে ইংরেজিতে আর্ট বলে, তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখো, যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না জানি তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি, যাহা চিত্তের জিনিস তাহাকে দুই হাতে দলন করিয়া মনে করি যেন তাহাকে পাইলাম।[১২৮]

কালিদাস শকুন্তলা এবং কুমারসম্ভব দুটি রচনাতেই দেখিয়েছেন নরনারীর প্রবৃত্তিচঞ্চল প্রেম কোথাও ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, কোথাও ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত হয়ে ব্যর্থ হয় আবার সেই প্রেমই যখন প্রবৃত্তির উদ্দামতাকে সংবরণ করে শান্ত সংযত রূপে বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে একীভূত হয় তখনই তা সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'আর্টের সৌন্দর্য' বলে স্বীকার করেন,

কালিদাসের সাহিত্যে তিনি তারই প্রতিফলন দেখেছেন। ফলে আর্ট বা শিল্পের সৌন্দর্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব তাত্ত্বিক ধারণা অনেকক্ষেত্রেই কালিদাসের সাহিত্যপাঠজনিত প্রতিক্রিয়া থেকে নিষ্ণাত—এমন সিদ্ধান্ত করাই যায়।

আমরা আগেই বলেছি, এই প্রবন্ধ যে সময়ে লিখিত হয় (অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) তখন রবীন্দ্রনাথের মন প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শ ও তপোবনকেন্দ্রিক চিন্তা ও চেতনার ভাবরসে নিমগ্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথ তপোবনকেন্দ্রিক যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও মূল্যবোধগুলিকে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে সেই সময়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন, তারই সৌন্দর্যদীপ্ত শিল্পমূর্তি প্রতিভাত হতে দেখেছিলেন কালিদাসের কাব্যে। লিখেছেন,--"ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্‌ভাসমান..."[১২৯] তাই দেখি যখন তিনি তপোবনের আদর্শকে ব্যাখ্যা করছেন, তখন দৃষ্টান্ত রূপে তুলে আনছেন কালিদাসের কাব্য। যেমন 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'তপোবন' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ দেখাচ্ছেন—

> কবি এই কাব্যে (কুমারসম্ভবে) বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব ; সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হইতে উদ্ধার পায়। অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।[১৩০]

এইভাবে প্রসঙ্গ শুরু করে তিনি আরও বলছেন, প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। কোন-একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ। এ জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্য নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্য। এই ত্যাগের অর্থ আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য এবং সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছেঃ ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়। বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবের দৃষ্টান্তসহযোগে এই ভাবে বুঝিয়েছেন,-- প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে

চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাই তাঁকে লাভ করলেন। কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের। কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না। কালিদাসের কাব্যের এই জীবনাদর্শকে তপোবনের জীবনাদর্শের সঙ্গে সমসূত্রে মিলিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।"[১৩১] এই বক্তব্যটিকেই রবীন্দ্রনাথ আরও সংহত রূপে স্পষ্টীকৃত করেছেন তাঁর 'The Religion of the Forest' নামক প্রবন্ধটিতে। অংশটি উদ্ধারযোগ্য—

> In the commencement of the poem (কুমারসম্ভব) we find that God Shiva, the Good, had remained for longlost in the self-centered solitude of ascetism, detached from the world of reality. And then paradise was lost. But kumarsambhava is the poem of paradise regained. When Sati, the spirit of reality, through humiliation suffering and penance, won the heart of Shiva, the spirit of Goodness. And thus, from the union of freedom of the real with the restraint of the Good, was born the heroism that released paradise from the demon of lawlessness.[১৩২]

কুমারসম্ভব কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূলগত অভিমত কী, তা তাঁর উপরোক্ত উক্তি থেকেই পরিষ্কার ধরা পড়ে। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটি প্রবন্ধ, যা প্রাচীন সাহিত্য বইতে স্থান পেয়েছে, সেটি হল 'শকুন্তলা'। এই প্রবন্ধটি মূলত শেকসপিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকের সঙ্গে শকুন্তলার প্রতিতুলনা। এই প্রবন্ধটি প্রথম পঠিত হয় 'আলোচনা সমিতি'র অধিবেশনে। পরে ১৩০৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'এ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। খুব সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধটি প্রণয়নের একটি অনুচ্চারিত উদ্দেশ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি প্রণয়নের বেশ কয়েক বছর আগে টেম্পেস্ট নাটকের মিরান্দা চরিত্রটির সঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্য দেখিয়ে স্ব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের পাতায় বৈশাখ ১২৮২ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' নামে একটি প্রবন্ধ

লেখেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি নাম না করে বঙ্কিমের সিদ্ধান্তের বিপরীত অভিমত স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। মতের বৈপরীত্য দুটি ক্ষেত্রে। বঙ্কিম মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন এবং উভয় কবির মধ্যে তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন,-- "শকুন্তলার কবি টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন।"[১৩৩] রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছেন মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলার বাহ্য কয়েকটি মিল অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ অমিল বা বৈসাদৃশ্যই বেশি এবং শিল্পগত বিচারে শেকসপিয়র অপেক্ষা কালিদাসের নাটক মহত্তর। বিশেষত বঙ্কিম যে কয়টি বাহ্য সাদৃশ্যের কারণে মিরন্দার সঙ্গে শকুন্তলাকে তুলনীয় বলে মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাও অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে—

> আমাদের সমালোচকেরা অনেক সময় নাটক-নভেল হইতে তাহার নায়ক ও নায়িকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাহাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিয়া থাকেন। আসামীকে কাঠ-গড়ার মধ্যে দাঁড় করাইয়া যে বিচার , সে-বিচার কাব্যের নহে। তাহা রাজার বিচার, শাস্ত্রের বিচার, জ্ঞানের বিচার বা ধর্মনীতির বিচার হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের বিচার নহে। কাব্যের নায়িকা কে বেশি লজ্জা করিয়াছে বা কম করিয়াছে, কে আত্মত্যাগ বেশি দেখাইয়াছে বা কম দেখাইয়াছে...এ সমস্ত আলোচনা অধিকাংশ স্থলেই অনর্থক।...মিরন্দার সরলতার অগ্নিপরীক্ষা হয় নাই, সংসার-জ্ঞানের সহিত তাহার আঘাত ঘটে নাই; আমরা তাহাকে কেবল প্রথম অবস্থার মধ্যে দেখিয়াছি, শকুন্তলাকে কবি প্রথম হইতে শেষ অবস্থা পর্যন্ত দেখাইয়াছেন। এমন স্থলে তুলনায় সমালোচনা বৃথা। আমরাও তাহা স্বীকার করি। এই দুই কাব্যকে পাশাপাশি রাখিলে উভয়ের মধ্যে ঐক্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই বেশি ফুটিয়া উঠে। এই বৈসাদৃশ্যের আলোচনাতেও দুই নাটককে পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার সহায়তা করিতে পারে। আমরা সেই আশায় এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।[১৩৪]

বঙ্কিমের বিপরীত পথে হেঁটে রবীন্দ্রনাথ এখানে মিরন্দা ও শকুন্তলা উভয় চরিত্রের পরিবেশগত, ভাবগত ও আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। এই পার্থক্যের কারণ দেশভেদে সাহিত্যিকের ভাব-চিন্তা, রুচি-আদর্শ, জীবনানুধ্যান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শকুন্তলাও সুন্দরী, মিরন্দাও সুন্দরী তবুও তাদের সৌন্দর্য একরূপ নয়। যে পরিবেশে উভয়ে বর্ধিত হয়েছে, তাদের মধ্যেকার পার্থক্যও সুবিপুল। মিরন্দার জীবনে তার পিতার সাহচর্যই ছিল

প্রধান অথচ শকুন্তলা তপোবনের স্নেহচ্ছায়ায় সমবয়সী সখীদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস ও নানা ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে মিরন্দার সরলতা বহির্ঘটনার অধীন কিন্তু শকুন্তলার সরলতা তার স্বভাবগত। যে নির্জন দ্বীপে মিরন্দার অবস্থান সেখানকার সঙ্গে তার জীবনের কোনো ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রই স্থাপিত হয়নি। কিন্তু শকুন্তলার জীবনে তপোবনের প্রাধান্য অনেকখানি এবং নায়িকা শকুন্তলা এই নাটকে তপোবনের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছে যে তপোবন থেকে উচ্ছিন্‌ন করলে তার স্বাভাবিকতা ও সাচ্ছন্দ্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তপোবন ও পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েই শকুন্তলা এক বৃহত্তর জীবনবোধ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কালিদাস তার নাটকে বহিঃপ্রকৃতির যে বর্ণনা করেছেন, তাকে কেবল নিসর্গ হিসেবে বাইরে ফেলে রাখেননি, শকুন্তলার চরিত্রের মাধ্যমে তাকে উন্মেষিত করে তুলেছেন। দেখিয়েছেন, “লতার সঙ্গে ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।”[১৩৫]

তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সম্পৃক্ততা ও বিচ্ছিন্নতাকে আজকের দিনে ‘ইকোফেমিনিজম’এর আলোয় পাঠ করা যেতে পারে। ফরাসি নারীবাদী লেখক ফ্রাসোয়াঁ দ্যুবন (Francoise d’Eaubonne) ১৯৭৪ সালে প্রথম ‘ইকোফেমিনিসম’ শব্দটি তাঁর Le Feminisme ou la Mort (নারীবাদ নাকি মৃত্যু) গ্রন্থে ব্যবহার করেন।[১৩৬] ইকোফেমিনিসম বস্তুত নারী ও প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বিষয়ক মতবাদ। সৃষ্টির একেবারে প্রথম থেকেই নারীরা প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। অথচ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর সঙ্গে প্রকৃতির এই আকাঙ্ক্ষিত সম্বন্ধটি বিপর্যস্ত। প্রকৃতিকেন্দ্রিকতার স্থান নিয়েছে পণ্যকেন্দ্রিক ফেটিশ সংস্কৃতি। এরই আগ্রাসনে নারী, শিশু ও দরিদ্র জনসাধারণ প্রকৃতির মুক্ত বায়ু, স্থল ও জলসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছে।[১৩৭] যে তত্ত্ব এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে তার নাম ‘ইকোক্রিটিসিজম’ এবং একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একেই বলা যেতে পারে ‘ইকোফেমিনিজম’। পাশ্চাত্যের ইকোক্রিটিকেরা ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে ‘শকুন্তলা’কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কন্বের তপোবনে মানুষ, বৃক্ষলতাসমূহ ও মানবেতর প্রাণীরা নির্বিবাদে বাস করত। রাজা দুষ্মন্ত যেন এক প্রধর্ষী নায়ক, যিনি অরণ্য-সভ্যতার কেউ নন, অথচ রাজসুলভ দাম্ভিকতা নিয়ে অরণ্যের ওপর স্বেচ্ছাচারিতার আনন্দে এক হরিণশিশুকে তীর নিক্ষেপ করে বধ করতে উদ্যত হন। তখন আশ্রমবালকেরা তাকে প্রতিহত করে। দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে উপভোগ এবং পরিত্যাগ নাগরিক মানুষ কর্তৃক আরণ্যক সভ্যতাকে লুণ্ঠন ও অবহেলাকেই দ্যোতিত করে। কন্ব

শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময়ে তপোবন তরুদের সম্বোধন করে বলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলদান না করে কখনও জলপান করতেন না। অলংকারপ্রিয় হলেও যিনি তোমাদের পল্লবভঙ্গ করতেন না, তোমাদের ফুল ফোটানোর সময় উপস্থিত হলে যার আনন্দের সীমা থাকত না, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছেন, তোমরা সকলে তার যাত্রা অনুমোদন করো। এই উক্তি থেকে শকুন্তলার সঙ্গে অরণ্য ও বৃক্ষলতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার এই সহজাত আরণ্যক পরিবেশ ত্যাগ করে দুষ্মন্তের রাজসভায় আসায় শকুন্তলা যেন স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। অস্থির হয়ে ওঠেন। প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন, তপোবনবিচ্ছিন্ন শকুন্তলার যন্ত্রণা আজকের পরিবেশ সংকটে অত্যাচারিত সকল মানুষের বিপন্নতার সঙ্গে এক হয়ে যায়। শকুন্তলা নাটকটিকে ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।[১৩৮]

শকুন্তলায় প্রকৃতি আত্মভাব রক্ষা করেও চরিত্রের সঙ্গে মধুর মিলনে একীভূত হয়ে গেছে কিন্তু টেম্পেস্টে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যের অনুরূপ। টেম্পেস্টে আছে দমননীতির দ্বারা প্রকৃতিজয় করে তার ওপর আধিপত্য বিস্তারের তাগিদ আর শকুন্তলায় আছে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ওতপ্রোত সম্বন্ধ। ভারতীয় কবি কালিদাসের প্রকৃতি-তন্ময়তার অনন্যতাকে বোঝানোর জন্য অন্য একটি প্রবন্ধে শেকসপিয়রের সঙ্গে কালিদাসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—

> শেক্সপীয়রের As you like it একটি বনবাস-কাহিনী—Tempest-ও তাই, Midsummer Night's Dream ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত; অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাইনে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্য-সাধন ঘটেনি। হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে, হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।[১৩৯]

তাই বিষয়ঘটিত তাৎপর্যের বিচারে 'টেম্পেস্ট' নাটকটিকে তিনি যথার্থ অর্থেই সার্থকনামা মনে করেছেন, কারণ এর আগাগোড়াই বিক্ষোভ ও প্রকৃতিগত বিরোধ-বিসংবাদের ঘটনা। এর প্রকৃত কারণ ইউরোপীয় কবির সঙ্গে ভারতীয় কবির মনের গঠনগত পার্থক্য। ইউরোপীয়

কবির স্ব-ভাব বাস্তব সত্যের দোহাই দিয়ে হৃদয়বৃত্তির আলোড়নকে একান্ত ও প্রবল করে তোলা। শেকসপিয়রও এর ব্যতিক্রম নন। তাই তার সাহিত্যের মধ্যেও দেখা যায় প্রচুর অশান্তি ও বিক্ষোভের ভাব। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন সংযম ও মঙ্গলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নরনারীর বাঁধনছিন্ন যৌবনাবেগকে কালিদাস অস্বীকার করেননি, তার প্রচণ্ড শক্তি, তার দুর্দমনীয় অনিবার্যতাকে তিনি দেখিয়েছেন কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই দুর্বাধ্য প্রবৃত্তিকে দুঃখ, ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ করে তার রূপান্তর ঘটিয়েছেন। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে বিষয়টি দেখিয়েছেন। দুর্বাশার অভিশাপ ও দুষ্মন্তের আত্মপীড়া এই দুঃখ ও ত্যাগব্রতেরই বহিঃপ্রকাশ। তাই শকুন্তলার নায়ক-নায়িকা শেষাবধি 'স্বভাবনিঃসৃত অশ্রুজলের দ্বারা কলঙ্কস্খালন করে, আন্তরিক ঘৃণার দ্বারা পাপকে দগ্ধ করে এবং সহজ আনন্দের দ্বারা পুণ্যকে অভ্যর্থনা করে। আত্মপরিশুদ্ধির মধ্যে দিয়ে চরিত্রের এই সমুন্নতি কালিদাসের কাব্য-ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিক আবিষ্কার, মানবচরিত্রের পূর্ণতার অনুরূপ ছবি রবীন্দ্রনাথ টেম্পেস্টে দেখতে পাননি।

মানবচরিত্রের প্রগলভ হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কালিদাসের লেখনী যে এক শান্ত, সংযত শ্রীর মধ্যে বেঁধে রেখেছেন, প্রবৃত্তির প্রবলতাকে কখনোই লাগামহীন উত্তেজনায় স্বেচ্ছাচারী হতে দেননি, এটিই রবীন্দ্রনাথের কাছে খুবই প্রশংসার্হ্য মনে হয়েছে। শকুন্তলায় কালিদাস তপোবনের পরস্পরভিন্ন দুটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। একটি কণ্বাশ্রমের তপোবন ও অপরটি মারীচের তপোবন। কণ্বের তপোবনে বৈরাগ্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। সেখানে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠেছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুটিকে তাঁরা নীবার মুষ্টি দিয়ে পালন করেছেন, কুশের ঘায়ে মৃগশিশুর মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে তার শুশ্রূষা করেছেন। এই তপোবন শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা দান করে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। এই স্বভাবিক পরিবেষ্টন থেকে বিদায়গ্রহণ করে, সমস্ত তপোবনের আশিস বহন করে শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা করেছে কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে পৌঁছে সেই সুখস্বপ্ন সহসা ভেঙে যায়, দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যান যখন বজ্রের মতো শকুন্তলার মাথার ওপর ভেঙে পড়ে তখন সরলা, পবিহৃদয়া তপোবনপালিতা শকুন্তলা শরাহত মৃগের মতো বিস্ময়ে, ত্রাসে, বেদনায় বিহ্বল হয়ে ব্যাকুল চোখে চারিদিকে আশ্রয় খুঁজতে চাইল। তার সেই নিঃসঙ্গ দুঃখের প্রতিচ্ছবি আঁকবেন বলেই কালিদাস প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলাকে কণ্বাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যাননি।

এইখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের অসামান্য কবিত্বের পরিচয় পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ—

> পূর্বপরিচিত বনভূমির সহিত তাহার(শকুন্তলার) পূর্বের মিলন আর সম্ভবপর নহে। কণ্বাশ্রম হইতে যথাকালে তপোবনের সহিত শকুন্তলার কেবল বাহ্যবিচ্ছেদমাত্র ঘটিয়াছিল, দুষ্মন্ত-ভবন হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল; সে শকুন্তলা আর রহিল না। এখন বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ পরিবর্তন হইয়া গেছে, এখন তাহাকে তাহার পুরাতন সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করিলে অসামঞ্জস্য উৎকট নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশিত হইত। এখন এই দুঃখিনীর জন্য তাহার মহৎ দুঃখের উপযোগী বিরলতা আবশ্যক। সখীবিহীন নূতন তপোবনে কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারিদিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করে দিয়েছেন।[১৪০]

অর্থাৎ যেখানে বিলাপ-পরিতাপ ও অশ্রুমোচনের রাশি রাশি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল সেখানে নিদারুণ সংযম রক্ষা করে বাক্যকে লাগাম পরিয়ে অনতিব্যক্তের অভিঘাতকেই তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। সেই নিস্তব্ধতা ও নীরবতার মধ্যে দিয়েই শকুন্তলার দুঃখ ও তপস্যা একইসঙ্গে শিল্পশ্রী লাভ করেছে। কাব্যের বাইরের শান্তি ও সংযমকে কোথাও অতিমাত্র আলোড়িত না করে সামান্য আভাস-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে তার আভ্যন্তরীণ শক্তিকে সর্বদা সবল ও সক্রিয় করে তোলার যে অসাধারণ ক্ষমতা কালিদাসের ছিল রবীন্দ্রনাথ তার সূক্ষ্ম রসবোধের সাহায্যে তা সঠিকভাবে নির্দেশ করেছেন। কালিদাসের রচনাশৈলীর এই লক্ষণগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কবিসত্তায় সনাতন ভারতীয়ত্বের মহিমাকেই উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠতে দেখেছেন। কালিদাসের নাটক যেন ভারতাত্মার স্বাভাবিক হৃদস্পন্দনটিকে অনাবিলভাবে প্রকাশ করছে। ভারতাত্মার সেই বৈশিষ্ট্যটি হল জীবনের প্রশান্ত, গম্ভীর পরিণতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। সেই পরিণতি ঘটে সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সামঞ্জস্যময় সম্মিলনে। কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে এই সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। ইন্দ্রিয়জ আবেগ তপস্যার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়েই যথার্থ মঙ্গলের জন্ম দিতে পারে আর নরনারীর মঙ্গলমিলনেই জগৎকল্যাণকারী কুমারের আবির্ভাব সম্ভাবনা। শকুন্তলা নাটকেও ভাবগত বিষয় সেই একই। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ইন্দ্রিয়জ প্রেম দুঃখ ও অনুতাপের অনলে দগ্ধ হয়ে যখন 'নিকষিত হেম' হয়ে উঠেছে, তখনই তা যথার্থ অর্থেই

মঙ্গলমিলন হয়ে উঠেছে। কণ্বের তপোবনে শকুন্তলার প্রেমের আত্মসর্বস্ব তন্ময়তা যখন অতিথি সৎকারের স্বাভাবিক কল্যাণধর্মকে বিস্মৃত হল, তখনই মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের, ভোগের সঙ্গে ত্যাগের সামঞ্জস্য ভেঙে গেল। তখনই সেখানে উদ্যত হয়ে উঠল ঋষির অভিশাপ ও ভর্তার প্রত্যাখ্যানজাত দুঃখ ও গ্লানি। অপরদিকে শকুন্তলাকে অস্বীকার করে দুষ্মন্তও অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন। এই অনুতাপই তার তপস্যা। রাজসভায় প্রবেশ করামাত্র দুষ্মন্ত যদি তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে গ্রহণ করতেন তবে বহুবল্লভ রাজার অন্তঃপুরে শকুন্তলা হংসপদিকার দল বৃদ্ধি করে তার অবরোধের এক প্রান্তে স্থান পেত। নারীবিলাসী রাজার এমন কত কত প্রেয়সী ক্ষণকালীন সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকুমাত্র নিয়ে অনাদরের অন্ধকারে অনাবশ্যক জীবন যাপন করছে। কিন্তু শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্তের নির্মম পরিহার এবং রাজসভায় দাঁড়িয়ে শকুন্তলার উক্তিসমূহ দুষ্মন্তকে আর শকুন্তলার প্রতি উদাসীন থাকতে দিল না। অনুতাপের সাধনার মধ্যে দিয়ে রাজা এই প্রথম যথার্থ প্রেমের অধিকারী হলেন। তার নাগরবৃত্তি একেবারে রহিত হয়ে গেল। এই ভাবে কালিদাস নাটকের পাত্র-পাত্রীর সমস্ত অমঙ্গলকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে মঙ্গলমিলনের দ্বারা তার নাটকখানি সমাপ্ত করেছেন এবং পাঠকের মনে এক সংশয়হীন পরিপূর্ণ পরিণতি মুদ্রিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> বাহির হইতে অকস্মাৎ বীজ পড়িয়া যে বিষবৃক্ষ জন্মে, ভিতর হইতে গভীরভাবে তাহাকে নির্মূল না করিলে তাহার উচ্ছেদ হয় না। কালিদাস দুষ্মন্ত-শকুন্তলার বাহিরের মিলনকে দুঃখে কাটা পথ দিয়া লইয়া গিয়া অভ্যন্তরের মিলনে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এইজন্যই কবি গেটে বলিয়াছেন, তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য এবং স্বর্গ, যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাওয়া যাইবে।[১৪১]

গেটের উক্ত মন্তব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার মর্মার্থ ব্যাখ্যার এক অমোঘ ও ধ্রুব সত্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে গেটের উক্তিটি "দীপবর্তিকার শিখার ন্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা দীপশিখার মতোই সমগ্র শকুন্তলাকে এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায়।"[১৪২] রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে শকুন্তলা সম্বন্ধে গেটের এই অভিমত কেবল আনন্দের অত্যুক্তি নয়, রসজ্ঞের বিচার। গেটে কখন, কোন্ প্রেক্ষিতে শকুন্তলার সমালোচনা লেখেন, সেই তথ্যটুকু এখানে উল্লেখ করতেই হয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে উইলিয়াম জোনস্ প্রথম শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদ করেন। জোন্সের এই অনুবাদের সাহায্য নিয়ে ফস্টর জার্মান ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ

প্রকাশ করেন। ফক্টর অনূদিত শকুন্তলা পাঠে মুগ্ধ হয়েই গেটে চার লাইনের একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেন মাতৃভাষা জার্মানে। পরে গেটের কবিতাটির দুটি ইংরেজি পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। একটির অনুবাদকারী E.A Bowring, অপরটির অনুবাদক E.B. Eastwick। Eastwick কৃত অনুবাদটি Sir Monier Williams কৃত শকুন্তলা অনুবাদের ভূমিকায় মুদ্রিত হয়েছে।[১৪৩] সেটি নিম্নরূপ—

Would’st thou the young year’s blossoms

And the fruits of its decline,

And all by which the soul is charmed,

enraptured, feasted and fed,

Would’st thou earth and heaven

Itself in one soul name combine?

I name thee, O sakuntala!

And all at once is said.[১৪৪]

গেটের এই উক্তিটি শকুন্তলা সমালোচনায় কেন সবচেয়ে প্রকৃষ্ট হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সূক্ষ্ম রসানুভূতির সাহায্যে তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মূল কথা হচ্ছে, শকুন্তলার মধ্যে একটা গভীর পরিণতির ভাব আছে, এই পরিণতি ফুল থেকে ফলে পরিণতি, মর্ত থেকে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব থেকে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করে উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্যে উপনীত হতে হয়, তেমনই শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম অঙ্কে মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক। ফুলের ফলে পরিণতি এবং মর্ত্যের স্বর্গে উত্তরণের তাৎপর্য হল নরনারীর ‘প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ’ থেকে ‘মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে’ উত্তীর্ণ করে দেওয়া।

এইকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশেষ প্রবণতা হল সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের যোগকে দেখানো। 'সৌন্দর্যবোধ' নামের প্রবন্ধে তাই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগলভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে, সে ভোগ-বিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবন-যাত্রার উপকরণ সাধাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়।[১৪৫]

সাহিত্যসৃষ্টিকে রবীন্দ্রনাথ চিদ্‌বৃত্তির আনন্দময় পরিণাম বলে মনে করতেন বলেই সৌন্দর্য ও মঙ্গলের নিবিড় মিলনকেই তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মনে করেছিলেন। অন্তত কালিদাস সমালোচনাপর্বে এই ছিল তার মানসিক অবস্থান। এখানে অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে 'কবির দীক্ষা'য় রবীন্দ্রনাথের উক্তি। "কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।"[১৪৬] কালিদাস শৈব ছিলেন বলেই তাঁর রচনায় সৌন্দর্যসাধনার সঙ্গে মঙ্গলপ্রীতির যোগ ছিল এত অঙ্গাঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পর্বের সাহিত্য-ভাবনায় কালিদাসীয় উত্তরাধিকারকেই নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। পূর্বোক্ত 'কবির দীক্ষা'য় আরও দুটি পংক্তি আছে এরকম, "মানুষের যিনি শিব/তিনি বিষপান করেন বিষকে কাটাবেন বলে"[১৪৭]। কালিদাসের 'শকুন্তলা'কে শৈব আদর্শের এই প্রত্যয়ে রেখে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষের দুর্বাধ্য প্রবৃত্তি অন্তরে পাপরূপী যে বিষের জন্ম দেয় কালিদাস সুতীব্র অনুতাপ, ক্রন্দন ও দুঃখ-ব্রতের দ্বারা নরনারীর সেই পাপ এবং বিমূঢ়তাকে ভিতর থেকে দগ্ধ করেছেন। মহেশ্বরের মতোই তিনি তার নাটকের নায়ক-নায়িকাকে প্রবৃত্তির বিষে প্রদাহিত করে তার সংশোধন ও রূপান্তর ঘটিয়েছেন। বিষ শেষাবধি অমৃতে রূপান্তরিত হয়েছে। মর্ত্যের মানব-চরিত্ররা নিজেদের দুর্বলতা জয় করে অমরাবতীর সিংহদ্বারে উপনীত হয়েছেন। মানুষের মধ্যেই তিনি পাপ ও পাপমুক্তি, স্বর্গচ্যুতি ও স্বর্গপ্রাপ্তি উভয়কেই দেখিয়েছেন। শকুন্তলা একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

> শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতা মৃগের সহিত মিশিয়া আছে।

সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং সৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর, উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।[১৪৮]

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ অতি যথার্থ ও মনোগ্রাহী।

শকুন্তলার দৃষ্টান্তে ভারতীয় কবির সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাধারণ প্রবণতার তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে এরপর রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্যটি করেন, সেটি যেমন চরম, তেমনই বিতর্কিত। প্রবন্ধে এই মন্তব্যটি সবচেয়ে গুরুতর; তাই এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিযোগ্য—

প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশের অবসরমাত্র পাইলেই য়ুরোপীয় কবিগণ যেন উদ্দাম হইয়া উঠেন। প্রবৃত্তি যে কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে তাহা অতিশয়োক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে তাঁহারা ভালোবাসেন। শেক্সপীয়রের রোমিয়ো-জুলিয়েট প্রভৃতি নাটকে তাহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত-গভীর, এমন সংযত-সম্পূর্ণ নাটক শেক্সপীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।[১৪৯]

সাহিত্যরসিক সমঝদার পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য নিঃশেষে মানতে পারবেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ মোটের ওপর সাহিত্য-সমালোচনার যে নীতিতে আস্থা রেখেছিলেন, তা সবসময়ই আস্বাদনধর্মী; সাহিত্যের তুল্যমূল্য বিচার করে এককে অন্যের থেকে উজ্জ্বলপ্রভ বা হীনপ্রভ দেখানো কখনোই তার রুচিসম্মত ছিল না তথাপি এই প্রবন্ধে তিনি কিছুটা চূড়ান্তবাদী অবস্থান নিয়ে শেকসপিয়র অপেক্ষা কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি মানসবৈশিষ্ট্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন, সেটি হল প্রাচীন ভারতীয় শান্তরস। আমরা আগে দেখিয়েছি, এই প্রবন্ধটি যে সময়ে রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রজীবনে সেটি তপোবনভিত্তিক জীবনাদর্শে অকুণ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনের কাল তাই শেকসপিয়রের নাটকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জটিলতা এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনোগ্রাহী হয়নি। এ কথা বলাই বাহুল্য যে টেম্পেস্ট বা শেকসপিয়রের অন্য যে-কোনো নাটকের সুরই কিছু সংঘাতময় ও উত্তেজনাকর হলেও সাহিত্য ও শিল্পের মূল্যে সেগুলি মহত্তম ও সারা বিশ্বে আদরণীয়। এমনকি শেকসপিয়রের প্রকাশ-রীতি ‘নাটক’ বলেই

তা দ্বন্দ্বময় জীবনের জটিলতাকে, মানব-মনের দ্বিধা-ভয়-সংশয়-বিশ্বাস-অবিশ্বাসসহ নানা ধরণের মনোবৃত্তির একটি বিশ্বস্ত চিত্রশালা হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের কাছে দর্শকের আকাঙ্ক্ষাও তাই। যদিও পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের দর্শকানুকূল উত্তেজনা সৃষ্টির পাশাপাশি শেকসপিয়রের নাটকগুলিতে এমন কিছু চিরন্তন উপাদান নিশ্চয় কিছু ছিল, যার দ্বারা শেকসপিয়রের নাটকগুলি কালের সীমারেখা পেরিয়ে কালান্তরের মানুষদেরও সমানভাবে আনন্দ যুগিয়ে যেতে পারছে কিন্তু সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথের শান্তরসাশ্রিত কবি-মানস শেকসপিয়রের নাটকের জীবন-রসের দুর্লভতা ও তার অতুলনীয় মহিমার পরিচয় গ্রহণে উৎসাহ বোধ করেননি। জীবনের এই পর্বে মানব-জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে অধ্যাত্মশক্তির লীলাদর্শনে তাঁর যেরকম সহানুভূতি ও আগ্রহ ছিল, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির জটিল ও গভীর রহস্য উদঘাটনে তাঁর মন সে সময় সেভাবে সাড়া দিতে চায়নি। আমরা বারেবারেই ‘এই পর্বে’ কথাটি উল্লেখ করছি এই কারণে যে সাহিত্য-বিচারে এই বিশেষ মনোপ্রেরণা রবীন্দ্রজীবনে একমাত্রিক নয়। উত্তর-জীবনে পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্যবিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে। সে কথা আমরা যথাস্থানে বিশদে আলোচনা করব আর পূর্ববর্তী জীবনে রবীন্দ্র-নাটক শেকসপিয়রকে কতখানি অনুসরণ করেছিল, তাও উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত পঞ্চাঙ্ক নাটকগুলি (যেমন রাজা ও রাণী, বিসর্জন) লক্ষ করলেই আমরা অনুধাবন করতে পারব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে কালিদাসের নাটককে বলেছেন ‘নন্দনকাননতুল্য’ আর শেকসপিয়রের নাটককে বলেছেন ‘সাগরবৎ’। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন ‘কাননে—সাগরে তুলনা হয় না’। কিন্তু একথা বলেও উভয় কবির রচনাধারার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে তিনি দেখিয়েছেন, “শকুন্তলার কবি টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন”। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত বঙ্কিমের সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি টেক্সটের সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্য গুরুত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন এবং ভারতীয় সংযম ও কল্যাণকরতার আদর্শে বিচার করে কালিদাসকে শেকসপিয়র অপেক্ষা উচ্চে স্থান দিয়েছেন। এই জায়গায় আপাতভাবে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশানুরাগ বঙ্কিমের তুলনায় বেশি কিন্তু বঙ্কিমের সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে সার্বিক পরিচয় থাকলে বোঝা যাবে ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্কিম নিজের লেখায় ইউরোপীয় আদর্শকে বরণ করে নিলেও ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কোনও অভাব ছিল না। ‘সীতারাম’ উপন্যাস হলেও সেখানে অন্ধ পাশ্চাত্যপ্রীতির সমালোচনা করেছেন বঙ্কিম—“কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল্ পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।”[১৫০]

‘শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা’ প্রবন্ধে শেকসপিয়রের তুলনায় কালিদাসকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন না দিলেও অন্য একটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধে মিল্টনের সঙ্গে তুলনায় কালিদাসের শেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে কিন্তু বঙ্কিম পরাঙ্মুখ হননি, সেখানে তাঁর মন্তব্য নিম্নরূপ—

> দেবচরিত্র প্রণয়নে তিনি (কালিদাস) মিল্টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের ন্যায় কবিত্ব, কোনও ভাষায় কোনও মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্টন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রমবোধ হয় ; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্যবিশিষ্ট করিয়াছেন।[১৫১]

বঙ্কিম যে মিল্টনের এত গুণগ্রাহী ছিলেন তিনিও জীবনবোধ এবং মানবীয় মূল্যবোধের বিচারে মিল্টনের ঊর্ধ্বে কালিদাসকে স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমের মতো মধুসূদনও একই স্বরে বলেছেন, মিল্টনের লোকোত্তর প্রতিভা পাঠককে আর্টের চরম সীমার কাছাকাছি নিয়ে যায় কিন্তু হৃদয়বৃত্তিকে বা পাঠক-মনের কোমল অনুভূতিগুলিকে ততখানি স্পর্শ করতে পারে না। মিল্টন সম্পর্কে মধুসূদন লিখেছেন—“Like his own satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart.”[১৫২]

রবীন্দ্রনাথের আগে বঙ্কিম ছাড়া আরও বেশ কিছু সমালোচক শেকসপিয়রের সঙ্গে কালিদাসের কবিত্বপ্রতিভার তুলনামূলক বিচার করেছেন। এঁদের মধ্যে দুজনের নাম খুবই স্মরণযোগ্য। প্রথম জন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আর দ্বিতীয়জন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের দুজনের সিদ্ধান্তের মধ্যে অবশ্য বিরোধ নেই। হরপ্রসাদ দ্বর্থহীন ভাষায় লিখেছেন—

> কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার একচেটে।... কিন্তু যেখানে দশ পনেরটি পরস্পরবিরোধী ভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে আচ্ছন্ন

করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত,...সেখানে কালিদাস আসিবে না। সেখানে শেক্সপীয়র ভিন্ন গতি নাই।[১৫৩]

হীরেন্দ্রনাথ এই কথাটিকেই ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, যিনি সৌন্দর্যের কবি, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যই যাঁহার কাব্যের উপাদান, কদর্য, কুৎসিত অসুন্দর যাঁহার কাব্যে স্থান পেতে পারে না তিনি 'অধ্যাত্মজগতের ছবি' পূর্ণাবয়ব হবে না কারণ অধ্যাত্ম জীবন চিত্রিত করতে গেলে অসুন্দর ও সুন্দর, কদর্য ও সৌন্দর্য উভয়ের সমাবেশ চাই। তাই শেকসপিয়র, গ্যেটে প্রমুখের কাব্যে 'অধ্যাত্মজগতের' যে উজ্জ্বল প্রতিকৃতি আছে, কালিদাসের কাব্যে তা নেই ; কারণ কালিদাস সৌন্দর্যের কবি, অসুন্দরের সমাবেশ পাশাপাশি না রাখলে অধ্যাত্মজগৎ সিদ্ধ হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেহেতু ইয়াগো, ক্লডিয়াস, আইক্যামো বা মেফিস্টোফেলিসের স্থান হবে না, তাই দেসদিমোনা, হ্যামলেট, ইমোজেন বা ফাউস্টের সম্ভাবনাও সেখানে দূরস্থ।[১৫৪]

বঙ্কিম-সমসাময়িক, উনিশ শতকীয় শেকসপিয়র-কালিদাস তুলনামূলক সমালোচনার এই যে ধারায় কালিদাসকে একচেটে 'সৌন্দর্যের কবি' বলে তুলে ধরা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা তার তুলনায় ভিন্নমার্গী কারণ রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে নেহাৎ সৌন্দর্যের কবি হিসেবে মনে করেননি। তিনি দেখিয়েছেন, কালিদাস তাঁর আশ্চর্য পরিমিতি ও সংযমবোধের দ্বারা সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গল ও সামাজিক কল্যাণকরতার আদর্শকে একত্রে গেঁথে রেখেছেন। সেইসঙ্গে অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়না বা ইন্দ্রিয়জ চাপল্য যে দৈন্য এবং চিত্তবিকার ঘনিয়ে তোলে তাকেও কালিদাস প্রকাশ করেছেন কিন্তু সেখানেই থেমে না গিয়ে দুঃখদহন, কৃচ্ছসাধন ও পরিতাপের অশ্রুজলে সেই দৈন্যের রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে শুচিশুভ্র করে তুলেছেন। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা; একটি কাব্য অপরটি নাটক কিন্তু কালিদাসের এই দুটি গ্রন্থ সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির এই সমতা লক্ষ করা যায়। পাপের চিত্র কালিদাস যে আঁকেননি তা নয় কিন্তু তিনি "পাপকে হৃদয়ের ভিতর দিক হইতে আপনার অনলে আপনি দগ্ধ করিয়াছেন ; বাহির হইতে তাহাকে ছাই চাপা দিয়া রাখেন নাই।"[১৫৫] অসংযম থেকে সংযমে, অমঙ্গল থেকে মঙ্গলে, প্রবৃত্তি থেকে কল্যাণে এবং প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে এই রূপান্তরই কালিদাসের বৈশিষ্ট্য। কালিদাসের সাহিত্যকে শুধুমাত্র সৌন্দর্যসম্ভোগ থেকে বের করে এনে এইভাবে ব্যাখ্যা কালিদাস-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিক অবদান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাণভট্টের কাদম্বরী

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার ধারায় 'কাদম্বরী' বিষয়ক আলোচনা একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই বিখ্যাত গদ্য-রোমান্সটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য পাওয়া যায় মুখ্যত যে দুটি প্রবন্ধে, সে দুটি প্রবন্ধ 'কাদম্বরী চিত্র' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' নামে 'প্রাচীন সাহিত্য' বইতে সংকলিত হয়েছে। 'কাদম্বরী চিত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে 'প্রদীপের মাঘ সংখ্যায়'। 'কাদম্বরী' গ্রন্থের শুরুতে বর্ণিত রাজসভার দৃশ্য অবলম্বনে তরুণ চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় একখানি চিত্র অঙ্কন করেন। প্রাথমিকভাবে সেই চিত্রটির পরিচয় দানই রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি রচনার মূল কারণ আর সেই কারণেই প্রবন্ধটির নাম 'কাদম্বরী চিত্র'। কিন্তু এই আশু উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথ কতকটা বিস্তৃতভাবেই এই গ্রন্থটি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি প্রবন্ধ শুরু করেছেন প্রাচীন মহাকাব্য যুগের সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এবং সেকালের পাঠকরুচির সঙ্গে একালের পাঠকরুচির তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্যে দিয়ে। 'কাদম্বরী'কে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রেখে তিনি নানা দিক থেকে এই গ্রন্থের অভিনবত্ব পর্যালোচনা করেছেন। তবে এই গ্রন্থের যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছেন, তা হল এর চিত্রগুণ। একটি ক্ষীণ গল্পসূত্রকে অবলম্বন করে তিনি বর্ণিতব্য বিষয়কে চিত্রীর মতো বর্ণে বর্ণে বর্ণিল করে তুলেছেন। তাই কাদম্বরী বইটিকে একটি চলমান সজীব 'চিত্রশালা' হিসেবেই মূল্যায়ন করেছেন কবি। অবশ্য কাদম্বরীতে পৌঁছনোর ভূমিকা রূপে প্রাচীন মহাকাব্য যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের সাধারণ কুললক্ষণ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখিয়েছেন, 'কাদম্বরী'তে গল্পের কাঠামো খুব ক্ষীণ, বর্ণনাই প্রধান। কবির মূল লক্ষ্য গল্প তৈরি করা নয়, বরং গল্পের উপলক্ষ্যে এক একটা দৃশ্যকে সাজিয়ে তোলা। গল্প-কাঠামো, আধুনিক পরিভাষায় যাকে 'প্লট' বলা হয়, তার কিছু দুর্বলতা ও শিথিলতা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তাতে ভারতের সাহিত্যরসগ্রহিষ্ণু মন একেবারেই বাধা পেত না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এই এক অসামান্যতা। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই গল্প শুনতে ভালোবাসে, ভারতবর্ষীয় মনও গল্পরসের প্রতি আকৃষ্ট ছিল কিন্তু গল্প শোনার জন্য তাড়া ছিল না। মহাকাব্যগুলোতে দেখা যায় সামান্য উপলক্ষ্যেই বর্ণনা ও তত্ত্বালোচনার ঘটা পড়ে যেত কিন্তু তাতে পাঠক বা শ্রোতার প্রশান্ত মনের লেশমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটত না। অবশ্য এই বর্ণনাংশ

বা কাহিনির পক্ষে যা অবান্তর সেগুলি কাব্যের মূল অঙ্গ নাকি প্রক্ষিপ্ত, সে আলোচনা নিষ্ফল। কারণ প্রক্ষেপ সহ্য করা বা উপভোগ করার লোক না থাকলে প্রক্ষিপ্ত টিকতেই পারে না। তাই দেখা যায়, মহাভারতের তুমুল যুদ্ধঘটনার উত্তেজনাকে মুহূর্তে থমকে দিয়ে অষ্টাদশ অধ্যায়বহুল গীতার দার্শনিক আলোচনা চলতে থাকে কিংবা রামায়ণে রাক্ষস কর্তৃক সীতা হরণের পরেও সীতা উদ্ধারের শলা-পরামর্শের মাঝেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা চলতে থাকে শ্লোকের পর শ্লোক জুড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মন তাতে কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব করে না। দ্বিতীয়ত, গল্পের পরিণতি-সামঞ্জস্য বিষয়ে ভারতবর্ষীয় মনোভাবও অপরাপর দেশ থেকে স্বতন্ত্র। জাগতিক ক্ষেত্রে কার্য-কারণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, গল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় মন তাকে কিছুমাত্র আমল দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন রামায়ণের ছয়টি কাণ্ডে যে অনুপম গল্পটি আনন্দ-বেদনার মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল; উত্তরকাণ্ডে কবি এক নিমেষে অসংকোচে তাকে ভেঙে দিলেন। লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনাধারায় পাঠকের দৃঢ়রূপে প্রতীতি হয়ে গেছে যে অধর্মাচারী নিষ্ঠুর রাবণই সীতার একমাত্র শত্রু। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে পৌঁছে অবাক বিস্ময়ে পাঠক দেখলেন অধর্মাচারী রাবণ নয়, পরম ধর্মনিষ্ঠ রামই সীতার যথার্থ শত্রু, নির্বাসনকালে সীতাকে ততখানি লজ্জা বা অপমান সইতে হয়নি, যতখানি সইতে হল আপন স্বামীগৃহে। যে সোনার তরী দীর্ঘকাল যুঝে ঝড়ের হাত থেকে উদ্ধার পেল, ঘাটের পাষাণে ঠেকামাত্রই মুহূর্তে তা খণ্ডিত হয়ে ডুবে গেল। মহাভারতেও তাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে যে রাজসিংহাসন, তার জন্য কত লড়াই, দলাদলি, রক্তপাত, অশ্রুপাত কিন্তু পাণ্ডবেরা সেই সিংহাসন জয় করেও ভোগ করতে পারল না। রবীন্দ্রনাথ এক কথায় বলেছেন,

> এক স্বর্গারোহন-পর্বেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধটার স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। যিনি কার্য-কারণ মেনে গল্প শুনতে ভালোবাসেন তার প্রত্যাশানুযায়ী গল্পের যেইখানে সমাপ্তি হওয়া উচিত মহাভারতকার সেইখানে থামলেন না বরং অতবড়ো গল্পটাকে বালি নির্মিত খেলাঘরের মতো এক নিমেষে ভেঙে দিয়ে চলে গেলেন। ফলে ভারতবর্ষীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য হল শিথিল-গতি, বর্ণনাপ্রাধান্য ও পরিণাম-অসামঞ্জস্যতা।[১৫৬]

মহাকাব্যের যুগ পেরিয়ে এসে ঐতিহাসিক যুগে কালিদাসের কাব্যের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সাহিত্যের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যটিকে খুঁজে পেয়েছেন। কালিদাসের কাব্য-নাটকাদির মধ্যে যে খুব প্লট বেঁধে গল্প পরিবেশনের চেষ্টা আছে, এমন কথা বলা যায় না। মেঘদূত বা কুমারসম্ভবের

গল্পাংশ সামান্যই, এর অসাধারণত্ব বর্ণনায়। কালিদাসের সময়কাল থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে পৌরাণিক যুগের ধর্মপ্রাণতা গৌণ হয়ে পড়ে। বর্ণনার দ্বারা চিত্তবিনোদনই কালিদাসের সাহিত্যের মূল লক্ষণ। তা লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,--"কুমারসম্ভব রঘুবংশ পৌরাণিক বটে, কিন্তু তাহা পুরাণ নহে, কাব্য। তাহা চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত, তাহার পাঠফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রলোভন নাই। ভারতবর্ষীয় আর্যসাহিত্যের ধর্মপ্রাণতা সম্বন্ধে যিনি যেমন মতবাদ প্রচার করুন, ঋতুসংহার পাঠে মোক্ষলাভের সহায়তা হইবে এমন উপদেশ কেহ দিবেন না।"[১৫৭]

কালিদাসের হাত ধরে সংস্কৃত সাহিত্য অতীত মহাকাব্য বা পৌরাণিক যুগের ধর্মপ্রাণতাকে অনেকখানি লঘু করে দিয়ে বিশুদ্ধ আস্বাদনধর্মী সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এমনটাই রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ। অবশ্য কালিদাসের কাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষীয় এমন কতকগুলি স্ব-ভাবের প্রবণতা ছিল, যা তার ধর্ম-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। কুমারসম্ভব বা শকুন্তলার সঙ্গে শেকসপিয়রের তুলনামূলক পর্যালোচনায় কালিদাসের রচনার এই ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথ উদঘাটন করে দেখিয়েছেন, আমরা আগেই তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কালিদাস যে রাজার রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের সময়ে দেশে যে অবিচ্ছিন্ন শান্তি ছিল এমন নয়, শক-হুনরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের তখন খুব দ্বন্দ্ব চলেছিল, বিক্রমাদিত্য নিজেই তার একজন নায়ক। তাই আধুনিক যুগের বীরকাব্যের রীতি মেনে দেব-দৈত্যের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে পৃষ্ঠপোষক রাজাকে পরিত্রাতা হিসেবে দেখানো বা যুদ্ধঘটনার উত্তেজনাকে কাব্যে বড়ো করে স্থান দেওয়ার কোনো চেষ্টা কালিদাসের রচনায় বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ের কাহিনি আছে বটে, তারকাসুরের হাত থেকে স্বর্গ উদ্ধার কুমারসম্ভবের লক্ষ্য বটে কিন্তু তা বলে সেই বিজয়ে পৌঁছনোর জন্য কবির যেমন খুব তাড়া নেই, তেমন কবির শ্রোতাদেরও তেমন উৎকণ্ঠা নেই। "সকলেই যেন বলিতেছেন, গল্প থাক, এখন ঐ বর্ণনাটাই চলুক।" এই বর্ণনাপ্রাধান্যই সে যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, গল্পের খুঁটিনাটি যদি কালিদাসের রচনায় গুরুত্ব পেত, তবে সেইসব গল্পের আড়ালে সেযুগের সমাজের ছবি কালিদাসের লেখনীতে আরও বিশদভাবে পাওয়া যেত কিন্তু কালিদাস স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় জীবনযাত্রাকে তাঁর লেখায় ততখানি স্থান

দেননি, তাঁর কাব্যের উপাদান বস্তুগত নয়, ভাবগত। গুপ্তযুগের সামাজিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়ার জন্য একজন ঐতিহাসিককে কালিদাসের কাব্য খুব অল্পই সাহায্য করতে পারে। এর কারণ বস্তুভিত্তির প্রতি কালিদাসের ঝোঁক ততখানি ছিল না, যতখানি ছিল নিখিল মানবের ভাবগত সত্যের প্রতি। কিন্তু তাই বলে কি অবন্তীরাজ্যে নববর্ষার দিনে উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা নীরব হয়ে থাকতেন! সাধারণ জনজীবনে কথার তরঙ্গ উঠত না! কিন্তু সেসব লিখিত হয়েছিল স্থানীয় কবিদের দ্বারা স্থানীয় গ্রামীণ বা প্রাকৃত ভাষায়। সেইসব গ্রাম্য কবিদের মধ্যেও অনেকে নিশ্চয় মহৎ কবি ছিলেন, কিন্তু তাদের ভাষা প্রদেশবিশেষে বদ্ধ, শিক্ষিত জন কর্তৃক উপেক্ষিত ও কালে কালে এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে সেইসব সাহিত্য কালের দরজা পেরিয়ে এযুগে পৌঁছনোর পূর্বেই তাদের নমনীয় ভিতের ওপর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

সংস্কৃত ভাষার অজস্র ঐশ্বর্য থাকতে কিন্তু একটি লক্ষণে সে দরিদ্র। সে ভাষা মাটিসংলগ্ন যে মানুষ তার হৃদয়কে ধারণ করতে পারে না। সংস্কৃত কথ্য ভাষা ছিল না বলেই সে ভাষায় ভারতবর্ষ নিজের হৃদয়কে উদঘাটিত করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—“মৃত ভাষায়, পরের ভাষায়, গল্পও চলে না; কারণ গল্পে লঘুতা ও গতিবেগ আবশ্যক। ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিয়া চলিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।”[১৫৮]

তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত যেহেতু সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল না, তাই সেই ভাষায় রচিত গানে হৃদয়ের অকৃত্রিমতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না। যেমন ‘বিক্রমোর্বশী’র সংস্কৃত গান এবং জয়দেবের সংস্কৃতে লেখা গীতগোবিন্দ গান। রবীন্দ্রনাথ তুলনা করে বলেছেন বাঙালি কবিদের লেখা পদাবলীর সঙ্গে মাধুর্যে ও অনির্বচনীয়তায় জয়দেবের সংস্কৃত পদাবলী হীন। রবীন্দ্রনাথের এই শেষোক্ত কথাটি নিয়ে রসিকমহলে তর্ক থাকতে পারে। বাঙালি শ্রোতার কাছে সংস্কৃত গানের তুলনায় বাংলা গান বেশি আদরণীয় হবে, তা যুক্তিসহ কিন্তু জয়দেবের পদাবলীও বাঙালি রসিকমহলে যুগ যুগ ধরে আদৃত হয়ে এসেছে। এর কারণ ভিন্ন। আসলে জয়দেবের সময়ে সংস্কৃত ভাষা নমনীয় হয়ে এত তরল হয়ে এসেছিল যে বাংলার সঙ্গে তার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃতের স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য নেই কিন্তু সংস্কৃতের ধ্বনিঝংকার ও লঘুচপল গতি পূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। তাই লিরিক হিসেবে সে গানের উৎকর্ষ এত অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।

সে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য বাণভট্টের সময়ের সংস্কৃত গদ্যভাষা নিয়ে। সে ভাষার স্বরবৈচিত্র্য ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাকে নিপুণভাবে চালনা করলে নানা যন্ত্রের এমন অপূর্ব কনসার্ট ধ্বনিত হয়ে ওঠে, যে বাক্‌নিপুণ কবি বাক্যের যাদুসম্মোহন সৃষ্টি করে পণ্ডিত শ্রোতাদের মুগ্ধ করবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করতে পারেন না। সেজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করে দেওয়া আবশ্যক সেখানে ভাষার যাদুশক্তিকে উপেক্ষা করতে না পেরে বাক্যই নানা সাজে সজ্জিত হয়ে স্থান জুড়ে বসে এবং বিষয় তার গৌরব হারায়। গোটা কাদম্বরী গ্রন্থে পাতায় পাতায় এমন দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাবে যেখানে বক্তব্যবিষয় হয়তো এক লাইনের অথবা তাও নেই কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে বর্ণনার ইন্দ্রজাল পাতার পর পাতা জুড়ে ব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। বাগ্‌বিস্তারের বাহুল্যে বিষয় অগ্রসর হতে পারছে না। সেকালের সংস্কৃত গদ্য যেহেতু সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, তাই বাহ্যশোভার এই বাহুল্য তার পক্ষে পীড়াদায়ক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ খানিকটা কৌতুকের সুরেই বলেছেন, মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখে মনে হয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে তৈরি নয়, বড়ো বড়ো টীকাকার, ভাষ্যকার, পণ্ডিত বাহকেরা তাকে কাঁধে তুলে না চললে সে চলতে অক্ষম।

কাদম্বরীতে যে ধরণের গদ্যরীতি ও রচনাকৌশল অনুসৃত হয়েছে, আধুনিক যুগে তা অচল। শুধু অচলই নয়, আধুনিক যুগের গদ্যলেখকেরা এর বিপরীত পথই অনুসরণ করে থাকেন। আধুনিক যুগ গতির যুগ, মানুষের ব্যস্ততার অন্ত নেই ; তাই সাহিত্যে কথা বিস্তারিত করে বলবার প্রলোভন পদে পদে সংযত করতে হয়। কাদম্বরীর লেখক কথা বিস্তারের যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, এ যুগের লেখককে কথাসংক্ষেপের যাবতীয় কৌশল শিক্ষা করতে হয়, নতুবা তিনি পাঠকের ধৈর্য রক্ষা করতে পারবেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, এ কালের পাঠক হয়ে যিনি কাদম্বরীর রস উপভোগ করতে চাইবেন, আপিসের বেলা হচ্ছে, এ কথা তাকে ভুলে যেতে হবে, মনে করতে হবে রাজসভার অখণ্ড অবসরের মধ্যে বসে তিনি বাক্যরস উপভোগ করছেন। কাদম্বরীর প্রখ্যাত বাংলা অনুবাদক প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর এই গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কথিত এই বিষয়গুলিকেই আরও সংহত করে বলেছেন, তাঁর কথায়[১৫৯]--

১।আজকালকার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ, গতির যুগ, এক ঘন্টায় দুশো পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাস রেলগাড়ির চলন্ত মুখরতার মধ্যে পড়ে ফেলে ছুঁড়ে ফেলার যুগ। কিন্তু কাদম্বরীর রস পান করতে হলে যেমন করেই হোক, আবহাওয়া বা পরিবেশের বদল করতেই হবে। নিজেকে প্রায় করে দিতে হবে পুরনো ভারতবর্ষের সেই শান্ত সভ্যতা যেখানে গতির জোর করে বৃদ্ধি করা প্রাখর্য নেই, যেখানে রয়েছে একটি গন্ধমোহ বাসর, একটি মনের মতো মানুষ, একটি অলস মধ্যাহ্ন দিন, তাম্বুল চর্বণের মধ্যে ধূমবর্তিকার শিখরে উঠছে নিঃশব্দ গোলাকৃতি ধূম, এবং চামরবাহিনীর কঙ্কনে অতি মৃদু অতি মধুর ঝংকার।

২। গল্পাংশের গতি নেই এই কথাসাহিত্যে, বরং রয়েছে গল্পাংশ থেকে মনকে সরিয়ে নেবার নিপুণতা, গল্পের পর্যবসান করবার স্পৃহা নেই, বরং রয়েছে কথার মধুসৃষ্টিতেই একটি অনবদ্য আনন্দ। অনুবাদ করতে করতে মনে হয়েছে যেন তিনি ছবির পর ছবি দেখছেন—ভাষারেখায় আবদ্ধ, ভাববর্ণে চিত্রিত ছবি।

৩। সাত শতাব্দী পূর্বের সামাজিক চিত্র যারা দেখতে চান কাদম্বরীতে অতি নিপুণভাবে তারা তা দেখতে পাবেন।অনেক সময় মনে হয় বাণভট্ট কথাশিল্পী নন, তিনি চিত্রশিল্পী ; কলমের মুখে কালি না দিয়ে, কলমের মুখে বিচিত্র রঙ নিয়ে লিখেছেন কাদম্বরী কথা। আধুনিক যুগের দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে তাই তার ঘটেছে এত বৃহৎ অথচ মোহকর পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাদম্বরী সমালোচনায় প্রবোধেন্দুনাথ বর্ণিত উপরোক্ত প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বলেছেন তবুও তিনি মুখ্যত জোর দিয়েছেন দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথম, গল্পাংশের অকিঞ্চিৎকরত্ব ও গতিহীনতা আর দ্বিতীয় চিত্ররীতি। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরীকাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে—বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন—এজন্য তাহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত।"[১৬০]

বাণভট্টের চিত্রাঙ্কন দক্ষতা কতখানি অনবদ্য ও অতুলনীয় তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীর একেবারে প্রারম্ভের প্রভাতচিত্রটির এবং জাবালির তপোবনে সন্ধ্যাসমাগমের দৃশ্যটির অবতারণা করেছেন। সকালের বর্ণনায় উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকুর মধ্যে দিয়ে লেখক যেমন সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে ও স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছেন তেমনই

তপোবনে সন্ধ্যাগমের উপমা হিসেবে গোষ্ঠে ফেরা অরুণচক্ষু কপিলবর্ণ ধেনুটির কথা তুলে সন্ধ্যার যতকিছু ভাব সমস্ত নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়েছেন যে এই বর্ণ-সৌন্দর্যের বিকাশ শুধুই শিল্পীর কল্পনাজাল বিস্তার নয়, এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বাণভট্টের অসাধারণ পর্যবেক্ষণ দক্ষতা এবং তার অনুভবী সকরুণ হৃদয়টি। কাদম্বরীকারের এই অসামান্য শক্তির পরিচয় দানের জন্য রবীন্দ্রনাথ শাল্মলীতরুর কোটর থেকে বৃদ্ধ শবর কর্তৃক পক্ষীশাবক হরণের দৃশ্যটির উল্লেখ করে লিখেছেন,--

> রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই! সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।...কথাটা এই যে ব্যাধ গাছের উপর চড়িয়া নীড় হইতে পক্ষীশাবকগুলিকে পাড়িতেছে—সেই অনুপজাত-উৎপতনশক্তি শাবকগুলির কেমন রঙ?... কেহ বা অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শাল্মলীকুসুমের মতো, কাহারও পদ্মের নূতন পাপড়ির মতো অল্প অল্প ডানা উঠিতেছে, কাহারও বা পদ্মরাগের মতো বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়মান চক্ষুর অগ্রভাগ ঈষৎ উন্মুক্তমুখ কমলের মতো, কাহারও বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে।[১৬১]

এই বর্ণনা করুণ তো বটেই, এমনকি ভয়ংকর নিষ্ঠুর। অথচ বর্ণনার মধ্যে কোনো হা-হুতাশ নেই। কেবল সুনির্বাচিত ভাষার তুলিতে আঁকা তুলনা চিত্রের সৌকুমার্যের দ্বারা পশুদের ভয়চাঞ্চল্যকে চমৎকারভাবে প্রকাশ করে বাণভট্ট পাঠকের মনে অতলস্পর্শী কারুণ্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

কাদম্বরী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য চিত্ররূপের মিছিল। একটির পর একটি বর্ণনা ও ছবি যেন চোখের ওপর ভেসে ভেসে চলেছে। শূদ্রক ও তাড়াপীড়ের রাজসভা, বিন্ধ্য-অটবী, দণ্ডক বনে ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম, পম্পা তীরবর্তী শাল্মলীতরু, মৃগয়ার দৃশ্যাবলী, জাবালির তপোবন, গন্ধর্ব-লোক, চণ্ডালপুরী, অচ্ছোদসরোবর ও হেমকূট—শব্দের তুলি দিয়ে আঁকা এমন অসংখ্য দৃশ্য পাঠকের চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে থাকে। এই অসংখ্য চিত্ররাজির মধ্যেও ভাবের তুলি দিয়ে অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত রূপসী প্রেমসাধিকা মহাশ্বেতা ও বিরহবেদনায় ক্ষীণ কাদম্বরীর চিত্রদুটি গভীর মমতা নিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। নিষ্ঠুরতা ও কারুণ্য, আশা ও আশাহতের

বেদনা, বিরহের আর্তি ও প্রেমের মহিমা, কামবিকার ও তপস্যার সৌন্দর্য—জীবনের প্রায় সবকটি অভিব্যক্তিকেই বাণভট্ট অতি দক্ষ শিল্পীর মতো করে রঙের তুলিতে এঁকেছেন।

এবার একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠতে পারে। বর্ণনা, চিত্ররীতি, রঙ ফলানো এ সবই সাহিত্যের রূপলোকের বিষয়, প্রকাশকলার সঙ্গে এর সম্বন্ধ। সাহিত্যে 'প্রকাশরীতি'র গুরুত্বকে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন লঘু করে দেখেননি এ কথা মনে রেখেও বলতে হয়, কাদম্বরী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ভাবের সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রকাশের নৈপুণ্যকেই যেন অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই প্রকাশকলার নানা দিকের মধ্যেও চিত্ররূপময় বর্ণনারীতির প্রতি ঝোঁক পড়েছে বেশি। স্পষ্টতই দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী আলোচনা শুরু করেছেন চিত্ররূপের কথা দিয়ে এবং চিত্র ছেড়ে বিষয়ের জগতে প্রবেশের অব্যবহিত আগে প্রবন্ধের সমাপ্তি টেনে দিয়েছেন। এর নিশ্চয় কিছু বাস্তব কারণ থাকতে পারে। যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাদম্বরীভিত্তিক ছবিটিই তাঁর আলোচনার মূল উপলক্ষ্য, তাই তিনি গোটা প্রবন্ধেই চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের দক্ষতাকেই মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন কিন্তু কাদম্বরীর বিষয়-গৌরব, এর অন্তর্নিহিত ভাবজগতকে রবীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে তুলে ধরেননি। রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার প্রায় সর্বত্রই আমরা দেখেছি তিনি সাহিত্যের রূপলোকের থেকেও ভাব-মহিমা বিষয়ে আলোচনা করেন বেশি। কালিদাসের সাহিত্যের ভাব-সৌন্দর্যকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু কাদম্বরী এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানে প্রকাশ কলাই তাঁর আলোচ্য বিষয়, গ্রন্থটির ভাব-জগতের মধ্যে তিনি ঢুকতে চাননি। কেন চাননি এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে অনুমান করা যায়, হয়তো কাদম্বরীকে বিষয়-গৌরবে গরীয়ান বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেননি। একমাত্র প্রেমসাধিকা মহাশ্বেতার উপাখ্যানটুকু রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ দাগ কেটেছিল, তার প্রমাণ কবিতায় আছে। যৌবনে লেখা 'চিত্রা' কাব্যের 'বিজয়িনী' কবিতায় যে নারীর শুচিশুভ্র, পবিত্র সৌন্দর্যের কাছে কামের দেবতা মদন পরাভূত হয়েছিল, সেই নারীর ভাব-কল্পনা যে মহাশ্বেতার অনুরূপ বিশিষ্ট গবেষকেরা তা সপ্রমাণ করেছেন।[১৬২] কিন্তু কাদম্বরী সমালোচনায় তিনি এর বিষয়-তাৎপর্য আলোচনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। হয়তো এখানে প্রেমকে যেভাবে দৈব ও নিয়তিতাড়িত করে দেখানো হয়েছে, তা তাঁর পছন্দ হয়নি অথবা তিন জন্মের কাহিনিকে টেনে আনতে গিয়ে কাহিনিকার যে অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচিকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। সংস্কৃত সাহিত্যে, মহাকাব্যে অতিপ্রাকৃতের অভাব নেই কিন্তু কাদম্বরীতে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত সাধারণ

কল্পনাশক্তিকে পীড়িত করে। কাদম্বরীতে বর্ণিত কাহিনির সংক্ষিপ্ত রেখালেখ্য এরকম— দুজন বন্ধুর তিন জন্মের প্রেমকাহিনি উপন্যাসটির বিষয়। একজনের নাম পুণ্ডরীক, তিনি দ্বিতীয় জন্মে বৈশম্পায়ন ও তৃতীয় জন্মে শুকপাখি অর্থাৎ তোতাপাখি রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শূদ্রক রাজার রাজসভা থেকে কাহিনির সূত্রপাত। একদিন এক চণ্ডালকন্যা একটি তোতাপাখি নিয়ে শূদ্রক রাজার রাজসভায় আসেন। কন্যাটি পাখিটিকে রাজার কাছে দান করেন। পাখিটি মানুষের মতো কথা বলতে পারে ও হিন্দু শাস্ত্র, বেদ-উপনিষদের সমস্ত মর্ম পাখিটির জানা। ফলে রাজা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন পাখিটি রাজাকে কাহিনি শুনিয়ে বলেন যে এক সময়ে উজ্জীয়ন নগরে চন্দ্রাপীড় নামে এক রাজার বৈশম্পায়ন নামে এক মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। একদিন গভীর অরণ্যে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী নামক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর সম্পর্ক প্রণয়ের রূপ নেয়। অন্যদিকে বৈশম্পায়ন মহাশ্বেতার প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু মহাশ্বেতা যথার্থ অর্থেই একনিষ্ঠ প্রেমসাধিকা, সে পুণ্ডরীক নামক এক মৃত ব্যক্তির প্রণয়কে একনিষ্ঠভাবে বুকে ধরে আছে কিন্তু বৈশম্পায়নই যে পুণ্ডরীকের দ্বিতীয় জন্ম, এ কথা বৈশম্পায়ন বা পুণ্ডরীক কেউই জানতেন না। মহাশ্বেতা কুপিত হয়ে বৈশম্পায়নকে তোতাপাখি হওয়ার অভিশাপ দেন। ফলে বৈশম্পায়ন তোতাপাখি রূপে জন্ম নেন। এ দিকে প্রিয় বন্ধুর অভিশাপের কথা শুনে চন্দ্রাপীড়ও দেহত্যাগ করেন। তোতারূপী বৈশম্পায়নের কাহিনি রাজাকে শোনানোর পর চণ্ডালকন্যা শূদ্রকরাজাকে বলেন যে তিনিই বিগত জন্মে চন্দ্রাপীড় ছিলেন। তখন রাজার পূর্বজন্ম স্মরণ হয় ও তিনি চন্দ্রাপীড়ের বেশ ধারণ করেন এবং তোতাপাখি পুণ্ডরীকের বেশে চলে আসে। এরপর তারা নিজ নিজ প্রণয়ী যথাক্রমে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সঙ্গে এবং পুণ্ডরীক মহাশ্বেতার সঙ্গে মিলিত হন। এখানেই কাহিনির সমাপ্তি। এমন কাহিনির অন্তর্লোকের মহিমা উদঘাটন করে দেখাতে গেলে বহু অবান্তর ও অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে বলেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সঙ্গে কাদম্বরীর বিষয় উদঘাটনের দিকটি এড়িয়ে এর অসামান্য চিত্রধর্মী প্রকাশকলার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। এই দিক থেকে বিদ্যাসাগরও কাদম্বরীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে পারেননি, তাঁর কথায়—

> কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শশূন্য নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দ-শ্লেষ ও বিরোধাভাসঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিরন্তন জ্ঞান করিয়া

থাকেন, যথার্থ বটে ; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।[১৬৩]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অবান্তর অংশ পরিত্যাগ করে কাদম্বরী গ্রন্থের মূল শক্তির দিকটি চিহ্নিত করেছেন এবং সেই মূল শক্তির দিকটি অর্থাৎ প্রকাশকলার দিকটিকেই সবিস্তারে আলোচনা করে রসজ্ঞ সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন।

কাব্যের উপেক্ষিতা

রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধরণের সমালোচনা রীতির জন্ম দিয়েছে। ১৩০৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী'তে প্রবন্ধটি প্রকাশের পর থেকেই এর অভিনবত্ব সকলকে চমৎকৃত করে। এ প্রকার সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর লিখিত হয়নি। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহমর্মিতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য থেকে চারজন নারীকে চিহ্নিত করে কাব্যলোকে তাদের অসম্পূর্ণতা ও অপরিস্ফুটতাকে নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এই চারজন নারীচরিত্রের স্রষ্টা চরিত্রগুলির অমিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেননি এবং অন্য চরিত্রদের তুলনায় লেখকের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা অনাদরে অবহেলায় উপেক্ষিতা হয়েছেন। উপেক্ষামলিন এই চারটি চরিত্র হল বাল্মীকির ঊর্মিলা, কালিদাসের অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং বাণভট্টের পত্রলেখা। 'অপারে বিশ্বসংসারে কবিরেব প্রজাপতি'—কবি নিজেই তাঁর কাব্যের স্রষ্টা, কাব্যের চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রীও তিনি। নিজ অভিরুচি অনুযায়ী সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সকলেই কবির কাছে সমান গুরুত্ব পায় না। সংহতি ও সুমিতিবোধের প্রয়োজনে অনেক বিকাশোন্মুখ ও সম্ভাবনাময় চরিত্রকেও কবি নির্মম হস্তে বিসর্জন দেন। সৃষ্টির এই রহস্য রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় জানা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই চারটি চরিত্রের এতখানি উপেক্ষা সমীচীন বলে মনে করেননি। তাঁর মনে হয়েছে লেখকের দ্বারা উপেক্ষিতা হলেও সহৃদয় পাঠক এই চরিত্রগুলির প্রতি অবিচার না করে তাদের হৃদয়ে স্থান দেবেন।

এই প্রবন্ধটি রচনার পশ্চাতে সম্ভবত ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী উদার সাহিত্যিক সংস্কার। প্রকৃতির প্রতি ও মানুষের প্রতি এক উদার মমত্ববোধ রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় সাহিত্যের

অনুপ্রেরণা। তাই জীবনের কদর্যতা, বীভৎসা ও জুগুপ্সা রবীন্দ্রসাহিত্যে কিংবা রবীন্দ্রচিন্তায় ততখানি জায়গা জুড়তে পারেনি। তাই যেমন জীবনে তেমন কাব্যেও চরিত্রের অনাদরমলিন উপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মনকে অতৃপ্ত করেছিল। এই অতৃপ্তি তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—"হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবারমাত্র উদিত হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় বা তোমার অস্তাচল, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল!"[১৬৪]—তখন ভাষার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দরদী মনের স্পর্শ পাঠকের মনকেও সহানুভূতির রসে আপ্লুত করে। বাল্মীকি ঊর্মিলার প্রতি অবিচার করেছেন কিনা তা পাঠকের কাছে গৌণ হয়ে যায়, পাঠক এক নিমেষে ঊর্মিলাকে ভালোবেসে ফেলে। চরিত্রের প্রতি সমালোচকের সহৃদয়তা সরাসরি পাঠকের মনে অভিনিষিক্ত হয়ে পাঠকের মনকে আর্দ্র করে দেয়। ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনার এটি একটি চূড়ান্ত রূপ।

খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, কল্পনার ঐশ্বর্য, অনুভূতির আন্তরিকতা ও আবেগমথিত ভাষা এই চারটি অস্ত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের চারটি উপেক্ষিতা নারীচরিত্রকে সংবেদনশীল মনের ভাবরসে সঞ্জীবিত করে সহৃদয় পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, যার দ্বারা এই গৌণ চরিত্রগুলিও পাঠকের চোখে এক নূতন তাৎপর্যে উজ্জ্বল ও মহিমময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কথা শুরু করেছেন ঊর্মিলাকে দিয়ে। সমগ্র রামায়ণের পক্ষে তাঁর ভূমিকা কতখানি অকিঞ্চিৎকর অথচ তাঁর চরিত্রে কতখানি মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর কথায়, রামায়ণের পাঠক ঊর্মিলাকে প্রথম দেখেন বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তারপরে যখন থেকে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করল, তখন থেকে আর তাকে আর একদিনও দেখা গেল না। যুবরাজ রামচন্দ্রের অভিষেক-মাঙ্গল্য রচনার আয়োজনে অন্যান্য রাজমহিষীদের মতো প্রসন্নবদনা ঊর্মিলা কেমন করে আত্মনিয়োগ করেছিল, সে কথাও যেমন অজ্ঞাত, তেমনই যেদিন অযোধ্যানগরী অন্ধকার করে দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে তপস্বীবেশে বনবাসের পথে বেরিয়ে গেলেন সেদিন বধূ ঊর্মিলা রাজপুরীর কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো লুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল তাও অজ্ঞাত। সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে সেই বিদীর্যমানা ক্ষুদ্র কোমল মনের অসহ্য শোক কি কারও চোখেও পড়েছিল? যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্য দুঃখ মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতে পারেননি তিনিও একবার চেয়ে পর্যন্ত দেখলেন না!

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের গুণে ত্যাগকৃচ্ছ্র এই উপেক্ষিতা নারী পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি আকর্ষণ করে নেয়। রামায়ণে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার আদর্শরূপিনী যে সীতা, তার উত্তুঙ্গ মহিমার বেদীতলে আর এক অপূর্ব ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা নিজেকে কতখানি আবৃত করে বিলীন করে রেখেছে ঊর্মিলা চরিত্রে তারই ছবি সহসা পাঠকের চোখে ধরা পড়ে। রামচন্দ্রের জন্য ভ্রাতা লক্ষণের আত্মবিলোপ কম নয়। ভায়ের জন্য ভায়ের স্বার্থত্যাগের সেই মহিমা বাল্মীকি শতমুখে প্রচার করেছেন, লক্ষণের দ্বারা জগৎসভায় ভ্রাতৃত্বের গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন কিন্তু সেই লক্ষণের স্ত্রী ঊর্মিলা যে শুধু আত্মবিলোপ করেছিলেন তাই-ই নয়, নারীর যা সর্বস্ব, সেই জীবনাধিক ধন স্বামীকে পর্যন্ত সে রাম-সীতার সেবা ও সন্তোষের জন্য অকাতরে দান করেছেন। অথচ তার এতবড়ো দান, এতবড়ো ত্যাগের কথা এই বিরাটাকার কাব্যে কোথাও স্থান পেল না! সীতার বেদনাদীর্ণ মূর্তি মহাকবি বাল্মীকির দৃষ্টিকে কি এমন করেই আচ্ছন্ন করেছিল যে তিনি ঊর্মিলার ত্যাগধন্য তপস্বিনী মূর্তিটি দেখতে পর্যন্ত পাননি নাকি সীতার মহিমাকে নিরঙ্কুশ রাখবার জন্য তিনি আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাব্যে স্থান দেননি? যথার্থ রসজ্ঞের মতোই রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্ন তুলেছেন।

‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম’ নাটকে শকুন্তলাই নায়িকা, সন্দেহ নেই কিন্তু শকুন্তলার জীবনকে রসমাধুর্যে ও সঙ্গসুধাদানে যারা ভরিয়ে তুলেছিল, সেই দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার ভূমিকাও শকুন্তলার ভাবজীবনে তো বটেই গোটা নাটকের ক্ষেত্রেও গৌণ নয়। তারা সম্পূর্ণভাবেই শকুন্তলার নর্মসহচরী ও শুভার্থী বয়স্যা। সখীচরিত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে বড়ো কম নেই কিন্তু মাধুর্যে ও সরসতায় শকুন্তলার সখীদ্বয় অনন্য। শকুন্তলার কল্যাণ ও সন্তোষবিধান তাদের লক্ষ্য হলেও কালিদাস দুটি চরিত্রেরই স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য রক্ষা করেছেন। সেজন্য এই দুটি চরিত্র গতানুগতিক সখীদের মতো টাইপ চরিত্র হয়ে ওঠেনি। প্রিয়ংবদা তার নামসাদৃশ্যেই প্রিয়ভাষিণী ও সদাহাস্যময়ী। এছাড়াও সে রসিকা, চতুরা, কৌতুকপ্রিয়া, প্রাণচঞ্চলা ও বান্ধবীবৎসলা। দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন সংগঠনে তার দূতীয়ালি অসামান্য। শকুন্তলার হৃদয়-মনের তত্ত্বানুসন্ধানে সে সদাব্যস্ত। অপরদিকে অনসূয়ার প্রকৃতিও খুব সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত। নামসাদৃশ্যে সে অসূয়াহীন তো বটেই তার সঙ্গে সে স্বভাবত ধীর ও গম্ভীর। সমবয়সী হলেও মাতৃপরিত্যক্তা শকুন্তলার প্রতি ছিল তার অপরিসীম স্নেহ। মায়ের মতোই সে ক্ষমাশীলা, অশেষ ধৈর্যময়ী, অকল্যাণের আশঙ্কায় শঙ্কিহৃদয়া এবং শকুন্তলার হিতসাধনে সমর্পিতপ্রাণা। দুর্বাশা যখন শকুন্তলাকে অভিশাপ দেন, তখন সেই অভিশাপ তীক্ষ্ণ

শরের মতো যেন অনসূয়ার হৃদয়কেই বিদ্ধ করেছিল। তারই সকাতর ও সনির্বন্ধ অনুরোধে রোষাতুর মুনি অবশেষে ঐ শাপ খণ্ডনের উপায় বলে দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন। শকুন্তলার সমস্ত ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে তার দুই সখী এমন ওতপ্রোত বন্ধনে জড়িত হয়ে আছে যে তাদের ছাড়া শকুন্তলা তার সমগ্র মূর্তির এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার চেয়েও কিছু কম। তাই রাজসভায় দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যানের কারণ দর্শাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ছিল না।"[১৬৫]

শকুন্তলার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক এমন নিবিড় ও অবিচ্ছিন্ন, তার জীবনের বিকাশে ও পূর্ণতা দানে যাদের ভূমিকা এতখানি প্রয়োজনীয়, সেই প্রয়োজনটুকু ফুরনো মাত্রই কালিদাস তাদের যবনিকার আড়ালে ঠেলে দিয়েছেন। শকুন্তলাকে বিদায় দিয়ে পথের মধ্য থেকে যে অনসূয়া প্রিয়ংবদা ফিরে এল, তারপর তাদের হৃদয় কেমন হল, সখীর অভাব তারা কেমন করে অনুভব করল, তার সামান্যতম ইঙ্গিতও কালিদাস কোথাও রাখেননি। তাদের এরকম আকস্মিক অন্তর্ধান নাটকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হলেও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তা যে নিরতিশয় নিষ্ঠুরতা, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনোরূপ সংশয় ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায়, "তাহারা তো ছায়া নহে...তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী।"[১৬৬]। সখী শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ দেখে তারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছে। এই জ্ঞানবৃক্ষের ফল হল প্রেম। তপোবনে যে প্রেম ছিল অদৃষ্টপূর্ব, তার মায়া ও রোমাঞ্চ শকুন্তলার দেহে-মনে প্রত্যক্ষ দেখেছে তার সখীরা। তাই এখন অপরাহ্নকালে মাঝে মাঝে আলবালে জলসেচন করতে ভুলে যাওয়া তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, মৃগশিশুও হয়তো আগের মতো তাদের হাতের আদর আর পাবে না, হয়তো বা তাদের উন্মন মনের অগোচরে তপোবন প্রাঙ্গন থেকে এক আধদিন কোনো অতিথিও আহ্বান না পেয়ে ফিরে যেতে পারেন। হয়তো অনতিপিনদ্ধ বল্কল আর তাদের নববিকশিত যৌবনকে বেঁধে রাখতে পারছে না। তাদের কলহাস্যের ওপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতোই অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলেছে। সখীসংসর্গে অনসূয়া প্রিয়ংবদার এই নারীসত্তার জাগরণ, তাদের মানস পরিবর্তনের ইঙ্গিত কালিদাস পাঠককে কিছুই দেননি। এতে এই দুই চরিত্রের স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। এককভাবে শকুন্তলাকে ঘিরেই কালিদাসের কুলপ্লাবিনী কল্পনা এতখানি প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল যে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার খণ্ডিত আলেখ্যকে পূর্ণতাদানের অবসর কালিদাস আর পাননি।

কাদম্বরীর ‘পত্রলেখা’ এক অনন্যপূর্ব চরিত্র। তার কারণ নায়ক চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি খুবই অভিনব—সে পত্নী নয়, প্রেমিকা নয়, দাসীও নয়, সে চন্দ্রাপীড়ের নিত্য সহচরী। রাজাকে নিত্য সাহচর্য দান ছাড়া আর একটিমাত্র ভূমিকাই তার আছে, সে রাজার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী। রাজান্তঃপুরে রাজার পত্নী, প্রণয়িনী বা কিঙ্করী না হয়ে কেবল সহচরীরূপে একজন নারীর অবস্থান সচরাচর নজিরবিহীন। এরূপ কল্পনায় বাণভট্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সে ছায়ার মতো দিবারাত্র রাজার পার্শ্ববর্তিনী অথচ তাদের সম্বন্ধ কখনও প্রীতির মাপা দরজা পেরিয়ে কখনও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার অবকাশ পায়নি, এটা রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহী মনে কিছুটা অলীক বলে ঠেকেছে। ‘নবযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে, বাণভট্ট যেন পত্রলেখার বেলায় তা স্বীকার করতে চাননি। পত্রলেখাকে তিনি পাষাণপ্রতিমার মতো পুরুষের হৃদয়ের দ্বারে অক্লান্ত প্রহরীর মতো চিরজাগরুক রেখেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও হৃদয়ের দাবি নিয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেননি। এরূপ চরিত্রচিত্রণের মধ্যে অভিনবত্ব যতই থাক, এটি পত্রলেখার নারী অধিকারের স্বাক্ষরবিহীন এবং সেই কারণেই তা খণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমরা বলিব কবি অন্ধ। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে(পত্রলেখাকে) তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়-তৃষ্ণার্ত চিরবঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেল, সে-কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন।[১৬৭]

উপরোক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার মধ্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রচুর সহমর্মিতার পরিচয় থাকলেও সমালোচনার রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের এই মনস্তাপ কতখানি যুক্তিসংগত তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। প্রথম কথা, সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে সাহিত্যের সামগ্রিক আবেদনের সৌন্দর্য-মহিমার ওপর। স্রষ্টার কল্পনা সাহিত্যের মূল ভাবপরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে কিনা এবং রূপনির্মিতি ভাবের অনুরূপ হয়েছে কিনা, সৃষ্ট সাহিত্যের রসোত্তীর্ণতার পরীক্ষায় এইটিই প্রধান মানদণ্ড। এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলে বাকি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি গৌণ। এই একক সিদ্ধি পাঠকের মনকে এমন রসবোধে ভরিয়ে দেয় যাতে অন্য সব অভাব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সাহিত্যের সংশ্লেষণাত্মক অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারের পক্ষে ছিলেন, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে সাহিত্য-বিশ্লেষণের সপক্ষতা রবীন্দ্রনাথ

করতে পারেননি। এছাড়াও রামায়ণের মতো মহাকাব্য অথবা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'র মতো নাটক যুগ যুগ ধরে ভারতবাসীর ভাবরসকে সামগ্রিক মহিমায় সম্পূর্ণতা দান করে এসেছে, তাই এক আধটি চরিত্রের অপূর্ণতা নিয়ে এই দুটি মহত্তম শিল্পের সমালোচনা বাঞ্ছনীয় কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। দ্বিতীয় কথা, বর্তমান যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। এ যুগের সাহিত্যিককে তাই প্রত্যেকটি সৃষ্ট চরিত্রের বিশিষ্টতা দান করে আনুপূর্বিক মূর্তি গড়তে হয় কিন্তু প্রাচীনকালে সমষ্টিচেতনাই ছিল বড়ো। সামগ্রিকতাকে সামনে রেখেই সে যুগের কবিরা ভাব, আদর্শ, রস ও সৌন্দর্যবিকাশের ওপর যথাসাধ্য গুরুত্ব আরোপ করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোনও একটিমাত্র ব্যক্তিচরিত্রের অসম্পূর্ণতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ কী? বহু সহস্র বছর ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ এই সাহিত্যকে কীভাবে গ্রহণ করেছে, স্তব্ধ হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তা উপলব্ধি করাই শোভন ও সঙ্গত। 'রামায়ণ' সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যও সেরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ' প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা; কারণ সাহিত্য এখন হাটের জিনিস।"[১৬৮] অর্থাৎ জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাবাদর্শও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই আধুনিক সাহিত্য-সংস্কার দিয়ে প্রাচীন সাহিত্য বিচারের চেষ্টা খুব সমীচীন নয়। একালের বোধ ও বিশ্বাস দিয়ে সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যের রস আস্বাদ করতে গেলে কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাপকাঠি দিয়ে প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনা যে সম্ভব নয়, তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র জানিয়েছেন। তাঁর কথায়—

> এখনকার দিনে মনুষ্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেশি হইয়াছে; লোকটা কে এবং সে কী করিতেছে, ইহার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল। এইজন্যে ঘরে, বাহিরে চতুর্দিকে মানুষের ক্রিয়াকলাপ জীবনবৃত্তান্ত আমরা তন্ন তন্ন করিয়া পর্যালোচনা করিয়াও পরিতৃপ্ত হই না। কিন্তু সেকালে পণ্ডিতই বল, রাজাই বল, মানুষকে বড়ো বেশি কিছু মনে করিতেন না।...এইজন্য রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে লোকচরিত্রসৃষ্টি এবং সংসার বর্ণনার প্রাধান্য দেখা যায় না। ভাব এবং রস তাহার প্রধান অবলম্বন।[১৬৯]

কিন্তু 'কাব্যের উপেক্ষিতা' সমালোচনায় 'ভাব ও রস' অপেক্ষা ব্যক্তির স্বতন্ত্র মূল্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে, যা রবীন্দ্র চিন্তাধারায় বেশ ব্যতিক্রমী। কারণ সমালোচনায়

ব্যষ্টি নয়, সমষ্টি বা সামগ্রিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখাই রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ সমালোচনায় বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

> তিনি(বঙ্কিমচন্দ্র) একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দু-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক সূক্ষানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোনো কোনো অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেইজন্য মনঃক্ষোভে লেখককে তাহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসঙ্গত নয়।[১৭০]

অর্থাৎ এই অংশে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, বঙ্কিম রাজসিংহে ইতিহাসের স্রোতটির অব্যাহত গতিলীলা দেখাতে চেয়েছেন, তাই চরিত্রগুলির হৃদয়লীলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করতে পারেননি। রামায়ণ অথবা মহাভারতকারও অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমাজ ও ধর্মের গতিপ্রকৃতির রূপটি বেশ কিছু চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন, ঘটনার বিবরণ দেওয়া কিংবা চরিত্রচিত্রণ করা তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। রামায়ণকারের মূল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ভারতবাসীর ধর্মেকর্মে, সামাজিক বিধিবিধানে, জীবনের আদর্শ ব্যাখ্যানে। তাই রামায়ণের মতো মহাকাব্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সকল চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয় দান করার পরিসর বা সুযোগ যেমন নেই, প্রয়োজনও তেমন নেই।

এইদিক থেকে বিচার করলে রামায়ণ কিংবা শকুন্তলা পড়ে ‘ঊর্মিলা’ কিংবা ‘অনসূয়া-প্রিয়ংবদা’ সম্বন্ধে পাঠকের মনে সত্যই কোনো অসন্তোষ কিংবা অভাববোধ জাগে কিনা সন্দেহ। ‘রামায়ণ’ কোনো খণ্ডকাব্য নয় যে সেখানে দুটি একটি ঘটনা কিংবা চরিত্রই প্রধান হয়ে উঠবে। বিচিত্র ঘটনা, অজস্র চরিত্র আর বিবিধ বর্ণসম্পাতে অসংখ্য চিত্রের বিপুল সমারোহে জাতির যৌথ জীবনের যে বিরাট রূপ প্রকাশ পায় মহাকাব্যকার সেই জীবনেরই ব্যাখ্যাতা ও রূপকার। এই বিরাট প্রেক্ষাপটে শত শত চরিত্রের সকলের প্রতিই সমান গুরুত্ব আরোপ একেবারেই অসম্ভব

ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, রামায়ণ গৃহাশ্রমের কাব্য। বিপুল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ভারতবাসীর গৃহাশ্রমের রূপকে প্রকট করে তোলাই বাল্মীকির মূল লক্ষ্য। ভাতৃপ্রেম গৃহধর্মের একটি মূল ভিত্তি। তাই রামন্দ্রকে কেন্দ্র করে ভ্রাতৃভক্তির অপূর্ব সৌন্দর্য বিকাশের জন্য লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন কাব্যে স্থান পেয়েছে। গার্হস্থ্য আদর্শকে পূর্ণতর ও স্ফুটতর করার জন্য লক্ষ্মণবধূ ঊর্মিলার পাশাপাশি বাল্মীকি ভরতপত্নী মাণ্ডবী ও শত্রুঘ্নপত্নী শ্রুতকীর্তিকেও কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন কিন্তু তাদের কাউকেই কাব্যে সীতার মতো জায়গা দেননি অথবা কাব্যের মূল লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসী থেকে তাদের কাউকেই সীতার সমকক্ষ করে নির্মাণ করেননি। রামায়ণে ঊর্মিলার যা ভূমিকা, যেটুকু ভূমিকা, মাণ্ডবী কিংবা শ্রুতকীর্তিরও ততটুকুই। ঊর্মিলার মতো এরাও কাব্যমধ্যে বাল্মীকির দ্বারা হীন গুরুত্ব পেয়েছেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের মতো স্রষ্টা যে সৃষ্টির এই মূল রহস্যটুকু জানতেন না তা নয়, ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসেই ঊর্মিলার পাশাপাশি মাণ্ডবী কিংবা শ্রুতকীর্তিকেও কাব্যের উপেক্ষিতা বলে চিহ্নিত করতে পারতেন। তাঁর অনুপম কল্পনাশক্তি ও ভাষাশৈলী তাঁকে একাজে নিশ্চিত সাহায্য করত কিন্তু তবুও তিনি যে মাণ্ডবী বা শ্রুতকীর্তিকে ছেড়ে ঊর্মিলাকেই 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলে নির্দেশ করেছেন, তার একটি প্রধান কারণ সম্ভবত 'ঊর্মিলা' নামটির মোহ। নামের আকর্ষণই তাঁকে ঊর্মিলা সম্পর্কে অতি-সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি প্রবন্ধ-মধ্যে স্পষ্ট— "আমি বলিতে পারি, সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্যযজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ঊর্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দেই। বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই।"[১৭১]

নামকে রবীন্দ্রনাথ বৃহৎ নন্দনকলার একটি অংশ বলে মনে করতেন। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তাঁর গ্রন্থের ও গ্রন্থের চরিত্রাদির নামকরণ তিনি করেছেন। এছাড়া প্রকৃতির নানা অজ্ঞাতপরিচয় ফুলের তিনি নবনামকরণ করেছেন; তাঁর ঘনিষ্ঠ অথবা ঘনিষ্ঠ নয় এমন বহু নবজাতক-জাতিকা ও শান্তিনিকেতনের বহু ভবনাদির নামকরণ তাঁর সুকুমার সৌন্দর্য-চেতনার একটি তাৎপর্যময় প্রকাশ। তাই ব্যক্তি বা বস্তুর নাম চিরদিনই তাঁর কাছে অশেষ মর্যাদাভাগী হয়েছে। নামের এই মহিমা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"মানুষের মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে।"[১৭২] দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 'দ্রৌপদী' নামটি যেমন তেজ, দৃঢ়তা, শক্তি ও সম্ভ্রমসূচক, ঊর্মিলা নামটি তেমনই কোমলতা, মিষ্টতা, শ্রী-

সৌন্দর্য ও শালীনতাশোভনতাসূচক। মধুর ও সুকোমল নামের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত সবাই জানেন। তাই মনে হয় ঊর্মিলা নামের মাধুর্যই ঐ চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও মমতা জাগ্রত করেছে এবং সেই মমতার কারণেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে 'ঊর্মিলা'কেই কাব্যের উপেক্ষিতা বলে চিহ্নিত করেছেন। ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনার লক্ষণ মেনে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য-সমালোচনার চিরাচরিত পন্থা-পদ্ধতি ত্যাগ করে কেবল আপন হৃদয়ের সাক্ষ্যকেই প্রামাণ্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং নিজ হৃদয়ের সেই অনুভূতিটুকুকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন। নিরপেক্ষ বিচারে আজকের পাঠক নিশ্চয় রামায়ণ পড়তে গিয়ে ঊর্মিলাকে উপেক্ষিতা বলে মনে করবেন না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পাঠকালে সহৃদয় পাঠকের চোখে বাল্মীকির ঊর্মিলা সকরুণ মূর্তিতে ধরা দেয়, পাঠকের মনকে সহানুভূতির রসে আর্দ্র করে তোলে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-কৌশল এখানেই সার্থক।

'শকুন্তলা' নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে অনুযোগ সূক্ষ্ম বিচারে তাও খণ্ডিত হতে পারে। নাটক মহাকাব্যের থেকেও অনেক বেশি সংহত শিল্প। একটি সুনির্দিষ্ট কালগত সীমার মধ্যে, নাতিদীর্ঘ একটি কাহিনির আধারে কয়েকটি পাত্রপাত্রীর দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনের রূপটিকে ফুটিয়ে তোলাই নাট্যকারের কাজ। সেই কারণে নায়ক-নায়িকা ও তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের জীবন-সমস্যাকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য নাট্যকার অন্যান্য চরিত্রকে দু-একবার দর্শকের সামনে আনেন, তাদের দিয়ে নির্ধারিত ভূমিকা পালন করান অবশেষে ভূমিকাপালনান্তে তাদের যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত করে দেন। নাট্যশিল্পের এটাই স্বাভাবিক দাবি।

শকুন্তলার কন্বাশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেছেন। এটি নাট্যকারের এক আশ্চর্য শিল্পকৌশল। কন্বের তপোবনে আজন্ম বেড়ে ওঠা শকুন্তলার সঙ্গে এই প্রথম তপোবনের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতলস্পর্শী ও অখণ্ড করে তোলার জন্য প্রয়োজন ছিল এক নিশ্ছিদ্র নীরবতার। এই নীরবতাই সেই বিচ্ছেদ মুহূর্তের ভাব-ব্যঞ্জনাকে শিল্পগতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। তাই অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সম্বন্ধে লেখনীকে নীরব রেখে কালিদাস তাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়টিকে দর্শকের মানসনেত্রে উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। শকুন্তলা যদি ফুল হন, তবে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা শকুন্তলারূপ ফুলের অলংকরণ। কন্বাশ্রমে যেমন অনসূয়া-প্রিয়ংবদা তেমনই দুষ্মন্তের রাজসভায়

শকুন্তলার সঙ্গী ছিলেন শার্ঙ্গরব, শারদ্বত আর গৌতমী। কিন্তু এরা সকলেই পার্শ্ব-অলংকার হিসেবে শকুন্তলা চরিত্রকেই সম্যকভাবে বিকশিত করেছে। এই চরিত্রগুলিকে শকুন্তলার পাশে উপযুক্তভাবে সন্নিবেশিত করে কালিদাস এদের নির্দিষ্ট ভূমিকাটুকু পালন করিয়েছেন। কিন্তু তবুও অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সৃষ্টিসার্থকতা এইখানে যে নাট্যকার যেখানে তাদের যবনিকার আড়ালে ঠেলে দেন, সেখান থেকেই দর্শকের মনের আয়নায়, দর্শকের কল্পনায় তারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে চিরজাগরুক থাকে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "(অনসূয়া-প্রিয়ংবদা) নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।"[১৭৩] প্রিয়সখীর বিচ্ছেদ তাদের কতখানি কাতর করেছে বা শকুন্তলার যৌবন-চাঞ্চল্য তাদের যুবতী দেহমনকে কতখানি সংক্রমিত করবে, আপন আপন যৌবনভারাক্রান্ত উন্মনা মন শকুন্তলার মতো তাদেরও অতিথি আপ্যায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে কিনা দর্শক কল্পনার চোখে তা প্রত্যক্ষ করে আজও রসানন্দ লাভ করেন, রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির মধ্যেই অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো অনিঃশেষ চরিত্রের সৃষ্টি-সার্থকতা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

একমাত্র 'পত্রলেখা' চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের দাবি নিয়ে যে অনুযোগটুকু তুলেছেন, সত্য ও বাস্তবের দিক থেকে তাকে সমর্থন করা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে যথার্থই দেখিয়েছেন যে সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্য এক নয়। এক না হলেও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। পাঠক সাহিত্যের দর্পণে জীবনেরই ছবি দেখেন, কিন্তু সে ছবি বাস্তবের হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, তা স্রষ্টার আবেগ ও কল্পনা দিয়ে গড়া রসের প্রতিমূর্তি। তবু তা জীবনবিবিক্ত নয়। বাণভট্ট পত্রলেখা চরিত্রটিকে যে রূপে নির্মাণ করেছেন, তা সাধারণ পাঠকের অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সঙ্গে মেলে না। পত্রলেখা যুবতী, সুন্দরী, সে রাজা চন্দ্রপীড়ের ঘনিষ্ঠ সহচরী, সে সাধিকাও নয়, সন্ন্যাসিনীও নয় অথচ তার হৃদয় একেবারে শুষ্ক। অথচ চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছিল রোহিণীর সাযুজ্যে। চন্দ্রের বধূ রোহিণী পরবর্তী জীবনে চন্দ্রস্বরূপ চন্দ্রাপীড়ের সান্নিধ্যলাভের আশায় মর্ত্যে পত্রলেখারূপে আবির্ভূত হন। অথচ চন্দ্রের প্রতি রোহিণীর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তা পত্রলেখার চরিত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়নি। বাণভট্ট পত্রলেখাকে শুধুমাত্র রাজার সেবাধিকারিণী রূপে এঁকেছেন অথচ সে রাজার ঘনিষ্ঠ সহচরী। রাজগৃহে অজস্র ধারায় প্রেমতরঙ্গ উচ্ছলিত হচ্ছে। এর প্রতি যে পত্রলেখার আগ্রহ নেই, তাও নয়। কাদম্বরীর প্রেম-প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের দুঃখ নিয়ে পত্রলেখা গভীর সহানুভূতিশীল। কাদম্বরীকে দুঃখ দেওয়ার জন্য সে চন্দ্রাপীড়কে মৃদু তিরস্কারও করেছে। অথচ তার নিজের

হৃদয়ের কোনও সংবাদ বাণভট্ট পাঠককে দেননি। কাদম্বরীর হৃদয়-সংবাদ সে চন্দ্রাপীড়ের কাছে বহন করে এনেছে অথচ 'কোনোদিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসেও' তার নারীহৃদয় মূক হয়ে রয়েছে। পত্রলেখা রাজার নিত্যসহচরী হওয়ায় সে অন্তঃপুর ত্যাগ করেছে সত্য কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের সমীপবর্তী হলে 'স্বভাবতই যে একটি সঙ্কোচে সাধ্বসে এমনকি সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই।' তাই বাণভট্টের অঙ্কিত পত্রলেখা নারীমনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক দাবি নিয়ে রচিত হয়নি। শুধু তাই নয় চন্দ্রাপীড়ের কাছে কাদম্বরী-চিত্তের বার্তা বহন করে এনে দিয়ে রাজার প্রিয়তর হয়ে ওঠবার বর্ণনায় বাণভট্‌ট শুধু পত্রলেখার নারী চরিত্রের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করেননি, তার নারীত্বের স্বাভাবিক আবেদনকেই অপমানিত করেছেন। পত্রলেখা চরিত্রের এই অস্বাভাবিকত্ব পাঠকের মনকে পীড়িত করে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> প্রেমের উচ্ছসিত অমৃত-পান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ঘ্রাণেও কি কোনোদিনের জন্য তাহার কোনো একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই! সে কি চন্দ্রাপীড়ের ছায়া! রাজপুত্রের তপ্ত যৌবনের তাপটুকু মাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই! কবি সে-প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা![১৭৪]

আসলে বাণভট্টের দৃষ্টি মহাশ্বেতা-কাদম্বরীর দিকে এতটা নিবদ্ধ ছিল যে পত্রলেখাকে নারীর পূর্ণ মর্যাদা দিতে তিনি কুণ্ঠিত হয়েছেন অথবা পত্রলেখার হৃদয়-রহস্য সম্বন্ধে তার স্রষ্টার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। চন্দ্রাপীড় নিজে না হয় কাদম্বরীর প্রতি গভীরভাবে আসক্ত কিন্তু পত্রলেখার হৃদয়ের তো কোনো অবলম্বন নেই। এই দুটি নরনারী যারা পরস্পর প্রীতিরসে আসক্ত, তাদের হৃদয়ঘটিত দুর্বলতা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিলে সেটাই হত স্বাভাবিক। তবে এই নারীচরিত্রের মর্যাদা কিছুটা হলেও রক্ষিত হত। কিন্তু তা না হওয়ায় এই চরিত্রটি খণ্ডিত বা অর্ধ-অঙ্কিত হয়েছে। কাহিনির স্বার্থে পত্রলেখা যেন কাহিনির বাইরেই রয়ে গেছে। কারণ বাণভট্ট তার গ্রন্থের একজোড়া নায়িকা ও তাদের তিন জন্মের নায়কদের নিয়ে এমন ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন, যে পত্রলেখার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ পাননি। তাই রবীন্দ্রনাথের কথাই এখানে যথার্থ বলে মেনে নিতে হবে—"কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয়, অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।"[১৭৫]

অতএব আমাদের বিচারে এই বিশেষ প্রবন্ধটিতে ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’ বলে যদি কাউকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে পত্রলেখাই যথার্থভাবে এই বিশেষণের উপযোগী।

জয়দেব ও তাঁর গীতগোবিন্দ

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার শেষ পর্যায়ের কবি এবং বাংলাদেশের কবি। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়স থেকেই আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। ‘গীতগোবিন্দ’ বইটির বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে তিনি নানাসময় বেশ কিছু আলোচনা ও অভিমত পোষণ করেছেন। তাই গীতগোবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করে আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করব।

যাদের মন ‘হরিস্মরণে সরস’ এবং একইসঙ্গে ‘বিলাসকলায় কৌতূহলী’ তাদের জন্য ‘পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী’ কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখেছেন বলে উপক্রমণিকায় জানিয়েছেন। এখন এই হরিস্মরণ আর বিলাসকলা অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ও ইন্দ্রিয়পরতাকে আড়াআড়ি করে না রেখে এদের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে ধর্মাচরণের একটি ধারা বাংলায় কখনও বৌদ্ধ-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর হাত ধরে আবার কখনও বৈষ্ণবদের একটি অংশের মধ্যে দিয়ে প্রচলিত হয়েছিল। বাংলার ধর্মসাধনার ইতিহাসে একে ‘সহজিয়া সাধনার ধারা’ নামে চিহ্নিত করা হয়। জয়দেব যে সেই বৈষ্ণব সহজিয়া গোষ্ঠীর আদিকবি তাঁর রচিত কাব্যের উপক্রমণিকাতেই সেই আভাষ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের মনে অথবা বৈষ্ণব ভক্তমহলে জয়দেবকে ভক্তকবিরূপে স্বীকার করা হলেও আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে প্রায় কেউই জয়দেবকে ভক্তিরসের কবি বলে স্বীকার করেননি। কারণ এই কাব্য আদ্যন্ত শৃঙ্গাররসের কাব্য। শুধু শৃঙ্গাররসের কাব্যই নয়, এর স্থানে স্থানে আদিরসের উচ্ছলিত তরঙ্গ ও দেহকামনার অলজ্জ প্রকাশ ইদানিংকালের মার্জিত রুচির পাঠককে পীড়া দেবে। তাই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচকদের অগ্রগণ্য বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবি হিসেবে জয়দেবকে উচ্চস্থান দিলেও তাঁর কাব্য যে আধ্যাত্মিকজাতীয়, তা স্বীকার করতে চাননি। ‘বিদ্যাপতি ও জয়দেব’ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন—“জয়দেব যে প্রণয় গীত

করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী।...জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ...জয়দেব ভোগ...ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ,জয়দেব।"[১৭৬]

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের উৎসাহী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ সরাসরি মন্তব্য করেছেন, "এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।"[১৭৭]

জয়দেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বতন্ত্র কোনো প্রবন্ধ লেখেননি, কিন্তু জয়দেবের কাব্য নিয়ে তার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বরাবর বজায় ছিল। এই ঔৎসুক্যের একটি প্রমাণ আছে বন্ধু প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠিতে। একটি চিঠিতে লিখছেন—"জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখলে কি? জয়দেবকে কী ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝতে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?"[১৭৮] এর পরের চিঠিতেই পুনরায় লিখছেন, "তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম।"[১৭৯] এই শেষ চিঠিটি যবে রচিত হয়েছিল, তার একমাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৯০ সালের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী 'জয়দেব' শিরোনামে প্রবন্ধটি লেখেন। এই প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী লেখেন,

> (এই গ্রন্থে) রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সকলেই যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে ঠিক প্রেম নহে। জয়দেব-বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ; তাহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট।...হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাহার কারবার...আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নাই।[১৮০]

প্রমথ চৌধুরীর লেখা এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পড়েছিলেন। আর বলেন্দ্রনাথের লেখা প্রবন্ধটি তো রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'সাধনা'তেই প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এঁদের প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহমত হয়েছিলেন, বিরোধী হলে সে কথা নিজে প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করতেন। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে পূর্ববর্তী সমালোচকদের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথও গীতগোবিন্দকে আধ্যাত্মিকতাবর্জিত ইন্দ্রিয়াসক্তির কাব্য হিসেবেই মনে করতেন।

তবে গীতগোবিন্দের বিষয় যাই হোক না কেন, এর মণ্ডনকলা, ভাষা ও ছন্দের লালিত্য রবীন্দ্রনাথকে আশৈশব আকর্ষণ করত, তার পরিচয় 'জীবনস্মৃতি'তে বিস্তৃতভাবে রয়েছে। এখানে তিনি জানিয়েছেন,--

> একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে-জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।[১৮১]

রবীন্দ্রনাথের এই কথা থেকেই পরিষ্কার, ছন্দে-কথায় জড়িত যে শ্রবণমনোহরতা, বাল্যকালে গীতগোবিন্দের সেই বৈশিষ্ট্যটুকুই তাঁর মন টেনেছিল। গীতগোবিন্দে 'বর্ষাপ্রকৃতির' যে বর্ণনা তাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বিশেষ করে মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি—"মেঘৈর্মেদুরমম্বরম বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ" শীর্ষক শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ নানা অনুষঙ্গে পদ্যে-গদ্যে-চিঠিপত্রে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় এই প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠেছে—

আষাঢ় হতেছে শেষ   মিশায়ে মল্লার দেশ

রচি 'ভরাবাদরের সুর

খুলিয়া প্রথম পাতা   গীতগোবিন্দের গাথা

গাহি 'মেঘে অম্বর মেদুর'[১৮২]

এছাড়াও মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় ও একাধিক চিঠিপত্রে কবি বর্ষার অনুষঙ্গে জয়দেবকে ব্যবহার করেছেন। তবে জয়দেবের কাব্যের শব্দের ধ্বনিমাধুর্য ও ছন্দোরীতিই যে তাঁকে সবচেয়ে চমৎকৃত ও প্রভাবিত করেছিল, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা জানিয়েছেন—

আমার মনে আছে ‘নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং’—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটা সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে ‘নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং’ এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি ‘অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষং হরিবিরহদহনেন বহুদূষণং’ এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।[১৮৩]

রবীন্দ্রনাথের মতে গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রধান সম্পদ হল এর ভাষালালিত্য এবং ছন্দোবিন্যাসের অপূর্বতা। বাংলা ভাষায় ‘সরল কলাবৃত্ত’ নামক যে নতুন ধরণের ছন্দ রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেন, তার পেছনে গীতগোবিন্দের সক্রিয় অবদান আছে। আধুনিক গীতিকাব্যের যা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ গেয় না হয়েও শব্দ ও ছন্দের যুগ্ম দোলায় পাঠকের মনে গীতিরসের সঞ্চার করা, গীতগোবিন্দ তার পরাকাষ্ঠা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ এও মনে করেছেন মধুরকোমলকান্ত জয়দেবের পদ স্বভাবতই এমন ধ্বনিস্পন্দ তৈরি করতে পারে, যেখানে সুর বাহুল্য। শব্দের উচ্চারণমাত্রেই তা সুরের রেশ কানে ধ্বনিত করে তোলে, পৃথক করে সুর সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—“জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না ; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে।”[১৮৪]

কিন্তু জয়দেব সমালোচনার আর একটি স্বরও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাওয়া যায়। জয়দেবের ভাষা ও ছন্দ যতই মনোহর হোক না কেন, তা প্রসাধিত মুখের মতোই কৃত্রিম বলে মনে হয়। হৃদয়ের গভীর স্তরকে তা ততখানি স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মনে হয়েছে ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে Lyrics বলে’ গীতগোবিন্দ তা নয়। কারণ যেহেতু সাধারণের মুখের ভাষা নয়, তাই সেই মৃত ভাষার আশ্রয়ে মানুষের হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করে বলা যায়

না। এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় তিনি বলেছেন—“বাঙালি জয়দেব সংস্কৃতেও গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।”[১৮৫] ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে তাঁর নিজের বই ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ সম্পর্কে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, একটু কষে বাজিয়ে দেখলেই তার মেকি ধরা পড়ে যায়। গীতগোবিন্দ সম্বন্ধেও তাঁর মনোভাব কতকটা সেইরকম ছিল। জয়দেবের প্রসাধিত শ্লোক মনকে আকৃষ্ট করলেও মনকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। আর গভীরতাতেও তা কালিদাসের সমতুল নয়। ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ বই এর ‘কেকাধ্বনি’ শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি বিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন—“জয়দেবের ‘ললিতলবঙ্গলতা’ ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়।”[১৮৬]

ঐ একই স্থানে জয়দেবের সঙ্গে তুলনায় তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক—‘আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং/বাসো বসানা অরুণার্করাগম্/পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাগ্রনম্রা/সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব’ শ্লোকটি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, কালিদাসের কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল হলেও এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতা অপেক্ষাও কানে মিষ্টি শোনাচ্ছে, কারণ মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করে দিচ্ছে। এই শ্লোকে ছন্দের যে দোলা তা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নয় কিন্তু তা নিগূঢ়। এই শ্লোকে একটি অনির্বচনীয় ভাবের সৌন্দর্য আছে, যা মনের সঙ্গে চক্রান্ত করে অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, যে সংগীত শব্দসংগীতকে ছাড়িয়ে চলে যায়।[১৮৭]

যা স্বভাবতই মিষ্ট মন তা মনকে সহজেই অলস করে ফেলে। মনের স্বাভাবিক সৃজনীশক্তিকে তা ডালপালা মেলতে দেয় না। জয়দেবের এইখানেই সীমাবদ্ধতা। পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার বিশেষ বদল ঘটেনি। ‘সাহিত্যতত্ত্ব’ শীর্ষক প্রবন্ধেও কালিদাস ও জয়দেবের তুলনামূলক বিচারে তাঁকে বলতে শুনি—“ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন মধুর হতে পারে, কিন্তু ‘বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী’ মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের।”[১৮৮]

এইভাবে জয়দেবের মনোহারী শব্দ ও ছন্দের প্রশংসা ও সীমাবদ্ধতা দুইই রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে দেখিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃ-৩১।

২. তদেব, পৃ-৬৪।

৩. দ্রষ্টব্য : 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপি, তদেব, পৃ-৭১৪।

৪. এই অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য: *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ-১১১।

৫. কালিদাস প্রণীত *কুমারসম্ভব* কাব্যের প্রথম সর্গের পঞ্চদশ সংখ্যক শ্লোক এটি। দ্র: কেদারনাথ তর্করত্ন অনূদিত, *মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভব,* অমৃতলাল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১২৭৮ব, পৃ-৫।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানবসত্য', *মানুষের ধর্ম,* বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃ-৭৬।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,* 'অধ্যায়-৩', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২০, পৃ-৫১১।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮-৪৯।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃ-১৩৭।

১১. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি,* শিশির পাবলিশিং, ১৩২৬ ব, পৃ-১৬৭।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-৯ [হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত], বিশ্বভারতী, ১৯৬৫, পৃ-৪৬।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', *ইতিহাস,* বিশ্বভারতী, ১৩৬২ ব, পৃ-২৪-২৫।

১৪. শঙ্করাচার্য্য (শ্রীমৎ), *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* শ্রী নৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৬, পৃ-৪৩৮।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রার্থনা', 'শান্তিনিকেতন-১', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৯।

১৬. তদেব, পৃ-১৭৯।

১৭. তদেব, পৃ-১৮০।

১৮. ক্ষিতিমোহন সেন, 'ভূমিকা', *দাদূ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪২ ব, পৃ-৫।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মপরিচয়,* বিশ্বভারতী, ১৩৫০ ব, পৃ-৫৩।

২০. অগ্নিপুরাণের শ্লোক। আনন্দবর্ধন 'ধ্বন্যালোক'এ ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র,* আনন্দ, ১৩৯৬ ব, পৃ-৩৪।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৭।

২২. দ্রষ্টব্য: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির কৈফিয়ৎ', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ ব, পৃ-৩৩।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯৩।

২৫. দ্রষ্টব্য: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র,* পূর্বোক্ত, পৃ-৯৭।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তথ্য ও সত্য' *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-৪৭।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-৯।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির কৈফিয়ৎ', পূর্বোক্ত, পৃ-২৯।

২৯. আচার্য ধনঞ্জয়, 'দশরূপক', ৪র্থ কারিকা, ৯০ নং শ্লোক। দ্রষ্টব্য: জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬, পৃ-১৮২।

৩০. তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ৬ নং শ্লোক। দ্রষ্টব্য: স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৬ ব, পৃ-২৬২।

৩১. বিশ্বনাথ কবিরাজ, [বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত], *সাহিত্যদর্পণঃ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮, পৃ-৯৬।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮-৯।

৩৩. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণঃ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৯।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৮।

৩৫. ঐতরেয় উপনিষদের ৬ নং শ্লোক। দ্রষ্টব্য: স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৬ ব, পৃ-৩৪১।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যতত্ত্ব', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৩।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি', *ছন্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৮, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৩৬।

৩৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৬-১৭।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রাপথ', *আকাশপ্রদীপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৩।

৪১. তদেব, পৃ-১৩৪।

৪২. তদেব, পৃ-১৩৪।

৪৩. তদেব, পৃ-১৩৪।

৪৪. তদেব, পৃ-১৩৪।

৪৫. তদেব, পৃ-১৩৫।

৪৬. তদেব, পৃ-১৩৭।

৪৭. তদেব, পৃ-১৩৫।

৪৮. তদেব, পৃ-১৩৫-১৩৬।

৪৯. তদেব, পৃ-১৩৬।

৫০. রবীন্দ্রনাথকৃত বাল্মীকি রামায়ণের উদ্ধৃতি, তদেব, পৃ-১৩৫।

৫১. তদেব, পৃ-১৩৫।

৫২. তদেব, পৃ-১৩৬।

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা', *ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ-৩০।

৫৪. তদেব, পৃ-৩৩।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের মাত্রা', *সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২০, পৃ-৫৯৪।

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভাযাত্রীর পত্র-৭, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৮, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬১।

৫৭. তদেব, পৃ-১৬২।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রস্তাবনা', *রক্তকরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ-৩২।

৫৯. তদেব, পৃ-৩২।

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অপূর্ব রামায়ণ', *পঞ্চভূত*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪২১-৪২২।

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', *প্রাচীন সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪০।

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুরস্কার', *সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৮৫।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধম্মপদং', *ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২২।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা', পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮।

৬৫. তদেব, পৃ-২৬-২৭।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভাযাত্রীর পত্র-৭*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬২।

৬৭. Tagore Rabindranath, 'A Vision of India's History', Visva-Bharati quarterly, 1923, p-26.

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বাস', *শান্তিনিকেতন-৬, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৯৭।

৬৯. Tagore Rabindranath, 'A Vision of India's History', Visva-Bharati quarterly, 1923, p-27.

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভাযাত্রীর পত্র-৭*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬১।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে চিত্রবিভাগ', *সাহিত্যের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ-৬১৩।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৮, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৮।

৭৩. দ্রষ্টব্য: অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি, 'ভূমিকা', *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-৮।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৮।

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মহাত্মা গান্ধী, *মহাত্মা গান্ধী*, বিশ্বভারতী, ১৩৪০ ব, পৃ-১২।

৭৬. Nehru Jawaharlal, *The Discovery of India*, Oxford University Press, Delhi, 1946, p-108.

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মুক্তির উপায়, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৩, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৪৪।

৭৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-৬৫৪।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'দেশহিত', *সমূহ*, পরিশিষ্ট, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১০, বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ ব, পৃ-৪০৮।

৮০. ভগবতগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৮ সংখ্যক শ্লোক। দ্র: *ভগবতগীতা,* গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ১৩৮০ব, পৃ-১০২।

৮১. Jha Ganganatha (translated), *The Chandogyopanishad*, Oriental Book Agency, Poona, 1942, p-140.

৮২. দ্রষ্টব্য: প্রবোধচন্দ্র সেন, *ধম্মপদ পরিচয়,* বিশ্বভারতী, ১৩৬০ ব, পৃ-৬-৭।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ঘরে-বাইরে, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৫০৫।

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পারস্যযাত্রী,* অধ্যায়-১, বিশ্বভারতী, ১৩৭০ ব, পৃ-১১।

৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মহাত্মা গান্ধী,* পূর্বোক্ত, পৃ-১২।

৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চতুরঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৯, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৮।

৮৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভাযাত্রীর পত্র-১, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৭।

৮৮. Rabindranath Tagore, 'The problem of Self', *Sadhana*, Viswa-bharati, p-132.

৮৯. সুধীরচন্দ্র কর, *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা,* ওরিয়েন্ট বুক, ১৩৯৩ ব, পৃ-১৩৬।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বুদ্ধদেব', *বুদ্ধদেব,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০, পৃ-১।

৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্রহ্মবিহার', *বুদ্ধদেব,* তদেব, পৃ-১৩।

৯২. তদেব, পৃ-১৬।

৯৩. তদেব, পৃ-২৩।

৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ধম্মপদং', *ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২৩।

৯৫. তদেব, পৃ-৬২২।

৯৬. তদেব, পৃ-৬২৪।

৯৭. তদেব, পৃ-৬২৫।

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *‘ঐতিহাসিক চিত্র’*, *ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪২-১৪৩।

৯৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, এস কে লাহিড়ী এন্ড কোং, ১৯০৯, পৃ-১৫৪।

১০০. দ্রষ্টব্য: Wilson Horace (translated), *Mehga Duta or Cloud Messenger*, published by Upendralal Das, 1890, Calcutta, p-6.

১০১. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত*, এম.সি.সরকার এন্ড সন্স, ১৯৫৭, পৃ-৪১।

১০২. Wilson Horace (translated), *Mehga Duta or Cloud Messenger*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

১০৩. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত*, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

১০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা ভাষা পরিচয়-১১, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৫।

১০৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের মাত্রা’, *সাহিত্যের স্বরূপ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৯৬।

১০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, খণ্ড-৫, বিশ্বভারতী, ১৩৫২ ব, পৃ-১৪১।

১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মেঘদূত’, *মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৬১।

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বসন্ত ও বর্ষা’, *বিবিধ প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৪।

১০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মেঘদূত’, *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯।

১১০. তদেব, পৃ-১৩৯।

১১১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পা), ‘সাহিত্য’, ভাদ্র-১২৯৮ ব, পৃ-১৮।

১১২. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কাব্যকৌতুক*, বিচিত্রা, ১৩৬২ ব, পৃ-১৩৫-১৩৬।

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানসসুন্দরী', *সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৩৪।

১১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৩৮ সংখ্যক কবিতা', *শেষ সপ্তক, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১২, পৃ-২৩১-২৩২।

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৩।

১১৬. তদেব, পৃ-২৬৪।

১১৭. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮।

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নববর্ষা', *বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮।

১১৯. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭।

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাজে কথা', *বিচিত্র প্রবন্ধ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩।

১২১. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬।

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুমারসম্ভব গান', *চৈতালী, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১১, পৃ-৫১।

১২৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র', *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ,* খণ্ড-৫, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৪, পৃ-১৩৭।

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৪।

১২৫. চন্দ্রনাথ বসু, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের অর্থ', *শকুন্তলাতত্ত্ব,* ক্যানিং লাইব্রেরি [যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত], ১২৮৮ ব, পৃ-৪৯।

১২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬১।

১২৭. তদেব, পৃ-২৬১।

১২৮. তদেব, পৃ-২৫৯।

১২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’, *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৭।

১৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তপোবন’, *শান্তিনিকেতন-৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৮৯।

১৩১. তদেব, পৃ-৫৮৯।

১৩২. Tagore Rabindranath, ‘The Religion of Forest’, *Creative Unity,* Macmillan, London, 1922, P-53.

১৩৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা’, *বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-৬৫৭।

১৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শকুন্তলা’, *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৯।

১৩৫. তদেব, পৃ-১৫২।

১৩৬. Carolyn, Merchant, ‘Ecofeminism’, *Radical Ecology,* Routledge, New York, 2012, P-193-221.

১৩৭. নবেন্দু সেন (সম্পাদিত), ‘ইকোক্রিটিসিজম’, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,* রত্নাবলী, পৃ-৬৬১।

১৩৮. হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য,* নিউ এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, ২০০৩, পৃ-১১২।

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তপোবন’, *শান্তিনিকেতন-৯, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৯২।

১৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শকুন্তলা’, *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৫।

১৪১. তদেব, পৃ-১৫৬।

১৪২. তদেব, পৃ-১৪৭।

১৪৩. এই তথ্যগুলির জন্য দ্রষ্টব্য: হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য,* নিউ এস ব্যানার্জি এন্ড কোং, ২০০৩, পৃ-১২৪।

১৪৪. Monier Williams (Translated), *Sakuntala by Kalidasa,* Oxford University Press, London, 1899, P-6.

১৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সৌন্দর্যবোধ', *সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৫।

১৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কবির দীক্ষা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৩, পূর্বোক্ত, পৃ-৩১২।

১৪৭. তদেব, পৃ-৩১৫।

১৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শকুন্তলা', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৬।

১৪৯. তদেব, পৃ-১৫৭।

১৫০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *সীতারাম, বঙ্কিম-রচনাবলী,* খণ্ড-২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ-৪৫৬।

১৫১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', *বিচিত্র প্রবন্ধ-১, বঙ্কিম রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২৪।

১৫২. ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী,* গ্রন্থ নিলয়, ১৩৪০ ব, পৃ-১৪৬।

১৫৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কালিদাস ও সেক্ষপীয়র', *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ,* খণ্ড-৫, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৪, পৃ-১৩৯।

১৫৪. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *সমালোচনা-সাহিত্য,* গ্রন্থ-প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ-৩৬৮-৩৬৯।

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শকুন্তলা', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৬।

১৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরীচিত্র', *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৯।

১৫৭. তদেব, পৃ-১৬০।

১৫৮. তদেব, পৃ-১৬১।

১৫৯. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *কাদম্বরী,* 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য রূপা এন্ড কোম্পানি, ১৯৬৪, পৃ-৩-৯।

১৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরীচিত্র', পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৬-১৬৭।

১৬১. তদেব, পৃ-১৬৪-১৬৫।

১৬২. দ্রষ্টব্য: ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়,* পুথিঘর, ১৩৬০ ব, পৃ-৯২-৯৩।

১৬৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব,* চতুর্থ সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, ১৮৭৯, পৃ-৫৮।

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাব্যের উপেক্ষিতা', *প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৭।

১৬৫. তদেব, পৃ-১৬৯।

১৬৬. তদেব, পৃ-১৬৯।

১৬৭. তদেব, পৃ-১৭২।

১৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৭।

১৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরী', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৬২-১৬৩।

১৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রাজসিংহ', *আধুনিক সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮০।

১৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাব্যের উপেক্ষিতা', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৭।

১৭২. তদেব, পৃ-১৬৭।

১৭৩. তদেব, পৃ-১৬৯।

১৭৪. তদেব, পৃ-১৭১।

১৭৫. তদেব, পৃ-১৭২।

১৭৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', *বঙ্কিম রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পূর্বোক্ত, পৃ-৬২৭।

১৭৭. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৪ ব, পৃ-৪২।

১৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-৫, বিশ্বভারতী, ১৩৫২ ব, পৃ-১৩৫।

১৭৯. তদেব, পৃ-১৩৮।

১৮০. প্রমথ চৌধুরী, 'জয়দেব', *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১৩, পৃ-৬৪।

১৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৪৭।

১৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বর্ষাযাপন', *সোনার তরী, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৫০৩।

১৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

১৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', *ছন্দ,* বিশ্বভারতী, ১৩৪৩ ব, পৃ-১৭৫।

১৮৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাদম্বরীচিত্র', *প্রাচীন সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৬১।

১৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কেকাধ্বনি', *বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত,পৃ-৩০।

১৮৭. তদেব, পৃ-৩০।

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৭।

তৃতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রাক্কালে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ঠাকুরবাড়িতে দেশীয় ভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবের সম্মিলনে আধুনিকতার একটি নতুন দিগন্ত পরিস্ফূট হয়ে উঠছিল। দ্বারকানাথ ইংরেজের সাহচর্যে ও সহযোগিতায় ব্যবসা-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছিলেন, বড়ো জমিদারি কিনেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও অভিজাত পিতার সন্তান হিসেবে হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন কিন্তু এসবসত্ত্বেও ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চর্চা চলেছিল পুরোমাত্রায়। ঠাকুরবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসত পাঠশালা, মেয়েমহলে চর্চিত হত রামায়ণ-মহাভারত ও বটতলার বই। অঙ্গনে কান পাতলেই শোনা যেত গোপাল উড়ে বা দাশরথি রায় বা মধুকানের পদ। রবীন্দ্রনাথ নিজে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়েও তাঁর স্বাজাত্যাভিমান ছিল প্রখর। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে জানিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথকে তাদের কোনো এক আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লেখায় তিনি সে পত্র না পড়েই ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।[১] এমন পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথের শৈশব অতিবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালীন শিক্ষার ভার ছিল হেমেন্দ্রনাথের ওপর। হেমেন্দ্রনাথ শিশুকালে মাতৃভাষা শিক্ষাদানে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা শিখেছিলেন চমৎকার। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে তাঁর সময়ে বাংলা সাহিত্যের কলেবর ছিল কৃশ। তাই পাঠ্য-অপাঠ্য সমস্ত বাংলা বই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন।[২] বাংলা ভাষার এই পাকা ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছিল ইংরেজি শিক্ষার বনিয়াদ। তাই মাত্র ষোলো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথকে দেখি ম্যাকবেথ অনুবাদ করতে। কৈশোরোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্য পড়েছেন গভীর মনো্যোগের সঙ্গে। তার পরিচয় পাই মাত্র সতেরো বছর বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর প্রবন্ধ 'বিয়াত্রীচে দান্তে ও তাহার প্রণয়িণীগণ' ও 'পিত্রার্কা ও লরা'। পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত নিজের সাহিত্যচর্চার কথা স্মরণ করে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেকসপীয়র, মিলটন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। এই হৃদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যবহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেশি। হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব।.... আমাদের বাল্য বয়সের সাহিত্য-দীক্ষা-দাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্ততেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।[৩]

উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির হাতে তৈরি নাগরিক বাংলা সাহিত্য দুটি মূল ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে যারা প্রবীণ ও রক্ষণশীল তারা সংস্কৃত রীতিতে বাংলা লিখতে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, বিপরীত শিবিরে ছিলেন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সাহিত্যমোদী তরুণেরা ; বঙ্কিম-রঙ্গলাল-মধুসূদন যাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ; এঁরা ইংরেজি ভাব ও ভাষাকে অবলম্বন করে বাংলা লিখতেন। এঁরা মূলত অনুসরণ করতেন শেকসপীয়রকে ও মিলটনকে এবং সেইসঙ্গে শেলি-কীটস-বায়রন সহ রোমান্টিক কবিদের। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে কলেজে পড়া শিক্ষিত বাঙালির কাছে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের আদর্শ ছিল মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে একটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন –

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন, উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয়সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত এবং পূর্ব্বতন ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোনো অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে।[৪]

--'সকলের ঘরেই সেক্ষপীয়র আছে' এবং 'কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ'—এই দুই উক্তি থেকেই সেকালে শিক্ষিত বাঙালির সাহিত্যরুচির প্রকৃতি বোঝা যায়। একদিকে খাঁটি সংস্কৃতানুগ, অন্যদিকে খাঁটি পাশ্চাত্যানুগ সাহিত্য রচনার অন্ধ পুচ্ছানুগ্রাহিতার যুগে একটি

অভাব সেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথের চোখে উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়েছিল, সেই অভাব বাঙালির রচিত সাহিত্যে খাঁটি বাঙালিত্বের অভাব। বাইশ বছর বয়সে জীবনের প্রথম লোকসাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধ ‘বাউলের গান’এ তরুণ রবীন্দ্রনাথ এই দিকে ভারতী পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন –

> আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙালিতেই ইহা লিখিয়াছে, বাংলাতেই ইহা লেখা সম্ভব এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙালির হৃদয়জাত একটি নূতন জিনিস লাভ করিতে পারিবে। ভালো হউক, মন্দ হউক আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরেজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ এখনো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই।[৫]

বাঙালির এই ঠিক ভাব, ঠিক ভাষাটির সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন বাংলার হৃদয় থেকে উদ্ভুত বাউলের গানে, তাই সেই পরানুকরণের দিনে বাংলার বাউল সংগীতকেই খাঁটি বাংলার সাহিত্য বলে দ্বর্থহীন ভাষায় চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের পাশাপাশি বাউলের দর্শনও তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাউলদর্শনে যে সার্বজাগতিক ও সার্বভৌতিক মানবতার কথা আছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে একটি স্থায়ি কল্যাণের কেন্দ্রস্থল বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কবি রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বের সামনে সংকীর্ণ জাতীয়তাপ্রসূত বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভেদকামিতার বিকল্প হিসেবে যে বৈশ্বিক একতার আদর্শ প্রচার করেছিলেন, সেইসব বক্তৃতামালাতেও তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে বাউলের দর্শনের কথাই তুলে ধরবেন। তাঁর সেই চেতনা মাত্র বাইশ বছর বয়সে এই প্রবন্ধ লেখার সময়েই যে নির্মিত হয়ে গিয়েছিল, তা দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। বাউলের জীবনসত্য উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – “গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না।”।[৬] এখানে আত্মহত্যা শব্দের অর্থ আত্মঅহং নাশ। মানুষের অহং ক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে তাকে বেঁধে রাখে। এটি নাশ হলেই মানুষ নিজের মধ্যে ‘বড়ো আমি’র সন্ধান পায়, যে বৃহৎ প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালোবাসে এইজন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র 'আমি' মাত্র নহে, যে যমের ভয় করিবে ; সে সমস্ত বিশ্বচরাচর।[৭]

বাংলার মাটির গানে রবীন্দ্রনাথ সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন ভাবীকালের আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবতার উদ্বোধন মন্ত্র—

Universal Love প্রভৃতি বড়ো বড়ো কথা বিদেশিদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়। কিন্তু ভিখারিরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন?[৮]

২২ বছর বয়সে এই প্রবন্ধ লেখার পর জমিদারি পরিদর্শনের কাজে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ অঞ্চলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, সেইসময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে বাউলদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তবে লালনের শিষ্যধারার বহু বাউল সাধকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসেন তিনি। বাউলদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট মনোভঙ্গি এই সময়েই তৈরি হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের। তাই দেখি এর ঠিক পরে পরেই ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে বাউলের ভাব ও ভাষা এক মস্ত জায়গা দখল করছে। শুধু গানেই নয়, তাঁর গদ্যরচনায় ও নাটকেও বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে তিনি বাউল দরবেশের অনুকরণে অঙ্কন করেছেন। তাদের গানের মর্মস্পর্শী সুর এবং সহজ ভাষায় গভীরভাবের প্রকাশ যেমন রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, তেমনই তাদের জাতপাতের সংস্কারবিহীন উদার মানবিকতা, প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরে আত্মতান্ত্রিক ধর্মবোধ রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ ধর্মসাধনার পরিসরে ও পরিবেশে জন্মেছিলেন ও বেড়ে উঠেছিলেন ঠিকই কিন্তু উত্তরকালে থিয়োলজিনির্ভর কোনো ধর্মসাধনার সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধিকে ছকে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতও তাঁর আত্মগত জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভুত। তাই বাউলদের 'মনের মানুষ' আর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' অনেকখানিই সমধর্মী। এই অর্থে তিনি যথাযথই 'রবি-বাউল'।

শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর 'ছোটো ও বড়ো' শীর্ষ্ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাউলের মনের মানুষ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন—

> বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম ; আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে!... এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্যভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীরভাবে একথা সত্য বৈকি! তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে।[৯]

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে, আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে, সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে, মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া, আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

বাংলার বাউল জাতি ও তাদের জীবনচর্চা সম্পর্কে অবাংলাভাষী মানুষদের জানানোর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু বাউল পদাবলীর ইংরেজি অনুবাদই করেননি, সেই ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রেক্ষাপটে তাদের জীবন ও বাণীকে আন্তর্জাতিক পাঠকের নিকটেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ইংরেজি ভাষায় অখ্যাত অবজ্ঞাত বাউলদের ধর্ম ও দর্শনের কথা এত বিস্তারিতভাবে আর কেউ লেখেননি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে 'Creative Unity' গ্রন্থের 'An Indian Folk Religion' প্রবন্ধের কথা। এই প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> The members of the religious sect I have mentioned call themselves 'Baul'. They live outside social recognition and their very obscurity

helps them in their seeking, from a direct source, the enlightment which the soul longs for, the eternal light of love[১০]

এই প্রবন্ধে বাউলদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সাহচর্য, প্রথম বাউল গান শোনার আশ্চর্য অনুভূতির কথাও লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে গগন হরকরার বিখ্যাত গান 'আমি কোথায় পাব তারে/আমার মনের মানুষ যে রে' গানটিকে অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করেছেন কবি। 'The man of my heart' বাউলের এই 'মনের মানুষ' প্রতীকটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

It means that, for me, the supreme truth of all existence is in the revelation of the infinite in my own humanity[১১]

বাউলদের সংস্কারবিহীন শাস্ত্র-বহির্ভূত জীবনচর্যা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে সে কথাও বলেছেন তিনি—

The Baul poet, when asked why he had no sect mark on his forehead, answered in his song that the true colour decoration appears on the skin of the fruit when its inner core is filled with ripe, sweet juice ; but by artificially smearing it with colour from outside you do not make it ripe. And he says of his Guru, his teacher, that he is puzzled to find in which direction he must make salutation. For his teacher is not one, but many, who, moving on, from a procession of wayfarers.[১২]

বাউলদের সাধনার মূল ভিত্তি যে দেহতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন আর জানতেন বলেই সেই গুঢ়বাদী দেহসাধনার মূল সত্যের পাশাপাশি এর উল্টোপিঠের ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যাভিচারের দিকটিও তাঁর জানা ছিল। দেহসাধনার নামে কিছু কিছু স্থানে উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়বৃত্তির চর্চা যে চলত, তাও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। শিলাইদহ পর্বের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত ; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে।

তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে-প্রশিষ্যে শাখায়িত।[১৩]

এর বিপরীতে বাউল দেহতত্ত্বের দার্শনিক সত্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পাঠককে অবহিত করার জন্য 'Creative Unity' গ্রন্থের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> These Bauls have a philosophy, which they call the philosophy of the body ; but they keep its secret ; it is only for the initiated. Evidently the underlying idea is that the individual's body is itself the temple, in whose inner mystic shrine the divine appears before the soul and the key to it has to be found from those who know. But as the key is not for us outsiders. I leave it with the observation that this, mystic philosophy of the body is the outcome of the attempt to get rid of all the outward shelters which are too costly for people like themselves. But this human body of ours is made by God's own hand, from his own love, and even if some men, in the pride of their superiority, may despise it, God finds his joy in dwelling in others of yet lower birth. It is a truth easier of discovery by these people of humble origin than by men of proud estate.[১৪]

বাউল দর্শনের ওপর এমন গভীর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ দেশে আর কেউ করেননি। অখ্যাত অবজ্ঞাত বাউলদের এই উচ্চ দর্শন রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের উচ্চস্তরের অভিজাত মহলে কেমন আলোড়ন তৈরি করেছিল তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ 'Mysore Mythic Society'তে বাউলদর্শন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ মাইসোরের যুবরাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তিনি এ কথা দৃঢ়স্বরে ব্যক্ত করেন যে দেশকে গভীরভাবে জানতে গেলে লোকসাহিত্যচর্চা একান্ত আবশ্যক। উচ্চশ্রেণির ওপর রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই প্রত্যক্ষ ফল।[১৫]

আরো একটি ইংরেজি বক্তৃতাতে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'The Modern Review'(January 1926) পত্রিকায় 'The Philosophy Of Our People' শিরোনামে। এই প্রবন্ধটির একটি বাংলা তর্জমা 'ভারতীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩২ সংখ্যায়। প্রবন্ধটি শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় এক বাউল গীতিকার হাছন রাজার প্রসঙ্গোল্লেখের মধ্যে দিয়ে। বিশেষত হাছনের গানের মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে দিয়েই বিশ্বসত্যে পৌঁছনোর যে তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। হাছনের গানে পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার যে মিলনাকুতি, জীবস্বরূপের মধ্যেই ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তির যেসব কথা রয়েছে তার সঙ্গে বৈদিক ঋষিবাণী বিশেষত উপনিষদের সুনিবিড় ভাবগত মিল দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এর ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন–

> The poet sings of the eternal bond of union between the infinite and the finite soul, from which there can be no 'Mukti', because it is an interrelation which makes truth complete, because love is ultimate, because absolute independence is the blankness of utter sterility. The idea in it is the same as we have in the Upanishad, that truth is neither in pure 'Vidya' nor in 'Avidya' but in their union.[১৬]

কেবল হাছন রাজা নন ; লালন ফকির, শেখ মদন, বিশা ভুঞিমালি, পদ্মলোচন প্রমুখের সাংগীতিক উদ্ধৃতি ও আলোচনায় প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ।

অসাম্প্রদায়িক মানব ঐক্যের চেতনা যে এদেশের বাউল পরম্পরার মধ্যেই যথার্থভাবে বিধৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গেই সে কথা ঘোষণা করেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায় দু'বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে, প্রথমটি 'মরমিয়া'(ভাদ্র,১৩৩২) ও দ্বিতীয়টি 'বাউল গান'(চৈত্র,১৩৩৪)। যে ধর্মের মূল মর্মগত, যা শাস্ত্রগত ও জ্ঞানগত নয়, যাকে কেবল মর্ম দিয়েই অনুভব করা যায় সেইসব ধর্মীয় সংগীতকেই রবীন্দ্রনাথ 'মরমীয়া' বলে অভিহিত করেছেন এবং মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত মরমীয়া কবি সাধকদের যথার্থ উত্তরসাধকরূপে এই প্রবন্ধে তিনি বাউলদের বিশ্লেষণ করেছেন। যাবতীয় বিভেদের মধ্যে ঐক্যের অন্বেষণকারী যারা

আজও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে গান গায় ; তাদের সেই একতারার তার ঐক্যের তার। ভেদবুদ্ধির পাণ্ডা শাস্ত্রজ্ঞের দল তাদের উপর দণ্ড উদ্যত করেছে। কিন্তু এতদিন যারা সামাজিক অবজ্ঞায় মরেনি তারা যে সামাজিক শাসনের কাছে হার মানবে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।[১৭]

'বাউলের গান' প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকারূপে সংযোজিত হয়। এই প্রবন্ধে বাউল গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশি চিত্তের ইতিহাস খুঁজেছেন। সেই ইতিহাস সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, সমন্বয়কামী। ইংরেজ যুগের সঙ্গে মুসলমান যুগের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ইংরেজরা শাসনকর্তারূপে এ দেশের আত্মার সঙ্গে মিলতে পারেননি কিন্তু বহিরাগত হয়েও মুসলমানরা এদেশকে আপন করে নিয়েছিল। তাদের বেশিরভাগই 'বংশগত জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান'। এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের ঐক্যসাধনে যেসব মহাত্মারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সেই রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস নামক মধ্যযুগের সন্ত কবিদের সাংস্কৃতিক অবদানকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ শতকে যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তখন প্রয়োজনের তাগিদে নয়, মানুষের অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মিলনের গভীর সত্য-সাধনা যে এদেশের ঐতিহ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন লালিত হয়েছিল, সেদিকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন ---

> বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,-- এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরাণ-পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।[১৮]

অন্যান্য সাহিত্যের মতো লোকসাহিত্যেও যে ভালোমন্দের ভেদ আছে 'বাউল গান' প্রবন্ধে তাও নির্ণয় করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বাউল গানও নকলনবিশীর দায়ে পড়ে তার গভীরতা ও বিশুদ্ধতা দুই-ই হারিয়েছে। বাঁধা বোল, হাস্যকর উপমা ও ভবনদী পারাপারের ক্লিশে প্রতীক বারবার ব্যবহার হতে হতে এ সব গানের সাহিত্যিক মূল্যও ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। খাঁটি বাউল গানের মধ্যে এমন একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকেলে আধুনিক, তা জাল করতে

গেলেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা। খাঁটি বাউল গানের অকৃত্রিম বিশিষ্টতা কেমন, সেই পরিচয় দেওয়ার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছেন—

> আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স,-- শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিলঃ
>
> ‘কোথায় পাব তারে
>
> আমার মনের মানুষ যে রে
>
> হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
>
> দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।’
>
> কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই কথাটিই উপ্নিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে, “তাং বেদ্যং পুরুষং বেদমাবো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ”। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নিলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম, তার গেঁয়ো সুরে সহজ ভাষায় যাঁকে সকলের চেয়ে জানবার তাঁকেই সকলের চেয়ে না জানবার বেদনা—অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। ‘অন্তরতর সদয়মাত্মা’ উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন ‘মনের মানুষ’ বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছিল। এর অনেক কাল পরে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।[১৯]

জীবনের মধ্য পর্ব থেকেই আনুষ্ঠানিকতা ও লোকাচারবিহীন বাউল সাধনাকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনচেতনায় অঙ্গীভূত করে নিচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে ‘পত্রপুট’ কাব্যের ১৫ সংখ্যক কবিতার কথা সকলেরই মনে পড়বে, যেখানে কবি বলছেন—

> ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
>
> দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে

পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।

ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে

সকল বেড়ার বাইরে

সহজ ভক্তির আলোকে,

নক্ষত্রখচিত আকাশে,

পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,

দোসর-জনার-মিলন-বিরহের

গহন বেদনায়।

....

কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে

একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,

যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা

পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।

দেখেছি একতারা-হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে

মনের মানুষকে সন্ধান করবার

গভীর নির্জন পথে।

কবি আমি ওদের দলে –

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,

দেবতার বন্দীশালায়

আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।[২০]

বাউলের অনুসৃত পন্থাতেই যথার্থভাবে 'মানবসত্য' এর কাছে পৌঁছনো সম্ভব বলে মনে করেছেন কবি। ১৯৩১ এ প্রকাশিত 'Religion Of Man' এবং ১৯৩৩ এ প্রকাশিত 'মানুষের ধর্‌ম' প্রবন্ধাবলীতে সে পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'Religion Of Man' গ্রন্থের 'Man's Universe', 'The Man Of My Heart' এবং 'Spiritual Freedom' এই তিনটি প্রবন্ধে বাউলদের পরিচয় বিস্তৃতভাবে উদ্ধার করে তাদের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা 'Creative Unity' বিশ্লেষণের সূত্রে আগেই সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি, এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। বরং 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে 'Man Of My Heart'কে আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথায় প্রতিটি মানুষই দ্বৈধসত্তাবিশিষ্ট। প্রথমত সে নিজেতে আবদ্ধ, সেটা তার জীবসীমা। দ্বিতীয়ত অন্তরে অন্তরে সে তার জীবসীমার ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবে প্রসারিত। সেখানে সে আত্মসুখ চায় না, চায় তারও বেশি কিছু। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক পরিভাষায় যাকে বলেছেন 'ভূমা'। লিখেছেন--

> মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্‌ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা। এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।[২১]

এটাই মানব ঐক্যের চূড়ান্ত কথা। এই 'অন্তরের মানুষ', এই বৃহৎ মানুষই বাউল ভাবনায় 'মনের মানুষ', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'মানুষের দেবতা'। আবার উপনিষদ এঁকেই বলেছেন 'পরমাত্মন' বা 'ব্রহ্মণ'। উপনিষদের শিক্ষা হল মানুষের অন্তরের এই পূর্ণত্বকে জানা – 'যিনি বেদনীয়, সেই পূর্ণ মানুষকে জানো'।[২২] এই বিশ্লেষণে বাউলতত্ত্ব ও ঔপনিষদিক জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ এক বিন্দুতে মিলে গিয়েছে। বাউল তথা লোকায়ত ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণততম জীবনদর্শনের এটাই চূড়ান্ত অভিজ্ঞান।

ছড়া সংগ্রহ ও ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ

প্রথমেই একথা বলে নেওয়া যাক, রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম শিক্ষিত বাঙালি যিনি বাংলার লোকসাহিত্যের প্রধান সম্পদ হিসেবে ছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। শুধু তাই-ই নয়, ছড়াগুলির কাব্যমূল্য বিচার করে এগুলির প্রতি শিক্ষিত কাব্যানুরাগী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন রবীন্দ্রনাথ একাজে এগিয়ে আসেন, তার পূর্বে কোনো বাঙালি বুদ্ধিজীবী এ কাজে উৎসাহী হননি, এটা আশ্চর্য হলেও সত্য। অবশ্য এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে ও বিক্ষিপ্তভাবে লোকসাহিত্য সংগ্রহ কিছু কিছু হয়েছিল ঠিকই যেমন রেভাঃ উইলিয়ম মর্টন ও রেভাঃ জেমস লঙ বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, বোম্পাস ও বোর্ডিং সাঁওতাল পরগণার 'লোককথা' সংকলন করেছিলেন। রেভাঃ লালবিহারী দে লিখেছিলেন 'Folk-Tales Of Bengal'। জি.এ.গ্রীয়ারসন তাঁর আলোচনায় গাথা বা 'Ballad'এর নিদর্শন উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু এইসব ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলি ছাড়া সার্বিকভাবে অর্থাৎ যেমন করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে লোকসংস্কৃতির প্রতি সচেতন ও গোষ্ঠীবদ্ধ দৃষ্টি পড়েছিল, বাংলাদেশে তা হয়নি। এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেন রবীন্দ্রনাথ। বিশেষত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন যাতে পরিষদ বাংলার অমূল্য লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণে তাদের দৃষ্টি ও উদ্যোগ নিয়োজিত করে। অবশ্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ভেবেছিলেন ও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার জানাচ্ছেন পল্লির সঙ্গে শহরের ব্যবধান দূর করবার জন্য তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ দেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন –

> গ্রাম্যগাথা এবং প্রচলিত গীতসমূহ সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা আমাদের দেশের লোকদের ভালো করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখদুঃখ আশা ভরসা আমাদের নিকট বিশেষ অপরিচিত থাকে না।[২৩]

১২৯৯-১৩০০ সাল নাগাদ শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথ বাংলার লোকসাহিত্য রূপে ছড়ার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ছড়া সংগ্রহ করতে শুরু করেন। সেইসঙ্গে যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে ছড়া সংগ্রহ করানোরও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা দুটো চিঠি উদ্ধৃত করতে চাই। এই দুটো চিঠির মধ্যে দিয়ে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সদিচ্ছা ও আগ্রহ তীব্রভাবে ধরা পড়বে। প্রথম চিঠিটি 'সরলা রায়'কে লেখা-

ইংরেজীতে যেমন Nursery Rhyms আছে আমি সেইরূপ বাঙ্গালার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন তো বড় উপকার হয়।....[২৪]

দ্বিতীয় চিঠিটি সাল-তারিখ বর্জিত, লেখা হয়েছিল অবন ঠাকুরকে। চিঠিটি নিম্নরূপ—

আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগচে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করচি। তোমাদের বূড়ী দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলো না।[২৫]

সংগ্রহের পাশাপাশি এইসব ছড়ার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ মনোগ্রাহী প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটি থেকে ছড়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও মনোভঙ্গি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। 'ছিন্নপত্র'এর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন—

আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটি লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বড়ো ভালো লাগছিল। ছড়ার রাজ্যে আইন-কানুন নেই; মেঘ রাজ্যের মতো।.... [২৬]

ছিন্নপত্রে উল্লিখিত এই প্রবন্ধটিই ১৩০১ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় পাঠ করেন। এই পঠিত প্রবন্ধটিই 'মেয়েলি ছড়া' নামে 'সাধনা'(আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১)পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটিরই অনেকাংশ বর্জিত হয়ে 'ছেলেভুলানো ছড়া' শিরোনামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সাধনা'য় মেয়েলি ছড়া প্রকাশের তিন মাস পরে একটি ছোটো ভূমিকাসহ সংগৃহীত ছড়াগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য়। পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়াগুলি এবং এ সম্পর্কে লিখিত 'ভূমিকা'র কিছু অংশ বর্জন করে 'ছেলেভুলানো ছড়া-২' শিরোনামে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া বিষয়ক মূল আলোচনা মূলত এই দুটি প্রবন্ধেই বিস্তারিত পাওয়া যায়।

'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়ার বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও তার 'সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস'এর দ্বারাই তিনি

গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অথচ ছড়াকে কেন্দ্র করে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ও সমাজতত্ত্বের আলোচনাকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেননি তিনি। রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলিকে বলেছেন 'শিশুসাহিত্য' এবং এর রসকে বলেছেন 'বাল্যরস'। লিখেছেন—

> আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদবেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন গোলাপ জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেন একটা অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে ; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন।[২৭]

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মুখে পরম্পরায় প্রবাহিত ছড়াগুলিকে একান্তভাবেই শিশুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ছড়াগুলিকে বলেছেন 'শিশুসাহিত্য'। এর কারণ তার বাল্যকালের ঘরোয়া স্মৃতি।

> ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি, ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতির এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি বর্তমান লেখকের নাই। একথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনও আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার মনের সেই মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী।[২৮]

শৈশবে মাতৃসঙ্গবিবর্জিত রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে উপভোগ করতেন মা ও শিশুর চিরন্তন স্নেহসম্পর্কটিকে। তাছাড়া 'শিশুত্ব' নামক ভাবটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আজীবন একটি প্রলোভনমিশ্র আকর্ষণ তাঁর বিভিন্ন লেখায় খুঁজলে পাওয়া যায়। তাঁর উন্মেষপর্বের কাব্যে, মূলত 'শৈশবসংগীত' থেকে 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্বের বিভিন্ন কবিতায় হারানো শৈশবের জন্য ব্যথাতুর

ক্রন্দন অভিব্যক্ত হয়েছে। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কবি তাঁর অনাবিল শৈশবপ্রকৃতি হারিয়ে ফেলছেন; ফলে জেগে উঠছে এক অন্তর্লীন বিষাদ। প্রকৃতি ও প্রেমের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এই বিষাদমথিত হৃদয়যন্ত্রণাই মোহিতচন্দ্র সেনের কাব্যগ্রন্থাবলীতে 'হৃদয় অরণ্য' শীর্ষক উপবিভাগে স্থান পেয়েছে। জীবনের মধ্যপর্বে এসে নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে। মৃণালিণী দেবীর মৃত্যুর পর বিশেষত 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় সন্তানের স্নেহসম্পর্কের বিচিত্র আলোছায়ার মধ্যে কবি যেন নিজ শৈশবের প্রতিভাসকে লুকিয়ে রেখেছেন—

> পুরনো বট, 'রাজার বাড়ি', 'কাগজের নৌকা' এইসব কবিতা নিশ্চয়ই আমাদের চট করে মনে পড়ে যাবে এখানে, যারা এক স্পর্শভীরু ও উন্মীলমান জগতে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে ধীরে ধীরে আমরা আবিষ্কার করে নিতে পারি ছোট্ট রবীন্দ্রনাথকে যিনি শীতকালের শেষ রাতে গায়ে শাল জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে শিশিরের শব্দ শুনতেন, যিনি জল পড়া ও পাতা নড়ার অবিরাম দোলার মাঝখানে শুনেছিলেন ছন্দের হিল্লোল। 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথ' পড়তে পড়তে স্পষ্ট দেখতে পাই এই কবিতাগুলির নায়ককে, এক ভাবুক শিশুকে—যে কল্পনায় এক আলোছায়ার জগৎ রচনা করে নিচ্ছে।[২৯]

"শিশু হবার ভরসা আবার জাগুক আমার প্রাণে, লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে"—'শিশু ভোলানাথ' কাব্য থেকে নেওয়া এই কথাটি রবীন্দ্রজীবনের অন্যতম একটি মূল সুর। প্রৌঢ় বয়সে যখন রবীন্দ্রনাথ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' লিখছেন, তখনও শৈশবে ফেরবার আকুতি ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়—

> এমন সময়ে ষাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।...একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা মনে উঠল যে, ওই ছেলেটা এই অপরাহ্নের আকাশের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ মিশ খেয়ে গেছে... আকাশের আলিঙ্গনে বাঁধা ওই ভোলামন ছেলেটিতে একটি নিত্যকালের কথা আছে, সে আমি শুনেছি, কিন্তু সে আমি ভাষায় কেমন করে স্পষ্ট করে তুলব। আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথা আমারই খুব ভিতরের কথা, গোলমালে অনেক কাল তার দিকে চোখ পড়েনি। বারো বছরের সেই নিত্য-ভোলা ইস্কুল-পালানো

লক্ষ্মীছাড়াটা গাম্ভীর্যের নিবিড় ছায়ায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করছিল। এমন ভাবনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন্ দিকটায়, সেই আরম্ভ-বেলাকার সাতাশের দিকে, না, শেষ বেলাকার?... মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা[৩০]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল, কিন্তু 'শিশু; হওয়ার বাসনাটি কবি কত গভীরভাবে সারা জীবন অন্তরের মধ্যে লালন করেছেন, তা বোঝবার জন্য এই দীর্ঘ উদ্ধৃটি প্রয়োজন ছিল। তাই খুব সঙ্গত কারণেই আমাদের সিদ্ধান্ত যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার আদিম ছড়াগুলির মধ্যে এই যা-খুশি তাই এবং যা-ইচ্ছে তাই শৈশবকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাংলার ছড়াগুলি রবীন্দ্রনাথের মতে শিশুসাহিত্য। শিশুদের জন্য রচিত সাহিত্য, এই হিসেবে শিশু-সাহিত্য নয়, এগুলি সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। শিশুর মধ্যে যেমন এক স্নেহোদবেলকর সৌকুমার্য আছে, সাহিত্যের আদি সৃষ্টি এই ছড়াগুলিও শৈশব অবস্থার অসংলগ্নতায় ভরা। তার না আছে বাঁধা অর্থ, না আছে সুস্পষ্ট কোনো অন্বয়। শিশুর মুখের না ফোটা বুলির মতোই এই ছড়াগুলিও প্রিমিটিভ। এই অর্থে তা শিশুসাহিত্য, দ্বিতীয়ত সাহিত্যের শৈশবাবস্থায় তৈরি হওয়া এই সব ছড়াগুলি ভাবগত দিক থেকেও মানবশিশুর খেয়ালী মনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই ছড়ার জগৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে শিশুর জগৎ। সাহিত্যের শৈশবাবস্থা ও মানুষের শৈশবাবস্থা এই দুই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ছড়াগুলিতে। তাই রবীন্দ্রনাথ ছড়াগুলির সঙ্গে শিশু ও শৈশবকে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন। লক্ষ্যণীয় যে অবনীন্দ্রনাথও 'ভারতী' পত্রিকায় যখন ছড়াগুলি নিয়ে আলোচনা করেন, নাম দিয়েছেন 'ছেলেভোলানো ছড়া'। এটা কি নিছক অনুকরণ? নাকি তিনিও ছড়াগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতোই 'বাল্যরসের জগৎ'কে সংশ্লিষ্ট করে দেখতে চেয়েছিলেন?

এখন ছড়াগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী তা আমরা সূত্রাকারে আলোচনা করে নিতে পারি। ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি আদৌ কবিত্বকল্পনামূলক ভাববাদী মন্তব্য নয়, তার সঙ্গে যুক্তি ও মনন অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হয়ে রয়েছে।

ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচকের মতো রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই আকৃষ্ট হয়েছেন ছড়াগুলির কাব্যরসের প্রতি। 'ছেলেভুলানো ছড়াঃ ১' প্রবন্ধের গোড়াতেই জানিয়েছেন—

> আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।[৩১]

দেশে-বিদেশে আজ লোকসংস্কৃতিচর্চার যে ধারা প্রতিষ্ঠিত, তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর জাতিসমূহ তাদের লোকসাহিত্যের উপকরণ থেকেই নিজ জাতির নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন, কোনো দেশেই শুদ্ধমাত্র কাব্যরস আস্বাদনের জন্য লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগৃহীত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যেসব বিদগ্ধজনেরা লোকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তার পিছনে কোনও না কোনও বস্তুগত উদ্দেশ্য ছিল। শুধুমাত্র কাব্যরস আস্বাদনের জন্য লোকসংস্কৃতিচর্চার যে ইমপ্রেশনিস্ট ধারা রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছিলেন, তা আক্ষরিক অর্থেই অভিনব ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল ছড়াগুলির চিরকালীনতা, যুগের পরে যুগ কেটে যায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা আমূল বদলে যায় কিন্তু ছড়াগুলি মানব মনে একইরকম আবেদন বজায় রেখে চলে—

> এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনোকালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নতুন।[৩২]

এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত। লোকসাহিত্যের এই চিরত্ব গুণটিকে রবীন্দ্রনাথ যত সহজে আবিষ্কার করতে পেরেছেন, লোকসংস্কৃতির পণ্ডিতবর্গও এত সহজে বিষয়টি প্রকাশ করতে পারেননি। এই উক্তির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন, ছড়া কিংবা লোকসাহিত্যের কোনও বিষয়ই সুনির্দিষ্ট কোনও সময়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, অর্থাৎ একটি ছড়া যদি বিশেষ এক সময়ে একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়, তবুও তা সেই বিশেষ যুগের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে না, তা কাল থেকে কালান্তরে বাহিত হয়ে চলতে থাকে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য' গ্রন্থে একটি চিরপরিচিত ছড়ার সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়েছেন।[৩৩] ছড়াটি এই—

“ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে”

এই ছড়ায় ‘বর্গী’ শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় বর্গী আক্রমণের ঐতিহাসিক তথ্যটিকে প্রকাশ করছে যার দ্বারা অনুমান করা চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার বুকে বর্গী আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এই ছড়াটি রচিত হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মৌখিক পরম্পরাবাহিত এই ছড়াটি অষ্টাদশ শতাব্দীর কালপর্বে আবদ্ধ হয়ে নেই। তা অষ্টাদশ শতাব্দী, ঊনবিংশ শতাব্দী, বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও সমান সজীব। এর কারণ এই ছড়ার মূল আবেদন যেখানে তা হল মা ও শিশুর চিরন্তন গার্হস্থ্য বাৎসল্য। মা শিশুকে ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছে। বর্গী আক্রমণের রাজনৈতিক ঘটনা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। মাতৃস্নেহের চিরন্তন আবেগমধুর ক্রিয়াটিই শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে এই ছড়াটিকে মায়ের মুখে সেই পুরাতন দিনের মতোই সজীব ও প্রাসঙ্গিক করে রেখেছে। রাজনৈতিক ঘটনাটি যে উপলক্ষ্যই মাত্র, তার প্রমাণ পাওয়া যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত এই ছড়ার একটি পরিবর্তিত পাঠান্তরের সাহায্যে—

“মণি ঘুমাইল, পাড়া জুড়াইল গোর্কি আইল দেশে

টিয়া পাখীতে ধান খাইল খাজনা দেব কীসে”

আঞ্চলিক অভিধান অনুযায়ী ‘গোর্কি’ শব্দের অর্থ হল ‘সামুদ্রিক ঝড়ের আবির্ভাবজাত দুঃখ’। ঐতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বর্গী আক্রমণ কখনও হয়নি কিন্তু বর্গীকে চট্টগ্রামের মানুষেরা প্রায় অনুরূপ অর্থবাচক অন্য একটি শব্দে পরিণত করে নিল কিন্তু তাতে ছড়াটির মূল ভাবের কোথাও কোনো হানি ঘটল না। এটিকেই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন ছড়ার চিরত্বগুণ, যা পৃথক পৃথক প্রতিবেশ এবং সময়কালেও একইভাবে সজীব ও প্রাসঙ্গিক থাকে।

ছড়ার এই চিরত্বগুণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিশু প্রকৃতির মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাই ছড়াগুলিকে তিনি বলেছেন ‘শিশুসাহিত্য’--

> ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মত পুরাতন আর কিছু নাই। দেশ-কাল-শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে

> যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে।... এর নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশুসাহিত্য; তাহারা মানবমনে আপনি জন্মিয়াছে।[৩৪]

শিশু প্রকৃতির সৃজন, এই কথাটির অর্থ হল পরিণত মানুষের মধ্যে একটা চেষ্টাকৃত বিকাশ দেখা যায়। শিক্ষা-রুচি-আভিজাত্য এই সবকিছু মিলে এই বিকাশ সংগঠিত হয় কিন্তু শিশু ফুল-নদী-অরণ্যের মতোই প্রকৃতির স্বহস্তের রচনা, এরা অনায়াসে আপনিই সৃষ্টি হয়েছে, এর ওপর কোনো প্রযত্নকৃত পালিশ পড়েনি। ছড়াগুলিও তেমনি মানব মনে সহজভাবে অনায়াস প্রযত্নে জন্মলাভ করেছে। জগতের মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শিশু প্রকৃতির মধ্যে যেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না ; যেমন করে পৃথিবীব্যাপী শিশুর ধর্ম, আচরণ ও প্রবণতা একইপ্রকার ঠিক তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত ছড়াগুলি প্রকৃতিগতভাবেই একইরকম। শিশুর মতোই তারা অসংলগ্ন, পরিশীলনপ্রযত্নবঞ্চিত, সরলগঠন। তাই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছড়াগুলি শিশুসাহিত্য। খুব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 'শিশু-সাহিত্য' কথাটি বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি। শিশুসাহিত্য বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সাহিত্যের শৈশবাবস্থা। মানুষের অপরিণত রূপ যেমন শিশু, সাহিত্যেরও অপরিণত রূপ তেমনি ছড়া। লক্ষ্যণীয় যে লোকসাহিত্যের বিচিত্র সংরূপের মধ্যে একমাত্র ছড়াকেই রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য বলেছেন। রূপকথা বা ব্যালাডগুলিকে তিনি শিশুসাহিত্য বলেননি।

তৃতীয়ত, প্রতিটি ছড়াতেই রয়েছে অর্থগত অসংগতি ও অসংলগ্নতা। অর্থগাহ্য হওয়ার কোনো দায় যেন ছড়াগুলির নেই। অর্থ নেই বটে, তবে ছবি আছে। সেগুলিও খুব সুপরিস্ফূট নয়। একটি ছবি সম্পূর্ণ ফুটে উঠতে না উঠতেই অন্য একটি ছবি তার ঘাড়ে লাফিয়ে এসে পড়ছে—এটাই ছড়ার রূপনির্মিতি। কিন্তু এই সবটুকুকেই বেঁধে রেখেছে ধ্বনির অনুপ্রাসগত মিল। ছড়ার মধ্যে এই অসম্ভব অবাস্তব অথচ মিলযুক্ত ছবিগুলিই ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সকল শ্রোতা ও পাঠকের মনকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। পরবর্তীকালে 'বাংলা ভাষা পরিচয়'(১৩৪৫) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই। যুক্তির বাঁধন ছেঁড়া ছবিগুলি ছন্দের ঢেউ এর অপর টগবগ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে

জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর একটা শব্দ রবাহুত এসে পড়ছে।... সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে ; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেই জন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।[৩৫]

মানব মনে ছড়াগুলি কেমনভাবে জন্ম নেয়, তা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবমনস্তত্ত্বের যে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেছেন, সে যুগে তা তুলনারহিত। মানবমন সম্পর্কিত ফ্রয়েডীয় তত্ত্বকাঠামো তখনও পৃথিবীর জ্ঞানবিশ্বকে আলোড়িত করেনি। তার আগেই রবীন্দ্রনাথ মানব মনের বিচিত্র ক্রিয়াকে অনুসন্ধান করে স্বপ্নের সঙ্গে ছড়ার সাদৃশ্যকে চিহ্নিত করেছেন।

স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব ও প্রতিধ্বনি ছিন্ন-বিছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্ররূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল—সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ।[৩৬]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর 'Interpretation Of Dreams' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ এই অভিমত প্রকাশের পরবর্তীকালে। সেখানে মনের মধ্যে ভেসে বেড়ানো এই অসংলগ্ন চিন্তা ও অভিজ্ঞতারাশি কীভাবে জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় স্বপ্নে পর্যবসিত হয়, ফ্রয়েড তা দেখিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকৃত প্রজ্ঞায় বিষয়টি বহু আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন—

আমাদের নিত্য প্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ, গন্ধ, শব্দ, কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া বেড়ায়[৩৭]

এই ভেসে বেড়ানো খণ্ড খণ্ড অসংলগ্ন দৃশ্যগুলোই নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অবচেতন মনে স্বপ্নজাল বোনে। এই সব কারণেই স্বপ্নের মধ্যে এত খাপছাড়া অসংলগ্নতা। রবীন্দ্রনাথের মতে মানবমনে ছড়াগুলির সৃজন প্রক্রিয়াও স্বপ্নের মতোই। এই সাদৃশ্যকে স্পষ্টতর করে তুলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন অলক্ষ্য বায়ু প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যদি কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মত।[৩৮]

স্বপ্নতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ছড়া সৃষ্টির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ব্যাখ্যার এক অভিনব অভিজ্ঞান, সন্দেহ নেই।

বাংলার ছড়াগুলিতে সৃজনের নানা অসংলগ্নতার মধ্যেও নানা ঐতিহাসিক উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে রয়ে গেছে। সে সময়ে পাশ্চাত্য প্রথা মেনে শিলা, লিপি, তাম্রশাসন ইত্যাদি থেকেই ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হত। বাংলার ছড়াগুলি অবলম্বন করে কোনো ঐতিহাসিক বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করেননি। অবশ্য এ কাজ যে কত দুরূহ ও কল্পনাসাপেক্ষ সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন।

> শুনা যায় মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়াগুলিকেও আমার টুকরা জগত বলিয়া মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনও পুরাতত্ত্ববিদ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।[৩৯]

ছড়ার ছবিগুলি অধিকাংশই অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত, খাপছাড়া। কিন্তু কোনো এক কল্পনাপ্রবণ মন অনায়াসেই এই টুকরোগুলিকে জোড়া দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ছবির চালচিত্র রচনা করতে পারে। এই ছবিগুলি সুখ-দুঃখের তরঙ্গে মিশ্রিত। বাল্যবিবাহে বালিকা কন্যার শ্বশুরঘরে যাত্রা, বুড়ো বরের সংসার, বৌ-কাঁটকি শাশুড়ির অত্যাচার, বালিকা বধূর সঙ্গে তার পিতামাতার বিচ্ছেদ-বেদনা প্রভৃতি মিলে 'বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনার কথা' যেমন আছে অপরদিকে রয়েছে খোকাখুকুকে ভোলাবার অজস্র ছবি, বিবাহ উপলক্ষ্যে পল্লিরমণীদের আনন্দ ও ঔৎসুক্য, জামাই দেখবার নামে নারীমহলের উন্মাদনা প্রভৃতি। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> প্রত্যেক ছড়ার মধ্যে প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।[৪০]

'ছেলেভুলানো ছড়াঃ ২' রচনাটি মূলত ছড়ার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ৮১টি ছড়া এখানে পরপর গ্রথিত। ছড়াগুলিকে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাদেশের জাতীয় সম্পত্তি' রূপে চিহ্নিত করে এগুলি সংরক্ষণে উৎসাহী হয়েছিলেন। লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ দরদটি এখান থেকে বুঝে নেওয়া যায়। ১৩০১ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' স্থাপিত হওয়ার পর যখন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা প্রকাশ করা স্থির হয়, তখন স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয় প্রথম সংখ্যার জন্য একটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লিখে দেবার জন্য। এরই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাংলার লৌকিক ছড়া নিয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পরিষদকে পাঠালেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুগম্ভীর সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ আশা করেছিলেন তারা নিরাশ হলেন বটে কিন্তু এই প্রবন্ধটি পরিষদ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পরিষদকে এই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে জাতীয় জীবনের মূল সুর রক্ষিত আছে লৌকিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে। তাই বাংলাদেশকে যথার্থ চিনতে গেলে এর লৌকিক সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হবে এবং সাহিত্য পরিষদকেই বাংলার লৌকিক সাহিত্যের সংগ্রহ-সংরক্ষণ ও প্রচারে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দেশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতটা অনুসরণ করেছে, তা বিচারসাপেক্ষ তবে এর মধ্যে লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমত্বপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ছড়াগুলির বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠগুলিকে রক্ষা করার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়—

> একই ছড়ার অনেকগুলিও পাঠ পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলে কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো-একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না।[৪১]

ছড়ার বিভিন্ন পাঠভেদের মধ্যে এর নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি কেমন করে এক এক স্থানে এক এক রকম রূপ ধারণ করেছে, 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে' ছড়াটির তিনটি ভিন্ন পাঠ উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।[৪২]

রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহই এদেশের সর্বপ্রথম ছড়ার সংগ্রহ। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারতের অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষাতেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ ছড়ার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হননি। কিন্তু আধুনিক লোকসংস্কৃতির পদ্ধতিবিজ্ঞান মেনে রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহ করেননি, সে কথা মানতেই হবে। তাঁর ছড়া সংগ্রহ ও সম্পাদনার যেসব সীমাবদ্ধতা আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ—

'ছেলেভুলানো ছড়া ২' প্রবন্ধে যে ৮১টি ছড়ার সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে চারটি ছড়া 'কোনো বিক্রমপুরনিবাসী ভদ্রগৃহস্থ হইতে সংগৃহীত' বলে রবীন্দ্রনাথ পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ছড়াগুলির কোনোটিই ঢাকা-বিক্রমপুরের প্রাদেশিক ভাষায় সংগৃহীত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ এদের ভাষা সামান্য পরিবর্তিত করে প্রচলিত সাধুরূপ দিয়ে নিয়েছেন। লোকসাহিত্যকে তার নিজস্ব রূপ থেকে পরিমার্জিত করা পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুযায়ী ভয়াবহ ত্রুটি, এ কথা মানতেই হবে।

দ্বিতীয়ত। 'আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে' ছড়াটির শেষ পদের একটি শব্দ 'ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করতে কুণ্ঠিত' হওয়ায় শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ পরিবর্তন করে গ্রহণ ক্রেছিলেন।(ভাতারখাকী>স্বামীখাকী)। রুচির দোহাই দিয়ে এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে পদ্ধতিবিজ্ঞান অনুযায়ী গুরুতর ত্রুটি। এছাড়াও সংগৃহীত ৮১টি ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে মাত্র

চারটি ছড়া বিক্রমপুরের অধিবাসী কর্তৃক প্রাপ্ত বলা হলেও বাকি ছড়াগুলি বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত, সে বিষয়ে সংগ্রাহক নীরব থেকেছেন। এই নীরবতা বাঞ্ছনীয় ছিল না।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ এমন বেশ কিছু ছড়া 'ছেলেভুলানো' শীর্ষক শিরোনামের তলায় এনেছেন, যে ছড়াগুলিকে কোনোভাবেই 'ছেলেভুলানো' বলা চলে না। সেগুলি সামাজিক ছড়া, বড়োদের ছড়া। ছেলেদের অভিজ্ঞতার বাইরে। যেমন সংগৃহীত ১৭ নম্বর ছড়ার একটি অংশ—

বড়োবউ গো ছোটোবউ গো আরেক কথা শুনসে

রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিনসে।

ঘটি নেয় না, বাটি নেয় না, নেয় না সোনার ঝারি

যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি[৪৩]

সমাজকলঙ্কিত পরিহাসরসিকতা থেকে তৈরি হওয়া এই ছড়া কি 'ছেলেভুলানো' অভিধা পাওয়ার যোগ্য? এছাড়াও—

এত টাকা নিলে বাবা ছাঁদনাতলায় বসে

এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে

আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে

পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে

দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে[৪৪]

পরিবারের আদরের মেয়েটির বিবাহ-পরবর্তী দুঃখ-দুর্দশার ছবি আছে এতে। এই ছড়ার সামাজিক মূল্য অপরিসীম কিন্তু একে আর যাই হোক 'ছেলেভুলানো ছড়া' বলা চলে না।

এইভাবে সংগ্রহের দিক থেকে কিছু ত্রুটি ঘটে থাকলেও ছড়াগুলির বিশ্লেষণ ও রসপরিচয় দানে রবীন্দ্রনাথ যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তার মূল্য অপরিসীম।

ব্রতকথা ও রূপকথা

রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন, তখন বাংলাদেশে জাতীয় সাহিত্য সংরক্ষণের এক স্বাদেশিক হাওয়া প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেশজ সাহিত্যের রত্নভাণ্ডারকে স্বদেশীয়দের কাছে নতুন করে পরিচিত করানো রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদকীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল দেশজ সাহিত্যের এই রত্নভাণ্ডার ছড়াগুলির পাশাপাশি রয়ে গেছে ব্রতকথা এবং রূপকথার মধ্যে। কিন্তু নাগরিক আগ্রাসনে এগুলি ক্রমশই বিলীয়মান। তাই বাংলার পল্লিসাহিত্যের একটি মহৎ অংশ ব্রতকথা ও রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এগুলিকে জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি বলেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে মেয়েলি ব্রতকথাগুলি চৈত্র ১৩০১ থেকে 'সাধনা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করে। আর সেইসঙ্গেই এসবের উৎপত্তি, ইতিহাস, বাংলার নারী সমাজে তার প্রভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়। ঐহিক মঙ্গলকামনা থেকেই ব্রতকথাগুলির উদ্ভব। বয়স এবং সধবা-বিধবা অবস্থাভেদে ব্রতেরও অধিকার ভেদ আছে। স্বামী কামনা, পুত্র কামনা, স্বামী ও পুত্রের মঙ্গলকামনা, ঐশ্বর্য কামনা ইত্যাদি বহুবিধ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে এইসব ব্রত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৪৫]

বাংলাদেশে দু'ধরণের ব্রত প্রচলিত আছে। ১.শাস্ত্রীয় ব্রত ও ২.যোষিৎ প্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত।এই মেয়েলি ব্রতকথাগুলির প্রতিই রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেননা এর ছড়ায়, আলপনায় ও ক্রিয়াকলাপে একটা জাতির মন, চিন্তা ও চেষ্টার ছাপই শুধু পরিলক্ষিত হয়, তাই-ই নয়, পল্লি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার একটা উজ্জ্বল ছবিও উঠে আসে।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথও বাংলার ব্রতগুলি বিশ্লেষণ করেছিলেন। ব্রতের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ খুব সহজ করে বলেছিলেন—"কিছু কামনা করে সমাজে যে অনুষ্ঠান চলে, তাকেই বলি ব্রত।"[৪৬] বিভিন্ন ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজে যে দশাবিপর্যয় ঘটে তাকে ঠেকাবার তাগিদ থেকেই ব্রত ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠান, আচার পদ্ধতি, মন্ত্র উপাখ্যানের মধ্যে দিয়েই তার প্রকাশ।

ব্রতগুলির মধ্যে নারীসমাজের একটি রূপ, তার বিবর্তনের সামাজিক ইতিহাস ধরা আছে। কারণ প্রাচীন ব্রতকথাগুলি মেয়েদের মহলেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে, কেননা বাইরের

জগৎ যত তাড়াতাড়ি বদলায়, মেয়েদের অন্তঃপুরে সময় ঠিক ততটাই স্তব্ধ হয়ে থাকে। ব্রতকথাগুলি রক্ষণশীল নারী জাতির ধর্ম ও গার্হস্থ্য জীবন চর্যার চিহ্ন বহন করে। ব্রত-অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপদেশ ও মন্ত্র ছড়া আকারে প্রচলিত আছে— সেগুলিই ব্রতকথা। এগুলি পর্যালোচনা করলে শুধু সামাজিক ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্বের রহস্যই উন্মোচিত হবে না, এর মধ্যে 'কিঞ্চিৎ কাব্যরস' পাওয়া যাবে বলে 'সাধনা' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়।[৪৭] অবনীন্দ্রনাথও মনে করেন ব্রতকথায় নাট্য, নৃত্য ও গীতকলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথ যখন 'সাধনা'র পাতায় বাংলার ব্রতগুলি প্রকাশ করতে শুরু করেন, তখন সে কাজে তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অঘোরনাথ যখন ঐ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য ঐ বই এর একটি ভূমিকা লিখে দেন। এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাবে মেয়েলিব্রত ও সেগুলি সংরক্ষণ ও সংকলনের গুরুত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন এবং যাঁরা মেয়েলি ব্রতের মতো একটি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বস্তু সংগ্রহকে 'সময়ের অপচয়' বলে নিন্দা করেন সেইসব 'গম্ভীর প্রকৃতির লোকের' হাসি ও বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অঘোরনাথকে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

> সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোনো প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল হৃদয়পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ীভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহিত করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর প্রকৃতির পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।[৪৯]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এও উল্লেখ করেছেন লোকসাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের কত তফাৎ! ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ যাঁরা দর্শন-বিজ্ঞান ও ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করে থাকেন, তারাও ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহে সংকোচ বোধ করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পেয়ে এসেছে,

তারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। দ্বিতীয়ত যারা স্বদেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসে ও স্বদেশের সঙ্গে সর্বতোভাবে ও অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হতে চায় ছড়া, রূপকথা ব্যতিরেকে সে পরিচয় কখনোই সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এই কারণে যে তিনি জনসাধারণ-প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র 'সাধনা'য় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন সেই চিত্রগুলিও স্থায়ীভাবে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে দীনেন্দ্রবাবু সেগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

বাংলার লোকসম্পদ সংরক্ষণে ও সেগুলি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের উৎসাহ দানে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কত সুগভীর—এই সব দৃষ্টান্তগুলি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এর কয়েক বছর পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ (ভাদ্র ১৩১৫) পরমেশ প্রসন্ন রায় 'মেয়েলি ব্রতকথা' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি 'মুখবন্ধ' লিখে দেন। এই মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন এতদিনে লোকসাহিত্য সংরক্ষণ ও সংকলনে শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ জন্মেছে, বর্তমান গ্রন্থ তারই সূচনা করছে। তিনি নিজে যখন 'সাধনা'র পাতায় ছড়া-ব্রতকথা সংগ্রহ বা আলোচনা করছিলেন, তখন এগুলির প্রতি মানুষের সাধারণ অবজ্ঞা ও অনাদর ছিল কিন্তু "এখন যে আমাদের সেই দুর্দিনের অবসান হইয়াছে, দেশকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিয়াছে।"[৫০]—তা দেখে রবীন্দ্রনাথ প্রীত হয়েছেন। কালের পরিবর্তনবশত এগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলে দেশের পুরাবৃত্তের একটি প্রধান উপকরণ নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন।

ছড়ার মতোই ব্রতকথাগুলিও যাতে মূল ভাষা অপরিবর্তিত রেখেই সংগৃহীত হয়, রবীন্দ্রনাথ বারবার সেটা স্মরণ করিয়ে দেন। বর্তমান গ্রন্থে ব্রতকথাগুলির ভাষাকে 'নিষ্ঠুরভাবে বিশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করা হয় নাই দেখিয়া' তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

ব্রতকথার মতো রূপকথাও রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দসই 'লোককথা'র একটি ফর্ম। রূপকথার কাহিনি আমাদের চোখের সামনে একটি রূপকে ফুটিয়ে তোলে মাত্র কিন্তু বাস্তবতার কোনও দায় তার নেই। রূপকথাগুলি কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও কালের সীমায় আবদ্ধ নয়, তা একপ্রকার

অসম্ভব, অবাস্তব, অলীক রসের মায়াবী ভুবন তৈরি করে। অথচ এই আপাতঅর্থহীন গল্পগুলিতে মানবসত্তা কোথাও না কোথাও নিজেকে খুঁজে পায়, তাই প্রতিটি দেশের প্রতিটি সাহিত্যে রূপকথার এত আদর। রূপকথার এই মূল আবেদনটিকে লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> শিশুকাল থেকে মানুষ বলছে 'গল্প বলো' ; সেই গল্পকে বলে রূপকথা, রূপকথাই সে বটে, তাতে না থাকতে পারে ঐতিহাসিক তথ্য, না থাকতে পারে আবশ্যিক সংবাদ, সম্ভপপরতা সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সে কোন-একটা রূপ দাঁড় করায় মনের সামনে, তার প্রতি ঔৎসুক্য জাগিয়ে তোলে, তাতে শূন্যতা দূর করে ; সে বাস্তব।[৫১]

আর্ট ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতার ধারণা রবীন্দ্রদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র। চোখে দেখা, ইন্দ্রিয়লব্ধ বাস্তবই সেখানে বাস্তবতার একমাত্র ধ্রুবক নয়। মানুষের মন একধরণের বাস্তবতা তৈরি করে নিতে পারে, তাকে বলা যায় সৃজনশীল বাস্তবতা। বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসংগত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity[৫২]

রূপকথা উপভোক্তার মনে বাস্তবতার এই রূপটিকেই নির্মাণ করে, তখন আপাত অসংলগ্নতা ও অলীকতা তার কাছে বাধা হয়ে ওঠে না—সে খুশি হয়ে ওঠে।

রূপকথা আর এক অর্থে রূপকাশ্রিত কথা। তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে নিহিত থাকে এক তাৎপর্যময় জীবনবাণী। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> গল্পে(রূপকথার) তথ্যের প্রদর্শনী নয়, কোনো একটা মানব পরিচয়ের সমগ্র ছবি, আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বেঁধেছে তার মধ্যে। রূপের মোহিনী শক্তি, বিপদের পথে বীরত্বের অধ্যবসায়, দুর্লভের সন্ধানে দুঃসাধ্য উদ্যম, মন্দের সঙ্গে ভালোর লড়াই, ভালোবাসার সাধনা, ঈর্ষায় তার বিঘ্ন, এ সমস্ত হৃদয়-বোধ নানা অবস্থায়, নানা আকারে

মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ; এর কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের; এদের সাজিয়ে গল্পের ছবিতে রূপ দিয়ে রূপকথায় ছেলেদের জন্য যোগানো হচ্ছে আদিকাল থেকে। এর মধ্যে অলৌকিক জীবের কথাও আছে, কিন্তু তারা মানুষেরই প্রতীক। আছে দৈত্যদানব, বস্তুত তারা মানুষ; ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি, তারাও তাই। এইসব গল্পে মানুষের বাস্তব জগৎ কল্পনায় রূপান্তরিত হয়ে শিশু-মনের জগৎরূপে দেখা দেয়, শিশু আনন্দিত হয়ে ওঠে।[৫৩]

প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে মন এখনও নবীন আছে, সেই নবীন মনের অপার বিস্ময়বোধ থেকে রূপকথারসের সৃষ্টি। তাতে তথাকথিত রিয়ালিজমের ভার নেই অথচ তা হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপকথা বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায় 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গ্রন্থসমালোচনায়। গ্রন্থটি হল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রূপকথাধর্মী উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'।'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের রূপকথা অংশে লেখকের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন—

গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা ও দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব, অমূলক, অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম পথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যত যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়মবন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে[৫৪]

অথচ দ্বিতীয় অংশের পরিকল্পনায় একটি গঠনগত ত্রুটির দিকে ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় অংশটিকে "রোগশয্যার স্বপ্ন" বলে চালানোর চেষ্টা ঠিক হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত। কারণ "ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নে এমন কোন অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না।"[৫৫] সমালোচক

রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এখানে সজাগ হয়ে উঠে স্বপ্নের সঙ্গে রূপকথার তফাৎ করেছে। উপন্যাসটির মধ্যে রূপকথার রসই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল কবিকে। শিশুমনের জড়ত্ব বিমোচনে রূপকথাধর্মী শিশুপাঠ্য গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন কবি ; যা সেকালের বাংলা সাহিত্যে প্রায় ছিল না বললেই চলে। একজন আদর্শ সমালোচকের দায়বদ্ধতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র পাঠকদের মনে রূপকথাধর্মী আখ্যানের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে দিয়ে বাঙালি পাঠকের সাহিত্যরুচি নতুন করে তৈরি করতে চাইছেন তিনি—

> সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা আমরা ধারণা করতে পারি।... সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে ; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয় জলধির বিচিত্র উত্থান পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়।[৫৬]

মানব মনে রূপকথার অদ্ভুত রস এতখানি মূল্যবান বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার লোকসাহিত্যগুলি সংগ্রহের পেছনে রবীন্দ্রনাথের এক গভীর স্বাদেশিক বোধ কাজ করেছে। বাংলার নিজস্ব লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার 'জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি' বলে অভিহিত করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত রূপকথা কাহিনির সংকলন 'ঠাকুরমার ঝুলি: বাংলার রূপকথা' গ্রন্থের যে 'ভূমিকা'টি রবীন্দ্রনাথ লেখেন তা আকারে ছোটো হলেও অত্যন্ত সারগর্ভ। এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রূপকথার গল্পগুলির মতো এতবড়ো স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কিছু নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে রেখেছে যে ইদানিং এই রূপকথাগুলিও ম্যাঞ্চেস্টারের কল থেকে তৈরি হয়ে বিলেতের হাতফেরতা দেশের শিশুদের কাছে এসে পৌঁছায়। স্বদেশের দিদিমা কোম্পানী একেবারে দেউলে। তাঁদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোনো কোনো স্থানে মার্টিনের 'এথিক্স' এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোটবই বেরিয়ে পড়তে পারে কিন্তু রাজপুত্র, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, সাত

সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত-রাজার ধন মানিক সেখান থেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে। রূপকথা যুগ যুগ ধরে বাঙালি শিশুকে চিত্তের মধু যুগিয়ে এসেছে। এই রূপকথার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাতা-মাতামহীদের স্নেহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় বলেছেন—

> যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যকন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।[৫৭]

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে তাড়িত হয়ে আজকের শিশুরা সেই আনন্দের রস থেকে বঞ্চিত। তাদের সায়ংকালীন শয্যাতল নীরব। তাদের পড়াঘরের কেরোসিনদীপ্ত টেবিলের ধারে কেবল বানান বই মুখস্থ করবার গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন—“মাতৃদুগ্ধ একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে?”[৫৮]

এই ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানিয়েছেন যে ইতিপূর্বে কোনো কোনো গল্পকুশলা অথচ শিক্ষিতা মেয়েকে দিয়ে তিনিও রূপকথা লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা কিছুতেই তাঁর মনঃপুত হয়নি কারণ যতই মেয়েলি হাতের লেখা হোক না কেন, বিলিতি কলমের যাদুতে রূপকথার রূপটি মরে গেছে, তা তার চিরত্ব বিসর্জন দিয়ে এখনকার কালের মতো হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি দক্ষিণাবাবুকে উচ্চকণ্ঠে অভিবাদন জানিয়েছেন কারণ,

> তিনি ঠাকুমা’র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।[৫৯]

শ্রুতিসাহিত্যকে ছাপার অক্ষরে ধরতে গেলেই তা বিকৃত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রূপকথার ভাষা ও ভঙ্গি যাতে মূলের অনুরূপ হয়, সে ব্যাপারে লোকসাহিত্য সংগ্রাহকদের

সতর্ক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরিণত বয়সে বিভূতিভূষণ গুপ্তের রূপকথা সংকলন ‘বেড়াল ঠাকুর ঝি’(১৩৩০) গ্রন্থের ‘ভূমিকা’য় একথা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> রূপকথা মেয়েদের মুখে যেমন শোনা যায় ঠিক তেমনই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। এগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে, এ-সমস্তই অখ্যাতনাম্নী মেয়েদেরই রচনা, তাহাদেরই প্রতিদিনের ঘরকর্‌নার হাঁড়িকুঁড়ির অন্তরের কথা।[৬০]

এই ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখেছেন – “মানবপ্রকৃতি ভিতরে সকল জায়গাতেই সমান, কিন্তু তাহার বাহিরের চেহারাটা দেশভেদে অবস্থাভেদে ভিন্ন।”[৬১] লোকসমাজ বিশেষত লোকসংস্কৃতিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ একেবারে গোড়াকার কথা। নৃতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে আজকের দিনে একথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেছে যে লোকমনের আদিম প্রকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সমাজে অভিন্ন ; সংস্কৃতির উপরিকাঠামো দেশ ও অবস্থা ভেদে ভিন্নতা এনে দিয়েছে।

এইভাবে রূপকথা নিয়ে সারা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছিলেন, তাতে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন এর ‘গণসাহিত্য’মূলক প্রবণতার ওপর। এর সর্বজনীন গল্পরসে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা সকলেই অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রূপকথার ভাষা জ্ঞানের ভাষা নয়, তা হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা। তাই সজীব মনকে সে কল্পনার রসে উজ্জীবিত করে তোলে।

প্রবাদ ও প্রবচন

লোকসংস্কৃতির অন্য শাখাগুলির মতো প্রবাদ ও প্রবচন(Proverbs and Idioms) নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণধর্মী বড়ো লেখা কিছু পাওয়া না গেলেও এ নিয়ে তাঁর যে গভীর চর্চা ছিল তার প্রমাণ কবিজীবিনে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন একটি ভাষাকে নিবিড়ভাবে জানার জন্য সেই ভাষায় রচিত প্রবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। তাই ১৮৭৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমবার বিলেত যাত্রাকালে ইংরেজি ভাষার বুলি রপ্ত করার জন্য তিনি জাহাজে যেতে যেতে পড়ছিলেন Richard Chenevise Trench এর প্রবাদ সম্পর্কিত গ্রন্থ ‘Proverbs And Their Lessons’। ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’এ কবি নিজেই এই বই পড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৬২] এই ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই জীবনের প্রান্তসীমায় ‘বাংলা

ভাষা পরিচয়' নামক গ্রন্থ লেখার উপকরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজের উদ্যোগে বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন।

তবে এর অনেক আগে থেকেই ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব লোকসংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে পরিবারের কোনো কোনো সদস্য প্রবাদ-প্রবচন প্রকাশ করেছিলেন। অন্তত এমন দুটো দৃষ্টান্ত আমরা পাই। প্রথমঃ ১২৯৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় ঠাকুরবাড়ির 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ইংরেজি প্রবাদ-প্রবচন নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'বিবাহ ও স্ত্রী সম্বন্ধে ইংরেজি পুরাতন প্রবচন' বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়।[৬৩] দ্বিতীয়ঃ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'পুণ্য' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি, হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শোভনা দেবী একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন—'কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবচন'।[৬৪] শোভনাসুন্দরী দেবী বিবাহসূত্রে রাজস্থানের জয়পুরে অবস্থান করায় সেখানকার প্রবাদ প্রবচনগুলি সংগ্রহ করে বঙ্গানুবাদসহ সেগুলি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন এবং বাংলা প্রবচনের সঙ্গে সেগুলির তুলনামূলক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় যেমন বিশ শতকের গোড়া থেকেই ছড়া-গীতিকা, রূপকথা-ব্রতকথা সংগ্রহের জোয়ার এসেছিল ঠিক তেমনই তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ মতো প্রবাদ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত বই 'প্রবাদপদ্মিনী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। ঐ একই বছরে রবীন্দ্রনাথ স্ব-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ করেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'প্রবাদ প্রসঙ্গ'। ঠিক এর আগের বছর ১৩০৪ এর আষাঢ় সংখ্যায় ভারতীতে 'প্রবাদ প্রসঙ্গ' শিরোনামে প্রকাশিত হয় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের প্রবন্ধ। এর অনেক পরে ১৩৪৩ এর পৌষ মাসে সুধীরচন্দ্র মজুমদার 'বাগধারা সংগ্রহ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'করকমলে গ্রন্থখানি সশ্রদ্ধ উপহার' দিয়ে তাঁর অভিমত প্রার্থনা করেন। সম্ভবত এই বইটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই কবি বাংলা ভাষার প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেন 'বাংলা ভাষা পরিচয়' বইটি লেখার উপকরণ হিসেবে। একটি খাতার চার পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি মোট ৮০টি বাগধারা সংগ্রহ করেছিলেন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন আর্কাইভে রক্ষিত ১৫৯ নম্বর পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে বাগধারাগুলি লিপিবদ্ধ আছে।[৬৫] ভাষা শিক্ষার আবশ্যক

শর্ত হিসেবে লোকভাষার নিদর্শন বাগধারাগুলিকে সংগ্রহ করা রবীন্দ্রনাথের কাছে সেদিন অপরিহার্য মনে হয়েছিল, আজও এর গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি।

গ্রাম্যসাহিত্য: পল্লিগীতি ও ময়মনসিংহ গীতিকা

পল্লিগীতি ও গ্রাম্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয় ঘটে শিলাইদহপর্বে, পদ্মাতীরে, জমিদারি পরিচালনার কাজ করতে গিয়ে। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন গ্রামের জীবনেই নিহিত আছে দেশের প্রাণশক্তির উৎস। এই বাংলার দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সহজ-সরল জীবনচরিত্র, এর সাহিত্য, সংগীত, অকৃত্রিম মাধুর্য গুণ কবিকে আকর্ষণ করেছে। পল্লিগীতির সুর তাঁর মনের মধ্যে কেমন আবেগ নিয়ে প্রবেশ করেছিল 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধের সূচনাতে কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন। ভরা শ্রাবণে পাবনা-রাজশাহির জলপথে ভ্রমণ করতে করতে রবীন্দ্রনাথ শুনলেন একটি ডিঙি নৌকায় দশ-বারোজন মাঝি দাঁড়ের পরিবর্তে এক একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরে গানের তালে তালে ঝপঝপ শব্দে জল কাটিয়ে চলেছে। তাদের সমবেত কণ্ঠে গানটি ছিল এইরূপ—

"যুবতী, ক্যান বা করো মন ভারী
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি"[৬৬]

গ্রাম্যকবির এই আটপৌরে রচনা যেন ছন্দোবদ্ধ সুরে-তালে সমগ্র মাঠ-ঘাট, জল-স্থল, চরাচরের মধ্যে জেগে উঠল –

> গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক, সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে।[৬৭]

গ্রাম্যকবির একক কণ্ঠস্বরে সমগ্র গ্রামজীবনের অন্তর্বেদনা ভাষা পায়। ব্যষ্টি নয় সমষ্টি ; ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীকে প্রতিফলিত করে বলে এই সব গ্রাম্যছড়া ও গানগুলি সম্পূর্ণমাত্রায় লোকসাহিত্য। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন এই গ্রাম্যসাহিত্যকে কাব্য হিসেবে আস্বাদন করতে

গেলে পল্লির সমস্ত লোকালয়কে মনের গভীরে জড়িয়ে নিতে হবে ; তাতেই তার ভাঙা ছন্দ ও অপূর্ণ মিল দূর হয়ে প্রাণের আবেগে তা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলছেন, গ্রাম্যসাহিত্যকে বাংলাভাষার মূল ধারার সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিৎ নয়। বরং গ্রাম্যসাহিত্যের শিকড়ের রসে পুষ্ট হয়েই গড়ে উঠেছে তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্যের উপরিকাঠামো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপমাবহুল ভাষায় এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন—

> গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য ও উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে।[৬৮]

নিচের সঙ্গে উপরের এই যোগ কেমনভাবে রক্ষিত হয়েছে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের দৃষ্টান্তে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিকঙ্কণ মুকুন্দ যদিও রাজসভা-ধনীসভার কবি, যদিও তাঁরা উভয়েই পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তবুও দেশীয় প্রচলিত লোকসাহিত্যকে তারা বেশিদূর ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প হতে পারে কিন্তু অন্নদামঙ্গল কখনোই কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া নয়। তার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনি অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পেলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়ার পথ তৈরি হয়।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু টেক্সট রাজসভার কবির হাতে লিখিত হলেও সেগুলির প্রকৃত যোগ যে গ্রাম্যসাহিত্যের শিকড়ে প্রোথিত, রবীন্দ্রনাথের আগে এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে তা কেউই অনুধাবন করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসারে গ্রাম্য গীতিকাগুলিকে(স্থূলভাবে তিনি এগুলিকেও ছড়া বলেছেন) মোটের ওপর দু'ভাগে ভাগ করেছেন – হরগৌরী বিষয়ক ও কৃষ্ণরাধা বিষয়ক। এই দুই এর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"হরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন আর একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।"[৬৯]

হরগৌরীর গানে বাংলাদেশের যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে, তাতে সামাজিক দাম্পত্য বন্ধনকেই উচ্চ আদর্শে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এই দাম্পত্যের প্রধান অন্তরায় মূলত দারিদ্র্য, পতির রোজগারহীনতা আবার কখনও বা স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই গ্রাম্য কবিরা হরগৌরীর দাম্পত্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সামাজিক দাম্পত্যের বিজয় গেয়েছেন। স্বামী দরিদ্র বে-রোজগেরে যাই হোক না কেন, তার জন্য দাম্পত্যে কোনো ভাঙন ধরত না—

> বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে।... ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন--- দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই। 'আমার সম্বল নাই' যে বলে সেই গরিব। 'আমার আবশ্যক নাই' যে বলিতে পারে তাহার অভাব কীসের? শিব তো তাহারই আদর্শ।[৭০]

গ্রাম্য কবির কবিপ্রতিভা শুধু এটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। গ্রাম্যকবিরা শিবকে গাঁজা, ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করে এঁকেছেন। শুধু তাই নয়, অসভ্য কোঁচ-কামিনীদের প্রতি শিবের আসক্তি প্রচার করতেও তারা ছাড়েননি। বাংলার 'শিবায়ন' প্রভৃতি কাব্য পড়লে দেখা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষত কালিদাসের জিতেন্দ্রীয়, মহাযোগীশ্বর শিব কীভাবে বাংলার গ্রাম্য কবিদের হাতে পড়ে 'দুর্গতিপ্রাপ্ত' হয়েছেন। তবে এমন নষ্টচরিত্র স্বামীর ঘর করেও যে গৌরী তার সমস্ত অভাব-অভিযোগসত্ত্বেও পতিগতপ্রাণ সাধবী—দাম্পত্যের এই অটুট বন্ধনকেই গ্রাম্য কবিরা তাদের গানে সমস্বরে প্রচার করেছেন এবং বাংলার গ্রামীণ জীবনের চিরস্থায়ী আদর্শ হিসেবে এর জয় ঘোষণা করেছেন। "স্বামী দীন-দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী"[৭১]—এই-ই ছিল সেযুগের সামাজিক আদর্শ, হরগৌরীর গানে গ্রাম্যকবিরা সেই আদর্শকেই প্রচার করেছেন।

এই দাম্পত্য সম্পর্কের সূত্রেই এসেছে পারিবারিক জীবনের কথা। গ্রাম্য কবিদের লেখনী গৌরীকে বাংলাদেশের অন্তঃপুরে ঘরের মেয়ে করে তুলেছে। শিব বাউণ্ডুলে, সংসার উদাসীন জামাই, দুই ছেলে ও মেয়ে নিয়ে গৌরীর দারিদ্র্যকন্টকিত, অভিযোগবহুল অথচ সুখী পারিবারিক জীবন গ্রাম্যকবিরা এঁকেছেন। তার সঙ্গে আগমনী-বিজয়ার গানে সাম্বৎসরিক পুত্র-কন্যাসহ গৌরীর পতিগৃহে আগমন ও বিজয়ায় মাতৃস্নেহ ছিন্ন করে স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তন—সব মিলিয়ে এক পারিবারিক নাট্যলীলা হরগৌরী কথাকে অবলম্বন করে বাংলার গ্রামীণ কবিদের হাতে ক্রমশই পরিশীলিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগৃহীত গ্রাম্য কবিতায় নানা উদাহরণ তুলে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন।

এই ঠিক বিপরীত প্রান্তে আছে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গানগুলি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।"[৭২] যদিও রাধাকৃষ্ণের সমাজ বহির্ভুত অপ্রাকৃত প্রেম বৈষ্ণবসাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব ও রূপকের আবরণে প্রকাশ পেয়েছে তবুও এই রূপকের অন্তরালে একটি পদার্থ আছে যা বাংলার বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী, মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, সেটি নিঃসন্দেহে নরনারীর প্রেম—যা যুগ যুগ ধরে ভাবুক চিত্তকে আলোড়িত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন, নরনারীর প্রেমের এই যে মোহিনী শক্তি, যে শক্তির বলে চন্দ্র-সূর্য, পুষ্পকানন, নদনদীসহ আমাদের চারপাশের পরিবেশ এক মুহূর্তে মধুর রসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যে প্রেমের শক্তি আকস্মিক, অনির্বচনীয়তায় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, উপেক্ষিত বিশ্বজগৎকে চোখের পলকে কৃতকৃতার্থ করে তোলে, সে শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলে অনুভব ও বর্ণনা করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন সলোমন, হাফেজ ও বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী। দুইটি মানুষের প্রেমের মধ্যে এমন এক বিশ্বব্যাপকতা আছে যে আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মনে হয় সেই প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ দুইটি মানুষের মধ্যেই সীমায়িত নয়, তা ইঙ্গিতে জগৎ ও জগদীশ্বরের মধ্যবর্তী অনন্তকালের সম্বন্ধ ও অপরিসীম ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করছে। রবীন্দ্রনাথের এই কথার সূত্রে আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ত্রুবাদুরদের প্রেমসংগীতের কথা। প্রাচীন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশ প্রভাঁসে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে ত্রুবাদুর নামে একদল চারণ কবিসমাজের উদ্ভব হয়, যাঁরা প্রেমসংগীত রচনা করে দেশে দেশে গেয়ে বেড়াতেন। শুরুর দিকে আমাদের বৈষ্ণবসাহিত্যের মতোই এই গানগুলিও ছিল পরকীয়া রতি আধারিত এবং রূপকের ভাবে এর সঙ্গে ধর্মচেতনা সংযুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই সমাজনিষিদ্ধ পরকীয়া প্রেম পরিশুদ্ধ হয়ে

কামনাহীন দেহহীন প্রেমে পরিণত হয়েছে, যার সঙ্গে আমাদের চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবধর্মের ‘কামগন্ধহীন প্রেমের’ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ রাধাকৃষ্ণগীতিকাগুলিকে যে অর্থে বাঙালির জীবনে ‘সৌন্দর্যের গান’ বলেছেন, তা দেহবাসনাসম্পৃক্ত ও দেহবাসনামুক্ত উভয় স্তরেই ত্রুবাদুর প্রেমেরই দোসর।[৭৩] রাধাকৃষ্ণলীলার সমাজনিষিদ্ধ প্রেমকে ত্রুবাদুরদের প্রেমসংগীতের অনুরূপেই রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয় কারণ মানব প্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মুলিত করতে পারে না। তাকে অযথাপরিমাণে রোধ করতে গেলেই সমাজের বিপদ।

> আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপাদিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য – বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্বার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন... তাহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন।[৭৪]

বৈষ্ণব কবিরা যে সর্বত্রই কামকে ‘নিকষিত হেমে’ পরিণত করতে পেরেছেন, এমনটা নয়। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনীতে পড়ে যেমন দূষিত ও মৃত পদার্থও প্রতিনিয়ত সংশোধিত হয় ঠিক তেমনই এইসব গানের সৌন্দর্য ও ভাবের বেগে জমে ওঠা বিকার সহজেই শোধিত হয়ে চলেছে। প্রাকৃত অসুন্দরকে ভাবের জগতে সার্থক ও সুন্দর করে তোলাই রাধাকৃষ্ণভাবের কবিতাগুলির সার্থকতা।

হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকার ভাবগত পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনার শেষে ‘গ্রাম্যসাহিত্য’ প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই দুই শ্রেণির গীতিকা ছাড়াও বাংলার গ্রাম্যসাহিত্যে সীতা-রাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তা তুলনায় স্বল্প। এর কারণ হিসেবে তাঁর মনে হয়েছে, পশ্চিমভারতে যেখানে রামায়ণকথাই সাধারণের মধ্যে বহুলভাবে

প্রচারিত সেখানে পৌরুষের চর্চা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হয়েছে ঠিকই কিন্তু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের উপযুক্ত বিকাশ যে রামায়ণের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে তার সর্বাঙ্গীণ চিহ্ন, রামায়ণের বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ বাংলায় গ্রাম্যসংগীতগুলিতে প্রচারিত হয়নি বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'রামায়ণ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন এক ভক্তিমিশ্রিত আবেগ লালন করেছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রামকথাকে তিনি যে কত উচ্চ ও মহৎ সাহিত্য বলে মনে করেন তার প্রমাণ পাব। রামায়ণের প্রতি এই ভক্তিমিশ্রিত পক্ষপাত থেকেই এখানে রবীন্দ্রনাথ যেন একটু অতিশয়োক্তিবশতই লেখেন—"বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।"[৭৫] রামায়ণ কথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্রে আছে। দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মানুষের যত প্রকার উচ্চাঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ রামায়ণে রয়েছে। বস্তুত মানুষকে মানুষ করবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশের কোনো সাহিত্যে নেই। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু প্রাগাধুনিক যুগে পাঁচালি কিংবা লোকশ্রুতিনির্ভর আখ্যায়িকা হিসেবে রাম-সীতার কাহিনি যে বাংলায় কম চর্চিত হয়েছিল, এ কথা ঠিক নয়। মূল ধারার পাশাপাশি সপ্তদশ শতাব্দীতে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে[৭২] নারীর অন্য স্বর উপস্থাপিত হয়েছিল, যা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়েনি। তাই রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটিকে কিছুটা একদেশদর্শী বলে আমাদের মেনে নিতে হবে।

ময়মনসিংহগীতিকা

গ্রাম্যসাহিত্যের গীতিকাবিষয়ক আলোচনায় ময়মনসিংহগীতিকা অবশ্যই পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নামক গাথাগুলি দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এগুলিকে খাঁটি লোকসাহিত্য হিসেবে চিনে নিয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাশে ও খরচে করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্য আপনি ধন্য।[৭৬]

ময়মনসিংহ গীতিকায় যা রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল তা হল পল্লির সহজ জীবনরস। তা ছাঁচে ঢালা ফরমায়েশি সাহিত্য নয়। 'জাভাযাত্রীর পত্র'এর অংশবিশেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> মৈমনসিংহ থেকে যে-সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে সহজেই বেজে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের সুর। কোনো শহুরে পাবলিকের দ্রুত ফরমাশের ছাঁচে ঢালা সাহিত্য তো সে নয়। মানুষের চিরকালের সুখ-দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে গাওয়া হয়েও থাকে, তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই, এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে বটে তবুও তা বিশ্বেরই ফসল—তা ধানের মঞ্জরী।[৭৭]

এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিসরে লোকবিশেষের গানের মধ্যে বিশ্বমানবের সর্বজনীন সুরটিকে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞ কান খুব সহজেই চিনে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন পরবর্তীকালে 'বাংলা কাব্যপরিচয়' সংকলন করেন, তখন ময়মনসিংহ গীতিকাকে সেখানে স্থান দেন। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাওয়ার পর চন্দ্রকুমার ও দীনেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, যে তাঁরা গ্রাম্যগাথার আদিরূপকে আধুনিক ভাষায় পরিমার্জিত করেছেন এবং দীনেশচন্দ্রও নিজের সম্পাদকীয় সীমা লঙ্ঘন করে মূল পাঠের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এ অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল খাঁটি লোকসাহিত্যের ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে জাল করা যায় না। নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> প্রচলিত লোকসাহিত্যে গ্রন্থসত্ত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে তবু মোটের ওপর তার ঐক্যধারা নষ্ট হয় না। ওর মধ্যে যে একটা আশ্চর্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটেনি যাতে একবার তার সুর কেটে যায়, তাল কেটে যায়। ওর ভিতরকার জিনিস রয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করার সাধ্য কারো

> নেই—বাইরে দুটো একটা জায়গায় একটু-আধটু চুনবালির পলাস্তারা লাগালেও ইমারৎটা বাতিল হয়ে যায় না। ময়মনসিংহ গীতিকার কালনির্ণয় চলে না, ওটা আবহমান কালের, কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে। এই কাল ওতে রিফু করতে যায় যদি, সেটা তখনই ধরা পড়ে এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে না।[৭৮]

ময়মনসিংহ গীতিকায় আধুনিকতার প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি সেই অভিযোগের সুচিন্তিত প্রত্যুত্তর। এই পত্রাংশ 'বাউল সঙ্গীত' শিরোনামে 'বাতায়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দীনেশচন্দ্র সেন তা পাঠ করে উৎসাহিত হন। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডিত হতে দেখে কৃতজ্ঞ মন নিয়ে তিনি কবিকে একটি চিঠিতে লেখেন—

> পূজাসংখ্যা বাতায়নে আপনি অতি অল্প কয়েকটি ছত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে রূপ সমালোচনা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ করিতে পারিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না, আপনার অন্তর্দৃষ্টি এত তীক্ষ্ম ও সত্যাশ্রিত যে তাহাতে যে কোন বিষয়ের জটিলতা ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ উজ্জ্বল করিয়া দেখায়। আপনি বৃদ্ধ, কিন্তু মনের জগতে আপনার চিরযৌবন ; তাহা বয়স এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আপনার মন্তব্য ক্ষুদ্র একটি মণির ন্যায় বহুমূল্য ও উজ্জ্বল। আপনি আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করুন।[৭৯]

অমিয় চক্রবর্তীকেও রবীন্দ্রনাথ অকপটে লিখেছিলেন—"যখন ময়মনসিংহ গীতিকা হাতে পড়ল খুব আনন্দ পেয়েছিলুম।... আমি তো জাত বুর্জোয়া, আমার ভাল লাগতে একটুও বাধেনি।"[৮০]

ময়মনসিংহ গীতিকায় বাংলার খাঁটি লোকজীবন তার নিজের সুরে কথা বলে উঠেছে। এই সুরটিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক মন খুব সহজেই সেদিন চিনে নিতে পেরেছিল।

কবি-সংগীত

সাধনা পত্রিকার জৈষ্ঠ্য ১৩০২ সংখ্যায় 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, 'লোকসাহিত্য'(প্রকাশ ১৯০৭) গ্রন্থে সেই প্রবন্ধটিই 'কবি-সংগীত' শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের একাধিক পুনর্মুদ্রণে এই প্রবন্ধটি স্বস্থানে রক্ষিত হয়। এখান থেকেই জেগে ওঠে একটি গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয় হিসেবে নিয়েছেন কবিওয়ালাদের গান, তা কি আদৌ লোকসাহিত্যের বিষয়? নগর গড়ে ওঠার প্রাকলগ্নে বাংলার সংস্কৃতিতে কবি-সংগীত নাম দিয়ে যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ লোকসাহিত্যের যোগাযোগ কতটা? এই প্রশ্নটি আগে বিচার করা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কাল এ দেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল। বণিক ইংরেজের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেওয়ার পর বৃহত্তর বাংলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ইংরেজদের উপনিবেশ এবং এই উপনিবেশের রাজধানী হল নতুন গড়ে ওঠা শহর কলকাতা। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকল। নবগঠিত শহর কলকাতা ও ভাগিরথীর উভয় তীরলগ্ন নানা অঞ্চলে ধীরে ধীরে তৈরি হল নগর। এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ল উত্তরে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত। এই নতুন গড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের প্রভু হলেন ইংরেজ আশ্রিত ধনী বেনিয়া ও মুৎসুদ্দীরা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গড়ে উঠল এক নতুন জমিদার ও জোতদার সম্প্রদায় ; যারা গ্রামাঞ্চলে জমিদারি কিনলেও মুখ্যত বসবাস করতেন শহরে। এই নতুন প্রভুদের কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজ সংগঠিত হতে শুরু করল। এদের হাতে জমে উঠল প্রচুর কাঁচা টাকা। এই নবোদ্ভূত বাবু সম্প্রদায়ের অবসর বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য এক নতুন ধরণের সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হল। এরই ফসল কবি-গান। এই নতুন উদ্ভূত বাবুসমাজের আর পুরনো রীতির যাত্রা, পাঁচালিতে মন উঠল না। আবার ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা তখনো এ দেশে পুরোপুরি প্রচলিত না হওয়ায় ইউরোপীয় কাব্য ঐশ্বর্যের সন্ধানও তখন এদের কাছে অধরা অথচ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য চাই উত্তেজক রোমাঞ্চ। এই রোমাঞ্চের যোগান দিতে বাংলার নাগরিক সমাজে তৈরি হয়ে উঠল এক লঘু ধরণের গীতবাদ্য – কবিগান, আখড়াই গান, তর্জা-খেউড় এবং একটু উচ্চ রুচির মহলে টপ্পা। আখড়াই বা টপ্পার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সরাসরি কোনো যোগ নেই কিন্তু কবিগানের উদ্ভব নাগরিক রুচির মধ্যে হলেও এর অঙ্গে জড়ানো রয়েছে প্রাচীন পদাবলী, কীর্তন বা গ্রাম্যগীতের বাণীচিত্র। বাইরের আবরণে লোকসাহিত্যের সঙ্গে কিছু মিল থাকলেও কবিগান নাগরিকতারই ফসল। যাঁরা কবি গাইতেন, তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও কবিপ্রতিভা বিশেষ না থাকলেও তাদের সভায় দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক গান তৈরির ক্ষমতা ছিল, তা সে গানের মান যাই হোক না কেন! এরা পয়সার বিনিময়ে মাঠে-

মেলায়-আসরে কিংবা বাবুদের বৈঠকখানায় গান গাইতেন। কবিগান গেয়ে এঁরা অর্থ উপার্জন করতেন, এটাই ছিল তাঁদের জীবিকা। এখানেই খাঁটি লোকসংগীতের সঙ্গে কবিগানের চারিত্রিক তফাৎ। খাঁটি লোকসংগীত অর্থাৎ জারি-সারি-বাউল-ভাটিয়ালি যাঁরা গান, তাঁরা হয় সাধনার অঙ্গ হিসেবে নয়তো শিল্পীর স্বাভাবিক প্রকাশের আনন্দে গান। সেখানে অর্থ বা বৃত্তির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। বিপরীতে কবিওয়ালারা ছিলেন ইংরেজি ‘Poetaster’ দের মতো। ফেরিওয়ালা যেমন মাথায় করে কবিতা বা গান ফেরি করে বেড়ায় তেমনিভাবে কবিওয়ালারাও সরস্বতীর সাধনাকে নিজেদের জীবিকার কাজে লাগিয়েছিলেন। অনেক সময় স্থূল রুচির খেয়াল মেটানোই ছিল এদের হাতযশের প্রধান উপায়। বাদনশিল্পী ও দোহারকে নিয়ে এরা দুই প্রতিপক্ষ দলে ভাগ হয়ে যেতেন। প্রথমে শুরু করতেন ঠাকুর-দেবতার গান দিয়ে। এরপর রাত যত বাড়তে থাকত, গ্যাসের বাতি অথবা রেড়ির তেলের শিখা যত ম্লান হয়ে আসত, কবিওয়ালাদের সুর দুন থেকে চৌদুনে পৌঁছত, কবিওয়ালারাও তখন ক্ষেত্র বুঝে ঠাকুরদেবতার প্রসঙ্গ ত্যাগ করে আসরে নিয়ে আসতেন ইন্দ্রিয় উত্তেজনাকর অশ্লীল প্রসঙ্গ। সমকালীন নানা কেচ্ছা নিয়ে অনুপ্রাস ও মিলের চমক লাগিয়ে তারা আসর সরগরম করে তুলতেন। সরস্বতীর বন্দনা গেয়ে আসরে নেমে এরা সরস্বতী প্রদত্ত যৎসামান্য সংগীতপ্রতিভাকে অশ্লীল রসের ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত করে তুলতেন। স্থূলরুচির বিনোদনপ্রিয় বাবুসমাজের তাতেই তাক লেগে যেত। কবিওয়ালাদের তারা প্রচুর পুরস্কার ও খেলাৎ সহযোগে নগদ বিদায় দিতেন। নাগরিক রুচির আবেষ্টনীর মধ্যে এভাবেই সে যুগে তৈরি হয়ে উঠেছিল কবি-সংগীত।

এই কবি-সংগীত নিয়ে বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ আর সেটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থে। কবি-সংগীতের উদ্ভব ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে আমরা তাই দেখানোর চেষ্টা করলাম কেন ‘কবি-সংগীত’ প্রবন্ধটি ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুপযোগী। যাই হোক, স্থূল বিচারে এই প্রবন্ধটি লোকাসাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলেও রবীন্দ্রনাথ কবি-সংগীতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং এই গানগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণে নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বাংলায় প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের অবসান ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিক কাব্য সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালারা সেতুবন্ধস্বরূপ। তাঁরা ক্রান্তিকালের ফসল কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা ও প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য ও তাৎক্ষণিক। এঁদের আয়ুও অত্যন্ত অল্প। রবীন্দ্রনাথ এঁদের তুলনা করেছেন গোধূলি আকাশের পতঙ্গের সঙ্গে –

> একদিন হঠাৎ গোধূলির সময় যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়, এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল – তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনো তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।[৮১]

কবি-গানগুলি গীতিকাব্যেরই অনুবর্তন আর বাংলাদেশ চিরকাল গীতিকবিতার পীঠস্থান। গীতিকাব্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনিবার্যভাবেই স্মরণ করেছেন বৈষ্ণব কবিতার কথা। তাঁর দৃষ্টিতে বৈষ্ণব পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো, যেমন তার ভাবের সৌরভ ; তেমনি তার গঠনের সৌন্দর্য। মঙ্গলকাব্য ধারার উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অন্নদামঙ্গল ও এর রচয়িতা রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেছেন। লিখেছেন রাজসভাকবি রায়গুনাকরের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য। কবি-সংগীতগুলি গীতিকবিতা হিসেবে এগুলির সমগোত্রীয় কিন্তু উৎকর্ষে অনেক ন্যূন। কারণ এতে ভাবের গাঢ়তা ও গঠনের পারিপাট্য কিছুই নেই। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে বাংলার প্রাচীন কাব্যগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হত, তাই এইসব রচনার প্রতি কবির ছিল সমীহমিশ্রিত ভক্তিবিনম্র আবেগ ; তাই ভাব-ভাষা-ছন্দ-রাগিনী কোনো অংশেই কবির পক্ষ থেকে অবহেলার কোনো লক্ষণ ছিল না। কবি ভক্তিমিশ্র আবেগ নিয়ে গান রচনা করতেন, শ্রোতৃগণ অখণ্ড অবসর নিয়ে সে গান শুনতেন এবং রাজা ছিলেন যথার্থই গুণের সমজদার, ফলে কীর্তিমান কবি রাজানুগ্রহে যথার্থই খ্যাতিমান হয়ে উঠতেন।

এদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকেই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যেহেতু বদলে গেল, রাজা বা দেবতার উচ্চ আসন থেকে কাব্যের লক্ষ্যস্থল নেমে এল জনসাধারণের আসরে এবং সেই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষক হঠাৎ-রাজা বা ভূস্বামীরাও যেহেতু উচ্চ আদর্শের পরিবর্তে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকেই বিনোদনের মূল লক্ষ্য বলে স্থির করলেন তখন বাংলার সুপ্রাচীন কাব্য ঐতিহ্য সংকীর্ণ ও মলিন হয়ে জনতার আসরের কবি-গানে পরিণত হল। এককালের বৃহৎ দীর্ঘিকা পাঁকে বুজে এসে ধীরে ধীরে পরিণত হল এঁদো পুকুরে। যুগমানসের এই পরিবর্তনকে গভীর পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখলেন –

ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।[৮২]

কবির দল তাদের সেই আমোদের উত্তেজনা পূর্ণ করতে আসরে অবতীর্ণ হলেন। কবিওয়ালারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশিয়ে, তাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য ভেঙে গনসাধারণের উপযোগী সুলভ করে দিয়ে লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারজোড়া ঢোল ও চারখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চিৎকার করে আকাশ বিদীর্ণ করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ দেখে আপতিকভাবে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো এক্ষেত্রে 'Popular Literature' এর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, পূর্বকালে সংগীতের লক্ষ্যস্থল যখন ছিলেন দেবতা ও রাজা তখন তা উৎকৃষ্ট ছিল কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন তা স্থানবিচ্যুত হয়ে জনসাধারণের আসরে নেমে এল তখনই তা চটকমিশ্রিত ও লঘু হয়ে পূর্বের শিল্পগুণ ও আভিজাত্য হারিয়ে ফেলল। 'লেসলি ফিডলার'[৮৩] পপুলার লিটারেচরের যে বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন, কবিগান সেগুলিকে ধারণ করেছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনই একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে শুধুমাত্র জনসাধারণের আসর লক্ষ্য করে কবিগানগুলি রচিত হয়েছে বলেই রবীন্দ্রনাথ এগুলির নিন্দা করেছেন, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণ ও নবোদ্ভূত বাবুসমাজের স্থূলরুচির নিন্দা করেছেন ; যে স্থূলরুচি সে যুগের শ্রেণিবাস্তবতারই ফল। কারণ রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মক্লান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসে দু'দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাইত, তারা সাহিত্য রস চাইত না।

কবি-সংগীতকে রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করেছেন আরো একটি বিশেষ কারণে। গান শোনার যে বিশেষ উদ্দেশ্য অর্থাৎ রসসম্ভোগ ও নান্দনিক আনন্দ সেটুকুই কবিগানের উপভোক্তাদের কাছে যথেষ্ট ছিল না। তারা গানকে উপলক্ষ করে রীতিমতো একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, লড়াই ও দু'পক্ষের বাদানুবাদে হার-জিতের উত্তেজনা চাইতেন। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে বলেছেন নূতন হঠাৎ-

রাজাদের মনোরঞ্জনার্থে এ এক নূতন ব্যাপার। সরস্বতীর বীণার তারে ঝনঝন শব্দে ঝংকার দিলেই চলবে না, বীণার কাঠের দণ্ডটি নিয়ে ঠক্ঠক্ শব্দে লাঠি খেলতে হবে। উত্তেজনার মাত্রা চড়ানোর জন্য কবিগানেও বিবর্তন হয়েছে। প্রথমে নিয়ম ছিল দুই প্রতিপক্ষদল আগে থেকেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর-প্রত্যুত্তর লিখে আনতেন কিন্তু তাতে বেশিদিন তৃপ্তি হল না। আসরে বসেই মুখে মুখে বাগযুদ্ধের রেওয়াজ চালু হল। কবিত্বশক্তি এদের অনেকেরই খুব বেশি ছিল না ফলে তাৎক্ষণিক বাগযুদ্ধে উচ্চভাব ধরে রাখা বেশিক্ষণ সম্ভব হত না, অচিরেই তা নেমে আসত পারস্পরিক গালিগালাজে অথবা সস্তা খেউড়ে। ভোক্তারাও গানের মধ্যে দিয়ে উত্তেজনার আমোদটুকু পেলেই খুশি। তাদের প্রত্যাশাও খুব বেশি ছিল না। কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমতো জবাবেই সভা জমে উঠত এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হত। তারপর আবার জোড়া জোড়া ঢোল কাঁসি আর গানের নামে সম্মিলিত চিৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে বিজনবিলাসিনী সরস্বতী অচিরেই সভাস্থল ত্যাগ করে পালাতেন।

কবিওয়ালাদের কবিত্বশক্তি যে অত্যন্ত মেকি ও কৃত্রিম তা এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন। সৌন্দর্যের সরলতা ও ভাবের গভীরতায় যাদের দৃষ্টি নিমগ্ন হতে পারে না, তারাই সস্তা কেরামতির প্রয়োগ ঘটিয়ে শ্রোতার কানে উত্তেজনা সঞ্চারের চেষ্টা করে। সংগীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাতে রাগ-রাগিণীর যতই অভাব থাক, তালপ্রয়োগের কোলাহল যথেষ্ট থাকে। বিশুদ্ধ সুর অপেক্ষা সেই তালের কোলাহলে অশিক্ষিত চিত্ত সহজেই মেতে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন সাধারণ লোকের কান শীঘ্র আকর্ষণ করার সুলভ উপায়। সংগীতে অনুপ্রাস যখন ভাব-ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয়, তখন তাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে সকলকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে উঠে যখন অনুপ্রাস লাগানোই কবিত্বশক্তির একমাত্র প্রদর্শন ক্ষেত্র হয়ে ওঠে তখন তা দিয়ে মূঢ় লোকের বাহবা আদায় করা যায়, মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, এটাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনুপ্রাস ও মিলের চমক সৃষ্টি করাই কবি গাইয়েদের একমাত্র মূলধন। বৈষ্ণব সংগীতের অক্ষম অনুকরণে এরা নিজেদের গানকে নানা উপবিভাগে সজ্জিত করেছিলেন—যেমন চিতান, পরচিতান, প্রথম ফুকা, প্রথম মেলতা, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা এবং অন্তরা। ফুকা, মেলতা এবং অন্তরাতে চটকদারি নানা মিল কৃত্রিমভাবে সজ্জিত করতেন

যাতে ব্যাকরণের শুদ্ধতা তো ছিলই না, আর্টের সংযমও বিন্দুমাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে যে কবিগানটি উদ্ধৃত করে বিষয়টি বুঝিয়েছেন, আমরাও এখানে সেটি উদ্ধার করলাম—

গেল গেল কুল কুল, যাক কুল—

তাহে নই আকুল।

লয়েছি যাহার কূল সে আমারে প্রতিকূল

যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়

অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়

এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকূল হারাব সই!

তাতে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়[৮৪]

এই গানটি উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে পাঠকদের উদ্দেশে বলেছেন, "পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি উদধৃত গীতাংশে এক কুল শব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনো গুণপনা নাই; কারণ উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তিমাত্র।"[৮৫] আসলে এইসব অযত্নরচিত ও স্বল্প প্রতিভার আয়াসসাধ্য গানগুলিকে শ্রোতার কানে জোর করে ভালো লাগানোর জন্য এত অনুপ্রাসবহুল শব্দের আবশ্যক হয়েছে। এই চেষ্টা অরূপবান মানুষের রূপবান হওয়ার চেষ্টায় সর্বাঙ্গ প্রসাধিত করার ব্যর্থ চেষ্টারই সমতুল। রবীন্দ্রনাথ আরো একটি উপমা ব্যবহার করে বলেছেন, সোজা দেওয়ালের উপর লতা উঠাতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মেরে অবলম্বন সৃষ্টি করে যেতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও তেমনি ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মেরে যাওয়া। অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করে বসে।

অর্থাৎ কবিওয়ালারা পূর্ববর্তী শাক্ত ও বৈষ্ণব মহাজনদের ভাবগুলিকে তরল ও ফিকে করে শহরের শ্রোতাদের সুলভ মূল্যে জুগিয়েছেন কিন্তু সেখানে যোগানদারের ফাঁকি অত্যন্ত বেআব্রু হয়ে ধরা পড়েছে। ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়ে কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার নিয়ে কাজ সারা হয়েছে।

ইন্দ্রিয় উপভোগের একটি প্রধান উপকরণ হল আদিরস অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের বর্ণনা দান। সেই বর্ণনার মাত্রা চড়িয়ে একে যত ইন্দ্রিয়সংলগ্ন করে তোলা যায় স্থূলরুচির শ্রোতারা ততই তা থেকে আমোদ ও উত্তেজনা অনুভব করেন। কবিওয়ালারা যেহেতু মূলত জনমনোরঞ্জনের কারবারি তাই তারা কিছুতেই এ মওকা ছাড়েননি। ইন্দ্রিয়লগ্ন প্রেমসম্পর্কের মূলধন এরা সংগ্রহ করেছেন পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের যে সুষম ও নিপুণ চালচিত্রে রাধাকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ প্রেমও শাশ্বত সৌন্দর্যের অমরাবতীতে মিলেমিশে ছিল, কবিওয়ালারা জোর করে সেই ইন্দ্রিয়জ অংশটুকুকে বৈষ্ণব পদাবলীর সামগ্রিক সৌন্দর্যমূর্তি থেকে স্খলিত ও বিচ্ছিন্ন করে ইতর ভাষা ও শিথিল ছন্দ সহযোগে সাকীর পেয়ালায় ফেনোচ্ছল মদের মতো বিতরণ করেছেন। ফলে তা গলিত পদার্থের মতোই কদর্য মূর্তি ধারণ করেছে। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর সুষমামণ্ডিত চালচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল কলঙ্ক এবং ছলনাকেই কবিওয়ালারা নিজেদের গানের বিষয় করে তুলেছেন। এমনকি কৃষ্ণের ছলনার উত্তরে রাধার যে অভিমান তাও নারী হিসেবে রাধার আত্মসম্মানবোধকে পদে পদে বিঘ্নিত করেছে এইভাবে বিষয়গৌরবে কবিগান যে কত হীন, তা রবীন্দ্রনাথ সপ্রমাণ করেছেন।

তবুও জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তাকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর মতে সমাজে দু'ধরণের সাহিত্য রুচি সমান্তরাল ভাবে থাকবে। পাঠকের আনন্দবিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যক সাধন ও অবসর রঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্য পাশাপাশি থাকবে। এই জনপ্রিয় ক্ষণিক সাহিত্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের সাময়িক পত্র ও নাট্যশালাগুলির উদাহরণ টেনেছেন। কিন্তু গোধূলির পতঙ্গের মতো এই ক্ষণকালজাত সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে পারেননি। কারণ এগুলিতে যে উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য, সুলভ অলংকারের বাহুল্য, ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য ও সাহিত্যনীতির ব্যাভিচার এবং সর্ববিষয়ে রূঢ়তা ও অসংযম দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি কোনোমতেই সাহিত্যের স্থায়ী আসনে অমরত্ব লাভ করতে পারে না। কবিগানে এবং তাঁর সময়ের আধুনিক নাট্যশালায় ও সংবাদপত্রে এই ধরণের লোকরঞ্জনার্থে সৃষ্ট জনপ্রিয় সাহিত্য সম্পর্কে এটাই তাঁর অভিমত। তবে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন ব্যতিক্রমী ভাবে কোনো কোনো কবিগানে সৌন্দর্য ও ভাবের উচ্চতা নিশ্চয়ই আছে তবে সামগ্রিকভাবে এই গানগুলির মধ্যে "রসের জলীয়তা এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয় ; এবং সেইরূপ হইবার প্রধান কারন, এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমতো রচিত।"[৮৬]

তবুও এই কবি-গানের মধ্যে দিয়েই যেহেতু বাংলা সাহিত্যে নূতন কালের পদসঞ্চার ঘটেছে, আধুনিক সাহিত্য সেই প্রথম রাজসভা ত্যাগ করে পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করেছে, সেজন্য কবিগানের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করতে পারেননি।

যাত্রা ও কথকতা

রবীন্দ্রনাথ বিদেশি প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও তার মঞ্চসজ্জার আড়ম্বরকে কখনোই পছন্দ করেননি এমনকি মঞ্চসজ্জার আড়ম্বরে দৃশ্যকাব্যের স্বতঃস্ফূর্ততা বিঘ্নিত হয় বলেই মতপ্রকাশ করেছেন। বিদেশি প্রসেনিয়াম থিয়েটার অপেক্ষা দেশীয় যাত্রাই তার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার সবচেয়ে সংহত রূপ পাওয়া যায় 'রঙ্গমঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই বলছেন, "যে মন বৈজ্ঞানিক নাটকের জমি সেইখানে। আমাদের দেশে যে যাত্রা ছিল সেইটেই খাঁটি দিশী। অর্থাৎ ভাবুকতাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা, বাস্তবিকতাকে নয়।"[৮৭] মঞ্চের কৃত্রিম চিত্রপটের তুলনায় দর্শকের চিত্তপটকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অভিনয়শিল্পীর কাছে আশা করেছেন যে তিনি তার সুচারু অভিনয়ের সাহায্যে দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করবেন, যাতে বাইরের দৃশ্যপট দর্শকের কাছে সম্পূর্ণ বাহুল্য বলে মনে হয়। দেশি যাত্রা যাবতীয় কৃত্রিমতার আড়ম্বর থেকে মুক্ত, সে কথা বোঝাতে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার এই জন্য ভাল লাগে যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপরে ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে – একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া ওঠে।

তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ ; আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে?[৮৮]

দেশি যাত্রায় সংগীতের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। অনেক সময় শুধু গানগুলি গেঁথে গেঁথে পালাবদ্ধ করে তা গাওয়া হতো। একে বলে যাত্রাপালা বা কোথাও কোথাও যাত্রাগান। রবীন্দ্রনাথ 'সংগীত' বইএর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—

বিদেশী অলঙ্কারশাস্ত্র পড়বার বহুপূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি, সে তো গানের সুরেই ঢালা। সে যেন বাংলাদেশের ভূ-সংস্থানের মতো, সেখানে স্থলের মধ্যে জলের অধিকারই বেশি... মনে তো পড়ে একদিন তাতে মুগ্ধ হয়েছিলুম।[৮৯]

'Performing Art'গুলির মধ্যে কথকতা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে প্রচলিত। এটি সংগীত ও অভিনয়ের সমাবেশ। যাত্রা বা পালাগানের মতো এখানে একাধিক কুশীলব, সাজসজ্জা, যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার থাকে না। কথকঠাকুর তার নির্দিষ্ট আসন বা বেদীতে বসে কোনো পৌরাণিক কাহিনি বা ইতিহাসের গল্প শ্রোতার সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন, যাতে কথকের অভিনয় ও কণ্ঠের সুর একত্রে মিশে গিয়ে শ্রোতার মনে এক মোহময় ভাবাবেগ তৈরি করতে পারে। নাটকের মতো বিভিন্ন কুশীলব না থাকায় কথক শুধু ভঙ্গি ও কণ্ঠের ওঠা-পড়ার সাহায্যে একাধিক চরিত্রকে বর্ণনা করেন। কখনও তিনি রাজা, কখনও দেবতা, কখনও সন্ন্যাসী আবার কখনও দেবী বা দাসীর ভূমিকাতেও তিনি সংলাপ বলেন। যাত্রার মতো কথকতাতেও সংগীত একটি বিশেষ স্থান অধিকার করত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"কথকতা যেন অলঙ্কার শাস্ত্রমতে ন্যারেটিভ শ্রেনীভুক্ত, তার কাঠামো গদ্যের হলেও স্ত্রীস্বাধীনতা যুগের মেয়েদের মতোই গীতকলা তার মধ্যে অনায়াসেই অসংকোচে প্রবেশ করত।"[৯০] ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন থিয়েটারকে লোকশিক্ষার একটি মাধ্যম বলে মনে করেছিলেন, তেমনই রবীন্দ্রনাথ যাত্রা ও কথকতাকে গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, সমাজহিতের পক্ষে গুরুতর অনেক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই দুই শিল্পরূপের মধ্যে দিয়ে খুব সহজেই জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া যেত—

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেক দিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।[৯১]

কথকতার মাধ্যমে তত্ত্বকথা বিস্তারের বিষয়টি 'জীবনস্মৃতি'তে একটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—

> আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে, আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেই জন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।[৬২]

ছাপা বই এর প্রসারের পর থেকে অবশ্য এই লোকসংস্কৃতির মাধ্যমটি ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

লোকশিল্প

গ্রামবাংলাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন বলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলার লোকজ শিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমত্ব ছিল। তার বহিঃপ্রকাশ পুরোপুরি লক্ষ করা যায় শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার পর। শ্রীনিকেতনে বাংলার লোকশিল্পগুলিকে Cottage Industry এর মাধ্যমে তিনি পুনরুজ্জীবিত করেন। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই খাঁটি লোকশিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলার ঐতিহ্যিক চারুকলাগুলির মধ্যে আলপনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। কখনও ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে আবার কখনও বা শুধুই অলংকরণের উদ্দেশ্যে আলপনা আঁকেন গ্রাম-বাংলার নারী ও স্থানবিশেষে পুরুষেরাও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালস্রোতে হারিয়ে যেতে বসেছিল বাংলার এই প্রাচীন লোকশিল্প। রবীন্দ্রনাথ এর পুনরুজ্জীবনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আগ্রহী পড়ুয়াদের আলপনা শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশ থেকে কালীমোহন ঘোষের এক বাল্যবিধবা আত্মীয়া সুকুমারী দেবীকে নিয়ে আসেন আশ্রমে। এই সময়ে সুকুমারী দেবী, চিত্রনিভা চৌধুরী, ইন্দুলেখা ঘোষ প্রমুখদের হাত ধরে শান্তিনিকেতনে আলপনার চর্চা চলতে থাকে পুরোমাত্রায়। এ বিষয়ে ১৩২২ বঙ্গাব্দে মৈত্রেয়ী দেবীর পিতা চট্টগ্রামনিবাসী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে

রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন, তা এ বিষয়ে তার আগ্রহের দলিল। সংশ্লিষ্ট পত্রাংশটি নিচে উদ্ধৃত করা হল—

> চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপুজো, বিবাহ উপলক্ষে যে সমস্ত আলপনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রং-এ আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিস হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিস চাই—চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়ে ঘর আছে তার ফটো বা অন্য কোনোরকমের প্রতিকৃতি, আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবে না। ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্প কাজ কি রকম চলিত আছে ভালো করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এইসমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।[৯৩]

মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ বইতে এই পত্রটি সম্পূর্ণ উদ্ধার করে তলায় লিখেছেন, সেই চিঠিখানি শনিবারের সেই সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল এবং প্রচুর আলোচনা হয়েছিল। সেদিন নাকি চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ভারি আশ্চর্য তো হয়েছিলেনই, কিছুটা হতভম্বও হয়েছিলেন –রবীন্দ্রনাথ বাঁশের বেড়া দিয়ে কী করবেন? যে রবীন্দ্রনাথ তখন ভারতের অথা এশিয়ার মধ্যগগনে দীপ্তিমান, যাঁর কবিতা, দর্শন, সাহিত্যকীর্তি বিশ্ববিশ্রুত, যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়ে স্পর্ধিত ইয়োরোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এশিয়ার বিজয় ঘোষণা করেছেন, তিনি পাড়াগেঁইয়ে মেয়েদের আঁকা আলপনা বা বাঁশের নক্সা দিয়ে কী করবেন? ও সব জিনিস বিদ্বান মানুষদের তখন চোখেই পড়ত না।[৯৪]

মৈত্রেয়ী দেবীর এই সংযোজনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কেন বাংলার লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ এবং চর্চার পুরোধাপুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছি। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ‘গণশিল্প’ সংগ্রহের যে উদ্‌যোগ তিনি নিয়েছিলেন, তার মধ্যে যতটুকু সংগৃহীত হয়েছিল তা আজও কলাভবনের নন্দন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চা অনেক এগিয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু সূচনা লগ্নে এই বিদ্যাচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রকে তিনি নিজের হাতে যেভাবে শুরু করেছিলেন তার মূল্যায়ন ভবিষ্যতেও আমাদের করে চলতে

হবে। বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় তাঁর সুদূরপ্রসারী অবদান সম্পর্কে এই পরিচ্ছেদে আমরা সাধ্যমতো আলোচনা করলাম।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭ পৃ-৮০।

২. তদেব, পৃ-৬৫।

৩. তদেব, পৃ-১০০।

৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধ, *বঙ্কিম রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃ-৬৫৬।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাউলের গান', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-২৪৪।

৬. তদেব, পৃ-২৪৬।

৭. তদেব, পৃ-২৪৬।

৮. তদেব, পৃ-২৪৫।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছোটো ও বড়ো', *শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী,* খণ্ড-১৭, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১১।

১০. Tagore Rabindranath, 'An Indian Folk Religion', *Creative Unity,* Macmillan, 1922, p-75-76.

১১. তদেব, p-76.

১২. তদেব, p-85.

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষার বিকিরণ', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৫।

১৪. Tagore Rabindranath, 'An Indian Folk Religion', পূর্বোক্ত, p-86.

১৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক,* ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৭ ব, পৃ-৭।

১৬. Tagore Rabindranath, 'The Philosophy Of Our People', *The Modern Review,* January 1926, p-84.

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মরমিয়া', প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩২, পৃ-৬০৯।

১৮. মুহম্মদ মুনসুরউদ্দীন সংকলিত 'হারামণি' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ লিখিত আশীর্বাদ, শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ,* পরিশিষ্ট-৬, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১, পৃ-৯৩।

১৯. তদেব, পৃ-৯১।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১৫ সংখ্যক কবিতা', 'পত্রপুট', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৪০০।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* শতবার্ষিক সংস্করণ, খণ্ড-১২, পৃ-৫৬৯।

২২. তদেব, পৃ-৫৯৬।

২৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক,* খণ্ড-৩, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৭।

২৪. অনাথনাথ দাশ ও বিশ্বনাথ রায়(সম্পা), *ছেলেভুলানো ছড়া,* আনন্দ, ১৪০২ ব, পৃ-২৬০।

২৫. তদেব, পৃ-২৬৬-৬৭।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্র,* ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩১৯ ব, পৃ-২৪০।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া-২', *লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-১৯৮-৯৯।

২৮. তদেব, পৃ-১৭৬।

২৯. মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য,* প্যাপিরাস, ২০০০, পৃ-৩৯-৪০।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি,* ৫ই অক্টোবর,১৯২৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৫৩, পৃ-৫০-৫২।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৫।

৩২. তদেব, ১৭৬।

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য,* এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৮০ ব, পৃ-৩৫-৩৬।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭৬।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা ভাষা পরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী,* শতবার্ষিক সংস্করণ, খণ্ড-১৪, পৃ-৪৬৬।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-১৭৬।

৩৭. তদেব, পৃ-১৭৬।

৩৮. তদেব, পৃ-১৭৭।

৩৯. তদেব, পৃ-১৮১।

৪০. তদেব, পৃ-১৮৫-৮৬।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া:২', তদেব, পৃ-১৯৯।

৪২. তদেব, পৃ-১৯৯-২০০।

৪৩. তদেব, পৃ-২০৫।

৪৪. তদেব, পৃ-২১৮।

৪৫. দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেয়েলি ব্রত', সাধনা, চৈত্র ১৩০১ ব, পৃ ৪৫৪-৫৫।

৪৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত,* বিশ্বভারতী, ১৩৫০ ব, পৃ- ১৩।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেয়েলি ব্রত', সাধনা, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫৬।

৪৮. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলার ব্রত,* পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫।

৪৯. শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট-১, পৃ-৮৪-৮৫।

৫০. তদেব, পরিশিষ্ট-৩, পৃ-৮৮।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যতত্ত্ব', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৫ ব, পৃ-১৩৫।

৫২. তদেব, পৃ-১৩৫

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৫২-৫৩।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কঙ্কাবতী', সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯ ব, পৃ-৩৫৭।

৫৫. তদেব, পৃ-৩৫৭।

৫৬. তদেব, পৃ-৩৬০।

৫৭. শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট-২, পৃ-৮৬-৮৭।

৫৮. তদেব, পৃ-৮৬।

৫৯. তদেব, পৃ-৮৭।

৬০. তদেব, পৃ-৮৯।

৬১. তদেব, পৃ-৮৯।

৬২. 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'(১ম পত্র) এ এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—''আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের 'Proverbs and Their Lessons' বইখানি পড়ছিলেম, তিনি[B বলে উল্লিখিত জনৈক ভদ্রলোক] এসে শিষ দিতে দিতে দু-চার পাত উলটিয়ে-পালটিয়ে বললেন 'হাঁ—ভালো

বই বটে।" দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭ ব, পৃ-৯।

৬৩. দ্রষ্টব্য, 'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ সংখ্যা, ১২৯৫, পৃ-২১১-২২১।

৬৪. প্রত্যুষকুমার রীত(সম্পা) 'শোভনাসুন্দরী দেবী: জয়পুরী কথা', *ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯, পৃ-৯-৩০।

৬৫. দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালার নির্ণীয়মান তালিকা(২য় খণ্ড), ১৯৮১, পৃ-১৪৮।

৬৬. 'গ্রাম্যসাহিত্য', *লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-২২৪।

৬৭. তদেব, পৃ-২২৫।

৬৮. তদেব, পৃ-২২৬।

৬৯. তদেব, পৃ-২২৭।

৭০. তদেব, পৃ-২২৭।

৭১. তদেব, পৃ-২২৮।

৭২. তদেব, পৃ-২২৮।

৭৩. জগদীশ ভট্টাচার্য, *সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ,* ভারবি, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-২৮।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গ্রাম্যসাহিত্য', *লোকসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-২২৯।

৭৫. তদেব, পৃ-২৪২।

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৪, পৃ-৪৯।

৭৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাভাযাত্রীর পত্র,* রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, খণ্ড-১০, পৃ-৬১৫।

৭৮. দ্রষ্টব্য দেশ পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৯ ব, পৃ-২৬।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* দশম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ-৭০।

৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* একাদশ খণ্ড, পৃ-১৫৪।

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবি-সংগীত', *লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-২১৯।

৮২. তদেব, পৃ-২১৯।

৮৩. জনপ্রিয় সাহিত্য বা Popular Literature সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Fiedler Leslie, 'Towards a Definition of Popular Literature', *Super Culture: American Popular Culture and Europe,* Bowling Green University Press, London, 1975.

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবি-সংগীত', পূর্বোক্ত, পৃ-২২০।

৮৫. তদেব, পৃ-২২০।

৮৬. তদেব, পৃ-২২৩।

৮৭. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ৩১শে আগস্ট, ১৯৩২, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট নামের ফাইল কপি।

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রঙ্গমঞ্চ', *বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-২৭।

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান', *সংগীতচিন্তা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃ-৭৬।

৯০. তদেব, পৃ-৭৬-৭৭।

৯১. দ্রষ্টব্য 'ভাণ্ডার', আষাঢ় ১৩১২, পৃ-১২১।

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* [পিতৃদেব], রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-১৭, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৮।

৯৩. মৈত্রেয়ী দেবী, *স্বর্গের কাছাকাছি*, প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৩৬৭, পৃ-২৩।

৯৪. তদেব, পৃ-২৪-২৫।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ মূলত বাংলা সাহিত্যের লেখক। সৃজনপ্রতিভার পাশাপাশি তিনি আবাল্য বাংলা সাহিত্যের রসসুধা পান করেই নিজের মনের পুষ্টি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে ; যখন এদেশে ছাপাখানার প্রসার ঘটেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে এদেশের সাহিত্যে নতুন দিগদর্শন জেগে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন দত্তের মতো শক্তিশালী প্রতিভা ততদিনে বাংলা সাহিত্যে নিজেদের স্বাক্ষর রেখেছেন। 'বঙ্গদর্শন', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'অবোধবন্ধু'র মতো উৎকৃষ্ট মানের সাহিত্যপত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার একইসঙ্গে পুরনো যুগের বাংলা পুথিসাহিত্য ছাপাখানার সাহায্যে মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত। কৃত্তিবাসের ঘরে ঘরে আদৃত পাঁচালি-রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংস্কৃত পুরাণাদি, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য—এই সবকিছুই নতুন উৎসাহে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে। নতুন ও পুরাতন এই দুই ধারার বাংলা সাহিত্যেরই অসামান্য রসভোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। পুরনো বাংলা সাহিত্যের পাঠ-প্রতিক্রিয়া তাঁর কলমে একাধিক সেরা সাহিত্য-সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্য-সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা সমালোচনার ইতিহাসে এক নজির সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে তিনি বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে মিলিতভাবে বৈষ্ণব পদ-সংকলন 'পদরত্নাবলী' সম্পাদনা করেন। এর পাশাপাশি উনিশ শতকের বরেণ্য বাঙালি সাহিত্যিকবৃন্দ যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের সাহিত্যকীর্তির অভিনব রসবিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। আবার বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন খ্যাতিমান সাহিত্যিক তখন অনুজ লেখকদের হাতে বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটেছে। সে-সবের সাক্ষী ও বিশ্লেষকও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই সব কথা বিবেচনায় রেখে আমরা রবীন্দ্রনাথকৃত বাংলা সাহিত্য-সমালোচনাকে দুটি উপ-অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। যেমন ক) প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা ও খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনা। প্রথমে প্রাগাধুনিক তথা পুরনো বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা হল :

ক)প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন ছাপাখানায় মুদ্রিত সাহিত্যের যুগে। কিন্তু আশৈশব পুথির যুগের পুরনো সাহিত্যের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অটুট। রবীন্দ্রনাথের জন্মকাল অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিক্ষিত সংস্কৃতাভিমানী বাঙালির স্বাজাত্যাভিমানের তাগিদে দেশীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো সাহিত্যসেবী পত্রিকা-সম্পাদকগণ পুরনো বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত সম্পদ উদ্ধারে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক আবহাওয়াতেও পুরনো বাংলা সাহিত্য আদরের সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল। প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়শিক্ষার শিকলকাটা রবীন্দ্রনাথ শৈশবকালের নবীন মনের আনন্দে ও কৌতূহলে সেইসব সাহিত্যের গহনে ডুব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে শৈশব স্মৃতিমূলক যেসব লেখা লিখেছিলেন তার সবকটিতেই তাঁর বাল্যের স্বাধীন লেখাপড়ার কথা উঠে এসেছে। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন সেই পঠনস্মৃতি—

> যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তারপর থেকে যে-বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়। তখন আমি যেসব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোন কোন গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি, অথচ ভার গেল কমে।[১]

এই কাজহীন, ভারমুক্ত মনের আনন্দেই রবীন্দ্রনাথ পুরনো বাংলা সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং সেই পাঠের আনন্দ-বেদনার প্রতিক্রিয়াতেই তৎকালীন সাময়িকপত্রের পাতায় সাহিত্য সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ।

তবে তন্নিষ্ঠ সমালোচক হওয়ার প্রাক-শর্ত হল তন্নিষ্ঠ পাঠক হওয়া। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় রবীন্দ্রনাথ অকপটে জানিয়েছিলেন যে "আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর ছিল কৃশ

ছিল। বোধকরি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম।...আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম—যাহা বুঝিতাম ও যাহা বুঝিতাম না দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।”[২] রবীন্দ্রনাথের এই কথা যে অতিরেক নয়, তা তাঁর শৈশব-কৈশোরের জীবনেতিহাস অনুসন্ধান করলেই জানা যাবে। ভৃত্যমহলে বাল্যকাল কাটবার সুবাদে তিনি চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুনে শুনেই অধিগত করে ফেলেছিলেন। রামায়ণ-মহাভারত ছাড়াও চাকরদের মহল জমে উঠত কিশোরী চাটুজ্জের সুরেলা গলায় দাশরথি রায়ের পাঁচালির ঝংকারে। চাকরদের মহলে যে-সব বাংলা বই প্রচলিত ছিল, সেগুলির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথের শৈশবকালীন সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি হয়। নর্মাল স্কুলে পড়বার সময় বাড়িতে এসে পড়িয়ে যেতেন ওই স্কুলেরই শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল। রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে এঁকে বলতেন ‘মনুষ্যজন্মধারী ছিপছিপে বেত’। এঁর তত্ত্বাবধানেই রবীন্দ্রনাথ পড়েন অক্ষয়কুমার দত্তের ‘চারুপাঠ’ ও ‘বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’, সাতকড়ি দত্তের ‘প্রাণীবৃত্তান্ত’, মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য। এর পাশাপাশি চলেছিল সংস্কৃত ও ইংরেজি শিক্ষা ও পঠন। হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে মুগ্ধবোধের সূত্র মুখস্থ থেকে শুরু করে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে ‘কুমারসম্ভব’ পাঠ ও তর্জমাকরণ। পাশাপাশি চলেছিল শেকসপিয়র চর্চা ও ম্যাকবেথের অনুবাদ। গঙ্গার বোটে পিতৃদেবের সঙ্গে বেড়াবার সময়ে অতি প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়মে ছাপা গীতগোবিন্দ তাঁর মানস-সঙ্গী হয়ে ওঠে আবার কখনও তাঁর উৎসুক মনের দরজায় কড়া নাড়ে প্রচুর ছবিসমৃদ্ধ ইংরেজি বই ‘ওল্ড কিউরিওসিটি শপ’। সাহিত্যের বই ছাড়াও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আশৈশব আগ্রহী পাঠক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সাতকড়ি দত্ত শেখাতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মেডিকেল কলেজের ছাত্র কঙ্কালসহযোগে শেখাতেন অস্থিবিদ্যা আর পিতৃদেব ডালহৌসি পাহাড়ে ভ্রমণের অবসরে প্রকটরের গ্রন্থসহযোগে রাতের আকাশে তারার সংস্থান দেখিয়ে শিশু রবীন্দ্রনাথকে আগ্রহী করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায়। বলা বাহুল্য এইসব পঠন-অভিজ্ঞতাই অল্প অল্প করে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে গঠন করেছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য কী ধরণের বইপত্র প্রবেশ করত তা স্বর্ণকুমারীর ‘সেকেলে কথা’র সূত্রে জানতে পারা যায়। তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল বটতলায় ছাপা বই, সেগুলো বাড়ির মধ্যে অন্দরমহলে যোগান দিত মালিনী। নিত্য নতুন বই এর আগমনে মেয়েমহলে শোরগোল পড়ে যেত। এ সব বইএর তালিকার

মধ্যে ছিল মানভঞ্জন, দূতী সংবাদ, কোকিলদূত ; আবার ছিল গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, হাতেমতাই, বাসবদত্তা। এই সব গ্রন্থগুলির সবকটির সঙ্গে না হলেও অধিকাংশের সঙ্গেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল বলে মনে করেন রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্ত পাল।[৩] রবীন্দ্রনাথ নিজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর পাঠচর্চার যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস', ডানিয়েল ডিফোর 'রবিনশন ক্রুশো', নীলমণি বসাকের 'পারস্য উপন্যাস', মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' ও 'মৎস্যনারীর কথা', উমাচরণ মিত্র অনূদিত 'গোলেবকাওলি', হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্ত', প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তুবিচার', লোহারাম শিরোরত্নের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ', মধুসূদন বাচস্পতির 'ছন্দোমালা' ইত্যাদি বই তিনি পড়েছিলেন।[৪] আর একটু পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-পরিধির পরিচয় মেলে 'জীবনস্মৃতি'র নানা অধ্যায়ে, 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে ও সমকালীন নানাজনকে লেখা চিঠিপত্রে। কিশোর বয়সে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে বইটি রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, তা হল সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'। এই বইটির সম্পাদনার ত্রুটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর মন্তব্য করলেও এই বই যে সেই সময় তাঁর 'লোভের সামগ্রী' ছিল, তা অকুণ্ঠভাবে জানিয়েছেন তিনি। 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী, রামেশ্বরের 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী', মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি। এইসব গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে বাল্যকালে পুথিআশ্রয়ী পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে সখ্য তৈরি হয়েছিল, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল। এই সব গ্রন্থের পাঠপ্রতিক্রিয়াজাত মনোভাব থেকে নানাসময়ে জন্ম হয়েছে সমালোচনাধর্মী নানা প্রবন্ধের, যার মধ্যে দিয়ে পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রাজ্ঞ রসভোক্তা হিসেবে রবীন্দ্রমননের অভিনব পরিচয় পাওয়া যায়।

সেইসঙ্গে অবশ্য সাময়িকপত্রের পাতায় সুলেখকের দ্বারা লিখিত পুরনো বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা পড়বার বিস্তর সুযোগ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পত্রিকা ছাড়াও 'বঙ্গদর্শন' ও 'অবোধবন্ধু' নিয়মিত পড়তেন তিনি। শুধু যে নিজে পড়তেন তাই-ই নয়, সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন ও ভালো পড়তে পারতেন বলে বাড়ির গুরুজনদের পত্রপত্রিকার নানা লেখা পড়ে শোনাতে হত তাঁকে। এই পঠনের সূত্রেই বঙ্গদর্শন ও অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখদের সুলিখিত মনস্বী সমালোচনা পড়বার সুযোগ

পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সব অভিজ্ঞতাও তাঁকে সাহিত্যের সমালোচকরূপে তৈরি হয়ে উঠতে সহায়তা করে থাকবে।

এই অধ্যায়ে আমরা পুথিআশ্রয়ী প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরূপে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করব। সকলেই স্বীকার করবেন, সাহিত্যের যুগ-বিভাজন সময়-চিহ্নিত হলেও তা আসলে প্রবণতানিয়ন্ত্রিত একটি ঘটনা। প্রবণতা অথবা মর্জি অথবা দৃষ্টিভঙ্গি যাই নাম দিই না কেন, সাহিত্যের বহিরঙ্গে তার চিহ্ন পড়ে। এর ফলে একটি সময়ের রচনার সঙ্গে অপর সময়ের রচনার সুস্পষ্ট তফাৎ চিহ্নিত হয়ে যায়। এই চিহ্নায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেই আমরা নির্ধারণ করি কোন্ ধরণের সাহিত্যকে আমরা 'আধুনিক' বলব আর কাকে বলব 'প্রাচীন' বা 'মধ্যযুগীয়'। মোটামুটিভাবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে যখন বাংলা বই মুদ্রিত হতে শুরু করল, ছাপার অক্ষরের সেই আদিপর্ব থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে। তার আগের আটশো বছর ব্যাপী বাংলা ভাষায় লিখিত ও মৌখিক পরম্পরাগত যে সাহিত্যের ধারা চলেছিল, তাকেই সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা 'প্রাগাধুনিক সাহিত্য' নামে অভিহিত করে থাকেন। বাংলা ভাষার প্রাচীন পুথিগুলির সময় সুস্পষ্টভাবে ও তর্কাতীতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও প্রাচীন বাংলার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তর্কাতীত। এটি হল ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির হাতে সেন রাজবংশের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজা লক্ষণসেনের পরাজয় ও পূর্ব বাংলায় পলায়ন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল এই সময়। বাংলা থেকে এই ইসলামী শাসনের অবসান ঘটে পলাশীর যুদ্ধে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার ইংরেজদের কাছে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। তুর্কি আক্রমণ থেকে পলাশীর যুদ্ধ এই অভ্যন্তরীণ সময়কাল পর্বটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'প্রাগাধুনিক যুগ' চিহ্নিত করা চলতে পারে। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে বৌদ্ধযুগে একমাত্র 'চর্যাগীতি' ছাড়া বাংলা ভাষার অন্য কোনও নিদর্শন মেলে না। তাই ইসলামী শাসনের সূচনা থেকে অবসান পর্যন্ত কালপর্বটিকেই মূখ্যত বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক যুগ নামে চিহ্নিত করা যায়। সাহিত্যের অন্তর্বর্তী লক্ষণে এই যুগের রচনায় ধর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব সর্বাধিক। প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মের তিনটি প্রধান শাখা বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই তিন উপসম্প্রদায়ের সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য ও সুফী মতাদর্শবাদী সাহিত্য ও সেইসঙ্গে মৌখিক পরম্পরাগত ধর্মসমন্বয়বাদী গীতিকাসাহিত্য এই সবকটি ধারায় তৈরি হয়েছিল অসংখ্য সংরূপ। যেমন পদাবলী সাহিত্য, চরিত সাহিত্য, সন্ত-জীবনী, আখ্যানধর্মী অনুবাদ-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, রোমান্টিক প্রণয়কাব্য, সূফী মতবাদী সাহিত্য, বাউল গান ও

গীতিকা সাহিত্য এবং ছড়া-ধাঁধা-পুরাকথা-রূপকথার মতো নানাশ্রেণির পরম্পরায় বাহিত মৌখিক সাহিত্য। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন বাঙালির কাছে উপরোক্ত এই সাহিত্যসম্ভার ছিল তার নিজস্ব, স্বদেশী সাহিত্যের দৃষ্টান্ত। শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী মনন এইসব পুরনো সাহিত্যকে রসগ্রাহী মন নিয়ে নতুন করে পড়বার প্রেরণা লাভ করে। এইভাবেই বঙ্গসংস্কৃতিচর্চার একটি বিশেষ দিক 'সাহিত্য-সমালোচনা'র রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিয়ালদের জীবনী ও কীর্তি রচনার মধ্যে দিয়ে এই প্রকল্পের সূত্রপাত করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্যসেবীদের হাতে এই ধারা আরও বিকাশ লাভ করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে এই তালিকায় যুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথের নাম। আশৈশব তিনি ছিলেন পুরনো বাংলা সাহিত্যের একজন নিবিষ্ট পাঠক। বৈষ্ণব ও শাক্ত দুধরণের পদাবলী সাহিত্য তো বটেই, তিনি খুব মন দিয়ে পড়েছিলেন মঙ্গলকাব্য আর অনুবাদ-সাহিত্য। বাউল গান ও মরমিয়াগীতির প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত। এইসব সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মূল্যায়ন ও পাঠ-প্রতিক্রিয়ার হদিশ নিলেই পুরনো বাংলা সাহিত্যের সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় সম্ভবপর হবে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগ ও কৌতূহল আকর্ষণ করতে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তাঁর নাম দীনেশচন্দ্র সেন। তিনিই প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরনো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কাঠামোটি প্রথম সুস্পষ্ট রূপ পায় দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'(১৮৯৬) গ্রন্থে। অবশ্য দীনেশচন্দ্রের আগেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'(১৮৬২), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস'(১৮৭১) এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'(১৮৭২)। সুকুমার সেনের মতে শেষোক্ত বইটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ। এই প্রত্যেকটি বইতেই উপনিবেশপূর্ব যুগের বাংলা সাহিত্যের রূপরেখাটি উঠে এসেছে। এছাড়াও রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'(১৮৭৮), রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Literature of Bengal'(১৮৭৭), গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা'(১৮৮০)। এই প্রত্যেকটি বই

দীনেশচন্দ্রের বইটির প্রারম্ভিক পথ প্রস্তুত করেছিল। এই বইসমূহের প্রতিটির সঙ্গে না হোক, অনেকগুলির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, এ কথা অনুমান করাই যায়, বিশেষত রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Literature of Bengal' এর সমালোচনা সূত্রে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 'বঙ্গসাহিত্য' শিরোনামে 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ পর্যন্ত দুবছর ২৪ টি কিস্তিতে বঙ্গসাহিত্যে প্রধান প্রধান কবিদের যে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক আলোচনা করেছিলেন, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল সে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫]

এই চর্চার ধারাবাহিকতাতেই ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দীনেশচন্দ্র সেনের মূল্যবান 'সাহিত্য-ইতিহাস' গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই বইটি পড়েন রবীন্দ্রনাথ এবং লেখককে একটি প্রশংসাসূচক পত্রের দ্বারা অভিনন্দিত করেন। তার পাশাপাশি এই বইটির দুবার সমালোচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। বইটির প্রথম সংস্করণ পড়ে প্রথম সমালোচনাটি লেখেন 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩০৫ সংখ্যা)। সেই সমালোচনায় তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন—

> এই গ্রন্থের আরম্ভভাগে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা পদে পদে পাঠকেরও চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। সেইসঙ্গে মনে এই খেদটুকুও জন্মে যে বাঙলার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা যথোচিত বিস্তৃত হয় নাই। বিষয়টির কেবল অবতারণা হইয়াছে তাহাকে আরও খানিকটা অগ্রসর দেখিলে মনের ক্ষোভ মিটিত।[৬]

বলা বাহুল্য, বঙ্গভাষা রবীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রিয়। এই ভাষা নিয়েই তাঁর সাধনা। তাই বাংলা ভাষার ইতিহাস, এর উৎপত্তি, এর বিকাশ এই সম্বন্ধে এর আগে যে-সব অকিঞ্চিৎকর আলোচনা হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথকে খুব বেশি খুশি করতে পারেনি। তাই এই বইটি পড়ে এই সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যাশা যেমন বেড়ে গিয়েছিল তেমনই এই বইটির অভাবনীয় গুরুত্ব তিনি এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করে এই বিষয়ে তাঁর কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত এবং চেষ্টা নতুন পথে ধাবিত হয়েছে। পাঠকের মনকে এইরূপে প্রবুদ্ধ করাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। দীনেশচন্দ্রের এই বইটি এই অর্থেই সার্থকতার দাবিদার।

রবীন্দ্রনাথের খেদের আরেকটি কারণ হল, তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালির মাতৃভাষার স্বরূপসন্ধান বিষয়ে কোনও হেলদোল নেই। ক্ষোভের সঙ্গেই তিনি লিখেছেন—

> সাময়িক রাজকীয় ব্যাপার ব্যতীত আর-কোনো বিষয়ে আমাদের শিক্ষিতসমাজে আলোচনা নাই। বাংলাভাষার উৎপত্তি প্রকৃতি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুটা কথা আন্দোলন করেন এমন দুইজন বাঙালি ভদ্রলোক আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। অতএব বাংলা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় কথা যিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহাকে সাহায্য বা সংশোধন করিবার উপায় দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।[৭]

তাঁর কথায় বিদেশিদের কাছে যেমন আমরা অনেক কিছুই শিখেছি, তেমনই আমাদের মাতৃভাষাতত্ত্বের সুলুকসন্ধানও আমাদের তাঁদের কাছেই শেখা। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি বীম্‌স সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হ্যারনলে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণের উল্লেখ করেছেন এবং বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে এঁদের মতের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের মতের তুলনাত্মক বিচার করেছেন। বোঝা যায়, দীনেশচন্দ্রের বইটি রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল উসকে দিয়েছিল, তাই আলোচ্য প্রবন্ধে দীনেশচন্দ্রের বইটির সমালোচনাকে উপলক্ষ্য করে তিনি নিজেই এই সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পণ্ডিতদের মতগুলিকে একত্রিত করে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ভেঙে আগত তিনপ্রকার প্রাকৃত ভাষা যথা শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী ও মাগধী এবং অপভ্রংশ ভাষার স্বরূপ বৈশিষ্ট্যকে তিনি একজন নিপুণ ভাষাতাত্ত্বিকের কৌতূহল নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন,

> এক্ষণে বাংলার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে প্রাকৃত, পালি, প্রাচ্যহিন্দি, মৈথিলী, আসামি, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়। কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাংলার ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্তত দুই-এক ঘন্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না।[৮]

আমাদের ভাবতে ভালো লাগে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই পরবর্তীকালে এই কার্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের এই বইটির সমালোচনা লিখতে লিখতেই হয়তো তাঁর মনে হয়, এই বিষয়ে আর কেউ না করুক, তাকেই এগিয়ে এসে কাজ করতে হবে। তাই এই প্রবন্ধের শেষ বাক্যে তিনি লিখেছিলেন, “দীনেশচন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে

আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।”[৯]। সেই ইচ্ছার নিপুণ অধ্যবসায়ী প্রকাশ ‘বাংলাভাষা পরিচয়’(১৯৩৮) বইটি। দীনেশচন্দ্রের বইটির সমালোচনাই রবীন্দ্রনাথকে আদ্যন্ত ভাষাতত্ত্বের এই বইটি রচনায় প্রণোদিত করেছিল।

‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ই একমাত্র গ্রন্থ যার দুবার সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলে বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে বইটি একাধিকবার পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। এই দ্বিতীয় পাঠের অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন নবপর্যায় ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩০৯)। বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন কবিদের স্বতন্ত্র পরিচয়ে ও তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন ‘বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা সম্পন্ন ইতিহাস বনস্পতির আভাস’। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ইতিহাসই যথার্থ মধ্যযুগের ইতিহাস। বাংলাদেশে বৌদ্ধযুগের অন্তিম অবস্থায় গৌড়ের রাজসিংহাসন যখন বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হচ্ছিল, তখন সেই অরাজকতার ছাপ পড়ল সমাজে। এরপর মুসলমান আক্রমণের পর ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

> তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সমেত এক দেবতার মন্দির আর এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্যয়ব্যাপার ঘটিতেছিল।[১০]

তুর্কি আক্রমণের পরে সমাজে উচ্চাবচতার প্রচলিত কাঠামো ভেঙে গিয়ে উচ্চসংস্কৃতি ও নিম্নসংস্কৃতির মধ্যে যে একটা চলাচল বা ‘বর্ণসংযোগ’ ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে সেইদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বৌদ্ধযুগ ও শৈবযুগে বঙ্গসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল, তা দীনেশচন্দ্র খুঁজে পাননি। বাংলাভাষায় লেখা বৌদ্ধযুগের টেক্সট ‘চর্যাপদ’ দীনেশচন্দ্রের এই বইটি লেখবার বছর দশেক পরে আবিষ্কৃত হয়। অবশ্য ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ চিহ্নগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু দীনেশচন্দ্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বঙ্গসাহিত্যের প্রথম পর্ব শৈবসংস্কৃতির ভাঙনের কাল। প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী, বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার বর্ণিত হয়েছে। এই সংঘর্ষই রূপলাভ করেছে উক্ত দেবীদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে। বাংলায় শৈবসংস্কৃতির সঙ্গে ‘মেয়ে-দেবতা’দের সংঘর্ষের পটভূমিকারূপে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয়

প্রেক্ষাপটে শৈবতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস তাঁর নিজ পর্যবেক্ষণ অনুসারে উপস্থিত করেছেন, যা যুক্তিগ্রাহ্য। মূলত কথাসরিৎসাগর ও বিবিধ পুরাণ অবলম্বনে তিনি দেখিয়েছেন, ইন্দ্র-বরুণশাসিত বৈদিক দেবতন্ত্রে শিবের আধিপত্য ছিল না। এরপর ইতিহাসের ক্রমপরিবর্তনের ধারায় ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণকালে সমাজে শৈব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বিরোধের মধ্যে দিয়ে। দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই তা বোঝা যায়। দক্ষের মুখে শিবের প্রতি যে-সকল নিন্দা বসানো হয়েছিল, তা আর্যসমাজেরই কণ্ঠস্বর। আর্যমণ্ডলীর যে বৈদিক যজ্ঞে প্রাচীন আর্যদেবতারা আহূত হতেন, সেই যজ্ঞে শ্মশানেশ্বর শিবকে দেবতা বলে স্বীকার করা হয়নি এবং তাঁকে অনার্য অনাচারী বলে নিন্দা করা হয়েছিল। সেই কারণে শিবের অনুচরদের সঙ্গে আর্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বেঁধেছিল। এই বিরোধে অনার্য ভূত-প্রেত-পিশাচের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং সেই যজ্ঞবেদীর ওপর নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘাত-বিরোধের মধ্যে দিয়েই শিব ক্রমশ আর্যসমাজে গৃহীত হন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,--

> কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবল জাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য উপাসকগণ কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য[১১]।

এই মুণ্ডবাদী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্যদের হাতে পড়ে কীরূপ পরমশান্ত, যোগরত, মঙ্গলমূর্তি ধারণ করে বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে উঠলেন, তা পণ্ডিতেরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন।[১২] শৈব ধর্মমতের প্রতিষ্ঠার কালে বঙ্গসাহিত্যের কীরূপ অবস্থা ছিল, দীনেশচন্দ্র তা খুঁজে পাননি অথবা বিশদে লেখেননি কিন্তু শৈবধর্ম ভেঙে কীভাবে শক্তির প্রতিষ্ঠা হল এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রভাব কতখানি পড়ল তা দীনেশচন্দ্র বিশদে দেখিয়েছেন। দীনেশচন্দ্রের সেই পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণসহায়ে দেখিয়েছেন, শক্তি পূর্বে শিবের পশ্চাতে অনুচর হিসেবে আত্মগোপন করে ছিল। শিবকে অতিক্রম করে সে প্রবলতাপ্রাপ্ত হয়নি। 'কুমারসম্ভব' কাব্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই কাব্যে "বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং—তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভানাং/কালী কপালাভরণা চকাশে—তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ

পাইতেছিলেন। এই কালীর সঙ্গে মহাদেবের কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।”[১৩] ‘মেঘদূতে’ও গোপবেশী বিষ্ণুর কথা পাওয়া যায় কিন্তু উপমাচ্ছলেও কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ‘মালতীমাধব’এও করালদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা রয়েছে, তা সেকালের ভদ্রসমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। শুধু কালিদাসেই নয়, বাণভট্টের ‘কাদম্বরী’তেও মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই পাওয়া যায়। অনার্য শবর পশুরুধির ও পশুমাংসের দ্বারা যে পূজা করতেন, তাকে কবি ঘৃণার সঙ্গেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে পুরনো বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠল তখন দেখা গেল, শিবের সঙ্গে শক্তির বিরোধ ঘনীভূত। এবং সেই বিরোধে শিবের পুজোকে হতমান করে নিজের পুজো প্রচার করতে দেবীর একান্ত চেষ্টা। শিব তাঁর স্বামী তবুও তাঁর সঙ্গে লড়াইতে দেবীর কোনও সংকোচ নেই। শিবের সঙ্গে শক্তির এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়া-মায়া, ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে। বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলি। তিনি কবিকঙ্কণচণ্ডীর উদাহরণ টেনে বলেছেন সেখানে দেখা যায়, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠেছে। কেন উঠেছে তার কোনও কারণ নেই। ব্যাধ যে ভক্ত ছিল, এমনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মেরেছে বলে দেবীর ক্রোধভাজন হতে পারত। কিন্তু দেবী নিতান্ত যথেচ্ছাক্রমে তাকে দয়া করলেন। এটাই শক্তির খেলা। ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করলেন, তেমনই কলিঙ্গরাজকে বিনা দোষে নিগ্রহ করলেন। তার দেশ জলে ডুবিয়ে দিলেন। শক্তির এই প্রকাশের মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্যকারণমালা দেখা যায় না। যে শক্তি নির্বিচারে পালন করছে, সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করছে। এই অহেতুক পালনে এবং অহেতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নেই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করে দেখা সেইসময়ের যুগলক্ষণ। তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও ওপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যেত। নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল, তাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হতে পারত। শক্তির অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার যখন মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে, তখন সমাজে অরাজকতা দেখা যায়। সেই অরাজক শক্তির লীলা রামপ্রসাদ চমৎকার লিখেছেন—“প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি/ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলে জমিদারী/হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকাকড়ি/আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছো রাজকুমারী।।”[১৪] রবীন্দ্রনাথের কথায়, “এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী।”[১৫] এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী। তবুও ভয়ঙ্করের ভীতিই মানুষকে অধিক আকৃষ্ট করে। কারণ এর কাছে

প্রত্যাশার কোনও সীমা নেই। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করতে হয় কিন্তু যেখানে ধর্মাধর্মের কোনও বাধকতা নেই, সেখানে শক্তির লীলা অপ্রতিহত, বল্গাহীন ও প্রমত্ত। কবিকঙ্কনের ধনপতির গল্পে দেখা যায়, যে ধনপতি উচ্চবর্ণীয় ভদ্রবৈশ্য এবং তিনি শিবোপাসক। শুধুমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করে আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করলেন। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জেগে উঠেছে, তখন শিবের পূজা টিকতে পারে না কারণ যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলে গ্রহণ করা যায় না। সংসারী মানুষ মুখে যাই বলুক, সে মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। তাই ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করে থাকতে পারল না। বহুতর নৌকা ডুবল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছেড়ে শক্তি-উপাসক হতে হয়েছিল।

কিন্তু শক্তির অপ্রসন্ন মুখ যে চণ্ডী তার প্রতি ভক্তহৃদয় বেশিদিন ভক্তি ধরে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারি পতির গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে মঙ্গলসুন্দর রূপেও প্রতিভাত হতে থাকলেন। লেখা হল অন্নদামঙ্গল, লেখা হল শক্তির মাধুর্যরূপআশ্রয়ী আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের গীতিকবিতাসমূহ। “চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।”[১৬]। এই দিকটি দীনেশচন্দ্র সেভাবে দেখাতে পারেননি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। মঙ্গলকাব্য ভেঙে গীতিকবিতার মাধ্যমে এই মাধুর্যমিশ্রিত শক্তিগীতিপদাবলী বা আগমনী-বিজয়া পর্যায়ের পদগুলি রচনার পটভূমিকা রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় যথার্থ রসগ্রাহী ও যুক্তিসহ হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ আরও দেখিয়েছেন, অদ্বৈতবাদী শৈব ধর্মমতের বিপরীত প্রতিক্রিয়াতেই বাংলায় দ্বৈতবাদী শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি। শঙ্করের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করেছিল। তখন জনসাধারনের হৃদয়সমুদ্র থেকে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠে শৈবধর্মকে ভেঙেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব দুইই দ্বৈতবাদী ধর্মমত হলেও এদের স্বরূপগত তফাৎ রয়েছে। শাক্তধর্মে ভক্তের সঙ্গে দেবীর যে সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, বৈষ্ণব ধর্মে বিষ্ণুর সঙ্গে ভক্তের তেমন সম্বন্ধ নয়। শাক্তধর্মে দেবীর সঙ্গে ভক্তের দূরত্বের

ব্যবধান রয়ে যায়। দেবী তার ভক্তের সমস্ত দাবি করে, প্রাণ পর্যন্ত কিন্তু ভক্তের উপাস্যের ওপরে কোনও দাবি নেই। সে উপাস্যের কাছে ধন-মান, টাকা-কড়ি চাইতে পারে কিন্তু উপাস্যকে চায় না। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলতে পারে, কিন্তু উচ্চ নীচের ব্যবধান সমানই রেখে দেয়। অপরদিকে বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি; সেই শক্তি বলরূপিণী নয়, প্রেমরুপিণী। বৈষ্ণব ধর্মে ভগবানের সঙ্গে জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করা হয় তা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। এই দুইয়ের তাই মূলগত তফাৎ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

> শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, ও বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ; শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে বেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।”[১৭]

তাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত, সাহিত্যে শেষপর্যন্ত বৈষ্ণবই জয়লাভ করেছে। প্রেমের শক্তিতে বলীয়ান বলেই আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা বৈষ্ণব পদসমূহকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে যে তা পূর্বাপরের তুলনায় অভিনব ও চমকপ্রদ। ভাষা-ভাব, ছন্দ, উপমা, তুলনা, আবেগ সব দিক দিয়ে এক বিচিত্র ও নতুন শক্তি বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশি সাহিত্যের অনুকরণে নয়, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনেও নয়, দেশের মাটি তার নিজের শক্তিতেই এই গান সৃষ্টি করতে পেরেছিল। তাই বাংলাদেশ নিজেকে যথার্থভাবে অনুভব করেছিল বৈষ্ণবযুগে। এই সময়ে সে এমন একটি গৌরব পেয়েছিল যা অলোকসামান্য, যা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যা এই দেশ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে অন্যত্র বিস্তারিত হয়েছিল। এর পরেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের এই ভাবোচ্ছ্বাস একটি বিশেষ অবস্থার পরিণাম মাত্র। এটা স্থায়ী হয়নি। অনতিকালের মধ্যেই সমাজে এই ভাব বিকৃত ও সাহিত্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,--“ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের।...ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনও কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।”[১৮] বাঙালি ভাবের বশে অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করেছে কিন্তু তার চরিত্র পৌরুষলাভ করেনি বা দৃঢ়নিষ্ঠা পায়নি। বাঙালি শক্তিপুজোয় নিজেকে শিশু কল্পনা করে মা মা করে আবদার করেছে আবার বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে

নায়িকা কল্পনা করে মান-অভিমান, বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হয়েছে। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে নিয়ে যায়নি, প্রেমের পূজাও আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করেনি। আমরা ভাববিলাসী বলেই অচিরেই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটতে থাকে। এই কথা বলে দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছেন, "পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"[১৯] আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যায়ন ভুল নয়। উনিশশতক-পূর্ব গোটা বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে না হলেও অন্তত বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে পৌরুষের অভাব ও ভাবকোমলতা মুখ্য লক্ষণ বলে প্রতীয়মান হয়। শাক্ত ও বৈষ্ণব মুখ্যত ভাবরসপ্রধান বঙ্গসাহিত্যের দুই পৃথক ধারা। প্রথম ধারাটির মূল চরিত্র দুর্গা এবং তার গতি গৃহের দিকে অর্থাৎ গৃহাঙ্গন তথা গার্হস্থ্য রসে আর দ্বিতীয় ধারার মূল চরিত্র রাধা; তার গতি গৃহের বাইরে, অর্থাৎ রোমান্টিক সৌন্দর্যের অসীমলোকে। শাক্ত পদাবলীতে তাই গৃহসম্পর্কের আলোছায়ার লীলা আর বৈষ্ণব পদাবলী সৌন্দর্যের অসীমলোকের হাতছানিতে ঘরছাড়া। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই দুই বলিষ্ঠ ধারার সাধারণ লক্ষণ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে চিহ্নিত করেছেন, তাতে তাঁর যথার্থ রসজ্ঞ মনের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যখন ইংরেজিতে লেখা হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও নির্দেশ অনুসরণে দীনেশচন্দ্র 'নূতন পদ্ধতি' অবলম্বন করেছিলেন। রবীন্দ্র-নির্দেশিত এই নতুন পদ্ধতি কী দীনেশচন্দ্র নিজেই তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করছি কারণ তা থেকে সাহিত্যের ইতিহাস কেমন করে লিখতে হয় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনারও পরিচয় পাওয়া যাবে। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন,--

> যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কিভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য একটা যুগের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগলক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষাদীক্ষার ঐতিহাসিক কারণগুলো বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষাদীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করাইয়া তাঁহার প্রসঙ্গে

সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য—নতুবা কোন একটি লোককে তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাঠি দিয়া বিচার করা সংগত নহে। আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা ব্যক্তিগতভাবে হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজী ইতিহাসখানায় রবীন্দ্রবাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।[২০]

রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখা দীনেশচন্দ্রের 'History of Bengali Language and Literature' (1907) প্রকাশিত হলে বিদেশি পণ্ডিতদের কাছে বইটি বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। বিলেতে 'টাইমস', 'অ্যাথিনিয়াম', 'স্পেকটেটর' প্রভৃতি পত্রিকায় বইটির অনুকূল সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বইটি সম্পর্কে আমেরিকা থেকে দীনেশচন্দ্রকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেন,--"ইংলণ্ডে আপনার ইংরাজী গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য ও ছাপার ভুল অপর্যাপ্ত।"[২১]

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর পাশাপাশি পুরনো বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকটি শাখা বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য বিষয়ে আলাদা করে বিস্তারিত লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। এখন আমরা সেই লেখাসমূহের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বৈষ্ণব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ছিল অতি গভীর ও ব্যাপক। ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল না কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে বৈষ্ণব কবিদের পদ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। বাল্যকাল থেকে সৌন্দর্যসন্ধানী তত্ত্বনিরপেক্ষ পাঠক হিসেবে তিনি বৈষ্ণব পদগুলি আস্বাদন করতেন। পরবর্তীকালে অবশ্য বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বকে তিনি মানবসমাজের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে ভিন্নভাবে ভেবেছেন ও লিখেছেন কিন্তু বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যকে তত্ত্বমূল্যে নয়, সাহিত্যমূল্যেই আস্বাদন করতেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র

পাঠকদের তিনি জানিয়েছেন, কিশোর বয়সেই তাঁর হাতে আসে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'। এর প্রথম পর্যায়ে ছিল বিদ্যাপতির পদসমূহের সটীক সংকলন। ১২৮১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ক্রমপ্রকাশিত এই পত্রিকায় সংকলিত পদগুলি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তেন রবীন্দ্রনাথ। এর ভাব, ভাষা এতটাই উঁচু স্তরে ছিল যে কোনও অল্পবয়সীর পক্ষে এর নাগাল পাওয়া শক্ত। তবু তিনি হাল ছাড়েননি। কতখানি অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি এই পদগুলি পড়েছিলেন, তা জানিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়—

> বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনও দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলিও আমার বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।"[২২]

এই পঠনের ফলে বিদ্যাপতির আশ্রয়ী ব্রজবুলি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য দখল জন্মে গিয়েছিল। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভানুসিংহ' ছদ্মনামে লেখা একের পর এক পদ প্রকাশ করতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। পরে এইধরণের একুশটি কবিতার সংকলন নিয়ে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। শুধু বিদ্যাপতির পদই নয়, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বসন্ত রায়, বলরাম দাস প্রমুখ সকল প্রতিনিধিস্থানীয় বৈষ্ণব কবিদের পদ অসীম কৌতূহল নিয়ে পাঠ করেছিলেন। এই পদসমূহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন কল্পনার দুর্লভ ঐশ্বর্য। এরপর বয়স যত এগিয়েছে তত বেশি করে তিনি অনুভব করেছেন বৈষ্ণব পদের রসসৌন্দর্য ; এর তত্ত্বমূল্যকেও নিখিল দেশকালের পটে আবিষ্কার করেছেন তিনি। বাউল গানের মতোই বৈষ্ণব পদগুলির মধ্যে তিনি লাভ করেছিলেন বিশ্ববোধের দীক্ষা। বৈষ্ণব সাহিত্যের পঠন-অভিজ্ঞতা কেমন করে তাঁর বিশ্ববোধকে নির্মাণ করেছিল, সে সম্পর্কে গভীর অনুভব তিনি ব্যক্ত করেছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একাধিক চিঠিতে। তার মধ্যে একটি চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধার করছি—

> আমার জীবনের একটা দিক তোমার ভালো করে জানা নেই। প্রথম বয়সে বৈষ্ণব সাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবন চাঞ্চল্যের আন্দোলনবশত নয়, কিছু উত্তেজনা

ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু ওর আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ ও আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেছে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে একে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারিনি।... আমি মানি রসস্বরূপকে যাঁর পরমানন্দের যাত্রা জীবে জীবে। আমি সেই আনন্দকেই উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্বত্র—বিশ্বপ্রকৃতিতে, বিশ্বমানবে। সত্যকে দেখবার সাধনা আমার, রূপককে সত্য বলে কল্পনা করা কেবল যে আমার পক্ষে অনাবশ্যক তা নয় কিন্তু তা বাধাজনক।[২৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রমাণসিদ্ধ কোনও তত্ত্বের কথা বলতে চাননি, নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়েই বৈষ্ণব তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন, যা একান্তভাবেই তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তাপ্রসূত। অবশ্য কোথাও কোথাও তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেরও মিল হয়ে গিয়েছে। যেমন, 'পঞ্চভূত'এর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,--

বৈষ্ণব ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটি সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।[২৪]

তখন এই কথার মধ্যে দিয়ে আসলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব দর্শনের মুখ্য পঞ্চরসকেই (শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর) প্রতিষ্ঠা দেন। কিন্তু আবার অন্যত্র যেমন প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে

যখন বলেন—“বৈষ্ণবের তত্ত্ব হচ্ছে যুগলমিলনের তত্ত্ব—কাজের সঙ্গে খেলার একাত্ম মিলন হচ্ছে সেই যুগলমিলন”[২৫]—তখন বলতেই হয়, এই যুগলমিলনতত্ত্ব বৈষ্ণব-আদর্শ অনুমোদিত নয়, তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত।

টীকা-টিপ্পনী ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছেড়ে দিলে বৈষ্ণব সাহিত্য বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে সাতটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ পাই। এই সাতটি প্রবন্ধের ভাববস্তু বিচার করলে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারব। রচনার কাল অনুযায়ী এই সাতটি প্রবন্ধের নাম, সেগুলির প্রথম প্রকাশের তথ্যাদিসহ নীচে উল্লিখিত হল—

১	প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (বিদ্যাপতি)	ভারতী	১২৮৮, শ্রাবণ
২	চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	ভারতী	১২৮৮, ফাল্গুন
৩	বসন্ত রায়	ভারতী	১২৮৯, শ্রাবণ
৪	বৈষ্ণব কবির গান	নবজীবন	১২৯১, কার্তিক
৫	বিদ্যাপতির রাধিকা	সাধনা	১২৯৮, চৈত্র
৬	নিছনি	সাধনা	১২৯৮-৯৯, চৈত্র ও বৈশাখ
৭	পহু	সাধনা	১২৯৯, জৈষ্ঠ্য, শ্রাবণ ও চৈত্র

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন তেরো-চোদ্দ, তখন চুঁচুড়া থেকে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালি ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ১৮৭৪ থেকে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ পেতে থাকে। পরে ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই পাঁচখানি বইয়ের সংগ্রহ দু'খণ্ডে প্রচারিত হয়। পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যরসিক ও বিদগ্ধজনেদের দৃষ্টি ফেরাতে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এই সংকলন ভাষাতীত ভূমিকা নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সেই এই সংকলন হাতে পেয়েছিলেন এবং চণ্ডীদাসের সরস ও সরল পদাবলী, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ব্রজবুলিতে রচিত বৈষ্ণব পদসমূহ ওই অল্পবয়সেই তাঁর কৌতূহলপূর্ণ বিস্ময়দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র ও সারদাচরণ এই সংকলন প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু

সত্যের খাতিরে একথাও স্বীকার্য যে তাঁদের সম্পাদনা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পাদকীয় ত্রুটির প্রতিবাদে ক্ষুরধার প্রতিবাদী সমালোচনা লেখেন ‘ভারতী’তে। সম্পাদকের যে-ভুলগুলি তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ও বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে শব্দের ভুল, শব্দার্থের ভুল, বাক্যার্থের ভুল, ব্যাকরণের ভুল, সম্পাদকের অসাবধানতাজনিত ভুল ও এমন নানাবিধ ত্রুটি। নবীন বয়সের যে কড়া উত্তেজনায় তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিবাদী সমালোচনা করেছিলেন, এটিও সেরূপ তীব্র, ঝাঁঝালো প্রতিবাদী লেখা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ যুক্তিসহ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য—প্রাচীন কবিতা সম্পাদনা করে সর্বসমক্ষে আনতে গেলে সম্পাদককে অবশ্যই দায়িত্বশীল হতে হবে। সম্পাদক অসঙ্গতিপূর্ণ পাঠ নির্ধারণ করলে পাঠকের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে। তাঁর কথায়, অক্ষয়চন্দ্র এমন গ্রন্থের সম্পাদকরূপে অযোগ্য নন, বরং অমনোযোগী। যে সতর্কতা ও নিষ্ঠা নিয়ে বিদ্যাপতির মতো একজন বিশিষ্ট কবির কবিতা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত ছিল, সেই সচেতনতা অক্ষয়চন্দ্রের ছিল না। এই কারণে এই ‘অমনোযোগী’, ‘অসাবধানী’, ‘অবহেলাপ্রবণ’ সম্পাদকের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে তিনটি নালিশ উত্থাপন করেছেন।

> প্রথমত কবিদের প্রতি তিনি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত সাহিত্যের সহিত তিনি যে চুক্তি করিয়াছিলেন, সে চুক্তি রীতিমতো পালন করেন নাই; তৃতীয়ত পাঠক সাধারণকে তিনি অপমান করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অথচ যথাযোগ্য আয়োজন করেন নাই; যথারীতি সম্ভাষণ করেন নাই; এতই কি তাহারা উপেক্ষার পাত্র?[২৬]

বলা বাহুল্য এই নেতিবাচক সমালোচনার উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন নয় বরং কবিতাগুলির ভুল ব্যাখ্যা সরিয়ে সেগুলির যথার্থ মর্মগ্রহণের চেষ্টা। বিদ্যাপতির পদসমূহে সম্পাদকীয় ত্রুটি কতখানি অন্তত বিশটিরও বেশি উদাহরণ তুলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। তাঁর কতকগুলি উদ্ধার করলেই রবীন্দ্রনাথের পাঠ যে কতখানি মেধাবী তা বোঝা যাবে। যেমন শ্যামকে ভর্ৎসনার করার জন্য প্রেরিত দূতীকে রাধিকা বলছেন, “যো পুন সহচরী হোয় মতিমান। করয়ে পিশুন বচন অবধান”[২৭]। এই বাক্যে ‘পিশুন’ শব্দের অক্ষয়চন্দ্র অর্থ করেছেন বায়স বা কাক। অর্থাৎ ‘কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ’ সম্পাদকের এই চূড়ান্ত অকাব্যিক অর্থব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ সংগতভাবেই মানতে পারেননি। তিনি সঙ্গতভাবেই ‘পিশুন’ শব্দের

আভিধানিক অর্থ করেছেন ‘নিন্দা’, যা এই পদটির অর্থব্যাখ্যায় সুসংগত বলে সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। বাক্যার্থের ভুল নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির একটি প্রসিদ্ধ পদের সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে রাধার কিশোরী অবস্থা থেকে যৌবনবতী হয়ে ওঠার বর্ণনা রয়েছে। ‘নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি/হসত আপন পয়োধর হেরি/পহিলে বদরী সম পুন নবরঙ্গ/দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে অঙ্গ’। এই পদের সম্পাদককৃত টীকা— “প্রথম বর্ষার মতো নূতন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি(হিন্দী) বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গা লেবু অভিধানে থাকিলে এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়।”[২৮] রবীন্দ্রনাথের কাছে এই অর্থ অসংগত ঠেকেছে। তিনি লিখেছেন,

> বর্ষার মত ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা শুনিলেই কেমন কানে লাগে যে, অর্থটা টানাবোনা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গালেবু অভিধানে থাকলে কিরূপ অর্থ হয় তাহাও দেখা উচিত ছিল। ‘প্রথম বর্ষার মত হাবভাব প্রকাশ করিতে লাগিল’ এরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ‘পুন’ শব্দের সার্থকতা কি থাকে? যাহা হউক, এ স্থানের অর্থ অতিশয় সহজ,..রাধা নির্জনে কতবার আপনার উরজ দেখেন, আপনার পয়োধর দেখিয়া হাসেন। সে পয়োধর কিরূপ? না, প্রথমে বদরীর(কুলের) ন্যায় ও পরে নারাঙ্গার ন্যায়।[২৯]

এমন বাক্যার্থগত সমালোচনা এই প্রবন্ধে আরও রয়েছে। কখনও কখনও টীকাকার নিজের ইচ্ছামতো শব্দ যোজনা করে দিয়েছেন। যেমন আর একটি বিখ্যাত পদ—“যব গোধূলি সময় বেলি/ধনি মন্দির বাহির ভেলি/ নবজলধরে বিজুরি-রেখা/ দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি। সম্পাদক টীকা করিতেছেন: “বিদ্যুৎ রেখার দ্বন্দ্ব(বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল। “সহিত” শব্দটি সম্পাদক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? ইহার সহজ অর্থ এই—“রাধা গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে মন্দিরের বাহির হইলেন ; যেন নবজলধরে বিদ্যুৎ রেখা দ্বন্দ্ব বিস্তার করিয়া গেল। ইহাই ব্যাকরণশুদ্ধ ও সুভাব-সংগত অর্থ।”[৩০]। পুরনো বাংলা সাহিত্য বিশেষ করে বিদ্যাপতির পদ রবীন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় আত্তীকৃত করেছিলেন। তাঁর সেই পাঠ কতখানি নির্ভুল ও যথার্থ ছিল, এই মেধাবী সমালোচনাটির দ্বারা তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শুদ্ধমাত্র ভাববাদী ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচক হিসেবে দেখতে চান রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের

সমালোচনা তাঁদের ধাক্কা দেবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা একেবারে কনটেক্সচুয়াল ক্রিটিকের অনুরূপ—যেখানে তিনি বলেন, --

> সমস্ত পুস্তকের মধ্যে এত অসাবধানতা, এত ভ্রম লক্ষিত হয় যে, কিয়দ্দূর পাঠ করিয়াই সম্পাদকের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া যায়। ইহার সমস্ত ভ্রম যে কেবল সম্পাদকের অক্ষমতাবশত ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহার অনেকগুলি তাঁহার অসাবধানতাবশত ঘটিয়াছে। এমনকি, স্থানে স্থানে অভিধান খুলিয়া অর্থ দেখিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করেন নাই। এত অবহেলা, এত আলস্য যেখানে, সেখানে এ কাজের ভার গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত।[৩১]

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'। তুলনামূলক সাহিত্যবিচারের এটি একটি উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মাসিক পত্রের পাতায় এই ধরণের তুলনামূলক সাহিত্য-আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বাল্মীকি ও ভবভূতি, 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা'য় কালিদাস ও শেকসপিয়রকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেছিলেন তিনি। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি—এই ত্রিভাষাতেই বিপুলতর মনস্বিতার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরণের প্রবন্ধ সার্থকভাবে লিখতে পেরেছিলেন। এই বিচারধারাতেই তিনি লেখেন 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি'(প্রকাশ--বঙ্গদর্শন, ১২৮০, পৌষ সংখ্যা)। খুব সংগত কারণেই আমাদের অনুমান, রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি'(প্রকাশ—ভারতী, ১২৮৮, ফাল্গুন সংখ্যা) প্রবন্ধটির কাঠামো ও গঠনকৌশল নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে জয়দেব ও বিদ্যাপতির রচনার তুলনামূলক আলোচনা করে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে প্রায় একই মতের অনুবর্তন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন,--

> জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল কমলজালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুল নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার; বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষ মালা। জয়দেবের গান মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাস।[৩২]

এই জোড়া জোড়া তুলনার রীতি রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। যেমন—

> বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি।[৩৩]

সহজেই বোঝা যায়, দ্বৈত তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাত যেমন বিদ্যাপতির দিকে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত তেমনই চণ্ডীদাসের দিকে। এই প্রবন্ধের শুরুতেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত কবি ও সুষ্ঠু কল্পনার কী লক্ষণ তা নির্দেশ করে দিয়েছেন। তাঁর কথায়—

> নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলো বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্মাণ করে। মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা। আর গোঁজামিলন দিবার কল্পনা—না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার একপ্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ যাকে গিলটি করা কল্পনা বলেছেন, তার বিপরীতে স্থাপন করে চণ্ডীদাসের মহত্ত্ব দর্শানোর জন্যই এই প্রাক্‌ভূমিকার অবতারণা। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনার দ্বারা বাইরের জগৎ থেকে আহরিত ভাব ও উপাদানকে সাহিত্যে রূপান্তর করেন।(দ্রষ্টব্য 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ, 'সাহিত্য'গ্রন্থভুক্ত) যাদের রবীন্দ্রকথিত এই বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনার জগৎ দুর্বল তারাই বাধ্য হয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়। এই কৃত্রিমতাকেই রবীন্দ্রনাথ নামান্তরে 'জালিয়াতি' বলেছেন। এই সূত্রে তাঁর আরও বক্তব্য, অকৃত্রিম সাহিত্যের প্রধান গুণ সহজ ভাব ও সহজ ভাষা। কিন্তু সহজ ভাষায়, সহজ ভাবকে পরিস্ফূট করাই শক্ত কারণ তাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে হয়। অন্য সময়ে লেখা একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই হালকা ছলে বলেছেন—

সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে

সহজ কথা যায় না লেখা সহজে...[৩৫]

তাঁর মতে, সহজ কথার গুণ এই যে, তা যতটা বলে তা অপেক্ষাও অনেক বেশি বলে। সে সমস্তটা বলে না। অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বে ব্যঞ্জনাবৃত্তির বৈশিষ্ট্যই সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবিতায় রয়েছে। এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, চণ্ডীদাসের কবিত্ব এই বিশেষ গুণে ভাস্বর। “আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে-সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহারই জন্য কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন।”[৩৬] বহু পূর্বে জার্মান দার্শনিক শিলার এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,--“The artist may be known rather by what he omits and in literature, too, the true artist may be best recognised by his tact of omission.[৩৭]

এই ‘না বলা বাণীর’ গুণেই চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব। প্রবন্ধে বিদ্যাপতির রচনা চাতুর্য, রচনার কলাকৌশল ও শিল্পগুণের প্রশংসা করলেও প্রাণের গভীরতার দিক থেকে তিনি চণ্ডীদাসকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত নিয়েও বাদ-প্রতিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ সাহিত্যের ইতিহাসে এটা অজস্রবার দেখা গেছে যে সহজভাবে সহজ ভাষায় যেমন রসসৃষ্টি সম্ভব তেমনই অলঙ্কৃত বাকপুঞ্জের দ্বারাও রসসৃষ্টি সম্ভব। চণ্ডীদাসের পদসমূহ যে গুণে গুণী অর্থাৎ ব্যঞ্জনা, মর্মের গভীরতা, অনুভূতির তীব্রতা—তা কি বিদ্যাপতিতে নেই? বিদ্যাপতির ভাষা ও ভঙ্গি মণ্ডনকলায় বেশি প্রসাধিত হতে পারে, পাণ্ডিত্য ও অলংকারে ভূষিত হতে পারে কিন্তু সেই অলঙ্কৃত, বিদগ্ধ বাক্‌রীতি কাব্যের ভাষা নয় বা নিম্নস্তরের কাব্য এমন বলা চলে না। তা হলে শুধু বিদ্যাপতি নয়, জয়দেব, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র কেউই প্রথম শ্রেণির কবি হিসেবে বিবেচিত হতেন না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের কথাই এ প্রসঙ্গে আনা যায়। তিনি নিজে যেমন সহজ ভাবের সহজ ভাষার কবিতা লিখেছেন আবার অলঙ্কৃত, বক্রোক্তিমূলক কবিতাও লিখেছেন। সাহিত্যরসের দিক থেকে এই দুই-ই সমান স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই আমাদের মনে হয় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে তর-তমের বিচার ব্যক্তির নিজস্ব সাহিত্যরুচির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য দুই কবির কবিবৈশিষ্ট্যের প্রভেদ তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে একেবারে যথার্থ বিচার করেছেন। আজ পর্যন্ত সমালোচক মহল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্পর্কে যে অভিমত দিয়ে থাকে তা রবীন্দ্রকথনেরই প্রতিধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্যসমীক্ষাটি এতই মোক্ষম ও

অভ্রান্ত ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো দুঁদে সমালোচকও জয়দেব ও বিদ্যাপতি সম্পর্কে তাঁর অভিমত সংশোধন করে নিতে বাধ্য হন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'মানস বিকাশ' নামক প্রবন্ধটি যখন 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নাম দিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র এর পত্রিকা-পাঠের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে একথা লেখেন, "যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশি খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।"[৩৮] বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংযোজন রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধের প্রভাবেই ঘটেছে, এমন অনুমান খুবই সংগত।[৩৯]

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বসন্তরায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে গণ্য হতে পারে, যদিও এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বসন্ত রায়ের কবিপ্রতিভাকে ক্ষেত্রবিশেষে বসন্ত রায়ের ঊর্ধ্বেও স্থান দিয়েছেন, তা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিতর্কের অবকাশ আছে। আসলে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রসগ্রাহী মন ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্য-আন্দোলন দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত ছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন, কবিতার ভাষা ও দৈনন্দিন সংলাপের ভাষার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই এবং যদি থাকে তবে সেই পার্থক্য মুছে ফেলাই কর্তব্য। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই পর্বের সমস্ত প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সেই সব কবিদেরই জয়মাল্য দিয়েছেন, যাঁরা গভীর ভাবকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তবে 'বসন্তরায়' প্রবন্ধটি নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। প্রথম কথা, বসন্ত রায় বা রায় বসন্ত বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম সারির কবি নন। কিন্তু সহজ ভাব ও সরল ভাষার গুণে তিনি বসন্ত রায়ের কবিত্বগুণে মুগ্ধ ছিলেন। তাই 'ভারতী'তে প্রবন্ধ লিখে তিনি বসন্ত রায়ের প্রতি শিক্ষিত, কাব্যমোদী মানুষের মন আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। প্রচারের অন্তরালে থাকা একজন গুণী কবির প্রতিভাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাই একজন আদর্শ সমালোচকের কাজ। একালে বুদ্ধদেব বসু যে-ভাবে জীবনানন্দকে আবিষ্কার করেছেন। কতকটা সেই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ যেন বসন্ত রায়কে তুলে এনেছেন, শুধু তুলে আনেননি, তাঁকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি কবির পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেছেন কেউ কেউ মনে করেন, বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় একই ব্যক্তি কিন্তু উভয়ের লেখা পড়লে মনে হয় তারা পৃথক। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখেছেন, সেই সময়ে বসন্তরায়ের ব্যক্তিপরিচয় নিয়ে বেশি কথা জানা ছিল না। নানারকম ধারণা ছিল। কেউ বলতেন তিনি ও বিদ্যাপতি অভিন্ন আবার কেউ নামসাদৃশ্যে বলতেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত এই বসন্ত রায়। তিনিও কবি ছিলেন ও নানা

কারণে প্রতাপাদিত্যের বিরাগভাজন হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ উপন্যাসে বসন্তরায়কে উদার, নির্মল ও বিবেকবান করে এঁকেছেন। সে যাই হোক, পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জানা গেছে, তিনি গোবিন্দদাসের সমসাময়িক। বৈষ্ণব পদসংকলন ‘পদকল্পতরু’তে তাঁর নামে একান্নটি পদ সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসকার আরও জানাচ্ছেন,--

> নরোত্তমের শিষ্য ব্রাহ্মণ বসন্ত রায় গোবিন্দদাসের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ছিলেন। ইনিই গোবিন্দদাসের পদাবলী লেখা হইলে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর কাছে পৌঁছাইয়া দিতেন। বসন্ত রায় নিজেও ভালো পদকর্তা ছিলেন।[৪০]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই সব তথ্য না জেনেও বুঝেছিলেন বিদ্যাপতি ও বসন্ত রায়ের ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব দুইই পৃথক। যুক্তি হিসেবে প্রথমেই তিনি এনেছেন ভাষার কথা। বিদ্যাপতির ভাষায় ব্রজবুলির সঙ্গে মিশেছে দু’চারটে বাংলা শব্দ; বিপরীত পক্ষে বসন্ত রায়ের ভাষা মুখ্যত বাংলা। ক্বচিৎ কদাচিৎ সেখানে ব্রজবুলি শব্দের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। বসন্ত রায়ের কবিতার ভাব ও ভাষা সাধাসিধে, সাবলীল কিন্তু অগভীর নয়। তিনি সহজ কথায় গভীর ভাবের দ্যোতনা জাগিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতির বৈশিষ্ট্য রাজকীয় অলংকৃতি। সেখানে যেন মানুষ পোশাক পরে নেই, পোশাকটাই মানুষ পরে বসে আছে। এরপরে তিনি একে একে এনেছেন রূপবর্ণনা, সম্ভোগ বর্ণনা, প্রেমস্বরূপের বর্ণনা। বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ের রূপানুরাগ পর্যায়ের দুটো পদ পাশাপাশি তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বসন্তরায়ের পদের মনোহারিত্ব নির্দেশ করেছেন এবং বিদ্যাপতি সম্বন্ধে লিখেছেন, “এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন।”[৪১] আমাদের কাছে মনে হয়েছে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে। কারণ বিদ্যাপতির ‘রূপানুরাগ’ পর্যায়ের যে পদটিকে তিনি গ্রহণ করেছেন সেটি বিদ্যাপতির অপেক্ষাকৃত দুর্বল পদ। সেই পদের ‘টানাবোনা বর্ণনার’ সমালোচনা করে সমগ্র বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার অপকর্ষ প্রমাণ হয় না। তবে বিদ্যাপতির ‘রূপানুরাগ’ পর্যায়ের পদসমূহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটো পর্যবেক্ষণ খুব মূল্যবান। প্রথম, বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হয়ে রাধার রূপ উপভোগ করতে পেরেছেন কিন্তু রাধা হয়ে কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করতে পারেননি। আসলে রাজসভার কবি হওয়ায় বিদ্যাপতির দৃষ্টিতে পুরুষালি ইন্দ্রিয়জ সংসক্তি বেশি দেখা

গেছে। তা অস্বীকার করা যায় না। আর দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ, বিদ্যাপতি রূপকে এক চোখে দেখেন আর বসন্তরায় রূপকে অন্য চোখে দেখেন। বিদ্যাপতি বলেন, রূপ উপভোগ্য বলে সুন্দর আর বসন্তরায় বলেন রূপ সুন্দর বলেই তা উপভোগ্য। এটা সত্য যে সৌন্দর্য ও ভোগ একসঙ্গেই থাকে কিন্তু সেইসঙ্গে এই কথাও সত্য যে এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। বসন্তরায় রূপবর্ণনায় যা কিছু সুন্দর তা দেখিয়েছেন আর বিদ্যাপতি রূপবর্ণনায় যা কিছু ভোগ্য, তাই দেখিয়েছেন। এই পর্যবেক্ষণ যথার্থ ও সত্য। এর কারণ পূর্বেই বলেছি, বিদ্যাপতি নাগরিক রুচির কবি, রাজসভার কবি। তাই মনস্তাত্ত্বিকভাবেই তাঁর কবিতায় ইন্দ্রিয়ভোগের উপকরণ ও প্রবণতা অনেক বেশি। তুলনায় বসন্তরায় কিংবা চণ্ডীদাসের মতো গ্রাম্য কবিদের রচনায় আটপৌরে, সরল ভাবসৌন্দর্যই বেশিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। উভয় কবির পারিপার্শ্বিকতা ও মনস্তত্ত্বের এই তফাৎ রবীন্দ্রনাথ যথার্থই নির্দেশ করেছেন। তবে একথা ঠিক বসন্তরায়ের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেননি। বসন্তরায়ের সাধারণ কথাকেও বড়ো করে তুলে তিনি যেন তাঁকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তবুও সমালোচনা-সাহিত্যের ভুবনে এই প্রবন্ধটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের কলমে বসন্তরায়ের অল্পখ্যাত পদগুলির যথার্থ সাহিত্যমূল্য নিরূপিত হয়েছে আর দ্বিতীয়ত 'ভারতী'তে প্রকাশিত এই সমালোচনাটিই সম্ভবত বসন্তরায়ের মতো অখ্যাত বৈষ্ণব কবির কবিপ্রতিভার একমাত্র রসবিশ্লেষণ।

'বৈষ্ণব কবির গান' শীর্ষক প্রবন্ধটি আবার একেবারে অন্য ধরণের রচনা। এটি তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের একটি পদকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে সৌন্দর্য যেন স্বর্গের জিনিস তা পৃথিবীতে এসে পড়েছে। সৌন্দর্য যে Divine তা পাশ্চাত্য সমালোচক ও রোমান্টিক কবিদের ভাবনার মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সেখান থেকেই এই ধারণা পেয়েছেন। তাঁর কথায়, সৌন্দর্য স্বর্গের, তা প্রতিদিনের মলিন মর্ত্য থেকে আমাদের অনন্তের দিকে নিয়ে যায়। সৌন্দর্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে দেয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ যাকে 'স্বর্গ' বলে নির্দেশ করেছেন, তা অনন্তের জগৎ বা Ideal। পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে সেই অসীম জগতের নানা রূপ ইশারায় ধরা দেয়। সুন্দর কবিতা বা সুন্দর গান পাঠক বা শ্রোতাকে সেই অনন্তের দিকেই ইশারা করে। জ্ঞানদাসের 'মুরলী করাও উপদেশ' পদটি উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,--"সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।"[৪২]

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কবিতা বা গানকে আশ্রয় করে এই সীমাচিহ্নিত বস্তুজগতের সঙ্গে অসীম সৌন্দর্যলোকের মিলন ঘটে। জ্ঞানদাসের পদকে আশ্রয় করে তিনি রাধা-কৃষ্ণের রূপকের মধ্যে দিয়ে সেই সীমা-অসীমের মিলনকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার এর উল্টোপিঠও আছে। সীমা যে শুধু অসীমকেই আহ্বান করছে তা নয়। অসীম জগৎ, Ideal জগতও কখনও কখনও বস্তুজগতের প্রেমে বাঁধা পড়ে সীমার দিকে নেমে আসতে চায়। "অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে।... সৌন্দর্য স্বর্গমর্ত্যের বিবাহবন্ধন।"[৪৩] এই উক্তির অর্থ এই যে সীমা জগৎ সৌন্দর্যের সূত্র ধরে অসীম জগৎকে ডাক দিচ্ছে আবার অসীম জগতও সীমার সৌন্দর্যে বাঁধা পড়ে সীমার দিকে নেমে আসছে। এই উভয় গতিমুখ যেন সৌন্দর্যসূত্রকে অবলম্বন করেই পরস্পর পরিণয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতাকে উপলক্ষ্যের মতো ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ আসলে সৌন্দর্যভাবনা কেমন করে সীমা-অসীমের মিলনস্বরূপ হয়ে উঠতে পারে, তারই তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করেছেন।

'বিদ্যাপতির রাধিকা' (চৈত্র ১২৯৮) প্রবন্ধটি যেন 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধেরই সংযোজিত বিন্যাস। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে চণ্ডিদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির কবিধর্মের যে তফাৎ রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন, এই প্রবন্ধে রাধার চরিত্র ও মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে সেই সিদ্ধান্তকেই আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। বিদ্যাপতির কবিতায় রাধার প্রেমে ভঙ্গি, নৃত্য ও চাঞ্চল্যের আধিক্য ও চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমে তীব্রতা, দাহ ও আলোকের উপস্থিতি। চণ্ডীদাসের প্রেম সুখ-দুঃখের উভয় সুতোয় চমৎকার ভাবে বোনা কিন্তু বিদ্যাপতির প্রেমে কেবল অবিমিশ্র সুখ ও যৌবনের উন্মাদনা। বিদ্যাপতির রাধার দেহ ও মনের বিকাশ বড়ো মন্থর। সে অল্পে অল্পে মুকুলিত ও বিকশিত। সে যৌবনের রহস্যে ভরপুর অথচ ভীরুস্বভাবা। যৌবনের সদ্যবিকশিত হৃদয় নিয়ে সে লজ্জায়, ভয়ে, সংশয়ে, আনন্দে অতিশয় বিহ্বল। তার প্রেম বেদনার অগ্নিজ্বালায় রাঙা নয়, বরং বিলাসের লীলায় চঞ্চল। কিন্তু এর বিপরীতে চণ্ডীদাসের রাধার প্রেমমনস্তত্ত্বকে স্থাপন করলে পাওয়া যাবে বিপরীত ছবি। চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে প্রথম থেকেই তদগতপ্রাণ। পূর্বরাগেই সে 'যোগিনী'। তার প্রেমে লীলাচাঞ্চল্য নেই, রয়েছে নিবেদনের গভীরতা। 'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে'—এই প্রচণ্ড আকুলতার চিত্তবিক্ষেপে চণ্ডীদাসের রাধার মিলনেও সুখ নেই। প্রেমের বিকাশ মুহূর্তে বিদ্যাপতির রাধার অপার কৌতূহল ও তীব্র অনভিজ্ঞতা। এই কৌতূহল ও অনভিজ্ঞতা রাধার নিজের দেহ-মন সম্পর্কেও এবং কৃষ্ণের প্রতিও। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা চাঞ্চল্যরহিত ও নিবেদিতপ্রাণ। দুই মহান কবির স্বভাবের মধ্যে

এই যে বৈপরীত্য রয়েছে, তা বৈষ্ণব সাহিত্যের মেধাবী সমালোচক রবীন্দ্রনাথ দক্ষতার সঙ্গেই চিহ্নিত করেছেন। এই বৈপরীত্যকে নির্দেশ করে তিনি লিখেছেন,

> ইহাতে(বিদ্যাপতির রাধায়) গভীরতার অটল স্থৈর্য নেই, কেবল নবানুরাগের উদ্‌ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য...কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গিতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানলীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।[৪৪]

কিন্তু শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অনন্ত মাধুর্যেই বিদ্যাপতির সমাপন স্বীকার করেননি, শেষে উদ্ধৃত করেছেন মিলনতৃপ্ত মনেও চির অতৃপ্তির বিধুরতা। 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল'—রোমান্টিক কবির চিরঅতৃপ্তির এই পরিচয়। ভরা প্রেমেও আরও পাওয়ার এই আর্তি বিদ্যাপতির নবীন প্রেমকে চিরপুরাতন করে তুলেছে। আবার প্রেমের এই অনিঃশেষ অচরিতার্থতা বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের সঙ্গে যুক্ত করেও দিয়েছে। সুতরাং অপ্রাপ্তির চিরঅতৃপ্তি নিয়ে বিদ্যাপতির রাধার পরিসমাপ্তি, সেইখান থেকেই চণ্ডীদাস পুনরায় তার গান শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই শেষ মন্তব্য তার সুগভীর রসবোধের পরিচয় বহন করছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় শব্দান্বেষণ বলে একটি বিভাগ ছিল, যেখানে মূলত বাংলা শব্দতত্ত্বের আলোচনা হত। জনৈক পত্রলেখক এই বিভাগে 'নিছনি' শব্দের অর্থ ও ব্যবহার জানতে চেয়ে পত্র লেখেন। এর উত্তরে জগদানন্দ রায় 'নিছনি' শব্দের অর্থ লিখেছিলেন 'অনিচ্ছা'।[৪৫] কিন্তু পুরনো বাংলা সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক রবীন্দ্রনাথ এই অর্থ মানতে পারেননি। তাই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই একটি পত্র লেখেন। 'নিছনি' শব্দটি পুরনো বাংলায় বহুল প্রচলিত। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই তাঁদের পদে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের পদে এই শব্দটি ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত করেছিলেন এই শব্দটি আসলে সংস্কৃতমূল তদ্ভব শব্দ। যার মূল তৎসম রূপটি হল 'নির্ম্মঞ্ছন'। অভিধানে 'নির্মঞ্ছন' শব্দের অনেকগুলি অর্থ পাওয়া যায়, যেমন—নীরাজন, আরতি, সেবা, মোছা। নীরাজন বা আরতির অনুষঙ্গে এর একটা অর্থ হতে পারে 'শান্তিকর্ম্ম'। আর 'শান্তিকর্ম্ম' সকল কিছু অশুভ আপদ-বালাই দূর করে। এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই যে 'নিছনি' শব্দটি নানা পদকারদের পদে প্রযুক্ত

হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তা দৃষ্টান্তসহযোগে দেখিয়েছেন। গোবিন্দদাসের পদে যখন পাই—'গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি—তখন সন্দেহাতীতভাবেই শব্দটির অর্থ 'বালাই'। আবার গোবিন্দদাসের পদেই অন্যত্র আছে—'দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই'—তখন 'নিরছাই' শব্দের অর্থ হয় 'মোছা'। আবার 'আরতি' অর্থে আরাধনার অর্ঘ্য বোঝাতেও 'নিছনি' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন বৈষ্ণব কবি। যেমন—'পরান নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার'। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ এক স্থলে লিখেছেন—"চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই"[৪৬]।

যা রবীন্দ্রনাথ দেখেননি, তা তাঁকে দেখিয়ে দেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। তাই ১২৯৮ এর চৈত্রে 'নিছনি' নামক প্রবন্ধটি সাধনায় বেরনোর পরেও ১২৯৯ এর বৈশাখে অর্থাৎ তার ঠিক পরের মাসেই এই প্রবন্ধের একটি দ্বিতীয় অংশ লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে দীনেন্দ্রবাবুর দেখানো চণ্ডীদাসের চারটি পদ উদ্ধৃত করেন, যেখানে 'নিছনি' শব্দের প্রয়োগ আছে। অবশ্য সেই সঙ্গে এও দেখিয়ে দেন দীনেন্দ্রনাথের উদ্ধার করে দেওয়া পদগুলিতেও 'নিছনি' শব্দটি 'নির্মঞ্ছন' শব্দের অর্থকেই কোনও না কোনওভাবে প্রকাশ করছে। প্রাচীন শব্দের অন্বেষণে দীনেন্দ্রবাবুর এই দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেন তিনি। লেখেন—"দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে-সকল দুর্বোধ শব্দপ্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এই রূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়োই সুখের বিষয় হইবে।"[৪৭] বাংলা ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে কতখানি মমত্ব ও ভালোবাসা ছিল, এই লেখাগুলিই তা প্রমাণ করছে। এই মমত্ব শুধু আবেগের ব্যাপার নয়, এতে শব্দতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর যথেষ্ট শ্রম, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

একইরকম শাব্দিক অনুসন্ধানের ফলে রচিত হয়েছিল অপর একটি প্রবন্ধ, যার নাম 'পহু'(সাধনা, ১২৯৯, জৈষ্ঠ্য, শ্রাবণ ও চৈত্র)। অক্ষয়চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, বৈষ্ণব পদসংকলনে 'পহু' শব্দটি 'প্রভু' ও 'পুনঃ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দদাস ও রাধামোহন ঠাকুরের কিছু পদ উদ্ধার করে দেখালেন যে সেখানে 'পহু' শব্দ 'ভণে' বা 'বলে' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এমনকি গোবিন্দদাসের পদে শব্দটি সব থেকে বেশিবার ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সর্বত্র অর্থের সমতা রক্ষিত হয়নি। কোথাও 'ভণে' অর্থে আবার কোথাও 'পুনঃ' অর্থে গোবিন্দদাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থের এই অসামঞ্জস্য লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ

লেখেন,--"গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর কোনও বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পহু শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনও দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।"[৪৮]

এই সাতটি মূল প্রবন্ধের বাইরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা লেখায় বিক্ষিপ্তভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন। কখনও কখনও নিজের মতের অনুকূলে যুক্তি সাজাতে বা তাঁর নিজের কোনও ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি বৈষ্ণব পদের ব্যাখ্যা করেছেন এমন হামেশাই দেখা যাবে। যেমন ধরা যাক, 'তথ্য ও সত্য'(বঙ্গবাণী, ভাদ্র ১৩৩১) প্রবন্ধটির কথা। এই প্রবন্ধে শব্দের লেক্সিকাল অর্থকে ছাপিয়ে ব্যঞ্জনা যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের কথা এনেছেন। দৈনন্দিন ভাষার তুলনায় কবিতার ভাষার চরিত্র যে আলাদা, তা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন জ্ঞানদাসের দুটি পংক্তি—'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল/যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।' এখানে শব্দগুলি আক্ষরিক অর্থে প্রযুক্ত নয়, তা মেলে ধরেছে অসীমের ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথের কথায়,--

> কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থই শব্দের তথ্যসীমা। এই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।[৪৯]

এই প্রসঙ্গেই এসেছে বিদ্যাপতির সেই বিখ্যাত চরণগুলির কথা—'যব গোধূলি সময় বেলি/ধনি মন্দির বাহির ভেলি/নবজলধরে বিজুরি রেহা/দ্বন্দ্ব পসারি গেলি'—মন্দির থেকে বালিকা বাহির হয়ে ঘরে চলেছে এই শুকনো তথ্যটুকু পরিবেশনেই কবির গৌরব নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ্য করে "ছন্দে বন্ধে বাক্যবিন্যাসে উপমা সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়"[৫০]। এই অনির্বচনীয়তাকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন 'সাহিত্যের প্রাণ'। অতএব দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ভাবনা নির্মাণের ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কাব্যের একটি বিশেষ ভূমিকা থেকে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, সাহিত্যে অত্যুক্তি চলতে পারে যদি তা রসসৃষ্টির অনুকূলে হয়। উদাহরণ হিসেবে এনেছেন বিদ্যাপতির পদ—'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তবু হিয়ে জুড়ন না গেল'। এই বাক্য সাধারণভাবে অত্যুক্তি। কিন্তু এই অত্যুক্তি যখন রসের আনুকূল্য পেল তখন সেই হৃদয় 'যুগযুগান্তরের সীমাচিহ্নের' বাইরে চলে গেল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক মন নির্মাণে, এমনকি তাঁর এক বিশেষ সাহিত্য-ভাবনার রূপায়নে বৈষ্ণব কাব্যের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে।

এরপর আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত বৈষ্ণব পদসংকলন 'পদরত্নাবলী'(প্রকাশ, বৈশাখ ১২৯২) বিষয়ে। এই পদসংকলনের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথের নয়, শ্রীশচন্দ্রের লেখা তবুও বৈষ্ণব পদাবলীর রসভাষ্য নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে না 'পদরত্নাবলী'র আলোচনা বাদ দিলে। এই সংকলনটির দুটি সংস্করণের কথা জানা যায়। প্রথম সংস্করণে ছিল ৮৩টি পদ। তারপর আরও ২৭ টি পদ যুক্ত করে মোট ১১০ টি পদের সংকলন হিসেবে বইটি প্রস্তুত হয়। ১১০টি পদের এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটির কথা বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগে উল্লিখিত হয়। কিন্তু তার আগেও যে এর একটি সংস্করণ ছিল সে কথা 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী'তে জানিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। পূর্বের এই দুষ্প্রাপ্য সংস্করণটির প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন—

> ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তের উল্লিখিত 'পদরত্নাবলী'র স্বতন্ত্র এই দুষ্প্রাপ্য সংস্করণটির দুটিমাত্র কপি আমরা পেয়েছি। একটি আছে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অনাথনাথ দাসের সংগ্রহে; অপরটি কলেজ স্ট্রিটের পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। দুঃখের বিষয় দুটি গ্রন্থেই নামপত্র বা টাইটেল পেজ নেই।[৫১]

১২৯২ এর বৈশাখে 'পদরত্নাবলী'র যে-সকল গ্রাহক বইটি সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের আরও দুই ফর্মার পদ বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল 'প্রচার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে।[৫২]। আমাদের মনে হয় এই অতিরিক্ত পদ সংযোজনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। যদি ধরেও নিই প্রথম সংস্করণের ৮৩ টি পদ শ্রীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নির্বাচন করেছিলেন তথাপি তাতে শ্রীশচন্দ্রের নির্বাচনই অধিক মূল্য পেয়েছিল কারণ সেই সংস্করণে ৮৩ টি পদের মধ্যে ১৫টি পদই বলরাম দাসের। শ্রীশচন্দ্র নিজে বলরাম দাসের বংশধর। সুতরাং পদ নির্বাচনে শ্রীশচন্দ্রের ভূমিকাই বেশি বলে মনে হয়। উলটোদিকে বিন্যস্ত পদগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট পদের অভাবও লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদগুলির প্রায় অধিকাংশই সেখানে অনুপস্থিত। বিশেষ করে এই সংকলন প্রকাশের বছর তিনেক পূর্বে

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে প্রবন্ধ লিখে যে বসন্তরায়কে সুধীজনের সামনে নিয়ে এলেন এমনকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিদ্যাপতির ঊর্ধ্বেও তাঁকে স্থান দিলেন, সেই বসন্তরায়ের পদও এই প্রথম ক্ষুদ্র সংস্করণটিতে ছিল না। পরবর্তীতে যে ২৭ টি পদ যুক্ত হয় সেখানে অবশ্য দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বসন্তরায়ের ৬টি পদ সংযোজিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান হয় যে পদ সংযোজনের প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কপ্রসূত।

'পদরত্নাবলী'র প্রধান বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য তার পদবিন্যাস পদ্ধতিতে। এতে সংকলিত ১১০ টি পদ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস-সংস্কার অনুযায়ী পর্যায়-বিভক্ত নয়। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পর্যায় বিন্যাস এখানে অনুসরণ করা হয়নি। আসলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব তত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে এই পর্যায় বিন্যাস করেননি। তিনি চেয়েছিলেন পাঠকেরা নিছক সাহিত্যরস আস্বাদন করুক। আমাদের মনে হয় শ্রীশচন্দ্র যেহেতু পদকর্তা বলরাম দাসের বংশধর ও সেই সঙ্গে নিজেও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, তাই তাঁর হাতে পদবিন্যাসের দায়িত্ব পড়লে তা হয়তো চিরাচরিত বৈষ্ণব রস-সংস্কার অনুযায়ী হত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ধারায় ব্যতিক্রম আনলেন। বিমানবিহারী মজুমদার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"পদরত্নাবলীই মহাজন পদাবলীর সর্ব প্রথম সংকলন যাহা বৈষ্ণব ধর্মের সাধন ভজনের অঙ্গ হিসেবে লিখিত হয় নাই। বিশুদ্ধ সাহিত্য রস পরিবেশন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।"[৫৩] পদগুলি সংকলন করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই কথাই মাথায় রেখেছিলেন, ধর্মীয় সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে পাঠকের কাব্যানুভূতিকে জাগিয়ে তোলা যায়।

মঙ্গলকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ

মঙ্গলকাব্যগুলিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ লোকজ সাহিত্যেরই এক বিশেষ সংরূপ ধারণা করেছেন। তাঁর সেই ধারণা অভ্রান্ত। তাঁর মতে, বাংলার সুবিস্তীর্ণ পল্লি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত হয়ে নানা ধরণের গান, পাঁচালি ও ব্রতকথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষই ছিল এগুলির শ্রোতা। ধীরে ধীরে এই গানগুলি গায়েন ও বাঁধনদারদের দ্বারা সংকলিত হতে শুরু করে। এরপর কোনও বড়ো কবি সেইসব প্রচলিত কাহিনিগুলিকে নিজ নিজ প্রতিভা ও ক্ষমতা অনুযায়ী কাব্যের আকার দিতে থাকেন। মঙ্গলকাব্যগুলি এই ভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> কোনও রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনও বৃহৎ বিশিষ্ট সভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন তখন সেই গ্রাম্য কথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন।...মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাষান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস।[৫৪]

বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি রবীন্দ্রনাথ যত্ন নিয়ে পড়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ কোনও প্রবন্ধ না থাকলেও জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা বক্তৃতায়, লেখায় তিনি বাংলা মঙ্গলকাব্য বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল (পুথির প্রকৃত নাম 'অভয়ামঙ্গল') নিয়েই রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সর্বাধিক। তরুণ বয়সে 'ভারতী' পত্রিকায় মুকুন্দের এই কাব্য নিয়ে তিনি অনেক বিরোধ বিতর্ক করেছেন। যৌবনে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বইটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি এই কাব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আবার প্রৌঢ় বয়সে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো বঙ্গবাসী সংস্করণ চণ্ডীমঙ্গলের মার্জিনাল নোটে ও 'কালান্তর' গ্রন্থভুক্ত 'বাতায়নিকের পত্র' ও 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে তিনি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় তিনি একমাত্র ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রের রূপায়ন ছাড়া কখনোই মুকুন্দের কাব্যের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেননি। মুকুন্দ বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এবং সেই যুক্তির সারবত্তা আমরা আলোচনা করে দেখব।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ প্রথম উত্থাপন করেন ১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধটিতে। আশ্বিন সংখ্যায় লেখেন আর একটি প্রবন্ধ—'বাঙ্গালী কবি নয় কেন'। এই দুটি প্রবন্ধ একত্রিত হয়ে 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' শিরোনামে 'সমালোচনা' গ্রন্থভুক্ত হয়। প্রবন্ধটিতে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের অন্তর্গত 'কমলে কামিনী'র চিত্ররূপ বর্ণনায় সৌন্দর্যের একান্ত হানি দেখে তরুণ রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, --

> কবিকঙ্কণের কমলে কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদগার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত

আঘাত দেয়। শিক্ষিত সংযত মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদগীরণ কোনওমতেই একত্র উদয় হইতে পারে না।[৫৫]

এই কথা যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো। রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শে মজে থাকা রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে হয়তো মনে করতেন সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্য ও শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি যদি একটু তলিয়ে ভাবতেন, তাহলে হয়তো বুঝতেন হস্তীগ্রাস ও উদগীরণ কবিকঙ্কণের কল্পনার ব্যাপার নয়। চণ্ডীমঙ্গল ধর্মকাব্য। এর বীজ লুকিয়ে আছে পৌরাণিকতায়। গজগ্রাসশীলা চণ্ডীদেবীর প্রসঙ্গ বৃহদ্ধর্মপুরাণে রয়েছে। পূর্ববর্তী সমস্ত চণ্ডীকাব্যে দেবীর এই মূর্তিই বর্ণিত হয়েছে। মুকুন্দ সেই ঐতিহ্যের অনুসরণ করতে বাধ্য। দেবীর এই সিদ্ধরসমূর্তিকে অন্যরকম ছবির দ্বারা সংস্কার করা মুকুন্দের অধিকারের বাইরে। কনটেক্সটকে না বুঝে টেক্সটকে ব্যাখ্যা করতে গেলে যে ভুল হয় রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই ভুলটিই করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের কলমে কবিকঙ্কণের কাব্যের উল্লেখ দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় **১২৯৩** বঙ্গাব্দে ‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকার জৈষ্ঠ্য সংখ্যায় প্রকাশিত ‘কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট’ প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটি লিখিত হওয়ার পেছনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিরোধ-বিতর্কের একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে। আমরা জানি উভয়ের রচনায় ভাবসাদৃশ্যের জন্য উনিশ শতকের একটি বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথকে ‘বাংলার শেলী’ বলা হত। রোমান্টিক আদর্শে লেখা কাব্যে কল্পনার আতিশয্য ও বাস্তবতার একান্ত অভাব দেখে বিরক্ত হয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ‘নবজীবন’ **১২৯৩** বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘কাব্যিসমালোচনা’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের মূল আক্রমণের লক্ষ্য শেলী ও সেই সঙ্গে নাম না করে রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তবহীনতা। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে বাস্তবতার বিপরীতে উৎকৃষ্ট কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ তিনি উদ্ধৃত করেন মুকুন্দের কাব্য—

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান

আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।

...দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি! কথাকয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়! ভাঙ্গাঘরের গর্ত্তকয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া, তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই

সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা। আর, নদীর ধারে কসাড়বনে তোমাদের জোৎস্না গা ঢালিয়া দিয়া ঘুমায়, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘোলা কবিত্বও ঘুমাইতে থাকে। এ পোড়া ঘুম কি আর ভাঙ্গিবে না?[৫৬]

রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার জবাব দেন 'কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধ লিখে। অক্ষয় সরকার মুকুন্দের যে-দুটি পংক্তিকে বাস্তবতার অসামান্য নিদর্শন বলে চিহ্নিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে কোনও সাহিত্যগুণ দেখতে পাননি। তাঁর কথায়—"ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই।"[৫৭] একে যারা সার্থক কবিত্ব বলেন, কবি তাদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন—"ইহা যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরও কবিত্ব"[৫৮]

এই বিরোধ-বিতর্কের উত্তাপ কবিকঙ্কণের কাব্যটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই বেঁধে রেখেছিল, তাই উত্তরকালেও রবীন্দ্রনাথ খুব খোলা মন নিয়ে মুকুন্দের কাব্যকে বিচার করতে পারেননি। তাই দেখি একষট্টি বছর বয়সে Edward Thompson কে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তিনি তুলে আনছেন পুরনো প্রসঙ্গ—

> The ideal of life which you find in kabikankan is very mean. When I was very young, I wrote a criticism of him which made folk very angry, and I was punished with abuse. They thought that because I was a Brahmo, I could not enter into the spirit of this wonderful things; that I criticized as a Brahmo.[৫৯]

দীনেশচন্দ্র সেনের বাংলা সাহিত্য-ইতিহাস 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'এর একটি বিস্তৃত সমালোচনা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তিনি পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবকটি শাখাকেই কম-বেশি স্পর্শ করে গেছেন। সেই প্রসঙ্গে এসেছে মঙ্গলকাব্যগুলির কথাও। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন শক্তির প্রতাপ। দেখেছিলেন সমকালীন সামাজিক বিপর্যয়। সমাজ থেকে শিবের প্রাধান্য হঠিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশের নিষ্ঠুর আখ্যান মঙ্গলকাব্যগুলো। মুকুন্দের কাব্যের প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোনও সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।[৬০]

সেকালের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অরাজকতার গহ্বর থেকেই এই নিদারুণ শক্তিমত্ততার জন্ম বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। যে নীচের লোক অথচ যে কিনা ভক্ত ও বশংবদ তাকে দেবী ওপরে তুলবেনই, এই তার পণ। এতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। ব্যাধকে যেমন তিনি বিনা কারণে দয়া করলেন আবার বিনা অপরাধে কলিঙ্গ রাজের রাজ্য ঝড়-জলে ডুবিয়ে দিলেন। যে-শক্তি নির্বিচারে পালন করছে, সেই শক্তিই আবার নির্বিচারে ধ্বংস করছে। এই অহেতুক পালন ও অহেতুক বিনাশে ধর্মাধর্ম কিংবা সাধু-অসাধুর ভেদ নেই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্মবিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করে দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল। স্বেচ্ছাচারী শক্তির খামখেয়ালে নীচের লোক ছলে-বলে-কৌশলে ওপরে উঠে পড়ল। এমনটা তো কেবল ভূমিকম্পের কালেই হয়। তাই মঙ্গলকাব্য সৃষ্টির কালটিকে বলা যেতে পারে সামাজিক ভূমিকম্পের কাল।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আবহাওয়ায় মঙ্গলকাব্যগুলোর উত্থানের ইতিবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ পুনরায় স্মরণ করেছেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে 'বাতায়নিকের পত্র' ও 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধে। 'বাতায়নিকের পত্র' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধের চতুর্থ উপচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলেছেন। তাঁর বক্তব্য এইরূপ, বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলোর বিষয় এক দেবতাকে তার সিংহাসন থেকে খেদিয়ে দিয়ে আর এক দেবতার অভ্যুদয়। দুই দেবতার মধ্যে যদি কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে তবে তা হওয়া উচিত ধর্মনীতিগত আদর্শ বিষয়ে। কিন্তু এখানে তা একেবারে উলটো। এক সময়ে বুদ্ধ বা শিব নামধারী যে-পুরুষ দেবতা ছিলেন, তার কোনও উপদ্রব ছিল না। খামোকা মেয়ে-দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন যে তার দেবত্ব চাই, সে পুরুষ দেবতার জায়গা দখল করবে। তার একমাত্র সম্বল গায়ের জোর। শক্তির প্রমত্ত লীলা দেখিয়ে, টাকাকড়ি ও ভয় প্রদর্শন করে সে ভক্তি আদায় করতে চায়। মধ্যযুগের বাংলায় যখন মোগল পাঠানের বন্যা দেশের ওপর ভেঙে পড়ল, তখন সমাজে-সংসারে এই শক্তির রূপই প্রবল হয়ে দেখা দিল। সেখানে ধর্মের হিসেব পাওয়া গেল না, শিবের পরিচয় আচ্ছন্ন হল। নিপীড়িত মানুষ লাভের প্রত্যাশায় শক্তির শরণাপন্ন হলেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাতির তীব্র অপৌরুষ

দেখেছেন। মানুষ যদি তখনও সমস্ত দুঃখ ও পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারত ‘আমি সব অত্যাচার সহ্য করব কিন্তু কোনওমতেই আদর্শ থেকে বিচলিত হব না’; তাহলে মানুষের জিত হত। অবশেষে শক্তির মারের কাছে সওদাগরের পরাজয় হল। সে শিবকে সরিয়ে রেখে শক্তির কাছে মাথা হেঁট করলে। এইখানেই শক্তির সকলের চেয়ে বীভৎস পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এই মোটিফের সঙ্গে সমকালীন ইউরোপের মিল খুঁজে পেয়ে লিখেছেন,--

> যুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলছেন, ‘যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, অমন নেহাত ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে; যেমন করে হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা’।[৬১]

শুধু তফাৎ এই মঙ্গলকাব্যে শক্তির কাছে যারা মাথা নত করেছেন তারা নিপীড়িত, দরিদ্র মানুষ। আর ইউরোপে যারা শক্তিপূজক, তারাই নিপীড়নকারী। রবীন্দ্রনাথের কথায়,--“য়ুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পানসভার বুলি? যারা জিতেছে, যারা লুটেছে, পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে যারা তাদের মদের চাট বানিয়ে খাচ্ছে।”[৬২] ‘শক্তিপূজা’ প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রায় একইরকম। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ‘বাংলা ভাষা পরিচয়’ গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন করেছেন এবং একইসঙ্গে মঙ্গলকাব্যে শক্তির হাতে শিবের লাঞ্ছনার কথা বলেছেন।

মঙ্গলকাব্যগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—“কল্যাণীয়েষু, কবিকঙ্কণ ও অন্নদামঙ্গল পড়ে নোট করে রেখেছি। এক কপি মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল যদি পাঠাতে পার তাহলে মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে আমার যা-কিছু বক্তব্য আছে জানতে পারবে।”[৬৩] চিঠিতে কবিকঙ্কণ পড়ে ‘নোট’ করে রাখার যে-কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা আসলে গ্রন্থের মধ্যেই মার্জিনাল নোট। যে গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই নোট রেখেছিলেন সেটা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বঙ্গবাসী সংস্করণ। বর্তমানে বইটি চারুচন্দ্রের পরিবারে রক্ষিত আছে। এই বইটির মার্জিনাল নোটে রবীন্দ্রনাথ যে-সব মন্তব্য করেছেন তা আমাদের গোচরে এসেছে।[৬৪] রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দের কাব্যে ‘প্রার্থনা’ ও ‘সৃষ্টি প্রকরণ’ বর্ণনার মধ্যে তাঁর বৈষ্ণবীয় মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। মুকুন্দ যে বৈষ্ণব

ছিলেন, সেটা রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার। মার্জিনাল নোটে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তব্যগুলি লিখেছিলেন, তা সূত্রাকারে লিখলে নিম্নরূপ হয়:

১) এই কাব্যগান ছেলেমানুষকে রূপকথা শোনানোর মতো। যিনি শোনাচ্ছেন তিনি ছেলেমানুষ নন, সেটা মাঝে মাঝে তাঁর পাণ্ডিত্যে ধরা পড়ে কিন্তু যারা শুনছে তারা ছেলেমানুষ, সরল, unsophisticated. তাদের মনোরঞ্জনের জন্য সম্ভব অসম্ভবের বিচার বর্জন করতে হয়।

২) 'নারীদের পতিনিন্দা', 'মহাদেবের ভিক্ষায় গমন' অধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন 'Epic এর একেবারে উল্টোপিঠ', 'দৈব কাহিনীকে শুধু মর্ত্য করা নয় তাকে মাটি করিয়া ছাড়া।'

৩) 'হরগৌরীর কলহ', 'গৌরীর খেদ' ইত্যাদি অধ্যায়গুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'দেবতাকে বড় করিয়া চিন্তা করার অভাব। তাহাকে ছোটো করার চেয়েও বেশি তাহাকে হীন করা'।

৪) 'পশুগণের ক্রন্দন', 'পশুগণের যুদ্ধে গমন' প্রভৃতি অধ্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ হল, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি ও অসঙ্গতি।

৫) অনার্য সাধারণের দেবতা আর্য শাস্ত্রের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করল, তখন দুই সংস্কৃতির খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। মঙ্গলকাব্যে আর্য-অনার্যের ভিন্ন উপকরণগুলি সহজে মিল খায়নি।

কবিকঙ্কণের কাব্যের সার্বিক চরিত্রচিত্রণও রবীন্দ্রনাথকে খুশি করতে পারেনি। 'পঞ্চভূত' বইয়ের 'নরনারী' প্রবন্ধে সমীরের জবানিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,--"কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে।"[৬৫] কিন্তু এই কাব্যেরই একটি মাত্র চরিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বারংবার করেছেন। সে ভাঁড়ু দত্ত। ভাঁড়ুর ঠকামি, অভিনয়-চাতুর্য্য, মোড়লিপনা রবীন্দ্রনাথের রসিক মনকে মুগ্ধ করেছিল। ভাষায় এমন একটি কৌতুকরস নিয়ে সে জেগে উঠেছিল যে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারেও সে অনায়াসে স্থান পেয়েছে। আমাদের প্রত্যক্ষ সংসারে সে এমন করে দৃষ্টিগোচর হত না। কবির কলমে চিত্রিত হয়েছে তার সার্থক রসমূর্তি। তাই রবীন্দ্রনাথের কথায়—"কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটা সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের

কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"[৬৬]। জীবনের অন্তিম প্রহরে 'সাহিত্যের মূল্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ু দত্ত।"[৬৭]

এই সমগ্র আলোচনায় আমরা দেখলাম রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে কোনওদিন খুব সপ্রশংস হতে পারেননি। অথচ রবীন্দ্রনাথের সমকালে সাহিত্যবোদ্ধারা প্রায় সকলেই কবিকঙ্কণের মহিমা গেয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য বর্ণনার গুণে মুগ্ধ, অক্ষয়চন্দ্র সরকারও তাই। সবচেয়ে বড়ো কথা বঙ্কিমচন্দ্র মুকুন্দের কাব্য সম্বন্ধে ইতিবাচক উক্তি করেছেন। 'Bengali Literature' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"Mukundaram Chakravartti—Kabi Kankan...deservedly enjoys a higher reputation than earlier Krittibas or Kasidas. Many passages of his book are touchingly beautiful"[৬৮]। এই ধারা অনুসরণ করে পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত ও দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁদের বইয়ে মুকুন্দের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। ব্যতিক্রম কেবল রবীন্দ্রনাথ। কবিকঙ্কণ পণ্ডিত কবি, একথা তিনি স্বীকার করেছেন তবুও তাঁর কাব্যে বাস্তবতার চিহ্ন বলে যা দেখানো হয় রবীন্দ্রনাথের কথায় তা অত্যুক্তি ও অসঙ্গতি। এই কাব্যে তিনি দেখেছেন গ্রাম্যতা, দেব চরিত্রের হীনতা, আর্য-অনার্য সংস্কৃতির অমিশ্রিত খিচুড়ি। এক ভাঁড়ু দত্ত ছাড়া চরিত্রগুলিও নিতান্তই স্থূল। এবং সর্বোপরি শক্তির অধার্মিক, অনিয়ন্ত্রিত লীলা এবং সেই শক্তির হাতে শিব তথা মঙ্গলময়তার পরাজয়। রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগগুলি কতখানি সঙ্গত, তা আমাদের বিচার করে দেখা আবশ্যক। প্রথম কথা রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকীয় শিক্ষিত, মার্জিত কল্পনায় মুকুন্দের প্রতি যে অভিযোগ করেছেন, মধ্যযুগীয় কাব্যাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি দোষবহ নয়। মুকুন্দ সংস্কৃত জানলেও তাঁর অভিজ্ঞতার সীমা গ্রামীণ জগৎ। ফলে স্থূল রুচি ও গ্রাম্যতা তাঁর কাব্যে স্বাভাবিক। উনিশ শতকের ইংরেজি পড়া Sophistication কি মুকুন্দের থেকে আশা করা উচিত? কালিদাসের দেব চরিত্রের আদর্শ মাথায় রেখে মুকুন্দের দেবখণ্ডের চরিত্রসৃষ্টির বিচার করতে গেলে মুকুন্দের দেবচরিত্রগুলিকে কিছুটা হীন বলে মনে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেকালের গ্রাম্য সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে এবং মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রেখে মুকুন্দ যা সৃষ্টি করেছিলেন, সমসাময়িক মঙ্গলকাব্যের কবিদের তুলনায় যা অনেক উৎকৃষ্ট। মুকুন্দের চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাপ্রবাহকে রবীন্দ্রনাথ যে-দৃষ্টিতে অসঙ্গত ও অত্যুক্তিতে ভরা বলেছেন, তা একালের সাহিত্যদৃষ্টির কথা। সাহিত্যে বাস্তবতার আদর্শ যুগে যুগে বদলে যায়, তাই আজ যাকে

অত্যুক্তি বলে মনে হচ্ছে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগের দেববাদ-নির্ভর সাহিত্যে তাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করা হত। আর চরিত্র বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মুকুন্দ তাঁর কাব্যের কাহিনি ও চরিত্র দুইই ঐতিহ্য থেকেই নিয়েছিলেন। চরিত্রগুলির স্বাধীন নির্মাণে তাঁর অধিকার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। তারই মধ্যে চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন, তা সমসাময়িক অন্য কবিদের তুলনায় প্রশংসার্হ্য। পরিশেষে বক্তব্য, বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমের তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথকে যতখানি মুগ্ধ করেছিল; শাক্ত ধর্মের বলের তত্ত্বটি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে ততখানি বিরূপ করে তুলেছিল। মুকুন্দ বৈষ্ণব হয়েও কেন স্বেচ্ছাচারী শক্তি-দেবতাকে স্তুতি করেছেন, এটাই রবীন্দ্রনাথের আপত্তির কারণ। এর উত্তরে বলা যায়, মঙ্গলকাব্যে শাক্ত দেবতার শক্তি প্রদর্শনের লীলা দেখানোর একটি বাঁধা গল্প আছে। মুকুন্দ তার বাইরে কীভাবে যাবেন? দ্বিতীয় কথা মঙ্গলকাব্যের শাক্ত দেবীর স্বেচ্ছাচারী খেয়ালিপনার মধ্যে তৎকালীন রাজশক্তির স্বৈরাচারকে এবং একালের রাজশক্তির স্বৈরাচারকেও (দ্রষ্টব্য বাতায়নিকের পত্র/কালান্তর) মিলিয়ে দেখা একালের নাগরিক কবির রাজনৈতিকবোধ। তাই দিয়ে সে-কালের ধর্মনৈতিক সাহিত্যকে বিচার করা সঙ্গত নয়। তাই আমাদের মনে হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের যুক্তিগুলি মৌলিক হলেও নিরপেক্ষ বিচারে তা সর্বার্থে মেনে নেওয়া যায় না।

মঙ্গলকাব্য বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গলকে এক গোত্রে রেখে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যকে যে-মোটিফে পড়তে চান তাতে এই দুই কাব্যে প্রভেদ হয় না। সেইসঙ্গে উভয়ের কাহিনিগত মিলও রয়েছে প্রচুর। তাই 'মনসামঙ্গল' নিয়ে তাঁর পৃথক কথা বিশেষ পাওয়া না গেলেও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য ও ভারতচন্দ্র বিষয়ে তিনি নানা স্থানে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল দুই-ই নোট করে রাখার কথা জানিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল বইটি মার্জিনাল নোটসহ উদ্ধার হলেও অন্নদামঙ্গল পাওয়া যায়নি। সেটি পাওয়া গেলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব বিস্তারে জানা যেত। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অন্নদামঙ্গলের কথাও এনেছেন। তিনি ভারতচন্দ্রের রচনায় রূপান্তরিত শিব-ঘরনিকে দেখেছেন। পূর্বের উগ্র চণ্ডী উত্তরোত্তর মধুর ও কোমল ভাব ধারণ করেছেন ভারতচন্দ্রের রচনায়। এখানে তিনি জননী অন্নপূর্ণা, ভিখারির গৃহলক্ষ্মী ও বিচ্ছেদ-বিধুর পিতামাতার কন্যা। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে কিয়ৎ পরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত

করিয়াছে, অন্নদামঙ্গল তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে।"[৬৯] অন্নদামঙ্গলে বিশেষত এর অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন 'অলস কল্পনা' ও 'রুচির বিকৃতি'। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'আলস্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কবি-কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে বিকৃতি পেতে থাকে। বিদ্যাসুন্দরের একটি অংশমাত্র উদ্ধার করে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারিয়ে কীভাবে বাঁকাচোরা কথার কৌশলে পর্যবসিত হয়। আলস্য ও দারিদ্র্য একে অপরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অলসতা কল্পনার দারিদ্র্যকেই ডেকে আনে। ভারতচন্দ্র অঙ্কিত শিব চরিত্রে এর প্রমাণ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অন্নদামঙ্গলের শিব কালিদাসের যোগীশ্রেষ্ঠ নন, তিনি বাংলার বেদে সমাজের লোক। তার ধূসর মলিন বেশ, মাথার চুলে জট, খড়ি উড়ছে গায়ে। শিবের এই মূর্তি অলসতাপ্রসূত দরিদ্র কল্পনারই ফল। সেইসঙ্গে বিদ্যাসুন্দরে যে রুচির অবমাননা ও ইন্দ্রিয়বিকার রয়েছে, তার মূলেও আছে কল্পনার দারিদ্র্য, এমনটাই ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়,--

> কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধমলিন জলে যেমন দূষিত বাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস-কলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।[৭০]

ভারতচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে বিকৃতরুচির প্রসঙ্গ এনেছেন তা উনিশ শতকের সমালোচকমহলে খুবই চর্চিত একতি বিষয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নিন্দা-প্রশংসার প্রশ্নে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের যথেষ্ট মতানৈক্য ছিল। এক দল মনে করত আদিরস মানেই তা অশ্লীল নয়। প্রাচীন সাহিত্যে ও জীবনে এই রসের চর্চা ছিল যথেষ্ট। ভারতচন্দ্র সেই পুরনো ধারারই অনুবর্তী মাত্র। অন্যপক্ষ যারা ইংরেজি রুচিসম্মত ভিক্টোরীয় পিউরিটান শুচিতাবোধে বিশ্বাসী, তাদের মতে ভারতচন্দ্র অশ্লীল। বিদ্যাসুন্দর রুচি-বিকৃতির চূড়ান্ত, যা পাঠকের মনকে অসুস্থ করে তোলে। প্রথম ধারায় যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মদনমোহন গোস্বামী, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ। আর যারা মনে করতেন ভারতকাব্য অশ্লীল, তাদের অগ্রবর্তী হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও বিদ্যাসুন্দরকে অশ্লীল কাব্য বলেই চিহ্নিত করেছেন। বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে একটি পত্রে

এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,--"সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। সেইজন্য সুবৃহৎ শেক্সপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল—কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।"[৭১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র অশ্লীলতাকে ভাষায়-ছন্দে-অলংকারে ও সুপটু বাগবিন্যাসে অর্ধগোপন করতে চেয়েছেন। অর্ধগোপন করতে চেয়েছেন বলেই তা উলটে অধিক ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের স্ত্রী-চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। 'মালিনী' ও 'বিদ্যা'র সজীব মূর্তি প্রকাশ পেলেও 'সুন্দর' অনেকটাই নিষ্প্রভ। তবে ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু যতই দরিদ্র কল্পনা ও রুচিবিকারের ফসল হোক, রাজসভার এই বিদগ্ধ কবির ভাষার কারুকার্য, বাগভঙ্গিমা ও ছন্দের উৎকর্ষ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভারত কবির কলাকৌশলের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তা স্মরণীয় হয়ে আছে—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।"[৭২] এই কথা বললেও সার্বিক বিচারে ভারতচন্দ্রের এই কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ একালের রুচির পক্ষে অচল বলে মনে করেছেন। বিলাস কলুষিত কল্পনার দারিদ্র্যই এই কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করতে পারেনি।

অনুবাদ সাহিত্য

তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে গৌড়ে যখন ইলিয়াস শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ অনুবাদের চর্চা দেখা দিল। দেখা গেল, অধিকাংশ হিন্দু কবিরা মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এই অনুবাদগুলি করেছিলেন। এই অনুবাদের ধারায় দুটি চিরন্তন গ্রন্থ হল কৃত্তিবাসী রামায়ণ (প্রকৃত নাম শ্রীরাম পাঁচালি) ও কাশীদাসী মহাভারত। এই দুটি বই বাঙালি সমাজে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পুথির যুগে তো বটেই, ছাপাখানা হওয়ার পর মুদ্রণের যুগেও এই দুটি প্রাচীন বই নিজস্ব জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পেরেছিল। কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কাব্য যে রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন তার প্রমাণ আছে 'জীবনস্মৃতি'তে এবং অন্যত্রও। আমাদের মনে পড়বে 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রবীন্দ্র-স্মৃতি—

দিদিমা, আমার মাতার কোনও এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়ে গেলাম।...রামায়ণের কোনও একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।[৭৩]।

বোঝা যায় সেই বালক বয়সেই কৃত্তিবাসের কাব্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরের কতখানি নিবিড় যোগ তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ পড়েছিলেন আরও কিছুটা বড়ো হওয়ার পর কিন্তু শৈশবে কৃত্তিবাসের লেখনীর দ্বারাই রামকথার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। রামায়ণের পাশাপাশি কাশীরাম দাসের মহাভারতও যে তাঁর অধীত ছিল, তা জানতে পারি 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই।"[৭৪]। তবুও এ-কথা ঠিক কাশীদাসী মহাভারত তার বিপুল বপু ও দীর্ঘত্বের কারণে ততটা জনপ্রিয় হতে পারেনি যতখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ পেরেছে। লোকায়ত ভাষা, রামভক্তিবাদের তরঙ্গ ও লোকমনোরঞ্জক কাহিনি কৃত্তিবাসকে জনপ্রিয় হওয়ার বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছে। কৃত্তিবাসের কাব্যের এই জনপ্রিয়তা ও লোকমান্যতাকে গভীরভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'চারিত্র্যপূজা' গ্রন্থের নামপ্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

যেমন 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলা দেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কীসে হইতে পারে।[৭৫]

কৃত্তিবাসের কাব্যের খুব বিস্তৃত আলোচনা রবীন্দ্রনাথ করেননি কিন্তু 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রতিতুলনায় কৃত্তিবাসের পাঁচালিকে তিনি 'ভক্তিবাদী' টেক্সট হিসেবে তুলে ধরেছেন। হিন্দি কবি তুলসীদাসের মতোই কৃত্তিবাসের কাব্যও তাঁর কাছে 'ভক্তির জলাভূমি'। বাল্মীকির কাব্যের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রতিতুলনা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে বাল্মীকি কর্তৃক অঙ্কিত রাম চরিত্রে অতিপ্রাকৃত ছিল কিন্তু তবুও বাল্মীকির চোখে রামচন্দ্র মোটের ওপর ছিলেন 'নরচন্দ্রমা'। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শ। কালক্রমে রামচরিতে

অতিপ্রাকৃতের উপাদান বাড়তে বাড়তে রাম ক্রমশ দেবতার পদবি অধিকার করে নিলেন। নরচরিত্র যখন দেবচরিত্র হয়ে ওঠে, তখন তিনি যে-সব কষ্টসাধ্য কাজ করেছিলেন তার দুঃসাধ্যতা চলে যায়। দেবতার পক্ষে আর দুঃসাধ্য কী, এমন ভাব জেগে ওঠে। তখন লেখনীর দ্বারা সেইরকম চরিত্রকে মহীয়ান করে তুলতে হলে তার কঠিনসাধ্য কাজগুলিকে বর্ণনা করাই যথেষ্ট হয় না ; বরং যে-ভাবের ভিতর দিয়ে দেখলে এমন দেব চরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয়, কাব্যে ভাবটাই প্রধান হয়ে ওঠে। সেই ভাবটি হল রামের 'ভক্তবৎসলতা'। কৃত্তিবাস রামকে আগাগোড়া দেবতা এবং আগাগোড়া 'ভক্তের ভগবান' করে এঁকেছেন।

> তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করেন। বিভীষণ তাহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।[৭৬]

বাংলাদেশের জল-মাটিতে এসে রাম ভক্তবৎসল হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণ ভ্রান্ত নয়। সেইসঙ্গে এই কথাও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ দেবতাকে এবং দেবচরিত্র-নির্ভর কাহিনিটিকে সর্বজনীন করে তুলেছিল। ঈশ্বর যে কেবল জ্ঞানীদের নয়, তাকে পেতে গেলে তন্ত্র-মন্ত্র বা বিশেষ বিধির আবশ্যক নেই, সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করতে পারে, এই কথাটা কৃত্তিবাস তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করে দিতে পেরেছিলেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ তার শ্রোতা- সাধারণকেও এক বিশেষ মর্যাদা ও গৌরব দিয়েছিল। কেবল উচ্চশ্রেণি নয়, কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নয়, সমাজে যারা নীচে পড়ে আছে দেবতা যে তাদেরও দেবতা, এই ভাবটি কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। তাই দেখি এই কাব্যে "ভগবান শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্য সেবাও যে তাহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর-একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।"[৭৭] পক্ষান্তরে কাশীরাম দাসের মহাভারতের উল্লেখটুকু ছাড়া এটি সম্পর্কে কোনও সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আমাদের চোখে পড়েনি। কেবলমাত্র বাংলা পয়ার ছন্দের আলোচনায়

কাশীরাম দাসের বহুব্যবহৃত ভণিতা-চরণদুটি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন, ‘মহাভারতের কথা অমৃতসমান/কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।’। এর বাইরে কাশীদাসী মহাভারতের বিশ্লেষণ তাঁর প্রবন্ধাদির মধ্যে বড়ো একটা চোখে পড়ে না।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৮ ব, পৃষ্ঠা-৩৫।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৬৫।

৩. প্রশান্ত পাল, *রবিজীবনী,* প্রথম খণ্ড, আনন্দ, পৌষ ১৪০০ ব, পৃষ্ঠা-১৩৩-১৩৭।

৪. বিশ্বনাথ রায়, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ,* সুজন প্রকাশনী, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩২-৩৬।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৬০, পৃষ্ঠা-১৯৮।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্গভাষা’, ভারতী, বৈশাখ ১৩০৫ ব, পৃষ্ঠা-৭৭।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৮০।

৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৮১।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩১০।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১২।

১২. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী,* ২য় খণ্ড, কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৯০-৯৫।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১২-৩১৩।

১৪. রামপ্রসাদ সেন, *শাক্ত পদাবলী,* ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রত্নাবলী, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-২৪৬।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫।

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৬।

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৭।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৮।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৮।

২০. দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য,* জিজ্ঞাসা, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-১৯৭।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৮।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবন-স্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭১ ব, পৃষ্ঠা-৩৩০-৩৩১।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পঞ্চভূত,* বিশ্বভারতী, ১৩০৪ ব, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* ৫ম, বিশ্বভারতী, ১৩০২ ব, পৃষ্ঠা-১৫৭।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বাংলা শব্দতত্ত্ব,* বিশ্বভারতী, ১৩৪২ ব, পৃষ্ঠা-৩২৮।

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৫।

২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৯।

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩০।

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৩

৩১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪০।

৩২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৬২৮।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃষ্ঠা-২৩০

৩৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২২৭-২২৮।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২১, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ ব, পৃষ্ঠা-১৪।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২৮।

৩৭. Pater W.H, 'Appriciation', *Style*, Macmillan & co, 1944, page-14.

৩৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬২৮।

৩৯. দ্রষ্টব্য, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় রবীন্দ্র প্রভাব', সাপ্তাহিক দেশ, ২৮ এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৫৫।

৪০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* প্রথম খণ্ড, আনন্দ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৩৮৮।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বসন্তরায়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃষ্ঠা-২৩৮।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বৈষ্ণব কবির গান', তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৫।

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৮।

৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাপতির রাধিকা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬১-৩৬২।

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নিছনি' [পাদটীকা দ্রষ্টব্য], *বাংলা শব্দতত্ত্ব*, বিশ্বভারতী, ১৩৯১ ব [৩য় সংস্করণ], পৃষ্ঠা-১৭০।

৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭২।

৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৩।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পহু’, তদেব, পৃষ্ঠা-১৮২

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তথ্য ও সত্য’, *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ ব, পৃষ্ঠা-৫৫।

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৬।

৫১. বিশ্বনাথ রায়, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।

৫২. তদেব, পৃষ্ঠা-১০১।

৫৩. বিমানবিহারী মজুমদার, *রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান,* বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৭ ব, পৃষ্ঠা-৪৬।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যসৃষ্টি’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯১।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২০৮।

৫৬. দ্র: গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃষ্ঠা-১০১০।

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট’ প্রবন্ধ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৩।

৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১৩।

৫৯. Edward Thomson, *Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist,* Oxford University Press, Delhi, 1979, p-98.

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৫।

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাতায়নিকের পত্র’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৪।

৬২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৫।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭ ব, পৃষ্ঠা-৯২।

৬৪. এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রবীন্দ্রনাথের চণ্ডীপাঠ’ নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার মার্চ ২০১৮ সংখ্যায়।

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘নরনারী’ প্রবন্ধ, *পঞ্চভূত, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৬২।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সৌন্দর্য ও সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৮৫।

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের মূল্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬১১।

৬৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘Bengali Literature’, *বঙ্কিম-রচনাবলী,* খণ্ড-৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৫৩।

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১৬।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘আলস্য ও সাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩২১।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মানবপ্রকাশ’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪৯।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কবি-সংগীত’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৯।

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৭।

৭৪. দ্রষ্টব্য ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সংকলিত নেই। অনলাইনে দেখবার জন্য লিঙ্ক: https://www.tagoreweb.in/Essays/shikkha-73/shikkhar-herpher-probondher-6292

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮০।

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যসৃষ্টি’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৯৫।

৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৯৫।

খ) আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

পাশ্চাত্য অর্থে যাকে 'আধুনিকতা' বলা যায়, আমাদের বঙ্গীয় জীবনে উনিশ শতক থেকেই তার সূত্রপাত। মধ্যযুগ থেকে আধুনি যুগে পদপাত—এ শুধুমাত্র কালগত ব্যবধান নয়, এই ব্যবধান ভাবগত ও আদর্শগত ; চেতনার স্বরূপের সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন উনিশ শতককে মধ্যযুগের থেকে পৃথক করে ফেলেছে। এই পৃথকীকরণের একদিকে আছে ভাঙন, অপরদিকে গড়ন। উনিশ শতকের গোড়া থেকে ছাপাখানার দৌলতে মধ্যযুগীয় পুথি সাহিত্যের অবসান হল, গদ্যসাহিত্যের প্রসার হল। হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি উচ্চতর বিদ্যাকেন্দ্রগুলো স্থাপিত হল। নানা ধরণের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল, তাতে নতুন জেগে ওঠা বাঙালিসমাজে নাড়ির চাঞ্চল্য দেখা দিল। সেই চাঞ্চল্য ঝড়ের আকারে ভেঙে পড়ল রামমোহনের আবির্ভাবের পর থেকে। শুধু রামমোহন নন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র—উনিশ শতক জুড়ে এইসব মণীষীদের আত্মপ্রকাশে অনেক কিছুই ভাঙল; যা কিছু মধ্যযুগীয়, মন্থর ও অলস, তাকে তাঁরা প্রচণ্ড বিক্রমে চূর্ণ করলেন। সেই সঙ্গে গড়ে তুললেন অনেক কিছু। ছাপাখানার আবির্ভাবের পর সাহিত্যের নবজন্ম হল। শয়ে শয়ে পত্র-পত্রিকা বেরোতে লাগল। সাহিত্যেরও নানারকম সংরূপ গড়ে উঠল। এল মহাকাব্য, উপন্যাস, নাট্য। এই গোটা কালপর্বকে এবং এই কালপর্বের প্রেক্ষাপটে গোড়া ওঠা বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কীর্তিসমূহকে বঙ্গীয় রেনেশাঁসের অন্যতম সন্তান রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেখেছেন বা কেমনভাবে মুল্যায়ন করেছেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপালেখ্য অঙ্কন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই অন্বেষণ যে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণকেই তুলে ধরবে তাই-ই নয়, সমগ্র উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথম পর্বের অন্তর্তরঙ্গকেও স্পর্শ করতে পারবে। সেইসঙ্গে নির্ধারণ করতে পারবে সমকালীন যুগসাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য-প্রবন্ধ রচনার উন্মেষকাল সূচিত হয়েছিল 'সাহিত্য-সমালোচনা' দিয়েই। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (ইংরেজি ১৮৭৬) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের স্বনামে লেখা একটি সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির নাম

‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী’। এই প্রবন্ধটি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর ছয় মাস। এই প্রবন্ধটি লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথের একটিই লিখিত প্রবন্ধের কথা জানা যায়। সেটা বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ। ১৭৯৬ শকাব্দের (১৮৭৪ খ্রিঃ) পৌষ সংখ্যায় ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি’। এই প্রবন্ধে যদিও তাঁর নাম ছিল না, নামের আদ্যক্ষরটি মাত্র ছিল। এই প্রবন্ধটির কথা বাদ দিলে সাড়ে পনেরো বছর বয়সে লিখিত ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা...’ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ এবং প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা। এই প্রবন্ধটিকে নেহাত বুক রিভিউ বা গ্রন্থ-সমালোচনা না বলে সাহিত্য-সমালোচনাই বলতে হবে কারণ প্রবন্ধের সূচনায় সাহিত্যের লক্ষণ বিশেষত গীতিকাব্যের লক্ষণ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা আছে এবং মহাকাব্যের তুলনায় গীতিকাব্যের প্রতিতুলনার জায়গাটিও আছে। সেই সাহিত্য-আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি নিয়ে এসেছেন সেকালের খ্যাতনামা তিন কবির সদ্য-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। প্রথম, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা’, দ্বিতীয়, রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘অবসরসরোজিনী’(১ম ভাগ) ও তৃতীয়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর ‘দুঃখসঙ্গিনী’। একেবারে কিশোর রবীন্দ্রনাথের কলমের এই সমালোচনাটি সে-যুগের পাঠকসমাজে কিছুটা আলোড়ন তুলেছিল। সেই আলোড়নের কথা প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ মনেও রেখেছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’তে তার সাক্ষ্য আছে।

> আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে লিখিলাম। খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতি-কাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম।[১]

বালক হয়েও রবীন্দ্রনাথ বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এই লেখায়। তাই পরে ‘জীবনস্মৃতি’তে কিছুটা কৌতুক করেই বলেছেন, সুবিধার কথা ছিল এই যে সেদিনের বালককে কেউ চিনত না, এদিকে ছাপার অক্ষরের মুখ দেখে এটা বোঝার উপায় নেই যে লেখকটি কেমন, তার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কত! তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জানিয়েছিলেন ‘একজন বি.এ তোমার এই লেখার জবাব লিখিতেছেন।’ এই কথা শুনে তরুণ সমালোচক ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হল না এই কথা ভেবে যে তাঁর কীর্তিস্তম্ভ সেই বি.এ ডিগ্রিধারীর কলম নিঃসৃত বড়ো বড়ো কোটেশনের আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে, পাঠকসমাজে তাঁর আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই বি.এ সমালোচক দেখা দেননি।[২]

‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা’ নামক কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে সে-যুগের পাঠক সমাজে বেশ চাঞ্চল্য ও গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই কাব্যের আখ্যাপত্রে কবির নাম ছিল নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কবি তাঁর আত্মীয় রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে কাব্যটি উপহার দিয়ে লিখেছিলেন : ‘আমার আদরিণী ভুবনমোহিনীপ্রতিভাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।’ ভুবনমোহিনী কাল্পনিক চরিত্র নয়। যে-রাধিকানাথ মুখোপাধ্যায়কে কাব্যটি উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীর নাম ভুবনমোহিনী। এই ভুবনমোহিনীও সেকালের একজন লেখিকা ছিলেন। সম্ভবত নবীনচন্দ্রের উৎসাহেই তাঁর লেখালেখি। আর এই সূত্রেই কাব্যটিকে ঘিরে একটি গোলযোগ বেঁধেছিল। যদিও বইয়ের আখ্যাপত্রে খুব স্পষ্টভাবে লেখকের নাম (নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ছাপা আছে, তবুও সাধারণের ধারণা হয়েছিল কাব্যটি আসলে ভুবনমোহিনী দেবী নাম্নী কোনও মহিলা-কবির রচনা। নবীনচন্দ্র সেগুলোকে সংকলন করেছেন মাত্র। সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরাও এই কথা বিশ্বাস করে ভুবনমোহিনীর কবি মহিলা-কবি হিসেবে চিহ্নিত করে বিস্তর প্রশংসা করেছিলেন। যেমন, ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।”[৩] কিন্তু প্রশ্ন হল, নবীনচন্দ্রের স্বনামে প্রকাশিত লেখাকে দেশসুদ্ধু লোক মহিলা-কবির লেখা বলে মনে করলেন কেন? এর কিছু ভিত্তি ছিল। নবীনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—

> এই স্থান (মুর্শিদাবাদের নসীপুর গ্রাম) হইতে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে দুই একটি মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় দেওয়া হয়, কিন্তু প্রথমে সম্পাদক মহাশয় ঐ সকল কবিতার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিলেন যে, এই দুইটি কবিতা কবিতাই হয় নাই, সুতরাং প্রকাশ করা গেল না। তৎপরে আর একটি কবিতা ভুবনমোহিনী দেবী—স্বাক্ষর করিয়া পাঠানোতে সম্পাদক মহাশয় আহ্লাদে অধীর হইয়া ভূয়সী প্রশংসাবাদ সহকারে মুর্শিদাবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন। এই কবিতা লইয়া নসীপুরে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে খুব একটা বাহবা পড়িয়া গেল। এইরূপে ভুবনমোহিনী দেবী স্বাক্ষরে কবিতাসকল বাহির হইতে লাগিল।[৪]

এইভাবে নবীনচন্দ্রই ভুবনমোহিনী কবিরূপে বাজারে জনপ্রিয় করেছিলেন। তাই তিনি যখন ভুবনমোহিনীর নামে কাব্যের নাম দিলেন তখন সাধারণ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিল যে

ভুবনমোহিনীই কবিতাগুলির প্রকৃত লেখিকা, নবীনচন্দ্র সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন মাত্র। উনিশ শতকে মেয়ে লেখিকার সংখ্যা ছিল হাতেগোনা। যাঁরা লিখতেন এমনকি নবীনা কোনও লেখিকার কাঁচা লেখা হলেও উৎসাহের চোটে তা প্রচুর প্রশংসা কুড়োতো। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভুবনমোহিনীর কবিতাগুলো নিয়ে সেকালে খুব শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ‘ভুবনমোহিনী’ র কবিকে সকলে মহিলা-কবি হিসেবে ধরে নিলেও রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তাই ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখেছেন—

> তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে ‘ভুবনমোহিনী’ সই করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন।...এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলে মনে করা অসম্ভব হইল।[৫]

কিন্তু আশ্চর্য এই যে এত গভীর সন্দেহ থাকলেও তিনি যখন এই কাব্যের সমালোচনা লিখলেন তখন এই কাব্যটি স্ত্রীলোকের রচনা ধরে নিয়েই লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে ‘জীবনস্মৃতি’তে তিনি যতই সন্দেহের কথা বলুন, অন্তত প্রবন্ধটি লেখবার কালে কাব্যের কবি যে স্ত্রীলোক এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

দ্বিতীয় যে কাব্যখানির সমালোচনা তিনি করেছেন, তা সে-যুগের জনপ্রিয় কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের ‘অবসরসরোজিনী’(১ম ভাগ) কাব্য। কাব্যের প্রকাশকাল ১২৮৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ(ইংরেজি ১৮৭৬ খ্রিঃ)। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা কালে এর শুধুমাত্র ১ম ভাগটাই দেখেছিলেন। কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ আরও তিন বছর পর (১৮৭৯)এ মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের বেশ কঠোর সমালোচনা করেছেন। এতে তাঁর যুক্তিবোধের সঙ্গে সঙ্গে সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায় কারণ সমালোচনাটি লেখবার কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র সাড়ে পনেরো, অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ তখন সাতাশ বছরের যুবক, শুধু তাই-ই নয় ইতোমধ্যেই তিনি বেশ কয়েকখানি কাব্য রচনা করে কবিখ্যাতি পেয়েছেন। রাজকৃষ্ণের কবিতা সে-যুগের প্রধান প্রধান সাময়িকপত্র (যেমন ‘বান্ধব’, ‘আর্যদর্শন’, ‘মধ্যস্থ’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘এডুকেশন গেজেট’, ‘সাধারণী’)তে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু কিশোরবয়সী কবি অকুতভয়ে তাঁর কাব্যের কিছুটা বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছিলেন।

তৃতীয় কবির নাম হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী। 'সাধারণী', 'আর্যদর্শন', 'বান্ধব', 'সাহিত্য' প্রভৃতি সে-কালের নামকরা সাহিত্য পত্রিকাগুলিতে তাঁর কবিতাও ইতোপূর্বেই ছাপা হয়েছিল। তাঁর 'দুঃখসঙ্গিনী' কবিতাগুচ্ছ ১৮৭৫ সালের অক্টোবর মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে অবশ্য এই কাব্যের কোনও কপি এদেশে পাওয়া যায় না। বইটি এখন সম্পুর্ণভাবে দুষ্প্রাপ্য। হরিশ্চন্দ্র মূলত প্রেমের কবি। তাঁর কবিতায় স্নিগ্ধ, সকরুণ দাম্পত্য প্রেমের বহু ছবি পাওয়া যায়। তাঁর সহধর্মিণীর নাম ছিল বিনোদকামিনী। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতা আলম্বন ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর অপর একটি কাব্যগ্রন্থ 'বিনোদমালার' মধ্যে স্ত্রীর নামটি রয়ে গেছে। এঁর কবিতা রবীন্দ্রনাথের বিচারে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখিত আলোচ্য প্রবন্ধটির দুটি ভাগ। প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, ইংরেজি lyric কবিতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাপ সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি (যেমন, 'উত্তরচরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব') একত্রিত করে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখাগুলি পড়েছিলেন। বিশেষত নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী'র আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' নামে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তার দ্বারা কিশোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন দেখা যাচ্ছে। 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

> গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে-কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফূটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ শুরুই করেছেন এই বাক্য দিয়ে—"মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না।"[৭] তাই যখন কোনও সঙ্গী জোটে, তখন তার কাছে মনোভাব ব্যক্ত করি অথবা মনের সেই ভাবকে সংগীতের দ্বারা ব্যক্ত করি।

এইরূপেই গীতিকবিতার উৎপত্তি। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা'ই যে গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথ সেই একই কথা বলেছেন। এরপর তিনি মহাকাব্যের লক্ষণ চিহ্নিত করে বলেছেন, যে-মহাবীর শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেন, দেশের গৌরব বর্ধন করেন, তাঁর কীর্তিকাহিনি অবলম্বনে মহাকাব্য রচিত হয়। এরপর মহাকাব্য ও গীতিকাব্যের তুলনা তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি।[৮]

প্রবন্ধটি লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন যে গীতিকবিতার গৌরবের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিল তা বোঝা যায়। এরপরেই গীতিকাব্যের মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ঋকবেদে রচিত শ্লোকগুলি ঋষিদের ভক্তির উৎস থেকেই গানের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। গীতিকবিতার দ্বারাই বাংলায় চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত ও দৃঢ়মূল হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের মতো বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠনের পেছনেও ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। এরপর তিনি সরাসরি গীতিকবিতাকে মহাকাব্যের ওপর স্থান দিয়ে বলেছেন—

> গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেন না তাহা আমাদের নিজেদের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণমাত্র।[৯]

অর্থাৎ, তাঁর মতে, মানুষ নিজের মনের কথা যতটা স্পষ্টভাবে বলতে পারে, অপরের মনের কথা ততটা পারে না। মহাকাব্য তন্ময় শ্রেণির কবিতা, সুতরাং তাতে অপরের হৃদয়ের কথাই বেশি। তাই মহাকাব্যকে কল্পনার দ্বারা অনেকখানি সৃষ্টি করে তুলতে হয়। সুতরাং মহাকাব্য কৃত্রিম শিল্প, অকৃত্রিম হৃদয়বাণী নয়। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার আরেকটি স্বরূপ নির্দেশ করেছেন, তা হল 'খণ্ডকাব্য'। যে কাব্যে আখ্যান (Narrative) এর প্রাধান্য আছে, তাতে গীতিপ্রাণতা থাকলেও রবীন্দ্রনাথের মতে সেগুলি গীতিকাব্য নয়, খণ্ডকাব্য। যেমন 'মেঘদূত', 'lalla Rookh' প্রভৃতিকে তিনি খণ্ডকাব্য বলেছেন কিন্তু 'ঋতুসংহার', 'Irish Melodies', ওড, সনেট প্রভৃতিকেই যথার্থ গীতিকবিতা বলেছেন।

‘জয়দেব ও বিদ্যাপতি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশে গীতিকবিতার প্রাবল্যের জন্য এদেশের আর্দ্র জলবায়ু এবং বাঙালির করুণ কোমল অন্তঃকরণের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথও এদেশে পৌরুষ-বীরত্বব্যঞ্জক মহাকাব্যের অভাবের কারণ দেখিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> বাংলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে। আবার বাঙ্গালার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালীরা স্বভাবত নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ পাইবে কোথায়? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে।[১০]

এখানে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা টেইনের[১১] মতো বাহ্যিক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণকেই একটি বিশেষ ধরণের সাহিত্যবিকাশের মূল প্রেরণা হিসেবে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর প্রবন্ধে (জয়দেব ও বিদ্যাপতি) গীতিকাব্যকে বাংলাদেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ফল বলে মনে করেছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বঙ্কিমের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।

এরপর রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ইংরেজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে এদেশের লেখকেরা তেজস্বিতা, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি বড়ো বড়ো ভাব নিয়ে মহাকাব্য রচনা করছেন কিন্তু তাতে তাদের অন্তরের ভাবের স্পর্শ সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। ফলে তাদের লেখা কৃত্রিম এবং বিদেশি কবিদের অনুকরণসঞ্জাত হয়ে উঠছে। অপরদিকে বাংলার গীতিকাব্যে যে-কান্নার রোল উঠেছে, তা কারও অনুকরণজাত নয়। পরাধীনতার যন্ত্রণাই গীতিকবিদের হৃদয়কে বেদনামথিত করেছে—

> বাঙ্গলার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গলার হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁপিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাতে ঢালিয়া দিতেছে।[১২]

অবশ্য গীতিকবিদের মাত্রাজ্ঞানও থাকা উচিত বলে কিশোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। জাতীয় ভাব ও স্বদেশপ্রেম নিয়ে তারা কখনও কখনও বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তাই তাঁদের উদ্দেশে কিশোর সমালোচকের উপদেশ—"তাহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক।"[১৩] অর্থাৎ শুধু ভাবের আবেগে ভেসে যাওয়াই নয়, সু-সাহিত্য তৈরি করতে গেলে যে-ভাবের যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ও মাত্রাজ্ঞান দরকার, কিশোর-সমালোচক সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

মহাকাব্যের তুলনায় গীতিকাব্যের উৎকর্ষের প্রেক্ষাপট রচনা করে এরপর রবীন্দ্রনাথ উক্ত তিনখানি কাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, ভুবনমোহিনীর কবিকে স্ত্রীলোক বলে ধরে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই কাব্যের দোষ-ত্রুটিকে কিছুটা হালকা করে দেখেছেন কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতাগুলিকে বেশ নির্মমভাবেই সমালোচনা করেছেন। শুরুতেই তিনি বলেছেন তাঁর সমালোচ্য যে-দুজন কবি "উহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সাড়ে পনেরো বছরের কিশোর সমালোচক প্রায় সাতাশ বছর বয়সী ততদিনে বেশ খ্যাতিমান রাজকৃষ্ণকে বালক বলছেন কেন? রাজকৃষ্ণের কবিতার ভাব ও ভাষা তাঁর কাছে বালকোচিত বলে মনে হয়েছে কি? যাই হোক, দুটি কাব্যের তুলনামূলক বিচার করে তিনি দেখালেন যে, ভুবনমোহিনীর কবিপ্রতিভায় শিক্ষা, অনুশীলন ও পরিমার্জনার অভাব থাকলেও তাতে কবির একান্ত নিষ্ঠা ও স্বাভাবিকতা আছে। ভুবনমোহিনীর কবিতা সরল ও অকৃত্রিম; তাই তাঁর অপরিপক্ক, অস্ফূট কবিতাগুলির জন্য কবি তাঁকে খুবই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায় "আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন।"[১৪] এই 'আপনার বলিয়া দিতেছেন' কথাটির মধ্যে রাজকৃষ্ণের প্রতি খোঁচা আছে। এই খোঁচার কারণ রাজকৃষ্ণ তাঁর রচনায় ইংরেজি কবিতার ভাব আত্মসাৎ করেছেন কিন্তু স্বীকৃতি দেননি। এই ভাব-চুরির নমুনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ হেরিকের 'The wounded Cupid' এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের 'মধুমক্ষিকাদংশন' এবং ম্যুরের Irish Melodies এর নদীবিষয়ক কবিতার সঙ্গে রাজকৃষ্ণের 'প্রবাহে চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী'র তুলনা টেনে এনেছেন। এবং সেইসঙ্গে বলেছেন—"কু-কবিরা যেখানে অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভালো হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন।"[১৫] অর্থাৎ রাজকৃষ্ণ যেখানে ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করেছেন, সেইখানেই কেবল সফল হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে,

পনেরো বছরের কিশোর সমালোচকের ইংরেজি কবিতা বিষয়ে এবং বাংলা কবিতার সঙ্গে তার প্রতিতুলনায় যে প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন, তা রীতিমতো বিস্ময়কর। কিশোর বেলায় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি এই ব্যুৎপত্তির পিছনে শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র চৌধুরীর প্রভাব থাকা সম্ভব। এই বিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন—

> বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিয়াছিল। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। সে-সাহিত্যে তাঁর যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল।...অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।[১৬]

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে লেখেন—"তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে, কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই।"[১৭] অপরদিকে "ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বন্ধ রচনা অনেক আছে, তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।"[১৮]। খোলা চোখে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা এখানে কিছুটা হলেও পক্ষপাতদুষ্ট। নিরপেক্ষ বিচার করলে দেখা যাবে, দুটি কাব্যেরই দোষ-গুণ-ত্রুটি একইরকম। কৃত্রিমতা, ভাবাবেগের অসংযম, প্রেম-প্রণয়ের নামে উচ্ছ্বাসের অতিরেক—দুটি কাব্যেই প্রায় সমান মাত্রায় আছে। তবুও স্রেফ মহিলা বলে ভুবনমোহিনীর প্রতি রবীন্দ্রনাথ যেন অতিরিক্ত দরদ দেখিয়েছেন। এমনকি প্রবন্ধে সে-কথা স্বীকারও করেছেন—"যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি, তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না।"[১৯]

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপে হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' কাব্যের আলোচনা করেছেন। এই কাব্যের বিষয় দাম্পত্য প্রেম। কবিতাগুলিতে প্রেমের বিষণ্নতা হৃদয়ের সরল আকুতি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আবেগ অনুচ্ছ্বসিত, রচনারীতিও আতিশয্যবর্জিত। তাই এই কাব্য ও কাব্যকারের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন। এই কাব্যের সরল একমাত্রিকতা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছে—"ইহাতে আর্যসঙ্গীত নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।"[২০] হরিশ্চন্দ্র নিছক প্রেমের কবিতা লিখেছেন বলে যাঁরা কবিতার প্রতি

বক্রোক্তি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ হরিশ্চন্দ্রের পক্ষ নিয়ে সেইসব সমালোচকদের উদ্দেশে লিখেছেন—"এমন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে, প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না।"[২১] এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, --"তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট হইয়াছে।... তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে।"[২২]

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সমালোচনাটি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী'তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটির কথা ছেড়ে দিলে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন গদ্যরচনা। এদিক থেকে রচনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তাছাড়াও এই সমালোচনাতে রবীন্দ্রনাথ কবির হৃদয়ের অবারিত উৎসার ও তার আত্মপ্রকাশের একনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অনুকরণ নয়, অপরিপক্ক হলেও স্বাধীন চিন্তার স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং ব্যক্তির আত্মতার সরল ও নিঃসংকোচ প্রকাশকেই গীতিকবিতার প্রধান গুণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্যাদর্শ উত্তরকালেও অটুট ছিল দেখতে পাওয়া যাবে। সব মিলিয়ে কিশোর বয়সের এই সমালোচনায় কিছু পক্ষপাত, কিছু ত্রুটি থাকলেও সাহিত্য বিশ্লেষণে সেই বয়সের নিরিখে তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)কে রবীন্দ্রনাথ 'উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মণীষী' বলেছেন। উনিশ শতকের অপরাপর মণীষী যেমন মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—এঁদের কথাও রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন, এঁদের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন । কিন্তু পরিমাপ করলে দেখা যাবে রামমোহন বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধ, প্রসঙ্গ ও মন্তব্যের পরিমাণ অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চারিত্রপূজা'র দুটি বড়ো মাপের প্রবন্ধে, 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' শীর্ষক পুস্তিকার দুটি প্রবন্ধে ও সেইসঙ্গে চিঠিপত্র, ডায়েরি ও আত্মকথায় নানা সময়ে নানা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে রামমোহনের ভূমিকা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কিত তাঁর যাবতীয় লেখায়, বক্তৃতায় পুনঃপুনঃ তাঁকে 'মহাপুরুষ' ও

'ভারতপথিক' বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কেন তিনি 'মহাপুরুষ' তথা 'ভারতপথিক' তা জানতে গেলে আমাদের তাঁর সময়কে ও তাঁর কার্যধারাকে পাশাপাশি রেখে বিচার করতে হবে।

রামমোহন এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন এদেশের হিন্দু সমাজ স্মৃতিসংহিতা বাহিত আচার অনুশাসনের দ্বারা ভারাক্রান্ত। স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনকে সামনে রেখে জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বর্ণ ইত্যাদি নানা মাপকাঠিতে মানুষে মানুষে ভেদকে বড়ো করে তোলা হয়েছে। পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ তখন অজস্র উপধর্ম এবং সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সমাজ-কাঠামোর মধ্যে রামমোহন আবির্ভূত হলেন বিদ্রোহ নিয়ে। বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত পৌত্তলিক হিন্দুসমাজে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ও 'নিরুপাধি' ব্রহ্মবাদ প্রচার করলেন। সেইসঙ্গে স্মৃতি-সংহিতাবাহিত আচার-বিচার মানলেন না। ফলে হিন্দুসমাজের কাছে তাঁকে অপাংক্তেয় হতে হল। ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা যে রামমোহনকে হিন্দু সমাজ থেকে বহিষ্কার করেছিলেন, তার অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমত রামমোহন হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থগুলোকে অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সুলভ মুদ্রণের মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দেশি ভাষায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ এইসব শাস্ত্রগ্রন্থের মর্মকথা বুঝতে পারল। এতে করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবসায়িক ও সামাজিক স্বার্থে ঘা পড়ল, দ্বিতীয়ত তিনি পৌরাণিকতার পরিবর্তে বেদান্ত তথা উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করায় এবং পুরাণকে অপ্রামাণিক বলে গণ্য করায় ব্রাহ্মণ্যসমাজের রোষ দৃষ্টিতে পড়েন। সর্বোপরি তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ও আইন পাশের অনুকূলে সহায়তা করে সাধারণ বাঙালিসমাজের কাছে ধর্মবিশ্বাসহীন অহিন্দু অপবাদ কুড়িয়েছিলেন। সেকালে তাঁর নামে বিদ্রুপাত্মক সঙ বেরিয়েছিল; তাঁর চরিত্র হনন করে গান বাঁধা হয়েছিল—

"সুরাই মেলের কুল

বেটার বাড়ি খানাকুল

বেটা সর্ব্বনাশের মূল

ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল

ও সে জাতের দফা, করলে রফা

মজালে তিন কুল।”[২৩]

সেকালে রামমোহন সম্পর্কে এই তো ছিল পাবলিকের মনোভাব। এই বিরোধ-বিতর্ক, এই অসম্মান-চরিত্রহনন—সবকিছুকে উপেক্ষা করে আপন সংকল্পে সুদৃঢ় থেকে রামমোহন তাঁর কাজ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে নিয়ে লেখা তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায় বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের কথা বলেছেন। যেমন, ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসবে পঠিত ‘রাজা রামমোহন রায়’ শীর্ষক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শুরুই করেছেন এই কথা দিয়ে—

> মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনও সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন, তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই।[২৪]

বাঙালির মনোজীবনে সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিকতার বীজ রামমোহনই বপন করেন। তাই রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার অগ্রপথিক হিসেবে রামমোহনকেই নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।[২৫]

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন ‘ভারতপথিক’ রূপে। এই ‘ভারতপথিক’ কথাটি রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন কবীরের দোঁহা থেকে। রামমোহনকে রবীন্দ্রনাথ কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রমুখ মণীষীদের উত্তরসূরী বলে মনে করেন। কারণ ভারতবর্ষের সর্বকালের সাধনা যে ‘বহুর মধ্যে এক’কে অনুভব করা, সেই নিবিড় অখণ্ড ঐক্যকে ভারতবাসীর ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রামমোহন। বহুকালাগত সংস্কারের অর্থহীন নিষ্পেষণে ভারতবর্ষের প্রাণসত্তা যখন লুপ্ত হতে বসেছিল ; অদ্বৈতবাদকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠে দেবতাকে বিভক্ত করে বহুবিধ দেবদেবীর পূজার্চনা চলছিল ; ভারতীয় হিন্দুসমাজ না বুঝে বা উদাসীনভাবে যে-সমস্ত অর্থহীন, হানিকর প্রথা পালন করে আসছিল, রামমোহন যুক্তির দ্বারা তার ত্রুটি দেখিয়ে দেন এবং ভারতীয় আর্যধর্মের মূল

প্রকৃতি যে বেদান্ত বর্ণিত ব্রহ্মবাদ তথা অদ্বৈতানুভূতি—তাকেই জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চান। তিনি একাধিকবার বলেছেন যে কোনও নতুন ধর্মমত বা সাম্প্রদায়িক দল গড়তে তিনি আসেননি বরং হিন্দুর পুরাতন ধর্ম ও আদর্শ, যা নিত্য ও সনাতন অথচ যা আমাদের অবহেলার ফলে হতবল, তাকে তিনি মালিন্য থেকে উদ্ধার করে এক নিবিড় অখণ্ডতায় দেশবাসীর মনোলোকে গ্রথিত করে দেবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা। এদিক থেকে কবীর, রজ্জব প্রমুখ সন্ত-সাধকদের মতোই ভারতের ঐক্যবোধের সাধনায় রামমোহনের গভীর ভূমিকা রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের ভারতপথিক সন্ত-সাধকদের সঙ্গে রামমোহনকে একাসনে বসিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিককালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে।[২৬]

চিন্তার জড়ত্ব ও সংস্কারের দাসত্ব থেকে স্বজাতিকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন রামমোহন। এ প্রসঙ্গে রামমোহনের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> তিনি(রামমোহন) জানতেন সকল প্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায়নি তার স্বরাজ; কেননা সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্মকে, কর্মকে, তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে, সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়।[২৭]

রামমোহন যথার্থ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই ‘জ্ঞানালোকিত আত্মা’ যিনি যুক্তির সাহায্যে বাঙালিকে মধ্যযুগীয় নিদ্রাতন্দ্রা থেকে জাগিয়ে আধুনিক কর্মমুখর রাজপথে নামিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রাচ্য বিশ্বের প্রথম জাগ্রত মানুষ। পাশ্চাত্য নবজাগরণের মূলে যে বাস্তববোধ, বৈজ্ঞানিকতা, যৌক্তিকতা, মানুশের প্রতি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ ক্রিয়াশীল ছিল; সেই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই রামমোহনের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল। তাই রামমোহনই ‘আধুনিক

ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত' এবং পাশ্চাত্য অর্থে তিনিই এদেশের প্রথম 'জাগ্রত মানুষ'। আমাদের দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকার মূল্যায়ন করে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ লিখেছেন,--

> নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমানকালে অন্তত বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতে ছিল সমান অধিকার। শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেই সঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ আমরা তা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি না।[২৮]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির প্রয়োজন হল কারণ ইতিহাসকে অবলম্বন করে সামগ্রিকভাবে রামমোহনের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, এই উদ্ধৃতিতে তা নিরূপিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সর্বোপরি সাহিত্যিক। তাই বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত যুক্তিশীল বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে রামমোহন রায়ের অবদানকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। বাংলা গদ্যের গঠন ও লালনে রামমোহনের ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন,--"নব্য বঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমি পত্তন করিয়াছেন।"[২৯] ওই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন ; সরস্বতীর খাস-দরবার হচ্ছে ছন্দ, তা অনেক প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে চলে আসছে কিন্তু আম-দরবার হচ্ছে গদ্য, যাতে শুধু কবিরা ও রসগ্রাহীরা নয়, সকলেই আত্মপ্রকাশ করতে

পারে। তাই তাঁর মন্তব্য, "রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম-দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।"[৩০]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে কিছুটা আতিশয্য যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, রামমোহনের অনেক আগেই ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত, মুনশি ও মিশনারিরা বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। বাক্যের অন্বয় ও যতিচিহ্নের ব্যবহারও তাঁরা অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন। তুলনায় রামমোহনের গদ্য তর্ক ও যুক্তি-আশ্রয়ী হওয়ায় তা অনেকক্ষেত্রেই নীরস ও লালিত্যহীন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ রায়, চণ্ডীচরণ মুনসী, তারিণীচরণ মিত্র প্রমুখ যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে অধ্যাপনা সূত্রে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের গদ্যগ্রন্থই রামমোহনের বাংলা রচনা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই প্রকাশ পায়। এঁদের লেখা পুস্তক-পুস্তিকার বেশ কয়েকটির ভাষা রামমোহনের ভাষার চেয়ে সরল ও সহজবোধ্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সাহিত্যগুণসম্পন্ন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ভাষা। তাঁকে বাদ দিলেও গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁরা মসীযুদ্ধে রামমোহনের বিপক্ষতা করতেন তারা কেউই প্রতিভায় রামমোহনের সমকক্ষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের লেখা রামমোহনের চেয়ে অনেক বেশি মনোরম ও স্বাভাবিক। আসলে কর্মযোগী ও সংস্কারক রামমোহন এদেশের ভার্নাকুলারকে নিজের কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ভাষাকে ব্যবহার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, ভাষার সৌন্দর্যবিধানে তিনি বড়ো একটা মন দিতে পারেননি। তাই পুরাতন ন্যায়শাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী প্রবর্তক-নিবর্তকের রীতি পদ্ধতি ছেড়ে তিনি খুব একটা বেরোতে পারেননি। তাঁর প্রতিভা মূলত তার্কিক ও নৈয়ায়িকের। তবে তিনি বহুভাষাবিদ ও পণ্ডিত। ভাষার শিল্পরীতি নিয়ে না ভাবলেও ভাষার অন্বয় নিয়ে যথেষ্ট ভেবেছেন। পাঠক কীভাবে পড়লে গদ্যের এবং বাক্যের অর্থ বুঝতে পারবে, সে বিষয়ে তিনি পাঠককে নির্দেশ দিয়েছেন—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিতে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"[৩১] ভাষা শিক্ষায় রামমোহনের বিশেষ দক্ষতা ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক ভাষা তিনি রীতিমতো আয়ত্ত করেছিলেন, যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন Poliglot. এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদপুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীকভাষা শিখিয়া খ্রীস্টানধর্মের মূল আকারের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন"[৩২]। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট ধর্মের একাধিক মূল ভাষা শিখতে অমিত প্রতিভা ও মানসিক বল প্রয়োজন। রামমোহনের সেই প্রতিভা ছিল। খ্রিস্টান পাদ্রিদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে অল্প সময়ের মধ্যে হিব্রুভাষা আয়ত্ত করে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করে দিয়েছিলেন তিনি, এটাই তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর।

অবশ্য রামমোহন বাংলা গদ্যকে তর্ক ও যুক্তিবিচারের আয়ুধ হিসেবে ব্যবহার করে বাংলা গদ্যের আত্মপ্রকাশের শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষত রামমোহন বেদ-বেদান্ত বাংলায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও প্রচার করে বহুকালের পাষাণ-সংস্কার ভেঙেছিলেন। এবং গদ্যে সাধারণ মানুষ বিশেষত নারীজাতির সুখ-দুঃখের কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন। এই জন্য রামমোহনের গদ্য-সাহিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। রামমোহন যে বাংলা গদ্যের শক্তি ও প্রয়োগকৌশলকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল ; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনও কোনও পণ্ডিত উপনিষদকে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন জাল করা শাস্ত্র।[৩৩]

সুতরাং রামমোহন সেই সময়ের অপরিণত গদ্যে, দুরূহ অধ্যবসায়ের সাহায্যে যে-সমস্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা লিখেছিলেন, তার রচনা পদ্ধতি সংস্কৃত বিতর্কের রীতিকে অনুসরণ করে প্রস্তুত। রামমোহনের এই গদ্য বিদ্যাসাগরের হাতে শিল্পিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেই মূর্তিতে লাবণ্য সঞ্চার করেন। বাংলা গদ্য বিকাশের এই ক্রম-পরম্পরাকে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রাণিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জমান দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার পলি ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।[৩৪]

সুতরাং বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহনের যে অনেকখানি অবদান ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে যথার্থই ধরা পড়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বাংলা গদ্যের ভূমিপত্তনকারী বা জনকরূপে যতখানি দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিকভাবে তা ঠিক নয়। আসলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠীর লেখা অনেক গদ্যগ্রন্থ এবং রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য গদ্যরচনা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকায় এবং সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথেরও অগোচর থাকায় তিনি রামমোহনকেই বাংলা গদ্যের 'ভিত্তিস্থাপনকারী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত অধুনাতন গবেষণায় অপ্রমাণ হয়েছে।[৩৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে (১৮২০-১৮৯১) মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতীকরূপে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। রামমোহনকে নব্যভারতের মন্ত্রদাতা বলে গ্রহণ করেও রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিশাল, উদার ও মানবহিতবাদী চরিত্রের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন, তা 'চারিত্রপূজা'য় তাঁর বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত প্রবন্ধ দুটি পড়লেই বোঝা যায়। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থভুক্ত 'বিদ্যাসাগরচরিত' নামক প্রথম দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিভা'র সঙ্গে 'চরিত্র' এর তফাৎ করেছেন এবং শুধুমাত্র প্রতিভাশালী হিসেবে নয়, অনুপম চরিত্রধর্মই বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলে মতপ্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়—"প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির।"[৩৬] এখানে রবীন্দ্রনাথের বলবার কথা এই বিদ্যাসাগরের সমকালে ও অন্যান্যকালে বঙ্গদেশে প্রতিভাশালীর অভাব নেই কিন্তু চারিত্রিক মহত্ত্বগুণে বিদ্যাসাগরের সমকক্ষ আর কেউ নেই।

যদিও আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দানকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন, তার বিশ্লেষণ। এখানে আমরা সেই প্রসঙ্গটুকুই বিস্তারে বলব। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগরের অবদান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বল্প কথাই বলেছেন। কিন্তু যা বলেছেন তা যেমন যথোপযুক্ত তেমনই মৌলিক। তাঁর কথায়—

> বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।[৩৭]

এই 'কলানৈপুণ্য' বলতে কী বোঝাচ্ছে, তা আরেকটু ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাজের ভাষায় দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটে কিন্তু রসের ভাষা না হলে অন্তরের তৃষ্ণা মেটে না। গদ্যের যা প্রকৃত রস অর্থাৎ সৌন্দর্য ও সৌষম্য জনিত আনন্দবোধ বাংলা গদ্যে প্রথম অবতারণা করেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আগেও বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল, কিন্তু সে ভাষায় তখনও ধ্বনিঝঙ্কার তৈরি হয়নি। পরিমিত যতিবন্ধনও তখন ছিল না। বিদ্যাসাগর গদ্যের সেই বিশৃঙ্খল বাহুল্যকে পরিমাণ-সামঞ্জস্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। শুধুমাত্র ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি নয়, বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য যথার্থ রসের ভাষা হয়ে উঠেছিল। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে 'বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী' বলেছেন।

বাংলা গদ্যকে বিদ্যাসাগর শুধু অর্থবোধের সীমানায় আটকে রাখলেন না, এর মধ্যে প্রবেশ করালেন ভাবপ্রকাশের সৌন্দর্যবোধকে। বিশৃঙ্খলতাকে সংযত করলেন। বাক্য ছিল দূরান্বয়ী, তাকে পরিমিত-অন্বয়ী করলেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে বাক্যে ক্রিয়াপদ বসানোর কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। ক্রিয়াই বাক্যের বন্ধন। কিন্তু যেখানে সেখানে ক্রিয়া বসানো হত। রামমোহন তাই তাঁর প্রণীত 'বেদান্তসূত্র'এর ভূমিকায় পাঠককে নির্দেশ দিয়েছেন কীভাবে বাক্য পড়তে হবে—"যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।"[৩৮] এই অবস্থায় বাংলা গদ্যকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে যতখানি প্রতিভার দরকার, বিদ্যাসাগর সেই প্রতিভায় গুণী। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষায় উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাহাকেই দিতে হয়।"[৩৯] উপমার মধ্যে দিয়ে এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের উৎকর্ষসাধনে বিদ্যাসাগরের দানকে যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন।

ভাষার সৌন্দর্যের আরও একটি বিষয় ধ্বনিসামঞ্জস্য ও যতিপাত। কবিতার মতো গদ্যেরও একটা সুর, তাল, লয় ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিরতি রয়েছে। কবিতায় যেমন এসব খুব সুনির্দিষ্ট, গদ্যে ততখানি নয়। কবিতায় যেমন পংক্তিগুলি সমমাত্রিক বিরতিচিহ্নে বিভক্ত, গদ্যে সেই বিরতি সমমাপের নয়। কোথাও ছোটো, কোথাও বড়ো। গদ্যের ক্ষেত্রে বিরতি মূলত অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবুও তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ধ্বনির তরঙ্গ বহমান। গদ্যের মধ্যে এই ধ্বনিতরঙ্গের দোলা প্রথম সার্থকভাবে লক্ষ করেন বিদ্যাসাগর এবং তার ভিত্তিতেই বাংলা গদ্যকে অন্বয় ও যতির শৃঙ্খলে বাঁধেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিভার এই দিকটিকে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটি ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য ও সরল শব্দগুলির নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।”[৪০]

তবে এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, গদ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য ও যতিপাত বিদ্যাসাগরই প্রথম সার্থকভাবে করলেন তা তো নয়। বিদ্যাসাগরের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কোনও কোনও রচনায় এই ধ্বনিসৌন্দর্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যেমন গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের ‘স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক’, কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ‘পাষণ্ডপীড়ন’, ভবানীচরণের ‘নববাবু বিলাস’, ‘দূতীবিলাস’ প্রভৃতি রচনাতেও ধ্বনিঝঙ্কার, শিল্পগুণ, যথার্থ যতিপ্রয়োগ কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো অতখানি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য তাঁরা তৈরি করতে পারেননি। এঁদের লেখা বাংলা গদ্যে পণ্ডিতি ছাঁদের বাগবাহুল্য ছিল প্রচুর। সমাস-সন্ধির বাড়াবাড়ি, প্রচলিত নয় এমন আভিধানিক শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার সর্বোপরি ক্রিয়ার অনুপযুক্ত অন্বয় এই সময়ের গদ্যভাষার প্রধান ত্রুটি। বিদ্যাসাগর সেইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত করে বাংলা গদ্যকে যে শুধু নিয়মানুবর্তী করলেন তাই-ই নয়, একে যথার্থ রসের ভাষা হিসেবে গড়ে তুললেন। বিদ্যাসাগরের এই দানকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম সার্থকভাবে চিহ্নিত করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা ‘চারিত্রপূজার’ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় যে আলোচনা করেছেন, পরবর্তীকালের গবেষকেরাও কেউই তার অতিরিক্ত মৌলিক কথা বলতে পারেননি।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে মধুসূদন: অস্বীকার ও পুনরাবিষ্কার

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা 'মেঘনাদবধ কাব্য'টি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে তিনি এই কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করলেও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ সে-জন্য লজ্জিত হয়েছেন এবং এই কাব্যের যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছেন। ফলে এই কাব্যটির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ নিজের অবস্থান বদল করেছেন। অস্বীকার থেকে পুনরাবিষ্কারের দিকে এগিয়েছেন।

মধুসূদন দত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় বাল্যশিক্ষায় নীরসভাবে পড়ানো বই 'মেঘনাদবধ' কাব্যের রচয়িতা হিসেবে। বাল্যে নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল কাব্য পড়ানোর ছলে ব্যাকরণ শেখাতেন। তাতে এই কাব্য রবীন্দ্রনাথের কাছে আরও নীরস ঠেকত। এই নীরসতা তাঁর মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল যে মধ্যবয়সে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, যে জিনিসটা পাতে পড়লে উপাদেয়, সেটাই মাথায় পড়লে গুরুতর হয়ে উঠতে পারে। ভাষা শেখানোর জন্য কাব্য পড়ালে কাব্যেরও জাত যায়, ভাষাশিক্ষাও বাধা পায়। এ বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন—"কাব্য জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসেবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।"[৪১] মনে হয়, এই সব কারণেই বাল্যকালে কবি মধুসূদন ও মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে বিরূপতা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। কম বয়সে মধুসূদন সমালোচনায় সেই বিরূপতা পূর্ণ মাত্রায় লক্ষ করা যায়।

'ভারতী' প্রথম সংখ্যা (১২৮৪ এর শ্রাবণ) থেকে পরপর চার সংখ্যা (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক) এবং তার পর আরও দুটি সংখ্যা (পৌষ ও ফাল্গুন) মোট ছয় সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে মধুসূদনের চরিত্র-সৃষ্টি ও রচনারীতির তীব্র বিরূপ সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন প্রথম কিস্তিতে রাবণ চরিত্রের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মধুসূদন পুত্রশোকাতুর ও বেদনাবিবশ রাবণের যে চরিত্র এঁকেছেন, সে চরিত্র আদৌ বীরচরিত্র হয়নি—বাল্মীকির রাবণের একটি দুর্বলতম হাস্যকর অনুকৃতি

হয়েছে। রাবণের বিলাপ ("এহেন সভায় বসে রক্ষঃ কুলপতি, বাক্যহীন পুত্রশোকে!/ঝর ঝর ঝরে, অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসন") অংশটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে ষোল বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে নায়ক নন, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণা কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত।[৪২]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিদেশি বীর সাহিত্য, স্পার্টার বীরমাতা ও রাজস্থানের বীরপুরুষদের সঙ্গে রাবণের তুলনা টেনে দেখিয়েছেন, রাবণের চরিত্রের মহাকাব্যের নায়কের কোনও গুণই রক্ষিত হয়নি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ রাবণের সঙ্গে 'বৃত্রসংহার'এর বৃত্রের তুলনা দিয়ে বলেছেন—

> রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহানভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।[৪৩]

দেখা যাচ্ছে, কিশোর সমালোচক এখানে চরিত্রবিচারে মারাত্মক ত্রুটি ঘটিয়েছেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রের সঙ্গে মধুসূদনের রাবণ কোনওভাবেই তুলনীয় নন। হেমচন্দ্রের বৃত্র পৌরাণিক যুগের ভাবাবেশ থেকেই তৈরি হয়েছে কিন্তু মধুসূদনের রাবণ ক্লাসিক মহাকাব্য থেকে তৈরি হলেও সে এ-যুগের হৃদস্পন্দনে স্পন্দিত। তার চরিত্র নির্মিত হয়েছে গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কদের অনুসরণে অন্ধ নিয়তির অনিবার্য পরিণাম দর্শাতে। 'রক্ষঃকুলপতি' হলেও সে স্থূল রাক্ষস নয়। তার মধ্যে দিয়ে মধুসূদন দেখিয়েছেন আবেগ-উৎকণ্ঠায় দোলায়িত, গৃহসুখবিজড়িত, স্নেহ-ভালোবাসাবুভুক্ষু এ যুগের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের অসহায়তা ও পরাজয়ের নিষ্ফল হাহাকার। মধুসূদনের রাবণ নামেই পৌরাণিক চরিত্র কিন্তু হৃদয়ে এবং আচরণে সে রোমান্টিক ও আধুনিক। স্রষ্টা

মধুসূদনের অনন্ত আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা বাণীরূপ পেয়েছে তাঁর কাব্যের নায়কের মধ্যে দিয়ে। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য তাই আর্য মহাকাব্যের আদর্শে বিচার্য নয়—এটি পরবর্তী কালের সারস্বত মহাকাব্য যেখানে পৌরাণিক নায়ক আধুনিক যুগের জীবনরসে স্পন্দিত ও মানবীয় উত্তাপে তাপিত। এই সত্যটি সেদিন কিশোর রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। পারেননি বলেই এক মহৎ চরিত্রের ওপর অন্ধভাবে নখরাঘাত করেছেন।

এর পরের কিস্তিগুলিতেও তিনি মেঘনাদবধের চরিত্র ও ভাষা ভেঙে ভেঙে বিচার করেছেন। ইন্দ্র, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রমুখ চরিত্রগুলোও তাঁর বিধ্বংসী আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। চতুর্থ কিস্তির আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ রাম চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাতে অধৈর্য, ভীরুতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও নারীসুলভ দুর্বলতাই লক্ষ করেছেন। রামের বিলাপের সঙ্গে ইলিয়াডের অ্যাকিলিসের তুলনা করেছেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ, রামকে ভীরু, সুযোগসন্ধানী ও নারীসুলভ করে অঙ্কন করে মধুসূদন বহুকালাশ্রিত আদর্শের হানি ঘটিয়েছেন। রামচন্দ্রের বিকৃতি ঘটিয়ে আসলে তিনি আলংকারিক পরিভাষায় যাকে 'সিদ্ধরস' বলে তাকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই বিকৃতির কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।"[৪৪]

অবশ্য শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা নয়, সে-যুগে মধুসূদনের এই কাব্যটিকে খুব অল্পজনই যথার্থ অর্থে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। রামচরিত্রে সিদ্ধরসের ব্যতিক্রম ঘটেছে, হিন্দুয়ানি ও আর্যমহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—রাজনারায়ণ বসু থেকে শুরু করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছোটো-বড়ো সকল সমালোচকই সেদিন এই অভিযোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নতুনদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন 'ভারতী'র পাতায় লেখেন—

> আপনার ছাগকে কেহ মুণ্ডের দিক দিয়াই কাটুক কিম্বা লেজের দিক দিয়াই কাটুক, সে বিষয়ে কাহারও আপত্তি না হইলে না হইতে পারে। কিন্তু যাহা কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্পত্তি—তাহা লইয়া এরূপ লণ্ডভণ্ড করিলে চলিবে কেন?...বলিতে কি মেঘনাদবধ কাব্যে সাজসরঞ্জাম ও কৌশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল কথা, চরিত্রের মহত্ত্ববিকাশ—যাহা মহাকাব্যের প্রাণ, তাহা মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?[৪৫]

কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই সেদিনের সমালোচনার এই পারিপার্শ্বিকতা থেকে বেরোতে পারেননি।

শুধু চরিত্রই নয়, মধুসূদনের ব্যবহৃত উপমাসমূহের অসারতাও সাহিত্যদর্পণের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। কিন্তু দু একটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যুক্তির দৌর্বল্য নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। যেমন—মেঘনাদবধে মধুসূদন লিখেছেন, "বরজে সজারু পশি বারুইর যথা ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ মজাইছে লঙ্কা মোর...' এই পংক্তিটি উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে ; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষপরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপিকপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেইখানে এটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।"[৪৬] আমরা 'সাহিত্যদর্পণ' খুঁজে দেখেছি, কিন্তু কোথাও এই প্রসঙ্গ পাইনি।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মূল অভিযোগকে একত্রিত করে প্রশ্ন তুলেছেন—

> এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু কাপুরুষরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কন্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়?[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ প্রতি পদক্ষেপেই এই কাব্যকে প্রাচীন মহাকাব্যের মানদণ্ডে বিচার করতে গেছেন। মধুসূদন বাল্মীকির কাব্যের নিছক অনুসরণ করলেই কি তিনি খুশি হতেন? মহাকাব্যের চরিত্রগুলোকে নামমাত্র গ্রহণ করে মধুসূদন যে তাঁর সময়ের আখ্যান রচনা করতে চেয়েছেন, আধুনিক যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিপন্নতাকে বাণীরূপ দিয়েছেন, কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই সত্য বোঝেননি।

এই প্রবন্ধ রচনার ঠিক পাঁচ বছর পরে, ১২৮৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামেই আর একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখেন। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'সমালোচনা' শীর্ষক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতেও মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে তাঁর প্রতিকূল মনোভাবই বজায় রয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে এই কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি দ্বিতীয় প্রবন্ধে আরও সংহত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দুটি মূল ত্রুটি

চিহ্নিত করেছেন যথা—মধুসূদন প্রাচীন মহাকাব্যের চরিত্রায়ণকে বিকৃত করে এর মহত্ত্বকে নাশ করেছেন। “মহৎ চরিত্র যদি নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন?”[৪৮] মধুসূদনের প্রতি তাঁর প্রশ্ন যে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করতে পারলেন! দেবতাদের কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদের দেবতাদের থেকে উচ্চ করলেন! এটা সেই পুরনো অভিযোগ! এর উত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে বলার, এই কাব্য সম্পূর্ণভাবেই মধুসূদনের নতুন সৃষ্টি। তিনি চরিত্রকে বিকৃত করেননি বরং তাঁর যুগের প্রেক্ষাপটে চরিত্রগুলির মানবায়ন ঘটিয়েছেন, তা প্রাচীন মহাকাব্যের আদর্শ না মানলেও সমসময়ের হৃদস্পন্দনকে বুকে ধারণ করতে পেরেছে। এই বিনির্মাণই এই মহাকাব্যের শক্তি।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অভিযোগ, মাইকেলের কাব্যের ভাব ও ভাষা কৃত্রিম ও অপরের নকল। তাঁর কথায় মাইকেল হোমারের আদর্শে তাঁর কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা জুড়েছেন। মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক বর্ণনাই রীতি, তাই মধুসূদন তাঁর কাব্যে জোর-জবরদস্তি স্বর্গ-নরক বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত মহাকাব্যগুলিতে যেহেতু উপমার ছড়াছড়ি, তাই মধুসূদন “পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন।”[৪৯] এ প্রসঙ্গে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের এই অভিযোগ সত্য নয়। সাহিত্যিক মহাকাব্যের কিছু রীতি ও নিয়ম মেঘনাদবধে আছে সত্য কিন্তু মহাকাব্য রচনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শাস্ত্রীয় বিধান মধুসূদন বহু ক্ষেত্রেই মানেননি। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের ‘Dicta’ হুবহু মানতে তিনি যেমন অস্বীকার করেছেন, তেমনই অ্যারিস্টটল প্রণীত ‘Poetics’ গ্রন্থে মহাকাব্যের সব বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্যে পাওয়া যাবে না। তাই মধুসূদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এপিককারদের নকল করেছেন, রবীন্দ্রনাথের এই কথা ভুল তো বটেই বরং এর উল্টোটাই সত্যি। আর দ্বিতীয়ত, মাইকেলের উপমা ‘দীনদরিদ্র’, তা ‘পীড়িত কল্পনার সৃষ্টি’ এবং ‘জোড়াতাড়া লাগানো’—এই উক্তি মধুসূদনের অতি নিন্দুকও স্বীকার করবেন কিনা সন্দেহ। কিছু জায়গায় কৃত্রিমতা থাকলেও মাইকেলের উপমা যে মোটের ওপর চিত্তচমৎকারী তা অধিকাংশ সাহিত্যরসিকই স্বীকার করবেন।

তৃতীয়ত, ভাষা প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কথায়—“ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন।”[৫০] একথা ঠিক যে এই কাব্যের ভাষা

মানুষের স্বাভাবিক কথনভাষার থেকে বহুদূরবর্তী, তা আভিধানিক এবং অলংকৃত। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্য, যা কবি একক প্রতিভায় সৃষ্টি করে থাকেন, যাকে Epic of Art বলা হয় বিশ্বজুড়েই সেইসব কাব্যের ভাষা আভিধানিক ও দুরূহ। 'প্যারাডাইস লস্ট' কিংবা 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা কি গীতিকবিতার মতো সরল হওয়া সম্ভব? বাগবৈদগ্ধ্য ও আলংকারিকতা সারস্বত মহাকাব্যের দোষ নয়, তা তার গুণই। যে ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম বলে নিন্দা করেছেন, সেই অনন্যপূর্ব ভাষার জন্যই বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

তরুণ বয়সের এই ভ্রান্ত সমালোচনার জন্য পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট লজ্জিত হয়েছেন। সাহিত্যবোধ পরিপক্ক হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করেছেন—

> আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।[৫১]

পরিণত বয়সে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে তিনি তাঁর আগের মূল্যায়ন থেকে সরে এসে মেঘনাদবধকাব্যের যথার্থ রসবিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের আগের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের যে সমালোচনা করেন তার প্রধান ক্রটি হল 'মেঘনাদবধ' যে আর্য মহাকাব্যের আদর্শে বিচার্য নয়—এটি সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসেবে রেনেশাঁসের আলোয় মানবীয় সংবেদনার রসে বিচার্য, তা সেদিন রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেননি। কিন্তু পরিণত বয়সে 'সাহিত্যসৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মধুসূদনকে বিচার করেছেন এবং যা বলেছেন তা মধুসূদনের কীর্তির যথার্থ পরিচয়। মেঘনাদবধের আত্মপ্রকাশের মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। এই বিদ্রোহ এই কাব্যের ভাষা ও ভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। মধুসূদন শুধু পয়ারের বেড়ি ভাঙেননি, "রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহারই শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।"[৫২] এর কারণ ধর্মভীরুতার স্থলে মধুসূদন ধর্মদ্রোহিতাকেই বরমাল্য দিয়েছেন। উনিশ শতকে

পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাতে শিক্ষিত বাঙালির মনের একটা বদল এসেছিল। আত্মনিগ্রহের দীনতা নয়, বরং আত্মপ্রতিষ্ঠার অভীপ্সাই সে-যুগে বড়ো হয়ে উঠেছিল। মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের মতোই জীবনের অনন্ত আশা এবং পরিণামে অপার ব্যর্থতাই এই কাব্যে বানীরূপ পেয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের মাঝেও যে মানবসত্তা অটল ও অবিচল, তারই জয়গান গাওয়া এই কাব্যের মূল কথা। সমালোচক হিসেবে এই কাব্যের মূল স্পিরিটটিকে এতদিনে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বুঝতে পেরেছেন। লিখেছেন—

> যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।[৫৩]

মধুসূদনের প্রতিভার মৌলিকত্ব এবং কাব্য হিসেবে মেঘনাদবধের স্বাতন্ত্র্য রবীন্দ্রনাথ এখানে যথার্থই নির্ধারণ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ : দ্বন্দ্বমধুর রসায়ন

বিরোধ-বিতর্ক ও খানিক মতান্তর সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রতি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তিনি তাঁর সাহিত্যাগ্রজ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে দু'একটি অপ্রীতিকর মতভেদ সত্ত্বেও অনুজ রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ বঙ্কিমকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানকে সোচ্চারে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় মহারাজা শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জ'এ অনুষ্ঠিত পুনর্মিলন উৎসবে। প্রথম দর্শনেই বঙ্কিমের স্বল্পবাক প্রবল ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ, সুরুচি ও সংযম তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। বঙ্কিমও রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিম তরুণ রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরিয়ে তাঁকে বাংলা

সাহিত্যের অঙ্গনে অভিষিক্ত করেন। ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ পড়বার পরেও রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।[৫৪]

চিঠি-পত্রে, আলাপ-আলোচনায়, প্রবন্ধ-নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অজস্রবার বঙ্কিমের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে তাঁর সেরা প্রবন্ধটি ১৮৯৪ সালে সদ্য পরলোকগত বঙ্কিমকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে চৈতন্য লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত একটি স্মরণসভার অভিভাষণ। প্রবন্ধটি ‘সাধনা’য় (বৈশাখ, ১৩০১) প্রকাশিত হয়েছিল ও পরে ‘আধুনিক সাহিত্য’ গ্রন্থভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেন, বঙ্কিম কেমনভাবে বঙ্গভাষার সঙ্গে নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয়সাধন করেছিলেন। তিনি বঙ্কিমকে ‘সাহিত্যে কর্মযোগী’ বলেছেন—

> সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল ও আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাহাকে আবশ্যক হইত, সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানে আর্তস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিন্নি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।[৫৫]

বঙ্কিমের পূর্বেও গদ্যে লিখিত বাংলা সাহিত্য ছিল। কিন্তু তাকে সাহিত্য হিসেবে লেখক-পাঠক কেউই শ্রদ্ধা করত না। বঙ্কিম আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা ও হীনমন্যতার হাত থেকে উদ্ধার করেন এবং মাতৃভাষাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

> লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনও দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।... রচনা ও সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্ত্বর, এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[৫৬]

সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার অবদান। রচনা এবং সমালোচনা দু’ক্ষেত্রেই ‘বঙ্গদর্শন’ সে-যুগের পথিকৃৎ। এই পত্রিকার আখ্যাপত্রে নামের তলায় লেখা হত ‘মাসিক পত্র ও সমালোচন’। বঙ্গদর্শন শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে এক নতুন

ভাবস্রোত জাগিয়ে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—“বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।”[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ মূলত বঙ্কিমের ‘রাজসিংহ’ ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’ এই দুটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছেন। তার মধ্যে ‘রাজসিংহ’ ঐতিহাসিক উপন্যাস। অন্তত বঙ্কিম ‘রাজসিংহ’কেই তাঁর লেখা একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৫৮] আমাদের মনে হয় এই প্রবন্ধটিকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের অপর একটি প্রবন্ধ ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’কেও একত্রে নিতে হবে। কারণ ‘রাজসিংহ’এর মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসের রসবিশ্লেষণ কেমন হওয়া উচিত, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তা আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, একজন পাঠক ঐতিহাসিক উপন্যাস থেকে কী পেতে চান? ইতিহাস চান? না উপন্যাস চান? না কি এর বাইরে আর কিছু? ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান সাহেব স্পষ্ট সাবধান করেছেন, যারা ইওরোপের ক্রুসেড যুগ সম্বন্ধে কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, তারা যেন স্কটের আইভ্যান হো পাঠ করা থেকে বিরত থাকেন। আবার স্যার ফ্রান্সিস প্যালগ্রেভের মত উদ্ধৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জবানিতে প্যালগ্রেভের মত এইরকম—

> ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন একদিকে ইতিহাসের শত্রু, তেমনি অন্যদিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাসলেখক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয়; ইহাতে গল্প বেচারার শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল দুই কুলই মাটি।[৫৯]

ঐতিহাসিক উপন্যাস পাঠের বিরুদ্ধে এই চরমপন্থী মতের প্রতিবাদ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনাপঞ্জী নয়, তার প্রাণের রস অর্থাৎ তার আত্মার ইঙ্গিতকে ফুটিয়ে তোলাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল চরিত্র। অর্থাৎ ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে যে রসটুকু আছে, তাকেই ঐতিহাসিক গল্পলেখক তুলে ধরতে চান। রসশাস্ত্রীদের নবরসের বাইরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এর একটি বিশিষ্ট নাম দিয়েছেন—‘ঐতিহাসিক রস’। এই কথাটিকে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

> ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনও খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড

ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষের সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনের স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষ্যমাত্র।[৬০]

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য এতই যুক্তিসংগত, যে এই নিয়ে দ্বিরুক্তি করবার অবকাশ কম। তাঁর মতে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের বিচিত্র লীলা ও রহস্যকে প্রকাশ করে দেখানোই ঐতিহাসিক রসস্রষ্টার প্রধান কর্তব্য। ঐতিহাসিক গল্পে ইতিহাসের বিচ্যুতি থাকতেই পারে, তাতে গল্পের শিল্পমূল্যের কোনও ক্ষতি হয় না। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিম রাজপুত ও মুঘলের সংঘাতকেই উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস এই উপন্যাসে কেবল পটভূমিকাই। ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্ব প্রধান হয়ে মানবচরিত্রকে গ্রাস করেনি। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বড়ো বেশি গতি। সেই গতিবেগের ধাক্কায় কোনও কোনও চরিত্র এত দ্রুত রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছে যে পাঠক যেন তার সমস্ত পরিচয়টা পাওয়ার আগেই সে ইতিহাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে। যেন এই উপন্যাসে প্রবল ইতিহাসের দুর্বার স্রোত কাউকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে দিচ্ছে না, কোনও কিছু হয়ে ওঠবার আগেই ঘটনার বুদ্বুদ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গভীরভাবে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বুঝলেন পাহাড়ের সানুদেশ থেকে যখন ঝরণারা উন্মত্তের মতো নেমে আসে, তখন মনে হয় এই পাগলামির কোনও অর্থ নেই। তারপর ধীরে ধীরে সমতল মাটি পেয়ে সেই ধারা গভীর হয়, প্রশস্ত হয় ; শেষপর্যন্ত সমুদ্রে মহাপরিণাম লাভ করে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও প্রথম দিকে কাহিনি-উপকাহিনি বড়ো চঞ্চল, ঊর্মিমুখর কিন্তু পরিণামে তা ছুঁয়েছে অতলস্পর্শী গভীরতা। এই উপন্যাসের নায়ক কে, এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন—"ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি না, নায়িকা জেবুন্নিসা"[৬১]। বিশেষত জেবুন্নিসার কাহিনিই এই উপন্যাসে মানবীয় রস সৃষ্টি করেছে। ঐশ্বর্যের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন সে আপনার নারীত্বকে স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের মধ্যে খুঁজে পেল, শাহজাদী নয় ; একজন মানবী প্রেমিকা হিসেবে যখন সে মবারকের জন্য চোখের জল ফেলল, সেইটিই এই উপন্যাসের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী অংশ। এই উপন্যাসে বঙ্কিম ইতিহাসের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কটিকে নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। সেইটিই রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে উপাদেয় বলে মনে হয়েছে—

> একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে সর্বত্যাগী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে।...ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয়মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।[৬২]

রাজসিংহ-ঔরঙ্গজেবের সন্ধি হল, রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের মহিষী হলেন। সমস্ত সুপরিণতির মধ্যেও জেবুন্নিসার উচ্ছিন্ন আহত হৃদয়ের ব্যথা এক ফোঁটা অশ্রুর মতো পাঠকের হৃদয়ে জেগে রইল। রবীন্দ্রনাথ কথিত ‘সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা’ যা এই উপন্যাসের রসপরিণামকে ঘনীভূত করেছে, তা জেবুন্নিসারই দান। রবীন্দ্রনাথ নিজে যাকে ‘ইতিহাস-রস’ বলেছেন, তারই আলোয় এই উপন্যাসের রসবিচার করে তিনি দেখিয়েছেন, ইতিহাসের কলকোলাহলের মধ্যে মানবীয় প্রেমের মাধুর্য ও বেদনাই এই উপন্যাসের ভাবসম্পদ হয়ে উঠেছে। আর তাতেই ইতিহাস হিসেবে না হোক, ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে ‘রাজসিংহ’ সার্থক হয়েছে।

‘রাজসিংহ’এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বইটিরও সমালোচনা লিখেছেন। ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক মহাগ্রন্থ। এটি একদিকে যেমন বঙ্কিম-মণীষার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তেমনই এই গ্রন্থ অনেক বিবাদ-বিতর্কেরও উৎপত্তিস্থল। এই গ্রন্থে বঙ্কিম কৃষ্ণকে ‘The Wisest and Greatest of the Hindus’ প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাই পৌরাণিক যুগ থেকে কৃষ্ণচরিত্রের ওপর লিপ্ত যা কিছু বৈশিষ্ট্য যা কৃষ্ণচরিত্রের নৈতিকতা ও বিশুদ্ধির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়, তাকে শাস্ত্র ও ইতিহাসসম্মত প্রমাণের সাহায্যে প্রক্ষিপ্ত, অমূলক ও কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণচরিত্রকে যা কালিমালিপ্ত করে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে তাকে ধুয়ে-মুছে কৃষ্ণকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় আদর্শ হিসেবে দাঁড় করানোই এই গ্রন্থে বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বইয়ের যে সমালোচনা লেখেন (প্রকাশ সাধনা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১) তাতে তিনি কতখানি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর দুটি কারণ। প্রথমত ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থটি যখন বঙ্কিম প্রকাশ করেন তখন তরুণ রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। হিন্দুধর্মের পৌরাণিক যুগ ও কৃষ্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অবতারবাদকে ব্রাহ্মসমাজ গ্রাহ্য করেনি। কেবল ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন বলেই হিন্দু সমাজের

দেবতা কৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিরূপতা ছিল, এমন স্থূল কথা আমরা বলছি না। তিনি সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন কিন্তু এও ঠিক হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কার এবং সে সংক্রান্ত ভাবাবেগকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে—

> উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালে প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারনে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করে নি।[৬৩]

সুতরাং বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায়গত বিরোধ না থাকলেও আদর্শ ও বিশ্বাসের জায়গায় মতভেদ ছিল। দ্বিতীয়ত, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' যখন রচিত হচ্ছে ঠিক তখনই কৃষ্ণোক্তিকে অবলম্বন করে সত্য-মিথ্যার বিচার নিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ জোরালো মসীযুদ্ধ হয়েছিল। যদিও এই ঘটনার দশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা লেখেন, তবুও সেই লেখায় অতীত স্মৃতির তিক্ততা কিছুই নেই, তা নিশ্চিত করে বলা চলে না। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে এই বিতর্কের ইতিবৃত্তটি সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে।

'প্রচার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম্ম' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (শ্রাবণ, ১২৯১)। সেখানে তিনি একজন হিন্দুর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, যিনি সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় হিন্দু, যিনি বিধান নির্দিষ্ট আচার পালন করেন না "কিন্তু কখনও মিথ্যা কথা কহেন না, যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থে মিথ্যা প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কহিয়া থাকেন।..."[৬৪] এই কথাতে মারাত্মক কিছু অন্যায় আছে বলে মনে হয় না কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে বঙ্কিমকে খোঁচা দিয়ে লিখলেন—"কোনও খানেই মিথ্যা সত্য হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"[৬৫] এর প্রত্যুত্তরে বঙ্কিম সেই বছরেই 'প্রচার' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখলেন 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' নামক একটি প্রবন্ধ। সেখানে তিনি বলেন তাঁর উদ্দিষ্ট 'সত্য' কথাটির অর্থ বুঝতে 'রবীন্দ্রবাবু'র ভুল হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি অর্থে Truth ও Falsehood বোঝাতে 'সত্য' বা 'মিথ্যা' কথাটিকে ব্যবহার করেননি। 'সত্য' বলতে সত্যরক্ষা বা কথা রাখাও বোঝায়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সেই অর্থেই কথাটি

ব্যবহার করেছিলেন। বঙ্কিমের যুক্তি না মানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ ফের ‘কৈফিয়ৎ’ নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ‘ভারতী’তে (পৌষ, ১২৯১)। এই বিরোধ-বিতর্কের পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতার পরিচয় ধরা আছে সরলা দেবীর ‘জীবনের ঝরাপাতা’ নামক স্মৃতিলেখটিতে। এই প্রসঙ্গে সরলা দেবী জানাচ্ছেন—

> রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভাগমন। কি excitement, কি উদ্দীপনা আমাদের—সুরেন বিবি সুধীদা বলুদাদারাও আছেন। সভাটি আদি ব্রাহ্ম সমাজের হলে আহূত। উদ্দেশ্য সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ।...সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোন অবস্থাতেই, কোন সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারকৃত ব্যতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন—এই প্রভেদ।...ছোটরা তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) Hero –worshipper হল।... বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনা শক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল, তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করিনি আমরা, সেদিন মাতুল ভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মতদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।[৬৬]

তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেদিন যুবধর্মের ঝোঁকে বঙ্কিমের নামোল্লেখ করে বঙ্কিমকে যে-ভাবে অভিযুক্ত করেছিলেন, তার অনৌচিত্য সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ পরে বুঝেছিলেন। এর পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, বঙ্কিমের প্রবন্ধে কৃষ্ণোক্তির যে সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’তে করেছিলেন, সেটি পরে ‘একটি পুরাতন কথা’ নাম দিয়ে ‘সমালোচনা’ গ্রন্থভুক্ত হয়। কিন্তু সেখানে বঙ্কিমের নামোল্লেখ করে যে দুটো পংক্তি মূল প্রবন্ধে ছিল, তা বাদ যায়। এখন আর কোনও মুদ্রিত গ্রন্থে ওই দুটো পংক্তি দেখা যাবে না। আমরা রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ওই দুটো লাইন দেখতে পেয়েছি।

অবশ্য এই বিবাদ-বিসংবাদের দীর্ঘ দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বইয়ের সমালোচনা লেখেন। পূর্বের কোনও তিক্ততার ছায়া সেখানে না পড়বারই কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ বইয়ের যে-সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ কার্যত করেছেন, তাকে ঠিক অনুকূল বলা চলে না। শুরুতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এ কথা স্বীকার করেছেন যে বঙ্কিমের স্বাধীন বুদ্ধি ও সচেষ্ট চিত্তবৃত্তির ফসল এই গ্রন্থ—

> আমাদের মতে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।[৬৭]

বঙ্কিমের স্বাধীন বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে কিছুটা সমালোচনার সুরেই বলেছেন, বঙ্কিম যে কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে কৃষ্ণ তাঁর নিজ মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুল-মনে সন্ধান করছিলেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বে যাকে তত্ত্বগতভাবে পেয়েছিলেন, ইতিহাসে তাকেই সজীব শরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করবার জন্য তার নিরতিশয় আগ্রহ জেগে উঠেছিল। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে বঙ্কিমের কলমে নির্মিত যে কৃষ্ণ তা বাস্তবিক নয় ; কাল্পনিক, তত্ত্বগত ও আদর্শায়িত। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ মূর্তিমান তত্ত্বকথা নন, আলোছায়ার মিলনেই তার সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ তাই নিস্পৃহ মনে কৃষ্ণচরিত্রের ত্রুটি প্রদর্শন করে লিখেছেন—“কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছেন।”[৬৮] তাঁর মনে হয়েছে বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করতেন এবং কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর কোনওরকম পূর্বপরিকল্পিত থিয়োরি না থাকত, তবেই তিনি নিরপেক্ষ নির্বিকারভাবে মহাভারতকার কবির আদর্শ কৃষ্ণকে অবিকলভাবে উদ্ধার করে পাঠকদের সামনে আনতে পারতেন। সর্বদা একটি বিরোধী পক্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করে অনর্থক কলহ-কাজিয়ায় উচ্চ সাহিত্যের উপযোগী শান্তিকে বিঘ্নিত করতেন না। কিন্তু একথা বলার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এ-কথা ভেবে দেখেননি যে, এটি বঙ্কিমের রসসাহিত্য নয় বরং ইতিহাসভিত্তিক প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রবন্ধ গ্রন্থে নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে স্থাপন করার জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে যৌক্তিক বিরোধ সর্বদাই স্বীকৃত। এটি প্রবন্ধগ্রন্থের দোষ তো নয়ই বরং গুণ। তবে একথাও ঠিক যে, বঙ্কিম উত্তেজনার বশে অনেকক্ষেত্রেই অযৌক্তিক কার্য-কারণের অবতারণা করে ফেলেছেন, যার হয়তো কোনও প্রয়োজন ছিল না। এর সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে দু একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। যেমন, মহাভারত অনুযায়ী শিশুপালের গালি শুনে কৃষ্ণ কোনও প্রত্যুত্তর করেননি, তাকে ক্ষমা করেছিলেন। কৃষ্ণের সেই

ক্ষমতা ছিল যে সেই দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনাশ করতে পারতেন। কিন্তু শিশুপালের পরুষবচনে তিনি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এর পরেই বঙ্কিমের উক্তি "য়ুরোপীয়দের মতো ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল, ক্ষমা বড়ো ধর্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।"[৬৯] শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ইউরোপীয়দের প্রসঙ্গ তুলে তাদের খোঁচা দেওয়া বঙ্কিমের পক্ষে ও এই গ্রন্থের মহত্ত্বের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। বিশেষত এই গ্রন্থ পাঠকালে একজন ইউরোপীয় পাঠকের মনে বিদ্রোহী ভাব জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। আবার কিছু স্থানে বঙ্কিম নানা সামাজিক তর্ক তুলেছেন, যার আশানুরূপ সমাধান না হওয়ায় গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মাত্র, আর কোনও ফল হয়নি। 'কৃষ্ণের বহুবিবাহ' শীর্ষক অধ্যায়ে রুক্মীণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না, এটা প্রমাণ করেও বঙ্কিম তর্ক তুলেছেন, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতে অধর্ম এ কথা বলা ঠিক নয়। কৃষ্ণ যখন একাধিক বিয়ে করেননি বলে বঙ্কিমের ধারণা, তখন বিবাহসম্পর্কীয় এই তর্ক নিতান্ত অমূলক। ঠিক একই ব্যাপার অবতারবাদ নিয়ে। ঈশ্বর আকার ধারণ করতে পারেন কিনা এই প্রশ্ন যাঁরা করেন বঙ্কিম তাদের এই বলে উত্তর দিয়েছেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চাইলেই আকার ধারণ করতে পারেন। আবার যাঁরা এই কথা বলেন, ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময় হন তবে তিনি তো ইচ্ছে করলেই রাবণ, কংস, শিশুপালকে বধ করতে পারেন, তার আর মানুষ হয়ে জন্মানোর প্রয়োজন কী! এর জবাবে বঙ্কিম বলবেন, শুধু রাবণ বা শিশুপালকে বধ করার জন্যই ঈশ্বর মানুষ রূপ ধারণ করে আসেন না। মানুষের সমাজে মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করতে এবং মানুষী শক্তি নিয়ে কতখানি জগৎ কল্যাণ করা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত জগতকে দেখানোর জন্যই ঈশ্বর অবতার পরিগ্রহ করেন। কিন্তু এটা বললেই তর্কের সমাধান হয় না। তখন এক তৃতীয় আপত্তির সম্ভাবনা জেগে ওঠে যে ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময় ও মঙ্গলময় তবে তিনি তো ইচ্ছামাত্রেই একজন মানুষকে আদর্শ মানবকে অভিব্যক্ত করে তুলতে পারেন, যাঁর কার্যধারায় জগতের মঙ্গল সাধিত হবে—এই কাজ করতে তাঁকে স্বয়ং মানুষ হয়ে জন্মাতে হবে কেন?? বঙ্কিম এই তর্কের সম্ভাবনা বা তার সম্ভাব্য উত্তর কোনওটাই অবশ্য বঙ্কিম দেননি। তবে এই সব নৈয়ায়িক বিতর্ক কিছু ক্ষেত্রে গ্রন্থের পক্ষে যে বাহুল্য হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা সহমত। কিন্তু সুগভীর চিন্তাশীলতা ও মণীষার যে ছাপ বঙ্কিম এই গ্রন্থে রেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে সাধুবাদ দিয়েছেন, একালের মনস্বী পাঠকেরাও তাকে সাধুবাদ দেবেন।

তবে সমস্ত বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে বঙ্কিমকে তিনি শ্রদ্ধা করেছেন, বাঙালির মননশীলতার উদ্ভাবকরূপে, বাংলা সাহিত্যের ভগীরথরূপে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে' কবিতায় লোকনায়ক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্ণধার বঙ্কিমের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। সেই কবিতার কিছু প্রাসঙ্গিক পংক্তি উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের যবনিকা টানি—

নব যুগসাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্রস্পর্শে তব

চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব

এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে

নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।[৭০]

সঞ্জীবচন্দ্র: গৃহিণীপনার অভাব

রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে যে ক'জন অগ্রজ সাহিত্যিকদের সাহিত্যকীর্তি বিচার করে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সঞ্জীবন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।(১৮৩৪-১৮৮৯)। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর ছয় বছর পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্জীবচন্দ্র' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের আগে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনীসুধা' এবং চন্দ্রনাথ বসু 'সঞ্জীব-ব্যাখ্যান' নামে দুটি প্রবন্ধে সঞ্জীবচন্দ্রের কীর্তি ব্যাখ্যা করেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীব চরিত্রের মূল বিন্দুটিকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। সেটা হল তাঁর সৌন্দর্যরসিক মন ও উদাসীন পথিকসত্তা। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের সৌন্দর্য-রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র সহোদর ভাই হলেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল দুধরণের। বঙ্কিম ছিলেন রাশভারী, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সংকুচিত হয়ে থাকতেন পক্ষান্তরে সঞ্জীবচন্দ্রকে তাঁর ভারি ভালো লাগত। তাঁর মুখে অদ্ভুত গাল-গল্প শুনতেও রবীন্দ্রনাথ ভারি ভালোবাসতেন। 'জীবনস্মৃতি'তে সঞ্জীবচন্দ্রের আমুদে চরিত্রের ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এক-একদিন দেখিতাম সঞ্জীববাবু তাকিয়া অধিকার করিয়া গড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড়ো খুশি হইতাম। তিনি আলাপী লোক ছিলেন। গল্প করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে গল্প শুনিতেও আনন্দ হইত।[৭১]

সঞ্জীবচন্দ্রের সমস্ত রচনার মধ্যে একটি সৌন্দর্যসচেতন পরিণত মন এবং আর-একটি চঞ্চল কৌতূহলী শিশুমন একসঙ্গে মিশে গিয়েছিল। প্রতিভা সত্ত্বেও কেন সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর উপযোগী জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারলেন না, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তা এক অমোঘ সত্য। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না...সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।"[৭২]

রবীন্দ্রনাথের এই একটি বাক্যেই সঞ্জীবচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধরা পড়েছে। তাঁর যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল, সেই পরিমাণ উদ্যম ছিল না। সঞ্জীব প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'পালামৌ' যথেষ্ট যত্নসহকারে লেখা হয়নি বলে মতপ্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এর অঙ্গে অঙ্গে সৌন্দর্য, অভিজ্ঞতা ও আলস্য জড়িত আছে। সঞ্জীবচন্দ্র যথেষ্ট পরিশ্রম করে আদালতের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে 'জালপ্রতাপচাঁদ' লিখেছিলেন, কিন্তু এ যেন ইতিহাসের উপাদান নিয়ে অবহেলায় খেলা করা। তিনি যদি প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে উপন্যাস লিখতেন, তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিগুণে তিনি নিশ্চয়ই বিরল ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারতেন কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা সে জাতের ছিল না। তিনি ছিলেন স্বভাব উদাসীন শিল্পী। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার ঐশ্বর্য ও দুর্বলতা—দুই-ই রবীন্দ্রনাথের অপক্ষপাতী দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে।

বিহারীলাল: বাংলা গীতিকাব্যে ভোরের পাখি

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'কাব্যগুরু' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তিনি উনিশ শতকের অশ্রুতকীর্তি গীতিকবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)। বিহারীলালকে 'অশ্রুতকীর্তি' বলতে হচ্ছে এই কারণে যে তাঁর সমকালে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিহারীলাল' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক ও সমালোচক-সমাজের দ্বারবর্তী হইত না।"[৭৩]

বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই বিহারীলালের খ্যাতিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বিহারীলালের যাতায়াত ছিল। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীও কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গে বিহারীলালের পুত্রের বিবাহ হলে দুই পরিবার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়ে।

'জীবনস্মৃতি'তে 'বিহারীলাল' নামক পরিচ্ছেদে এবং বিহারীলালের পরলোকপ্রাপ্তির পর 'বিহারীলাল' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবন্ধটি পরে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত হয়) রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যা করেন। এই দুটি লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিহারীলালই সর্বপ্রথম বাংলা কাব্যে আত্মভাবমূলক (Subjective) গীতিকবিতার প্রবর্তন করেছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সে প্রত্যুষে লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাঁহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।...বিহারীলাল তখনকার ইংরেজিভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।[৭৪]

বিহারীলাল আত্মভাবগ্রস্থ কবি ছিলেন। রোমান্টিক সৌন্দর্যলোক ও অতীন্দ্রিয় ভাবলোক—দুই প্রান্তেই তাঁর সহজ গতিবিধি ছিল। 'বিহারীলাল' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ভাষা, রীতি, বিষয়বস্তু—সব কিছু নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শেলির 'Hymn to the Intellectual Beauty'র অনুসরণেই বিহারীলাল 'সারদামঙ্গল'এর 'সরস্বতী'কে নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও সেদিকে নির্দেশ করে বলেছেন ইংরেজ কবি শেলি যে বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্তব করেছেন, সেই দেবীই বিহারীলালের সরস্বতী। কিন্তু 'সারদামঙ্গল'এর বিষয়বস্তু এত অস্পষ্ট ও কুহেলিকাচ্ছন্ন যে সাধারণ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারেননি। তাই এই কাব্য বিশেষভাবে লোকপ্রিয় হয়নি। কিন্তু প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ আশা করেছেন যে কালান্তরে এই কাব্য লোকস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং বিহারীলাল 'যশঃস্বর্গে' অম্লান বরণমাল্য লাভ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল: মৈত্রী ও মনান্তর

সখ্য ও মতান্তর মিলিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল বেশ বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে তিনি দু'বছরের কনিষ্ঠ কিন্তু লোকান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের আটাশ বছর আগে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্ক প্রথমদিকে বেশ প্রীতিপূর্ণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্যগাথা', 'মন্দ্র' ও 'আষাঢ়ে'—এই তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন। 'আর্যগাথা' মূলত গানের বই। সে-জন্য এই গ্রন্থের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ সংগীত সম্বন্ধে নানা সমস্যা ও তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। সংগীতের সঙ্গে কবিতা ও ছন্দের কী সম্পর্ক, বিশুদ্ধ কাব্য ও বিশুদ্ধ সংগীতের আত্মীয়তা কোথায়? হিন্দি গানে কথা দুর্বল কিন্তু সুরের প্রাধান্য। সেই তুলনায় বাংলা গানে বাণী ও সুর উভয়েই তুল্যমূল্য ; প্রয়োজন এদের সুষ্ঠু সংগতি—এইসব নানা সমস্যা ও প্রশ্নের ইঙ্গিত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'আর্যগাথা' কাব্যের গীতিধর্ম ও কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই গীতিসংগ্রহে কয়েকটি গান কীভাবে সুরের দাসত্ব ছাড়িয়ে স্বাধীন লিরিক কবিতায় পরিণত হয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। 'আর্যগাথা' কাব্যের উচ্চকিত প্রশংসার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথই কার্যত দ্বিজেন্দ্রলালকে বাংলার রসিক মহলে পরিচিত করিয়ে দিলেন। কারণ তখন বাংলার সাহিত্যমহলে দ্বিজেন্দ্রলাল আগন্তুক কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত কবি ও গদ্যকার। তবে এই বইটির প্রতিটি গানই যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ নয়। তবে দু'একটি গান, যেমন—'আয়রে বসন্ত তোর কিরণমাখা পাখা তুলে', 'এ জনমে পূরিল না সাধ' প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে লিরিক সৌন্দর্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

সেই তুলনায় ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'মন্দ্র' গ্রন্থটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যথার্থ রসজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেননি। এই কাব্যের দুর্বল রচনাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশংসার ফুলচন্দনে ভূষিত করেছেন। এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে তিনি কবির 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা' এবং 'প্রবল আত্মবিশ্বাসের অবাধ সাহস' লক্ষ করেছেন। ছন্দের অভিনবত্বের নামে এর দুর্বলতাকেই আসলে তিনি প্রশংসা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আশীর্বাদ' ও 'উদ্‌বোধন' কবিতায় ছন্দ নিয়ে যে বিশেষ পরীক্ষা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে দেখেছেন 'গতিশক্তি'। তাঁর কথায়—

> দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গভীর ভাষায়, ভাব

হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে, ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।[৭৫]

যে-কবিতার নমুনা সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের এই অনর্থক প্রশংসা সেই কবিতা কিছুটা উদ্ধৃত করলেই রসজ্ঞের চোখে ও কানে তার ত্রুটি ধরা পড়বে। একটু উদ্ধৃত করা যাক—

এসেছিলে তুমি

বসন্তের মতো মনোহর

প্রাবৃটের নবস্নিগ্ধ ঘন সম প্রিয়।

এসেছিলে তুমি

শুধু উজলিতে; স্বর্গীয়

সুন্দর!

কভু ভাবি মনে

তুমি নও শীত

ধরণীর;

কোন সূর্যালোক হতে এসেছিলে নেমে

এক বিন্দু কিরণ শিশির;

শুধু গাথা—গীত

আলোক ও প্রেমে;

লালিত ললিত এক অমর স্বপনে।[৭৬]

পংক্তিগুলোকে অসমমাত্রিক করে তুলে ছন্দ নিয়ে বিশেষ নিরীক্ষা পরবর্তীকালে 'বলাকা' কাব্যে সফল করে তুলবেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে তার আয়োজনটুকু মাত্র হয়েছে, সিদ্ধি হয়নি। এখানে যে মাত্রাবিন্যাসে ত্রুটি আছে, তা কেবল কানে শুনলেই ধরা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই

দৌর্বল্যকে ঢেকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি সখ্যের কারণে অনাবশ্যক প্রশংসা করেছেন। ফলে এখানে সমালোচনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই অতি-প্রশংসা অনেকের কাছেই সেদিন অনর্থক বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ; যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"আপনার 'মন্দ্র'কে আমি ভালো বলেছিলাম বলে অনেকে আমার বিচারশক্তির প্রতি দোষারোপ করেছিলেন—যদি বস্তুতই আমি সে দোষের ভাগী হই তবে তার উপরে আমার হাত নেই।"[৭৭] কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, যে-সখ্যের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের নিরপেক্ষতা বর্জন করে বন্ধুর কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন, উদ্দিষ্ট বন্ধু কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই তা ভুলে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে কটূক্তি বর্ষণ করতে শুরু করেন।

তুলনায় 'আষাঢ়ে'(প্রকাশ ১৮৯৯) দ্বিজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। রঙ্গ-ব্যঙ্গ, কৌতুকরসের গান বাংলা সাহিত্যে আগে তেমনভাবে ছিল না। ইংরেজ কবি বায়রণ তাঁর রচনায় রঙ্গকৌতুকের যে ছিটেগুলি বজায় রেখেছেন, বাংলায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাগুলোতে তার সাদৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। এই সমালোচনাটি প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। দ্বিজেন্দ্রলালের এই বইটির বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন দুভাবে। প্রথমত, এর ভাষা ও ছন্দের অভিনবত্ব ও দ্বিতীয়ত এতে কৌতুক ও কল্পনা, রঙ্গরস ও সমাজদৃষ্টির সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> তাঁহার 'বাঙালি মহিমা', 'ইংরেজস্তোত্র', 'ডিপুটি কাহিনী' ও 'কর্ণবিমর্দন' সর্বত্র উদ্ধৃত, পঠিত ও ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছে। এই লেখাগুলির মধ্যে যে সুনিপুণ হাস্য ও সুতীক্ষ্ণ বিদ্রুপ আছে তাহা শাণিত সংযত ছন্দের মধ্যে সর্বত্র ঝকঝক করিতেছে।[৭৮]

কিন্তু তিনি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কৌতুকরসের কবিতায় নিখুঁত ছন্দের পারিপাট্য চাই। কিন্তু এই কাব্যের কিছু কবিতার মাত্রাগত সমতার অভাব দেখে রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন—"অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতাবশত আবৃত্তির পক্ষে সুগম হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে।"[৭৯]। তবে রবীন্দ্রনাথের মতে কেবল হাস্যরসের দ্বারা কেউ যথার্থ অমর হয় না। হাস্যরসের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের ভার থাকলে তবেই সেই সাহিত্যের স্থায়ি আদর হয়। এই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের এই কাব্যে শুধু তরল কৌতুক নয়,

তারই সঙ্গে মানুষকে ভাবানো ও দেখানোর নিপুণতাও আছে। তাই এই স্যাটায়ারধর্মী কাব্যটিতে কিছু ছন্দোগত বিচ্যুতি থাকলেও মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথ এর প্রশংসাই করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 'বিরহ' কৌতুকনাট্য রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এই বিরোধের প্রথম সূত্রপাত দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক 'সোনার তরী' কবিতার প্রতিকূল সমালোচনায়। এরপর বিশ শতকে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক'এ রবীন্দ্রনাথ যে আত্মপরিচয় লেখেন, তাতে তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণাস্বরূপ জীবনদেবতার ঐশী প্রভাবের কথা বলেন। এর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত অহমিকার প্রদর্শন লক্ষ করে প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় সুনীতির অভাব, বিশেষত 'চিত্রাঙ্গদা'র অশ্লীলতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করেন। সব সীমা ছাড়িয়ে যায় 'আনন্দবিদায়' নাটকে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারকে কুৎসিত ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসেন। অবশ্য দর্শকদের আপত্তিতে এই নাটক বন্ধ হয়ে যায় অচিরেই। তবে শেষ অবধি বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুতাপ জন্মেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার ইচ্ছেয় তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি প্রেরককে পাঠানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৮০]

তিনটি অপ্রধান গ্রন্থের সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী', 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' এ যে-সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সমালোচনা করেছেন, আমরা আগে তাদের বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছি। এর পাশাপাশি এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তিনজন ব্যক্তির উপন্যাসের সমালোচনা করেন। এগুলি যথাক্রমে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' ও শরৎকুমারী চৌধুরাণীর 'শুভবিবাহ'। দেখা যাবে, এই তিনটি গ্রন্থের সমালোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তিনজন গ্রন্থকারই রবীন্দ্রনাথের খুবই ঘনিষ্ঠজন অথচ আত্মীয়তা অথবা বান্ধবতার খাতিরে লেখক এঁদের গ্রন্থের সমালোচনায় কোনও পক্ষপাত দেখাননি। গ্রন্থের মধ্যে যা ভালো ও প্রশংসনীয়, তার যেমন সাধুবাদ করেছেন, তেমনই ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলিকেও খোলাখুলিভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর 'ফুলজানি' উপন্যাসের সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন ১৩০১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে 'সাধনা' পত্রিকায়। এটি মুখ্যত সামাজিক উপন্যাস কিন্তু সম্ভবত বঙ্কিমের প্রভাবেই উপন্যাসের শেষে শ্রীশচন্দ্র এটিকে ঐতিহাসিক রোমান্সের ছাঁচে ঢালতে চেয়েছেন। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে স্বচ্ছ, সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে। মুখ্য চরিত্র পুরন্দর। সে গ্রাম্য যুবক। কিন্তু তার চরিত্রে অসামান্যতা আনার জন্য গ্রন্থকার তাকে আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজাগতিক ভাবে বিভোর করে তুলেছেন। তার এই নবলব্ধ দার্শনিক সত্তা চরিত্রের স্বাভাবিক বাস্তবতাকে বিনষ্ট করেছে। উপন্যাসের শেষে ঐতিহাসিক রোমান্সের রঙ বড়ো চড়ে উঠেছে। নবাব সিরাজদৌল্লা পুরন্দরের পত্নী ফুলকুমারীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে নিজের হারেমে বন্দি করলেন। বাধা দিতে গিয়ে পুরন্দরও প্রাণ দিল। ফুলকুমারী নবাব হারেমে বন্দিনী ফুলজানিতে পরিণত হল। এইসব নাটকীয় সংঘটনে আপত্তি তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

> এ সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কী যোগ? প্রথম হইতেই এমন কী সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্য সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল? গ্রন্থকার যদি বলিতেন, 'গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলেই মরিয়া গেল' তবে কাব্য হিসেবে তাহার সহিত ইহার প্রভেদ কী?'[৮১]

বোঝা যায়, বঙ্কিমযুগের প্রভাবে ছদ্ম ঐতিহাসিক রোমান্স গড়তে গিয়ে উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ও গতি যে-ভাবে বিনষ্ট হয়েছে তা যথার্থভাবেই ধরিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর'এও উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ। 'যুগান্তর' উপন্যাসের সমালোচনাটি প্রকাশ পেয়েছিল 'সাধনা'য়, চৈত্র, ১৩০১ বঙ্গাব্দে। উপন্যাসটির সহজ রসের গ্রাম্য প্রেক্ষাপটটিকে রবীন্দ্রনাথের খুবই উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। 'চরিত্রসৃজন, সুরস হাস্য ও সহৃদয়তার বিশেষ প্রশংসা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।নসীপুর গ্রাম এবং বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সজীব হয়ে উঠেছে এখানে। কিন্তু উনিশ শতকের যুগান্তর এই গ্রামকে স্পর্শ করে এর গ্রামীণ স্নিগ্ধতাকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিল। উনিশ শতকের ভাব-প্রবাহ এসে চরিত্রগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। উপন্যাসে বিশ্বনাথ তর্কভূষণের বিধবা ভগ্নি বিজয়া ও তার ছোটো ছেলে হরচন্দ্রের কলকাতায় আসার পর থেকে নবজীবনের ভাব বিপ্লবের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। কলকাতায় আগমনের পূর্বে এবং পরে উপন্যাসের যে দুটি অংশ তারা

ভালোমতো জোড় বাঁধেনি। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—"গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবত দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।"[৮২] দ্বিতীয় গল্পটিতেও যেখানে তিনি নবযুগের আদর্শ ছেড়ে খাঁটি মানুষদের কথা বলেছেন সেখানেই তা অতি সুন্দর হয়েছে। কিন্তু মত-সংঘাত ও তর্ক-বিতর্ক বেড়ে উঠেছে, সেখানে উপন্যাসের স্বাভাবিক শ্রী ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই সমালোচকের অভিমত।

তৃতীয় সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শরৎকুমারী চৌধুরাণীর উপন্যাস 'শুভবিবাহ'। এই সমালোচনাটি প্রকাশ পেয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায়, আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। শরৎকুমারী যে বিশেষ লেখালেখি করেছেন তা নয়। তাঁর এই একটি মাত্র উপন্যাসই গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল। কিন্তু লেখিকার সহজ-স্বাভাবিক রচনা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। কলকাতার এক কায়স্থ পরিবারের অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। সামান্য ঘরোয়া কাহিনি, তাতে নাটকীয় মিলন বা বিয়োগান্ত পরিস্থিতির ঘনঘটা নেই, যা আছে তা হল পরিচিত চরিত্র ও দৃশ্যের সজীব চিত্র। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই...কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নাই, কেবল জীবন এবং সত্য আছে।[৮৩]

এই সব কারণেই তিনি লেখিকার রচনাশক্তির উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

এই আলোচনাটি অন্য একটি কারণেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসটিকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব ও উপন্যাসের আঙ্গিক বিষয়েও নানা আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি রাস্কিনের একটি উক্তি—'মহৎ আর্ট মানেই স্তব', এই প্রসঙ্গের সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। রাস্কিনের এই কথা তিনি সম্পূর্ণ মানেননি। শুধুমাত্র সুন্দর বিষয়বস্তুই আর্টের উপজীব্য নয়। যা তথাকথিত সুন্দর নয় কিন্তু যা সত্য ও স্বাভাবিক তাও আর্টের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> একথা সত্য যে, অনেক আর্টই, যাহা উদার, যাহা সুন্দর, তাহার প্রতি আমাদের ভক্তি বা প্রণতির প্রকাশ। কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, যাহা সাধারণ, তাহার প্রতি আমাদের মনের

সহজ আনন্দ—ইহাও আর্টের বিষয়। যদি তাহা না হইত, তবে আর্ট আমাদের ক্ষতিই করিত।[৮৪]

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর বিষয়ই যে আর্টের উপজীব্য এ কথা মানতে চাননি। তাঁর মতে যা মনকে আকর্ষণ করে, হৃদয়ে সাড়া জাগায় ; বাস্তব জগতে তা কুৎসিত হলেও মন তাতেই আনন্দ পায়। তাই যা বাস্তবের কুৎসিত তা রসের সামগ্রী হতে বাধা পায় না। একারণেই ইয়াগো, ফলস্টাফ, ভাঁড়ু দত্ত আমাদের চোখে সুন্দর। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের থেকেও কর্ণ আমাদের বেশি প্রিয়। বাস্তবতার আদর্শ নিয়েও এখানে রবীন্দ্রনাথ সামান্য তর্ক তুলেছেন। "য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।"[৮৫] মানুষের চরিত্রে কুশ্রীতা, জঘন্যতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা পুরোপুরি শিল্প হতে পারে না। কারণ শিল্প বা আর্ট স্বভাবের নির্বিকার অনুকরণ নয়, তা স্বভাবের সৃষ্টি। সাহিত্যিকের বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা বাস্তবের উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলে। তাই পুতিগন্ধময় বাস্তব, মহৎ শিল্প নয়। 'শুভবিবাহ' উপন্যাসে সহজ স্বাভাবিক ছবি আছে। বাস্তবতার নামে পঙ্কিলতাকে স্থান দেওয়া হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথের মতে সাধারণ স্তরের হয়েও এই উপন্যাসটি এক অসামান্য সৃষ্টি।

রবীন্দ্র সমালোচনায় বিশ শতক

এই প্রসঙ্গ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এসে পৌঁছোলাম বিশ শতকের দ্বারপ্রান্তে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছর রবীন্দ্রনাথ জীবনরক্ষা করেছিলেন। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য নানা ঘাতপ্রতিঘাতে, নানা বিচিত্র যুগকল্লোলে তরঙ্গসংকুল। উনিশ শতকীয় চিন্তা, বিশ্বাস, মতাদর্শ, ভাবধারা দুই বিশ্বযুদ্ধের আঘাতে বদলে গেল দ্রুত। দেশে জেগে উঠল উপনিবেশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ দৃঢ়তর হল। অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার আরও প্রসার হল। ইউরোপীয় ভাববিশ্বের সঙ্গে এদেশের শিক্ষিত তরুণেরা পরিচিত হতে শুরু করল। বিদেশি সাহিত্যের থেকে রসদ পেয়ে বাংলা সাহিত্যে এল নতুনতর আস্বাদ। নিসর্গ-আশ্রয়ী রোমান্টিক ভাব-কল্পনার বদলে জেগে উঠল বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিক আলোড়ন। সাহিত্যে দেখা দিল দিন বদলের চেতনা। দেখা দিল শ্রেণি শোষণ ও

শ্রেণি-সংগ্রামের নানা চিহ্নায়ন। এই নতুন যুগের সাহিত্য ভাবে এবং রূপে রবীন্দ্রনাথের ভাবজগৎ থেকে সরে গেল অনেকখানি। কয়েকটি তরুণ সাহিত্যিক-গোষ্ঠী সরাসরি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল।(যেমন কল্লোল, কালিকলম)। তারা বলল নতুন যুগের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ বেমানান। ইউরোপীয় আদর্শে বাংলায় নতুন সাহিত্য তৈরি করতে হবে। এই তরুণ দলের বিরোধী গোষ্ঠীও ছিল, যারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। এই স্থিতবাদী দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস। রবীন্দ্র-অনুসারী বা অনুরাগী এবং রবীন্দ্র-বিরোধী এই দুই দলের মধ্যবর্তী আরও এক দল ছিলেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে মহান কবির মর্যাদা দিতেন অথচ আপন প্রতিভাবলে তাঁর থেকে অন্যরকম, অন্য স্বাদের সাহিত্য রচনার জন্য চেষ্টা করতেন। এঁরাই ত্রিশের কবিরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতে অথবা চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। এঁদের অনেকের লেখার সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ করেছেন। এই আধুনিক কবিকুল ও আধুনিক সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, তা এখানে আমরা বিবৃত করে দেখাব। অবশ্য তার আগে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি জরিপ করে নেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বিশ শতকের সেই সকল কবিদেরই আমরা 'রবীন্দ্রানুসারী' বলছি, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শে আস্থাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েই এঁরা নিজেদের লেখায় হাত পাকিয়েছেন। এঁদের কারও কারও সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, যেমন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আবার কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের পরিচিত না হলেও তাঁকে নিজেদের কবিতার বই উৎসর্গ করেছেন অথবা বইটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানতে চেয়েছেন। তাঁদের মনে হয়েছে যুগশিল্পী স্বয়ং যদি তাঁদের বইয়ের সপ্রশংস সমালোচনা করেন, তবে তারা কৃতার্থ হবেন। এভাবেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোনও কোনও রবীন্দ্রানুসারী কবির যোগাযোগ ঘটেছে। যেমন কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ। এখানে আমরা সেইরকম কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের নিয়ে আলোচনা করব।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশীল ছিলেন সম্ভবত **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (১৮৮২-১৯২২)** সত্যেন্দ্রনাথের ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে সত্যেন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র দত্তের পৌত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থ তিন রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল—"যিনি জগতের সাহিত্যকে অলংকৃত করিয়াছেন যিনি স্বদেশের সাহিত্যকে অমর করিয়াছেন, যিনি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক সেই অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন কবির উদ্দেশে এই সামান্য কবিতাগুলি সসম্ভ্রমে অর্পিত হইল।"[৮৬]। সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুহু ও কেকা' পড়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠিটি পাওয়া না গেলেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর চিঠি থেকে পরোক্ষে তার প্রমাণ মেলে।[৮৭]

সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'—এই তিনটি তাঁর অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথের কলমের এই অপূর্ব অনুবাদ রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ খুশি করেছিল। 'তীর্থসলিল' পড়ে তিনি সত্যেন্দ্রকে লেখেন—

> অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সরস ও সহজ হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।[৮৮]

'তীর্থরেণু' পড়েও রবীন্দ্রনাথ একই রকম মুগ্ধ। লিখেছেন—"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্প কার্য নহে সৃষ্টি কার্য।"[৮৯]

ছন্দের ওপর সত্যেন্দ্রনাথের দখল কতখানি, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় আনার ব্যাপারে একটি নিরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করেন। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দোস্পন্দন বাংলায় আনতে সত্যেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথমে কুণ্ঠিত হলেও পরে তাঁর নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টায়

জন্মলাভ করে মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূতের অসামান্য অনুবাদ—'যক্ষের নিবেদন'। কবিতাটি সকলের পরিচিত। তবুও প্রথম স্তবকটি উদ্ধার করি—

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভোতল কই গো কই মেঘ উদয় হও

সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও

সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম

বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম[৯০]

(৮+৭+৭+৫=২৭ মাত্রা)

রামমোহন লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরবর্তী শোকসভায় রবীন্দ্রনাথ যে লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেন—

> আমি কিছুমাত্র বিনয় প্রকাশ না করিয়া স্পষ্টভাবে বলিতেছি, ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গির গৌরবে সত্যেন্দ্রনাথ শুধু যে আমার চেয়ে বড় ছিলেন তাহা নহে, আমার মনে হয় এ পর্যন্ত বাংলার কোনো কবিই ছন্দ বৈচিত্র্যে তাঁহার মতো অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং কেহ পারিতেছেন না।[৯১]

ছন্দের পাশাপাশি বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন। সেকালে বাংলাদেশে সাহিত্য সমালোচনার যে প্রবণতা চলতি ছিল, তা রবীন্দ্রনাথের মনোমত ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বাংলাদেশের সমালোচককুল ছোটো রসের কারবারি, তারা যেন মুদির দোকানের ব্যাপারি। সত্যেন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বসাহিত্য অধীত করা বিদ্যা। তাই তাঁকে কবি আহ্বান জানিয়েছিলেন—

> আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন? কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।...প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা তো সাহিত্যপথের মশাল নয়, এ কেবল চকমকি ঠোকা—ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়?[৯২]

রবীন্দ্রনাথ নিজে সত্যেন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। এদের মধ্যে ‘তোড়া’ ও ‘চম্পা’ এই দুটি কবিতার অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের ‘Lover’s Gift’ বইতে স্থান পেয়েছে। গান্ধী যখন ‘হরিজন’ পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের ‘মেথর’ কবিতাটি ‘Scavenger’ নামে অনুবাদ করে পাঠিয়েছিলেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে একটি কবিতা রচনা করেন। যেখানে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সংকটের দিনে সত্যেন্দ্রনাথ অন্ধকারে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। অনাগত কালের মানুষের কাছে তিনি ‘দেখার অতীত’ এক আদর্শ। কিন্তু যারা তাঁকে পেয়েছিল সঙ্গী হিসেবে, এই মৃত্যুতে তাদের ক্ষতি অপূরণীয়।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা?...[৯৩]

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের এই এলিজি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। এ শুধু প্রথাগত শোকজ্ঞাপন নয়। এর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও তাঁর অপূর্ব চারিত্র্যের কথা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রবীন্দ্র-অনুরাগী কবি। কিন্তু রবীন্দ্র-অনুসারী বলতে যা বোঝায়, বোধহয় তা তিনি নন। তাঁর প্রতিবেশ তাঁকে রবীন্দ্রবৃত্ত থেকে স্বতন্ত্র করে গড়েছিল। অতি নিম্নবিত্ত, দুঃখী পরিবারে তার জন্ম। লেটোর দলে ঘুরে বেড়াতেন। পরে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। প্রথাগত পড়াশোনা তাঁর কিছুই ছিল না। কিন্তু ছিল সহজ কবিত্বশক্তি। তাঁর আবেগ ছিল প্রচণ্ড, জেদ ছিল দুর্দমনীয়, যৌবনশক্তি ছিল অক্লান্ত। সেগুলোকেই পুঁজি করে বাংলা সাহিত্যে ঝড়ের মতোই তাঁর আবির্ভাব। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি দিয়েই বাংলা কবিতার জগতে তাঁর

আবির্ভাব। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২২ এর ৬ই জানুয়ারি ‘বিজলি’ পত্রিকায়। শোনা যায় যে কবিতাটি রচনার পরে তিনি সেটি রবীন্দ্রনাথকে শোনান ও তার আশীর্বাদ লাভ করেন। কিন্তু এই তথ্যের সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে।[৯৪] ১৯২২ এর অগাস্ট মাসে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশিত হলে নজরুলকে একটি কবিতায় আশীর্বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ। এই কবিতাটি নজরুল ব্লক করে ছাপেন[৯৫]—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু

আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু

দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন।

অলক্ষণের তিলকরেখা

রাতের ভালে হোক না লেখা

জাগিয়ে দে রে ডঙ্কা মেরে আছে যারা অর্ধচেতন।

সমাজকে জাগিয়ে দেওয়ার যে লক্ষণ নিজের ললাটে এঁকে নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা যেন তাকেই অভিনন্দিত করছে। ১৯২৩ এর ১৬ই জানুয়ারি রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের জেল হয়। রবীন্দ্রনাথ কারাগারে বন্দি নজরুলকে তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য উৎসর্গ করেন। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ওপর নজরুলের দুর্দমনীয় যৌবন শক্তিকে অভিনন্দিত করতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই বই উৎসর্গ করেন। বইটি তিনি নজরুলকে পাঠান পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। বলে পাঠান, “তাকে বোলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে।...বোলো, কবিতা লেখা যেন সে কোনো কারণেই বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।”[৯৬]

১৯২৫ সালে সাম্যবাদী আদর্শে এদেশে শ্রমিক-কৃষক দল গড়ে ওঠে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মুজফফর আহমেদ, নলিনী গুপ্ত, হেমন্ত সরকার। এই দলের মুখপত্র ছিল লাঙল। নজরুল ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান লেখক ও কার্যকরী সম্পাদক। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাণী চেয়ে আনেন। কবি লিখে দিয়েছিলেন—

জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরুভাঙা হল

প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল[৯৭]

বাংলাদেশে সার্থক গণসংগীত নজরুলেরই সৃষ্টি। এই পত্রিকার জন্য নজরুল লিখেছিলেন বেশ কিছু গান। যেমন—'চলচঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল', 'শিকলপরা ছল'। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথায় জানা যায় এই তিনটি গান শুনে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বলেছিলেন—"নজরুলের একটি নিজস্ব জোরালো ধরন আছে।"[৯৮]

এই নিজস্বতা, এই স্বকীয়তাই নজরুলকে আর পাঁচজন নাগরিক কবির থেকে আলাদা করেছিল। তাঁর অনেক লেখায় অশিক্ষিতপটুত্ব থাকতে পারে, অমার্জিত অসংযম থাকতে পারে। তবু সেটাই তার জোরের জায়গা। এখানে সে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

কবিশেখর কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫) ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা রচনা শুরু করেন। রবীন্দ্র কবিতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর আত্মীয়ের প্রেস থাকার সুবাদে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রকাশ করলেন একটি কাব্যগ্রন্থ। নাম ছিল 'কুন্দ'। উৎসাহের ঝোঁকে বইটি উৎসর্গ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। শুধু তাই-ই নয়, রেজিস্ট্রি করে বইটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েও দিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অল্পবুদ্ধি কিশোর বলে কালিদাসকে নিরাশ করেননি। তাঁর বইয়ের প্রাপ্তিস্বীকার করে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন—

> কল্যাণীয়েষু,
>
> তোমার কাঁচা বয়সের লেখা—ইহার উপরে অধিক ভরসা রাখিয়ো না। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও অভ্যাসের সহিত যখন তোমার শক্তি পরিণতি লাভ করিবে তখন বাহিরের সমালোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়ো। এখন অনেকদিন পর্যন্ত নিন্দা-প্রশংসায় তোমার কোন উপকার হইবে না। যদি কাব্য-রচনায় তোমার অন্তরের অনুরাগ থাকে তবে অন্য কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা মনে না রাখিয়া আপাতত সেই আনন্দে লিখিতে থাক। পরে সময় উপস্থিত হইলে পাঠক সমাজের সমক্ষে সার্থকতা লাভ করিবে।[৯৯]

কবিতাগুলি নেহাত কাঁচা এ সত্য গোপন না করেও রবীন্দ্রনাথ সেদিনের কিশোর কালিদাস রায়কে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন বাইরের নিন্দা-প্রশংসায় কান না দিয়ে, নিশ্চিত ফললাভের আশা না রেখে শুধু অন্তরের অনুরাগ নিয়ে লিখে যেতে। সেই উপদেশ পরবর্তীতে তাঁর জীবনে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ১৯০৭ সালে কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে প্রথম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সভার সভাপতি ও অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন কালিদাস রায়। সেই সভায় তিনি কালিদাসকে সস্নেহে বলেছিলেন—"তুমি তো বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র। অনেক ইংরেজ কবির কবিতা পড়েছ। একশোটা ইংরেজি কবিতা পড়ে হাত পাকালে পরে অন্যশ্রেণির কবিতা লিখবে।"[১০০] রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যকাল থেকে প্রচুর কবিতা অনুবাদ করতেন। ফলে অনুবাদ করার মাধ্যমে একদিকে যেমন ভাষার প্রতি দখল আসে, তেমনই ছন্দোবন্ধ তৈরিতে হাত পাকে। এটাই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন। কালক্রমে কালিদাস রায়ের বহু কবিতার বই প্রকাশিত হয়। 'বল্লরী', 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু'। কালিদাসের বন্ধু অমল হোম তাঁর সম্মতি না নিয়েই এই বইগুলি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। কালিদাসের কবিতার মধ্যে যে স্নিগ্ধ, সরস ভঙ্গি, তা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। বাস্তবতার নাম করে তিনি কোনও কৃত্রিমতা দেখাতে যাননি। এই গ্রন্থগুলির পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> তোমার কাব্যগ্রন্থগুলি পাইয়াছি এবং অবকাশমতো তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি। তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালোবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের এই কাব্যগুলো পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার ভিতরকার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।[১০১]

কালিদাসের স্নিগ্ধ, সরস, মাটির গন্ধ মাখানো কবিতাগুলির আন্তরিক প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী(১৮৭৮-১৯৪৮) ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন নীতির প্রশ্নে তুমুল রবীন্দ্র-বিরোধিতা করে চলেছিলেন, তখন যতীন্দ্রমোহন সেই বিরোধিতার উত্তরে লিখেছিলেন—'কাব্যে নীতি'। **১৩১৬** বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'মানসী'তে এটি বেরিয়েছিল।

যতীন্দ্রমোহনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লেখা' রবীন্দ্রনাথ নিজে সযত্নে দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।[১০২] যতীন্দ্রমোহন একসময়ে নিজের আর্থিক দৈন্যের কারণে শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করতে শুরু করেন। সেই উপলক্ষ্যে যাতে বইটি ব্যবসায়িক সাফল্য পায়, তার জন্য তিনি

রবীন্দ্রনাথকে দু-চার ছত্র লিখে দিতে বললে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা রাখেন। যতীন্দ্রমোহনকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে তিনি লিখে দিয়েছিলেন—“তোমার চরিত-কথা বইখানি শিশুদের উপযোগী হয়েছে। এর ভাষা সরল এবং এর কথাবস্তু শিশুদের চিত্ত আকর্ষণ করবে।”[১০৩] এটিকে রিভিয়ু বলা যায় না বরং রবীন্দ্রনাথকৃত বইয়ের বিজ্ঞাপন বলতে হবে।

১৩৩৮ এর ২ রা ভাদ্র যতীন্দ্রমোহনের সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতাতে নতুন কালে তিনি ক্রমশই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছেন, এই আক্ষেপের সুর বেজেছে। এটি ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। আমরা কিছু অংশ উদ্ধার করলাম—

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়

নবীন বটে ছিলেম কোনো কালে

বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়

ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে

একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে

মধুর পালা রেণুকণার মুখে

ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে[১০৪]

কবির ব্যক্তিগত আক্ষেপোক্তি বাদ দিলে কবিতাটি সুন্দর। তরুণদের সাহিত্যসভায় তাঁর কদর ক্রমশই কমতির দিকে এটা কখনোই মন থেকে মেনে নিতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। তাই পূর্বের হৃদ্যতার রেশ ধরে যতীন্দ্রমোহন তাঁর কাব্য সম্বন্ধে মতামত চাইলে অসহিষ্ণু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন—

তুমি চেনা বামুন, তোমাকে ফিরে ফিরে পৈতে পরাবার মানে নেই...অভিমত দেবার বিপত্তি থেকে আমাকে রক্ষা করো...মনে রেখো নতুনের ভিড়ের মধ্যে পুরাতন মাঝে

> মাঝে অলক্ষ্য হয়ে আসে...অনেকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করে শ্রেষ্ঠতার তুলনা করে নয়, স্বাদ বদলাবার লোভে। সাহিত্যেও তাই...[১০৫]

যতীন্দ্রমোহনকে উপলক্ষ্য করে তিনি তরুণ সাহিত্যিকদেরই কটাক্ষ করেছেন, যারা সাহিত্যে স্বাদ বদলাবার লোভে পুরাতনকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) ছিলেন প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। স্বদেশি আন্দোলনের সময় জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শান্তিপুরে তাঁর বাড়িতে দেশলাই কারখানা তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গড়া 'ভাণ্ডার' এর অনুকরণে স্বদেশি শিল্প ও জাতীয় বিদ্যালয়ও নির্মাণের চেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকো বাড়ির গৃহশিক্ষকও ছিলেন তিনি।

১৯১১ সালে করুণানিধানের 'ঝরাফুল' কাব্যগ্রন্থ বের হয়। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—"তোমার মিষ্টি লেখার পরিচয় আগেই পেয়েছি। আজ থেকে বাংলার কবিকুলে তোমার পাকা আসন করে নিলে।"[১০৬]। রবীন্দ্র-করুণানিধান পত্রাবলী এখন সম্পূর্ণই হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত তিনটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পাওয়া যায়, যেখানে তিনি করুণানিধানকে তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।[১০৭] রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংকলিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে করুণানিধানের দুটি কবিতা গ্রহণ করেছিলেন।

এবার আমরা প্রবেশ করব অপেক্ষাকৃত জটিল একটা বিষয়ের মধ্যে। আলোচনা করব সেইসব কবি ও সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গ যাঁরা রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরের মানুষ। এরা অধিকাংশই তরুণ। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অস্বীকার না করলেও এরা রবীন্দ্রভুবনের বাইরে গিয়ে স্বপথচারী হতে চেয়েছিলেন। তাঁদের যৌবনশক্তির মধ্যে বিদ্রোহ ছিল। রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হয়ে তারা সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে। ফলে বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শের ঢেউ জেগে উঠেছিল রবীন্দ্র-বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াতেই। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য—১) রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির সর্বাত্মক প্রয়াস ২) আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যাদর্শকে বাংলা সাহিত্যে পরিগ্রহণের চেষ্টা। পাশ্চাত্য রিয়ালিজমের অনুসরণে বাস্তববাদী বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়া থেকে 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রমুখ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এর অনেকগুলি লক্ষ্যের মধ্যে একটি ছিল

রবীন্দ্রভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি। এই মনোভঙ্গিটিকে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ'এ লিখেছেন—

> বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরও মানুষ আছে, আরও ভাষা আছে, আছে আরও ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ—তখনকার সাহিত্যে শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনের হীন অনুকৃতি হলে চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ।[১০৮]

প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ মানতে চাননি এই নতুন সাহিত্যাদর্শকে। আধুনিকতাকে 'হুযুগ', 'ভঙ্গিসর্বস্ব' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এমনকি সাহিত্যে 'তারুণ্য' বিষয়টির প্রতিও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল তাঁর মন—"সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে, তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে।"[১০৯] আধুনিক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যখন সাহিত্যে শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকে বড়ো করে তোলা হল, তখন তাকেও রবীন্দ্রনাথ কটাক্ষ করে বলেছেন—

> সম্প্রতি যে দেশে (অর্থাৎ ইউরোপে) বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলজ্জ কৌতূহলবৃত্তি দুঃশাসনমূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্মীর বস্ত্রহরণের অধিকার দাবি করছে সে দেশের সাহিত্য অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ত দিতে পারে। কিন্তু যে দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনোখানেই প্রবেশাধিকার পায় নি সে দেশের সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে![১১০]

কিন্তু অচিরেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন 'আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন' নিছক হুজুগের জিনিস নয়। বহু প্রতিভাবান তরুণের নিরলস শ্রম ও মেধা একে তৈরি করে তুলছে। যাকে তিনি 'ধার-করা নকল নির্লজ্জতা' বলছেন তা 'ধার করা' হতে পারে কিন্তু 'নকল' নয়। এই আধুনিক সাহিত্য যে-সব তরুণ সাহিত্যিক সৃষ্টি করে তুলছেন, তাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এই নবীনদের সাহিত্যিক আদর্শের প্রতি তাঁর সংশয় থাকলেও এঁদের লেখালেখির প্রতি তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে যথার্থ ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসার টানেই তিনি এই তরুণ লেখকদের গল্প-কবিতা পড়ছেন, এদের স্বতন্ত্র মেজাজ ও যুগচরিত্রকে নিজের সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

এই পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে তাঁর নিজের ভালো অথবা মন্দ লাগা। সেই ভালো-মন্দকে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করেছেন। মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) এর প্রসঙ্গে বলেছেন—

> মোহিতলাল সাধারণের কাছে ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এইজন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তাড়া-মারা পালোয়ানি নেই।[১১১]

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) বাংলা কবিতায় নতুন কাব্যভাষা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু খাঁটি জহুরির বাংলা কবিতার এই নতুন তারকাকে চিনে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নতুনের সম্ভাবনাকে সেদিন ততখানি বুঝতে পারেননি। জীবনানন্দের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' পড়ে তিনি জীবনানন্দকে লিখেছিলেন—"ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।"[১১২] বুদ্ধদেবের 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি পড়ে তিনি শুধুমাত্র 'চিত্ররূপময়' এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন। যা জীবনানন্দের বৈপ্লবিক কবিভাষার ক্ষেত্রে একটি মামুলি কথা বলেই মনে হয়। আধুনিক কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি, এটা তারই প্রমাণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) 'ধূলিধূসর' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি তাঁর ভালো লেগেছে বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তার নামকরণ তাঁর বিশেষত্বের সঙ্গে মেলেনি বলে মতপ্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিদিনের জীবনের ধূলিধূসর পথে যারা চলে প্রাথমিকভাবে মনে হবে এ তাদেরই কাহিনি। কিন্তু তা নয়।

> অপ্রত্যাশিতের উঁকিমারা মুখ কোথাও বা ব্যঙ্গহাস্যে কোথাও বা দাঁত খিঁচিয়ে দেখা দিয়েছে। সেইটেই তার বিশেষত্ব, ধূলির আবরণটা নয়।...জীবনের এই অন্তর্গূঢ় কৌতুক তোমার প্রায় সব গল্পেই হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। এরা সব আচমকা, একে ধূসরতা বলা যায় না। বইটি পড়ে খুশি হলুম।[১১৩]

প্রেমেন্দ্রর 'প্রথমা' প্রকাশিত হল ১৯৩০ সালে। এই বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমেন্দ্রর বিখ্যাত কিছু কবিতা। যেমন 'সুদূরের আহ্বান' (অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম/চেন

কি তাদের ভাই) অথবা 'কবি' (আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের, মুটে মজুরের/আমি কবি যত ইতরের)। বইটির সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—"তোমার 'প্রথমা'র কবিতাগুলি আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটানো কবিতা—এদের মধ্যে পরুষ অদৃষ্টের অগ্নিস্রাব জমে গিয়েছে।"[১১৪]। কিন্তু এই আগুন-রুক্ষতাই একমাত্রিক নয়, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে আরও লিখলেন—"জীবনের যে ভূভাগে মরুর উত্তাপ পাকা হয় নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে একথা মনে রেখো—কেবল দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।"[১১৫]

অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব, তাঁর কাছের মানুষদের অন্যতম ছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা ও আলোচনার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন অমিয়। বিদেশি সাহিত্য বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য চর্চায় রবীন্দ্রনাথের একান্ত নির্ভরতা ছিল তাঁর প্রতি। চিঠিতে লিখেছেন—

> বর্তমান সাহিত্যে আমার অনভিজ্ঞতা আমি কবুল করি। তাই আমি খুঁজি এমন কোনো পথচারীকে যিনি এ পথের পথিকদের ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, আধুনিক সাহিত্যে যাঁর পরিচয় বই-পড়া পরিচয় নয়, যিনি কাছের থেকে নবীন কবিদের মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছেন।[১১৬]

অমিয়র 'চেতন স্যাকরা'(একমুঠো কাব্যগ্রন্থভুক্ত) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। প্রশংসা করে লিখেছিলেন—"কবিতা রচনায় যথেচ্ছ শৈথিল্যের দ্বারা যাকে সহজ দেখায় সে আবর্জনা, কিন্তু যথার্থ যা সহজ তাই দুঃসাধ্য—তোমার এই লেখায় সেই দুরূহ সহজ অনায়াসের প্রতীতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার এই কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম।"[১১৭] এরপর অমিয় যখন তাঁকে 'একমুঠো' ও 'খসড়া' দুটি কাব্যগ্রন্থ একত্রে পাঠালেন, তখন এই দুটি কাব্যকে আশ্রয় করে ও সেইসঙ্গে কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ বিচার করে 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধ লিখলেন রবীন্দ্রনাথ, নাম 'নবযুগের কাব্য'(চৈত্র, ১৩৪৬)। আধুনিক কবিতায় 'অবচেতনতত্ত্বের' নানা বিভঙ্গের কথা বলে পরিশেষে অমিয় চক্রবর্তীর অনেকগুলি কবিতার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। " 'খসড়া' বইটিতে 'হাসপাতাল' বলে যে কবিতা বেরিয়েছে তার লেখার ছাঁদ একেবারেই আমাদের ধরণের নয় কিন্তু তার মধ্যে যে একটি অনুভূতির রহস্যময় ছবি দেখা দিয়েছে তাকে আদর করে মেনে নিতে হবে।"[১১৮] 'ঘুম' নামক কবিতাটি

রবীন্দ্রনাথের কাছে ছায়াপথের মতো অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে কারণ অর্থস্পষ্টতার প্রতি কবির মমতা নেই। এ-কথা বলেও একটি বিষয়ে তিনি সতর্ক করেছেন—"যেখানে অস্পষ্টতার আবরণ সুন্দরীর ঘোমটার মতো বিশেষ ভাবে রস প্রকাশের সহায়তা করে সেখানে তাকে কবিত্বের খাতিরে মেনে নিতে পারি কিন্তু যেখানে বাণী তার থেকে দুর্গমতায় পৌঁছেছে সেখানে মার্জনা করতে পারব না।"[১১৯] কারণ যেখানে বচন একেবারেই বোধগম্যতার বাইরে সেখানে যিনিই বক্তা তিনিই শ্রোতা, সাহিত্যের সর্বজনীন সভায় তার স্থান নেই। তবে প্রশ্ন এই উঠতে পারে যেখানে একজন পাঠক বুঝতে পারছেন না, সেখানে অন্যদের বোঝবার রাস্তা খালি আছে। গূঢ় কবিতার বোধগম্যতার বিষয়ে পাঠকে পাঠকে ভেদ আছে। এই সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব নয়। তবে সব মিলিয়ে অমিয়চন্দ্রের কবিতার স্বাতন্ত্র্যে কবি আহ্লাদিত হয়েছেন। "এই স্বাতন্ত্র্য সংকীর্ণ পরিধি নিয়ে নয়। এ নয় কেবল যৌন রসভোগের উদবেলতা, এ নয় আঙ্গিকের বিস্ফোরণে ভাষাকে উলটপালট করে দেওয়া। অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে—বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ।"[১২০]

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ আধুনিক লেখকদের মধ্যে একজন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ এবং পত্রালাপ হয়েছিল অনেক বেশি। তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করতেন। তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় লেখাও দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের সাহিত্যিক জ্ঞানের ওপর রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল। বুদ্ধদেবের কিশোর বয়সে লেখা একটি কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন একটি নিবন্ধে। সেটির নাম 'নবীন কবি' (প্রকাশ 'বিচিত্রা', কার্তিক ১৩৩৮)। এই প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, কিছুকাল আগে যখন তিনি ঢাকায় গিয়েছিলেন, সেখানে কিশোর বয়সী বুদ্ধদেব বসুর লেখা তাঁর চোখে পড়েছিল। তার কবিতায় ছন্দ, ভাষা ও ভাবগ্রন্থনের যে পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তাঁর মনে হয়েছিল "কেবল কবিত্বশক্তি নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে, একদিন প্রকাশ পাবে।"[১২১] যে-সময়ে তিনি বুদ্ধদেবের লেখা পড়েছেন সেইসময় আধুনিক নামধারী কবিতাশ্রেণির প্রতি তাঁর সংশয় ছিল পুরোপুরি। এই নিবন্ধেই আছে সেই কথা—

> বোধকরি মহাযুদ্ধের অপঘাতে বা অন্য গভীরতর ভূমিকম্পে ইউরোপের ভিত নড়ে গেছে। সেখানে সাহিত্যে শিল্পে সমাজে বাণিজ্যে আজ সর্বত্রই যে একটা কষ্টকল্পনা দেখা

> যাচ্ছে সেটাকে যদি আমরা উৎকর্ষের লক্ষণ বলে মনে করি তবে প্রদীপের শিখার অন্তিম চাঞ্চল্যকেও তেলের প্রাচুর্যের লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে।[১২২]

কিন্তু বুদ্ধদেবের কবিতায় তিনি 'কষ্টকল্পনার উৎকর্ষ' দেখেন নি। বরং দিলীপকুমার রায় কয়েকটি কাঁচিছাঁটা পাতায় বুদ্ধদেবের যে ছয়টি কবিতা তাঁকে পাঠিয়েছিলেন সেগুলি পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল "জলভরা ঘনমেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।"[১২৩]

অপর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের 'বাসরঘর' উপন্যাসটির প্রশংসা করে বলেছেন, "এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে"[১২৪]। আসলে গল্পহীন গল্প লেখার ধারা তখন জেগে উঠেছিল বাংলা কথাসাহিত্যে। বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও এই ধারায় লিখেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, গোপাল হালদার প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের কলমে এই ধারাটিকে সমর্থন করলেও দুবছর পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন অন্যরকম—"গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যারা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি।"[১২৫]

বুদ্ধদেবের 'যেদিন ফুটল কমল' উপন্যাসটির স্বকীয়তা স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ এর ভাষাভঙ্গি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন—

> পড়তে পড়তে পদে পদে খটকা লেগেছে তোমার ভাষায়। অনেক স্থানেই বাক্যের প্রণালী অত্যন্ত ইংরেজি। মনে মনে ভাবছিলেম, এখনকার যুবকযুবতীরা সত্যিই কি এমনতরো তর্জ্জমা করা ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কয়ে থাকে! কথাবার্ত্তার এ রকম কৃত্রিম ঢংটাতে রসভঙ্গ হয় কেননা তাতে সমস্ত জিনিসটার সত্যতাকে দাগী করে দেয়।[১২৬]

এছাড়াও 'হঠাৎ আলোর ঝলসানি' রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। এটি রম্যপ্রবন্ধের বই কিন্তু 'পড়ে মনে হল লেখাগুলিতে আলোর ঝলক ভালো করে লাগেনি।"[১২৭]

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর বুদ্ধদেব বসুকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্র লিখেছিলেন—"তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেক রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারির দল বাঁধা লেখার মতো হয়নি।"[১২৮] এরপর তিনি ধরে ধরে প্রত্যেকের কবিতা নিয়ে মতামত জানিয়েছেন। স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতা

পদ্যছন্দের মৌতাত কাটাতে পারেনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা ‘তামাসা’য় গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ ভালো লেগেছে। বুদ্ধদেবের তিনটি কবিতা (‘চিল্কায় সকাল’, ‘ঘুমের গান’, ‘বিরহ’) “গদ্যের কণ্ঠে তালমান ছেঁড়া লিরিক কিন্তু ভালো লিরিক”। পৌরাণিক ও ভৌগোলিক উপমার পুনঃপুন ব্যবহার বিষ্ণু দের সাহিত্যিক মুদ্রাদোষ। সমর সেনের কবিতায় ‘গদ্যের রূঢ়তার সঙ্গে কাব্যের লাবণ্য’ প্রকাশ পেয়েছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘নীলিমাকে’ কবিতা ও সুধীন্দ্রনাথের ‘জন্মান্তর’ কবিতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। জীবনানন্দ দাশের ‘চিত্ররূপময় কবিতাটি’(‘মৃত্যুর আগে’) তাঁকে আনন্দ দিয়েছে। সেইসঙ্গে ভালো লেগেছে অজিত দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা।[১২৯]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) কে রবীন্দ্রনাথ সম্মান করতেন কাব্যের মননশীল সমজদার হিসেবে। তাঁর মননশীলতার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই পেয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। সুধীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুহৃদ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র। একবার এক আলোচনার মজলিশে কবিতার ফর্ম ও বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে তর্ক উঠেছিল। তরুণ সুধীন্দ্রনাথ কবিতায় বিষয়গৌরবের মূল্য স্বীকার করতে চাননি। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সকৌতুকে বলেছিলেন—‘তাহলে মোরগের ওপর একটা কবিতা লেখো তো!’। কিছুদিন পরে সুধীন্দ্র ‘কুক্কুট’ নামে একটা কবিতা লিখে আনলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়লেন। পর পর দুবার। মুগ্ধ ও প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, ‘না, তুমি জিতেছ।’ সেই কবিতা নিজেই পাঠিয়ে দিলেন ‘প্রবাসী’তে। এটাই সুধীন্দ্রনাথের প্রকাশিত প্রথম কবিতা।[১৩০]

আধুনিক কাব্যদর্শনকে বোঝার ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথ গভীরভাবে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে রবীন্দ্র-সুধীন্দ্রের দীর্ঘ পত্রবিনিময় হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে জানিয়েছিলেন—

> আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ Lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে গেলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে...সত্যকে নূতনভাবে দেখতে গিয়ে নূতন রূপকের দরকার হওয়া স্বাভাবিক। এই রূপকের অন্বেষণে কবিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মন্থন করতে হতে পারে। শুধু পারিপার্শ্বিক প্রতীক দেখেই যে কবি তুষ্ট সে-কবি অলস।[১৩১]

সুধীন্দ্রনাথের ‘স্বগত’ বইটিতে তাঁর সুগভীর মননশীলতার প্রকাশ দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই বইতে সুধীন্দ্র লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ, ফকনর, স্ট্রেচি, এজরা পাউন্ড, ইয়েটস

প্রমুখ বহু বিদেশি সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই বইটি পড়ে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন।...গদ্যে সুধীন্দ্র মননের আর্টিস্ট। তাঁর লক্ষ্য মুখ্যত রচনার প্রতি, গৌণত পাঠকদের দিকে।...সুধীন্দ্র দেশ বিদেশের নানা সাহিত্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন।...'স্বগত' বইখানির অনেকটা অংশের আলোচনা যথানিয়মে করতে পারিনে। কেননা সুধীন্দ্র তাঁর লেখায় যে সব বিদেশী লেখকদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের অধিকাংশের বই আমি পড়িনি।[১৩২]

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তন্বী' অনেকখানি পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সেই ঋণকে গৌণ করবার জন্যই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন—"কাব্যে তোমার একান্ত স্বকীয়তা আর সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে প্রকাশ পেয়েছে। তোমার কবিতা যেখান থেকেই গয়না নিক না রূপ তো তারই—নিজের চেহারা বন্ধক রেখে সে কিছুই ধার নেয় নি।"[১৩৩]

'তন্বী'র পাঁচ বছর পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ সুধীন্দ্রকে পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—"তোমার কাব্য এসেছে সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত বেশে—স্পর্ধিত আধুনিকতার তারস্বরও তার নয়, সাবেক আমলের মধুর সৌজন্যেরও অভাব আছে।...বাংলা সাহিত্যে তুমি যথার্থই আধুনিক কিন্তু তোমার কাব্য আধুনিকত্বের ভেক ধারণ করতে উপেক্ষা করেছে..."[১৩৪]

আধুনিক সাহিত্যে সুধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অভিনিবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংসভাবে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন—

> যে সব তরুণদের চিত্ত এখনকার যুগের প্রবর্তনায় আলোড়িত আমি তাদের নবজীবনের দৃশ্য দেখছি দূর সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপের মতো। যদি সময় থাকত তাহলে নৌকা বেয়ে সেখানে কিছুদিনের মতো সায়ের করে আসা যেত। মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তাই তোমাদের মতো সিন্ধবাদ নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। সুধীন্দ্র সেই সিন্ধবাদের দলের একজন।[১৩৫]

বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সামান্যই পত্রবিনিময় হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা বোঝবার ভাষা যতখানি সহজগম্য, বিষ্ণু দের কবিতার ভাষা ঠিক ততখানি দুরধিগম্য। কবিতার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেই যুগের সব কবিই কমবেশি করেছেন। কিন্তু বিষ্ণু দে সকলকেই প্রায় ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। বিদেশি পৌরাণিক অনুষঙ্গ, ভূগোল, ধ্রুপদী নানা উপাখ্যানের চুম্বক ও সেইসঙ্গে অভিধানলাঞ্ছিত ভাষা তাঁর কবিতাকে এত দুরূহ করে তুলেছিল যে সাধারণ পাঠক তো বটেই সাহিত্যের অনেক পণ্ডিতের পক্ষেও তাঁর কবিতার অর্থ সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। বুদ্ধদেব বসুর মতো অধ্যাপক কবিও বিষ্ণু দের উদ্দেশে বলেছিলেন—

> 'ক্রতুকৃতম', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ'(এমন আরও আছে) এই সব শব্দ ব্যবহার করে সত্যি লাভটা কোথায়? হয়তো কথাগুলোর জমকালো আওয়াজই প্রীতিকর, কিন্তু শারীরিক আলস্য, অভিধান দেখার বিঘ্ন, এবং সাধারণ অভিধানে হয়তো সব পাওয়াও যাবে না। আপনার কি মনে হয় না যে সৎপাঠক এসব শব্দে প্রতিহত হবে?[১৩৬]

তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসুকে —"এর কবিতা বুঝিয়ে দিতে পারো তো শিরোপা দেব।"[১৩৭]

'কবিতা' পত্রিকায় বিষ্ণু দের কবিতা প্রথম পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'মুদ্রাদোষ' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। 'পঞ্চমুখ' নামে একটি কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথের এমন মনে হয়েছিল। কবিতার প্রাসঙ্গিক পংক্তিগুলো ছিল এইরকম—

"আসবে তো এক সাঁঝে বৈরাগী ঘরছাড়া কেউ

--তোমার হৃদয়পাইনের বনে কী কানাকানি।

...

সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?

আমাদের ভালোবাসা রিফ্লেকস্‌, লিলি।"[১৩৮]

কবিতাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

বিষ্ণু দের কবিত্বশক্তি আছে কিন্তু তাকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে—সেটা দুর্ব্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে কিন্তু এগুলি প্রায়ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে তবে বলতেই হবে এটা জবরদস্তি। ঘাটবাঁধানো দীঘির পাশাপাশি পাইন বনের ছবি আমাদের চোখে স্পষ্ট হতে পারে না। সাইকলজির আকাঁড়া ইংরেজি শব্দ (রিফ্লেকস্) বাংলা কাব্যের জঠরে চালান করতে পারো কিন্তু সেটা হজম না হয়ে আস্ত থেকেই যাবে।[১৩৯]

'ঊর্বসী ও আর্টেমিস' কাব্যটির পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মতদ্বৈধের পরিচয় পাওয়া যায়। বইটি পড়ে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে কে লিখেছিলেন—

তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায় দেখা গেল। কিন্তু প্রথম আরম্ভে জমিটা থাকে এবড়ো-খেবড়ো, সম্পূর্ণ সুগম হয় না, সেটা বোধহয় অপরিহার্য...সৃষ্টিকার্যে নতুন কাল এবং পুরনো কাল দুটো কালকেই এড়িয়ে চলতে হয়—চিরকাল বলে আর একটা কাল আছে সেইটির পরেই ভরসা।[১৪০]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে প্যাঁচ আছে। সাধুবাদের আড়ালে ব্যজস্তুতি আছে। শেষ বিচারক হলেন মহাকাল। সেখানে এই কাব্যের কী গতি হবে, এমন একটা কটাক্ষ যেন এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ১৩ই জুলাই এই চিঠি লিখে তিনি স্বস্তি পাননি। চারদিন পরে ১৭ই জুলাই ফের বিষ্ণু দে কে লেখেন—

তোমাকে চিঠি লেখার পরেই মনে হল বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। আজকাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়েচি—বোধহয় বয়সের প্রভাবে।...চিঠি ডাকে রওনা হওয়ার পর বইখানা আর একবার হাতে পড়ল—দেখলুম কবিতাগুলি এমনতরো সরাসরি বিচারের যোগ্য নয়। এ তাজা মনের লেখা, যৌবনের ঢেউ পাথুরে উপকূলের উপরে উদ্বেল হয়ে উঠচে—কঠিনের সঙ্গে তরলের চলেচে লীলা...একরকম নূতনত্ব আছে যেটা কায়দার নূতনত্ব, সেইটের অতিকৃতিই চোখে পড়ে—আর একরকম আছে যেটাতে মানুষেরই নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে, মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে সেই বিশিষ্টতা আছে![১৪১]

আগের চিঠি থেকে এটা তুলনায় বেশি প্রশংসাগন্ধী। কিন্তু এই কাব্যের মূল রূপবৈচিত্র্য এই সমালোচনায় ধরা পড়েনি। যদিও চিঠির শেষে তিনি বিষ্ণু দেকে সতর্ক করে বলেছেন বিদেশি আদর্শ সামনে রেখে সযত্নে ভঙ্গী অভ্যাস করে নিজের রচনাকে নতুন হাটে চালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস তাঁর নেই, এ তিনি আশা করেন। হাটের হট্টগোল স্থায়ী নয়, তা একদিন ভাঙবে কিন্তু যে কবিতা যুগান্তরের বাণীবাহক তার প্রতিই যেন বিষ্ণু দের কলমের পক্ষপাত থাকে, এমনটাই আশা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বিষ্ণু দের 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থটির পাঠ প্রতিক্রিয়াতেও রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধার পরিচয় স্পষ্ট। বিষ্ণু দেকে লেখা চিঠিতে তিনি কবিতাটিকে দুর্বোধ্য বলেন—"তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছ যে আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে। অভ্যস্ত আদর্শে বিচার করতে পারিনে, অন্য আদর্শ আমার জানা নেই।"[১৪২]

কিন্তু 'স্বগত' গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের আলোচনা পড়ে তিনি আর 'দুর্বোধ্য' বলে একে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন—

> ঐ বইটি এবং ঐ নামের কবিতাটি পড়েছি। বোঝবার এবং ভালো লাগবার একান্ত ইচ্ছা করেছি। বুঝতে পারি নি। কিন্তু নিজের মনের অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে সুধীন্দ্রনাথের মতো অভিজ্ঞ সমজদারের প্রশস্তিবাদ উড়িয়ে দিতে সাহস হয় না। মনে ভাবি তিনি এখনকার কালের যাচাইখানা থেকে যে কষ্টিপাথর পেয়েছেন সে আমার জানার মধ্যে নেই।[১৪৩]

এই চিঠিটিই যখন প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল তখন তার মধ্যে আরও অতিরিক্ত কথা ছিল। সুধীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর সংশয় জেগেছিল। সুধীন্দ্রনাথ 'চোরাবালি'কে রিরংসার কবিতা বলে স্বীকার করেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"সুধীন্দ্র সংশয়কে নিরস্ত করতে গিয়েই তাকে জাগিয়ে দিলেন।...অত্যন্ত রিরংসার বাস্তব চিত্রের অভিযোগ বাঁচাবার জন্যে সুধীন্দ্র এর মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ও ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ করেছেন। মেলাতে পারলুম না।"[১৪৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিষ্ণু দের কবিতা নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা রবীন্দ্রনাথের রয়েই গিয়েছিল। আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব বিষ্ণু দের প্রবর্তনায় রবীন্দ্রনাথের এলিয়ট অনুবাদের কথা বলে। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে (প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়', বৈশাখ, ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথ এলিয়টের কাব্য

নিয়ে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। বিষ্ণু দে তাতে ক্রুদ্ধ হন এবং 'মুগ্ধছন্দের' প্রসঙ্গ তুলে এলিয়টের একটি কবিতা নিজে তর্জমা করে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান এবং অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথ যেন তা সংশোধন করে দেন। এটি যে এলিয়টের কবিতা তা বিষ্ণু দে গোপন রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দের পাঠানো তর্জমা পুনর্লিখন করে দেন। পরে প্রবাসী সম্পাদকের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে সেটি আসলে এলিয়টের কবিতা। তখন তিনি ইংরেজি কবিতা ও অনুবাদটি মিলিয়ে দেখে আরও একবার সংশোধন করে দেন। এলিয়টের উক্ত কবিতার নাম 'The Journey of the Magi'। রবীন্দ্র অনূদিত নাম 'তীর্থযাত্রী', যা 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৪৫]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭৬) এর কবিতা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ অস্থিরচিত্ততার পরিচয় লক্ষ করা গেছে। কামাক্ষীপ্রসাদ তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'মৈনাক'(প্রকাশ ১৯৪০) সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত চেয়েছিলেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে প্রথমে তিনি এলিয়ট, অডেন প্রমুখ আধুনিক ইংরেজ কবিদের রচনায় যুগযন্ত্রণার যে ছবি ফুটে উঠেছে, সে সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করে শেষে কামাক্ষীর উদ্দেশে লেখেন—

> তোমার লেখায় রূপের একটা উন্মেষ দেখা দিয়েছে।...সব জায়গায় বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি, অন্তত আমার বোধের কাছে। মনে হয় যে আঙ্গিককে গ্রহণ করেছ, সেটা তোমার স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহজ হয়ে মেলেনি...বলবার কথা সত্য হয়ে না থাকলে বাঁকা ভঙ্গী দুর্বোধ্যতা বানিয়ে তুলে বাহাদুরি নেয় বটে কিন্তু যথার্থ বলবার কথা যদি থাকে তবে স্বভাবতই সে স্বচ্ছতাকে কামনা করে।...আমার ক্ষীণ দৃষ্টি সত্ত্বেও তোমার বই আরও কিছু পড়ে দেখলুম, পড়বার জিনিস আছে বটে।[১৪৬]

এই চিঠিকে কখনোই প্রশংসা বলা চলে না। আঙ্গিক স্বভাবের সঙ্গে মেলেনি, বাঁকা ভঙ্গি দুর্বোধ্যতা জাগিয়েছে ইত্যাদি সমালোচনার পরেও আবার বলেছেন বইটিতে পড়বার জিনিসও কিছু আছে। তবে কামাক্ষীপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থ 'মৈনাক' পড়ে তিনি কামাক্ষীকে যে চিঠি লেখেন, তা আরও অদ্ভুত। চিঠিটি নীচে উল্লেখ করছি:

> হতবুদ্ধি পাঠকদের অনুরোধে তোমার মৈনাক আবার মন দিয়ে পড়তে হলো...বহু চেষ্টার পর স্বীকার করতে হলো এমন বিস্ময়কর দুর্বোধ্যতা ইতিপূর্বে অল্পই দেখেছি। অমিয়র

উৎসাহ বাক্যে স্থির করেছিলুম এর মধ্যে কাব্যের স্পষ্ট মূর্তি কিছু কিছু আছে। তাঁর সেই বিচারের উপর নির্ভর করে নিজের একান্ত ক্লান্ত দৃষ্টি বাঁচিয়ে তোমাকে যে চিঠি পূর্বে লিখেছি এখন দেখছি সেটা অসঙ্গত হয়েছে, অন্তত আমার মতে।[১৪৭]

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ভালো করে বইটি পড়েননি। অমিয় চক্রবর্তীর কথায় বইটির সম্বন্ধে লিখেছিলেন। পরে আবার নিজের কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। 'বিস্ময়কর দুর্বোধ্যতা' মৈনাক কাব্যগ্রন্থে কতদূর আছে, তাও প্রশ্ন। এই কবিতা যে আদৌ দুর্বোধ্য নয়, তার প্রমাণ হিসেবে কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

" তোমাকে

ভীড়াক্রান্ত আকাশের চির প্রেতলোকে

শতাব্দীর শব্দহীন তরী

এলো আর গেল।

কতবার নীল চোখে মৃত্যু হানা দিল

কতবার! প্রথম প্রণয় শেষ

নিবিড় অরণ্যে শুধু বৎসরের বাসন্তী আবেশ।..."[১৪৮]

এই কবিতাকে কী কারণে রবীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য বলেছেন, তা আমাদের কাছে রহস্য। রহস্য আরও ঘনীভূত হয় যখন দেখি এই চিঠি লেখার মাত্র একুশ দিন পরে বুদ্ধদেব বসুকে তিনি জানাচ্ছেন যে মাসিকপত্রে কামাক্ষীপ্রসাদের লেখা পড়ে তাঁর ভালো লেগেছে—

মাসিকপত্রে তাঁর কয়েকটি লেখা পড়ে দেখলুম সে সরল, আধুনিকতার ফ্যাশন প্রবেশ করে তাদের অস্বাভাবিক মোচড় দেয় নি, তাদের টেরা চোখে দেখতে হয়নি, আমার মতো তিনকূল খোওয়ানো মানুষকেও কবুল করতে হল ভালো লেগেছে।[১৪৯]

এই-সব ঘটনায় আমাদের মনে হয় কামাক্ষীপ্রসাদের 'মৈনাক' বইটি তিনি আদৌ মন দিয়ে পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ করা চলে।

সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ অল্পই। তাঁর কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অনুধাবন করতে পারেননি, একথা তিনি সরাসরি কবুল করেছেন। ১৯৪০ সালে সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হয়। এই বইটি পাঠিয়ে সমর সেন রবীন্দ্রনাথের মতামত চেয়েছিলেন। তার উত্তরে তিনি সমর সেনকে লেখেন–

> তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে সে আমার অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারণের কাছে এর ম্যাপ স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি সুতরাং এখানে তোমার আসন অল্প লোকের কাছেই স্বীকৃত হতে বাধ্য। এখানকার পরিচয় হয়তো ক্রমশ প্রশস্ত হবে কিন্তু যে পর্যন্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমার অভ্যর্থনা বিশেষ রসগ্রাহী মহলেই সংকীর্ণ হয়ে থাকবে–এ অনিবার্য। আমাদের রস সম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এ যুগের নয় ক্ষুণ্ণ মনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই।[১৫০]

রবীন্দ্রনাথ এখানে দুটো কথা বলেছেন। প্রথম, সমর সেন যে ধরণের কবিতা লেখেন তা শুধু তাঁর নয়, সাধারণের কাছেও অস্পষ্ট। তাই তাঁর কবিতার আদর সংকীর্ণ রসগ্রাহী মহলে। দ্বিতীয়, তাঁর কবিতার রসগ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি অনুপযুক্ত কারণ বয়স এবং প্রজন্মের কাব্যরুচিগত তফাৎ। নতুন যুগের কাব্যকে তিনি অনুধাবন করতে পারছেন একথা ক্ষুণ্ণ মনেই স্পষ্ট জানিয়েছেন তিনি।

সুতরাং আধুনিক কবিতা বিষয়ে একদিকে সংশয় অন্যদিকে জিজ্ঞাসা দুই-ই ছিল তাঁর। বিষ্ণু দে কে লেখা চিঠিতে তিনি সংশয় প্রকাশ করছেন যে মহাকালের দরবারে এই নতুন কাব্যাদর্শ অক্ষয় হবে কিনা তা তিনি জানেন না। আবার এই কবিতার বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকেননি। একে জানার, চেনার ও এর রসগ্রহণের আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। সুধীন্দ্রনাথের ভ্রাতা হরীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে তিনি (অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ) অনেক সময়েই তর্ক করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত চিত্তে অনুসন্ধিৎসু তরুণ সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে বিদেশী সাহিত্য, য়ুরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ব্যুৎপত্তি দেখে তিনি মনে মনে সুধীন্দ্রনাথকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন এবং বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন।[১৫১]

আধুনিক কবিতায় যৌবনের তেজ ও মননশীলতাকে বরণ করে নিলেও তিনি এর উৎকট ভঙ্গিসর্বস্বতা, দুর্বোধ্যতা, ক্ষয়িষ্ণু ও মূল্যবোধহীন জীবনকে অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণের আদর্শে তুলে ধরা এ সবের বিরোধিতা করেছেন। শুধু প্রবন্ধে নয়, কখনও কখনও কবিতাতেও। 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের বিখ্যাত কবিতাটির প্রাসঙ্গিক অংশ এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে—

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে

নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে

সে বাণী সত্য হোক,

শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ

সত্যমূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি

ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।[১৫২]

অথবা

মন উড়ুউড়ু চোখ ঢুলুঢুলু

ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—

আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো

ছন্দটা নির্‌বাঁধুনিক।

পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা

বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা

কবি বলে, 'তার কারণ আমার

কবিতার ছাঁদ আধুনিক'।[১৫৩]

কিন্তু এই সবের মধ্যেও শেষ দিকে তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক কবিতার জয়যাত্রা অপ্রতিরোধ্য, অপরিচয়ের সংকোচ নিয়ে একে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। ১৯৩৮ এ প্রকাশিত

কাব্যসংকলন ‘বাংলা কাব্য পরিচয়’ গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—“আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।”[১৫৪] তার চেয়েও বড়ো কথা, জীবনের একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত নানা জনের পাঠানো অথবা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত আধুনিক কবিতা তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়তেন। এর ফল ফলছিল তাঁর নিজের রচনাতেও। শেষ তিন চার বছরের কবিতায় তাঁর লেখনীতেও আধুনিকতার নানা মাত্রা দেখা দিতে শুরু করেছিল। বিষয়ে না হোক, রীতি ও ফর্মের দিক থেকে তিনি যেন আধুনিকতাকে ধরতে চাইছিলেন। ফলে এই শ্রেণির কবিতা নিয়ে সংশয় ও দ্বিধা তিনি যেন ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিলেন। ফলে সংশয় ও দ্বিধার পাশাপাশি অপার কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি তাঁর মনের সজীব গ্রহণশক্তিকে মুক্ত করে রেখেছিলেন আধুনিক কবিতাকে বোঝবার পক্ষে।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে আধুনিক কথাসাহিত্য

আধুনিক কবিতার পাশাপাশি এই আধুনিকতার ধাক্কায় বিশ শতকের গোড়া থেকেই বদলে যেতে থাকে বাংলা গল্প-উপন্যাসের ধরন-ধারনও। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিক ইউরোপীয় মর্বিডিটির নানা ছোঁয়া এসে লাগতে থাকে। ন্যাচারালিজমের ধারা মেনে নুট হামসুন, এমিল জোলা, বালজাক প্রমুখ বিদেশি সাহিত্যিকদের রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে থাকেন বাঙালি কথাকাররা। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ শাসিত বাংলা গল্প-উপন্যাসকে নতুন আদর্শে বদলে দেয় কল্লোল-কালিকলমের গল্প লিখিয়েরা। ন্যাচারিলিজমের নামে বাংলা সাহিত্যে উগ্র হয়ে উঠেছিল ক্ষুধা ও যৌনতার ব্যাপকতা। মানুষের শিশ্নোদর প্রবৃত্তি সাহিত্যে রূপ ধারণ করল। সেই সঙ্গে অবক্ষয়, হতাশা ও অসংযম হয়ে উঠল আধুনিক কথাসাহিত্যের মূল অভিজ্ঞান। আধুনিকতার নামে এই স্বভাবজ অনুবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেননি। পশুরা স্বভাবের দাস, মানুষ তা নয় এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন আর্টের নামে এই কলুষকে। তাঁর কথায়—

> মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য; নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।[১৫৫]

বিষয়ের ক্ষেত্রেও যেমন, প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও এসেছে অস্বাভাবিক জটিলতা। আধুনিকেরা যাকে প্রকাশভঙ্গির নতুনত্ব বলে দাবি করেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছে অর্থহীন ও অত্যন্ত কৃত্রিম।–

> ভাষাটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে-অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম।[১৫৬]

বিদেশি সাহিত্যের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে যা সত্য, বাংলাদেশের পক্ষে তা হুবহু অনুকরণ করা ঠিক নয়। অক্ষম লেখনীর হাতে পড়ে বিদেশি সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণ কেবল পাঁককে মথিত করে তুলছে। বিদেশি রিয়ালিজমকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যভোজের 'কারি-পাউডার'। অপটু লেখকের পাকশালায় যা দিয়ে তৈরি হয় দুটি সুস্বাদ আহার্য, 'দারিদ্র্যের আস্ফালন', 'লালসার অসংযম'। সুতরাং এই ক্ষণিক উত্তেজনাকে প্রতিহত করে সাহিত্যের নিত্য সত্যকেই শাশ্বত বলে মনে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই আদর্শেই তিনি সমকালীন কথাসাহিত্যের সমালোচনা করেছেন।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) 'কল্লোল' বিশেষ করে 'কালিকলম' পত্রিকার লেখক। সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা। প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনকে তিনি সত্যদৃষ্টি নিয়ে তুলে ধরেছিলেন। 'কয়লাকুঠীর দেশ' তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ। তাঁর রচনায় সত্য জীবনদৃষ্টি দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> লেখবার শক্তি তাঁর আছে বলেই তাঁর রচনায় দারিদ্র্য ঘোষণার কৃত্রিমতা নেই। তাঁর বিষয়গুলি সাহিত্যসভার মর্যাদা অতিক্রম করে নকল দারিদ্র্যের সখের যাত্রার পালায় এসে ঠেকেনি।...তাঁর কলমে গ্রামের যেসব চিত্র দেখেছি তাতে তিনি সহজে ঠিক কথাটি বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলবার কারি পাউডারি ভঙ্গীটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি।[১৫৭]

কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'ভঙ্গি দিয়ে না ভোলায় চোখ', সেই ভঙ্গিহীন সত্য জীবনদৃষ্টি শৈলজানন্দের লেখায় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৪-১৯৭৬) 'কল্লোল'এর একজন প্রধান লেখক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'বেদে'। রবীন্দ্রনাথ এই বইটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু লেখকের

দুর্বলতাও ধরিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশগুলো এখানে উদ্ধার করা প্রয়োজন বলে মনে করি—

> তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখ বোধ করেছি কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুণ্য আছে—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি।...যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে তাকেই তুমি নানা দিক থেকে দেখাতে গিয়েছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে তারা এত বুভুক্ষু নয়—অন্তত আমাদের দেশের হিন্দু জনসাধারণ।...নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির যে সহজ উত্তাপ আছে, এদের তা নেই।...এই কারণে আমাদের সাহিত্যে যখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি তখন তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্দম বলিষ্ঠতার পরিচয় পাইনে—সেজন্য ওটাকে অশুচি রোগের মতো মনে হয়।...লালসার অতি-বর্ণনায় আমরা মানুষের যে মূর্তি দেখি সেটা বীভৎস, এরকম রোগবিকারের বর্ণনার স্থান সাহিত্যে নয়, এটা ডাক্তারি শাস্ত্রে শোভা পায়।[১৫৮]

এই চিঠিটি বিশ্লেষণ করলেই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। নরওয়ে দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ তুলেছেন মূলত ন্যুট হামসুন ও যোহান বয়ারের কথা ভেবে। তাঁদের ‘Hunger’ এবং ‘Great Hunger’ দুটি গ্রন্থই রিয়ালিস্ট ও ন্যাচারিলিস্টদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সস্তায় চটকদার বানানোর জন্য যে ‘কারি-পাউডার’ এর কথা ভেবেছিলেন তাঁর দুটি মাত্রার মধ্যে একটি ‘লালসার অসংযম’। অচিন্ত্যকুমারের প্রতিভা আছে যথেষ্ট, তাই তিনি যেন এই সস্তা চটকদারির মোহ ত্যাগ করে চিরজীবী সাহিত্য গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, এটাই তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী ধারার লেখক। তাঁর ‘লঘু-গুরু’ উপন্যাসের এক দীর্ঘ সমালোচনা করেছলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সমালোচনার মূল কারণ বাস্তবতার অভাব। সামাজিক বাস্তবতা নয়, সাহিত্যিক বাস্তবতা। কোনও কাহিনি কল্পিত হতে পারে, কিন্তু লেখক তাঁর মুন্সিয়ানার সাহায্যে সেই কল্পিত কাহিনিকেই পাঠকের কাছে বিশ্বাস্য করে তোলেন। কিন্তু এই উপন্যাসের ‘বিশ্বম্ভর’ ও ‘উত্তম’ চরিত্রে সেই বিশ্বস্ততা রক্ষিত হয়নি।

তাছাড়া এই উপন্যাসকে সমালোচক বাংলার সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরেকার বলেছেন। তাঁর কথায়—

> লঘু-গুরু গল্প সম্বন্ধে যদি জজিয়তি করতেই হয় তবে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবুও আমি নাচার। বলে রাখছি, এ দেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে জীবন কাটালুম, এ উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বললেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতর সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।[১৫৯]

এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজকে লেখক বাঙালি জীবন থেকে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বলেছেন। গল্পটি বিশ্লেষণ করে কারণটাও দেখিয়েছেন। বিশ্বম্ভর মদের উপকরণ জোগাতে তাড়া দেওয়ায় তার গর্ভিনী স্ত্রী পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাতে মারা যায়। এরপর বিশ্বম্ভর উত্তম নামে একটি বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের শিশু সন্তানের বিমাতা পরিচয় দিয়ে ঘরে এনে তোলে। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জীবনের বাস্তবতার অভাব চাক্ষুস করেছেন। "বেশ্যাবিবাহের মতো সমাজবিরুদ্ধ অপরাধ তো তেমন চুপে-চাপে সমাজে পার হয় না।"[১৬০] তাছাড়া উত্তমের চরিত্রও যথেষ্ট স্বাভাবিক হয়নি। যে-মেয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে অভ্যস্ত, সে যে ঘরে ঢুকেই সদ্য গৃহিণীর জায়গা নিতে পারে, সেই ইঙ্গিতটি উত্তমের চরিত্রের মধ্যে নেই। তবে শেষে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবু কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই।...গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্ছে না, এইটেতেই আমার আপত্তি।"[১৬১]

বাঙালিসমাজে বেশ্যা-বিবাহ ও উত্তম চরিত্রটির বাস্তবতা নিয়ে যে-সংশয় রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, তা যুক্তিসংগত বলেই মনে হয়। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত নিজে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রত্যুত্তরে তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন ব্যক্তিগত পরিসর থেকে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ইঙ্গিত করেছেন, লেখক নিজে কাঁটাবন পেরিয়ে ঐ স্থানে (অর্থাৎ বেশ্যালয়ে) উঁকি দিয়ে এসেছেন। এতে জগদীশ গুপ্ত ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—"পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-

কথা না তুলিলেই ভালো হইত, কারণ উহা সমালোচকের ‘অবশ্য দায়িত্বের বাইরে’ এবং তাহার ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’ ছিল না।”[১৬২]।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) সেকালের নামজাদা গদ্যকার। তিনি রিয়ালিজমের অনুসরণ করে বিধবা নারীর প্রেম বিষয় অবলম্বনে ‘তমস্বিনী’ নামে একটি উপন্যাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই উপন্যাসে শিল্পরীতির সৌষম্য খুঁজে পাননি। তিনি রিয়ালিজমের বিরুদ্ধতা করেননি। কিন্তু সেই রিয়ালিজমের পূর্ণ বিকাশ এই গ্রন্থে তিনি খুঁজে পাননি। সেইখানেই তাঁর আপত্তি। এই বইটি সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—

> নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তমস্বিনী পড়ে দেখলাম। ঠিক হয়নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাংলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে এসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি ওরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে।...সেই বিধবা মেয়েটির সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপনই করলেন, তবে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার না করে ছাড়লেন কেন?...সব কথা ভালোভাবে প্রকাশ করতেও পারেননি, ভালভাবে গোপন করতেও পারেননি।[১৬৩]

স্বল্প আবরণের থেকে নির্ভীক অনাবরণ ভালো। রবীন্দ্রনাথ এ কথা অন্য প্রসঙ্গেও বলেছেন। ‘মানবপ্রকাশ’ প্রবন্ধের এক জায়গায় এই প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন—“সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্য সেক্সপীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ-মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল ; কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ”[১৬৪]। ‘তমস্বিনী’ উপন্যাসটিরও দুর্বলতা এইখানেই বলে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮২-১৯৬৪) কিছু গল্প রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। ‘পথের স্মৃতি’, ‘বরদা-ডাক্তার’, ‘জমা-খরচ’—এই তিনখানি বই পড়ে রবীন্দ্রনাথ লেখকের মাত্রাজ্ঞানের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়—

> কোন কোন জায়গায় রঙ চড়িয়েছেন কিছু বেশী মাত্রায়, করুণকে অতি করুণ এবং ভালোকে অতি ভাল করার ইচ্ছায়—কিন্তু বাস্তবকে নিশ্চিত বাস্তন করবার উত্তেজনায়

> তাকে ত্যাড়াবাঁকা অষ্টাবক্র করেন নি যে সেটাতে আরাম পেলুম। শুনেছি পাঠকদের কাছে আপনার লেখা খ্যাতিলাভ করেছে, এটা সুসংবাদ।[১৬৫]

কিন্তু এরই 'মাটীর স্বর্গ' পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হতে পারেননি। হয়তো লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁর বইয়ের বড়ো করে সমালোচনা করার জন্য ; এই জোর খাটানোয় হয়তো তিনি কিছু ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন। সেই অসহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের লেখার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। চিঠির শুরুতেই তিনি বলেছেন—"লেখক আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যে তাঁর এই বইয়ের সমালোচনাটা যেন ইঞ্চির মাপে না হয়ে গজের মাপে হয়।...মাটি দিয়ে গড়া স্বর্গের পরিচয় লেখক উপস্থিত করেছেন, তাতে কোনও ক্ষতি নেই, স্বর্গ যদি মাটি না হয়ে থাকে।"[১৬৬] সেইসঙ্গে কিছুটা কটাক্ষ করে এ কথাও বলেছেন এই উপন্যাসে লেখকের ওরিজিনালিটি প্রায় নেই। অন্য প্রতিভাধর লেখকদের থেকে উপকরণ আহরণ করে বইটি তৈরি।–"ক্ষমতাশালীদের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা উপকরণ জোড়া দিলেই যে ফল পাওয়া যাবে এমন যদি কারও বিশ্বাস থাকে তবে তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন নভেল বানানোর একটা পাকপ্রণালী প্রকাশ করেন।"[১৬৭]

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৬১) লেখার মননশীলতা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে তিনি যে বিশ্বসাহিত্য মন্থন করা মনন দেখতে পেয়েছিলেন, ধূর্জটিপ্রসাদের গদ্যেও তা দেখেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা' পড়ে তিনি তাঁকে লেখেন—

> ভাবতে বললে মানুষ চটে ওঠে, অথচ এই বইয়ের প্রত্যেক পাতায় তুমি লোককে ঠেলা মেরে বলেচ, ভেবে দেখো। এর ফল তুমি পাবে আমার চেয়েও সকাল সকাল, এ আমি তোমাকে বলে রাখচি।[১৬৮]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর বিখ্যাত 'দেবী' গল্পের প্লটটি রবীন্দ্রনাথই তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁর হাস্যরসাত্মক সরস গল্পগুলো রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করেছিলেন। প্রভাতকুমারকে লেখা চিঠিতে তাঁর পরিচয় রয়ে গেছে—

তোমার গল্পগুলি ভারী ভালো। হাসির হাওয়ায় কল্পনার পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব থেকে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মতো।[১৬৯]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' বইটিই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'ভঙ্গিসর্বস্ব' বলে অপছন্দ বলে অপছন্দ করতেন বিভূতিভূষণের লেখা তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল। সত্য দৃষ্টি ও সত্য অভিজ্ঞতাই বিভূতিভূষণের একমাত্র মূলধন। চিরচেনা গ্রামবাংলার চিরচেনা মানুষগুলিকে তিনি লেখনীর জোরে এক ভিন্নতর উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মাত্র একটি উপন্যাস পড়েই এর অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে সুচিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'পরিচয়' পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪০) বেরিয়েছিল এই ছোট্ট অথচ মূল্যবান সমালোচনাটি—

'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটি অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলা পাড়া-গাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে নতুন জিনিস ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তাদরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েচি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই। দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মত সে সুস্পষ্ট।[১৭০]

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা যেমন 'পথের পাঁচালী'কে চিনিয়ে দিচ্ছে তেমনই চিনিয়ে দিচ্ছে বিভূতিভূষণের লেখনীর বিশিষ্টতাকেও।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) লেখা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ পছন্দ করতেন। তারাশঙ্কর বীরভূমের ভূমিপুত্র। গ্রামসেবক ও কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়। তারপর অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। পত্র-যোগাযোগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গ ও সান্নিধ্যের স্মৃতি তারাশঙ্কর তাঁর 'আমার সাহিত্যজীবন' বইতে ধরে রেখেছেন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় বাংলার মাটির গন্ধ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতাই তারাশঙ্করের প্রেরণা। তাঁর লেখার এই নির্ভেজাল খাঁটিত্বই রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

সম্ভবত তারাশঙ্করের 'রাইকমল'(প্রকাশ ১৯৩৭) উপন্যাসটিই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পড়েছিলেন। বীরভূমের সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা, প্রেম ও বঞ্চনা এবং শেষপর্যন্ত বৈষ্ণবীর চরিত্র-মাধুর্য রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। এই গ্রন্থ্ সম্বন্ধে তারাশঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> তোমার বইখানি পড়ে খুশী হয়েছি।...রাইকমল গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে। তাছাড়া এটি ষোল আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছুই নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি গড়ে তোলা সহজ নয়।[১৭১]

এই তিন লাইনের সমালোচনায় উপন্যাসটির অন্তর্বস্তুর বিশ্লেষণ কিছুই নেই। শুধু উপন্যাসের যে সহজ স্বাভাবিকতা আছে তাকেই মূল্য দিয়েছেন সমালোচক।

এর কিছুদিন পরে তারাশঙ্করের দুটো গল্পগ্রন্থ্ প্রকাশ পায়। 'ছলনাময়ী' ও 'জলসাঘর'। এই দুটো গল্পগ্রন্থ্কে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠি দেন। তাতে লেখেন—

> তোমার ছোট গল্পের কয়েকটি আমার ভালো লেগেছে, দু একটা আছে কষ্টকল্পিত। তোমার স্থূল দৃষ্টির অপরাধ কে দিয়েছে জানি না—কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে। তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়ে দেখা দেয়, তাতে বাস্তবের কোমর বাঁধা ভাণ নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি তাতে খুসী হয়েছি। তোমার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।[১৭২]

বিভূতিভূষণকে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তারাশঙ্করকেও প্রকারান্তরে তাই বললেন। অর্থাৎ চলতিকালের ফ্যাসানের কাছে এরা নিজেদের লেখনীকে সমর্পণ করে দেননি। সত্যদৃষ্টি ও বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতাই এইসব লেখার প্রাণ। অকৃত্রিমতাই তারাশঙ্করের রচনার প্রধান সম্পদ। আর তারাশঙ্করের রচনায় স্থূলতার যে অভিযোগের কথা উঠেছে, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

তারাশঙ্করের কথোপকথন হয়। ‘আমার সাহিত্যজীবন’ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধার করছি—

> সেখান থেকে কেমন করে কি জানি কথাটার মোড় ঘুরে গেল—সাহিত্য সমালোচনার প্রসঙ্গের দিকে। ওই, আমার কলমের স্থূলতার অপবাদের কথা উঠল। হঠাৎ যেন রক্তোচ্ছ্বাসে মুখখানি ভরে উঠল। বললেন—ও দুঃখ পাবে। পেতে হবে। যত উঠবে তত তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করবে। এ দেশে জন্মানোর ওই এক কঠিন ভাগ্য। আমি নিষ্ঠুর দুঃখ পেয়েছি।[১৭৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলে তারাশঙ্করকে প্রেরণা দিয়েছেন। এরপর তারাশঙ্করের ‘ডাইনি’ গল্পটি নিয়ে কথা হয়। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার এক পণ্ডিত সাহিত্যিকের কাছে সেই গল্পের প্রসঙ্গ তুললে তিনি শুনেই অবলীলায় বললেন, উইচক্র্যাফট! এ নিশ্চয়ই ইউরোপের গল্প। পড়ে লিখেছে। কিন্তু তারাশঙ্কর জানালেন তাঁর চোখে দেখা স্বর্ণ-ডাইনিকেই এই গল্পে তিনি রূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করলেন তারাশঙ্করকে। বললেন, এদেশের মাটির কথা, মানুষের কথা যে বিশ্বস্ততায় তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলতে পারেন, এমন কেউ না।[১৭৪]

তারাশঙ্করের লেখার প্রতি সপ্রশংস হয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসটির বিরুদ্ধ সমালোচনাই করেছেন। তিনি যাঁর থেকে প্রচুর আশা করতেন, তাঁর ত্রুটি ধরিয়ে দিতেও কসুর করতেন না। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তা দেখতে পাওয়া যাবে। ‘ধাত্রীদেবতা’ পড়ে তারাশঙ্করকে চিঠিতে লিখেছেন—

> গল্প লেখায় তুমি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে, তোমার লেখা আমার বিশেষ ভালো লাগে সে কথা তুমি জানো। আমার সময়ের অভাব, দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল তবুও তোমার ‘ধাত্রীদেবতা’ আনন্দিত কৌতূহলের সঙ্গে পড়তে শুরু করেছিলুম। বইয়ের প্রথম অর্ধেক অংশে তোমার হাতের নৈপুণ্য উজ্জ্বলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেখানেই তোমার গল্পের জন্য উচ্চমঞ্চ গড়ে তুললে সেখানেই সে স্বস্থানচ্যুত স্বভাবভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। মনে হল এ অংশটা যেন অনুরূপা দেবীর লেখা। একশ্রেণীর পাঠকের কাছে তুমি পুরস্কার পাবে কিন্তু সেই পুরস্কার তোমার যোগ্য হবে না। তোমার এই লেখাটিকে পরিমাণে বড় করতে গিয়ে সম্মানে ছোট করেছ, আমার এই অভিমত

ক্ষোভের সঙ্গে তোমাকে জানাতে হল। তোমার রচনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেই তোমাকে দুঃখ দিতে আমি দুঃখবোধ করচি।[১৭৫]

কড়া সমালোচনা। কিন্তু যথার্থ সমালোচনা। তারাশঙ্করের লেখা রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক ভালোবাসেন বলেই তাঁর বিচ্যুতি তাঁকে পীড়া দিয়েছে। 'ধাত্রীদেবতা' গল্পের সূচনাটা উজ্জ্বল কিন্তু উপন্যাসের শেষের দিকে যেখানে একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে বড়ো করে তুলতে গিয়ে উপন্যাসের নায়ক শিবনাথ কারাবরণ করছেন, সেখানে উপন্যাসের শিল্পবস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। শিবনাথের চারিত্র্যকে আদর্শায়িত করতে গিয়ে তাঁর জীবনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে গেছে। অনুরূপা দেবীর প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, তারাশঙ্করের থেকে তিনি আরও বেশি সূক্ষ্মতা ও শিল্পনৈপুণ্য আশা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা তারাশঙ্কর মেনে নেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন—"শিবনাথের মনের চিন্তার রূপ দিতে গিয়ে objectivity ক্ষুণ্ণ হয়েছে ও সস্তা হয়েছে।"[১৭৬]

কিন্তু মোটের ওপর তারাশঙ্করের লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। শ্রীনিকেতনের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিয়েছিলেন তারাশঙ্করের গল্প পড়ে শোনাতে। কারণ তাতে খাঁটি গ্রামের চিত্র আছে।[১৭৭]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) রবীন্দ্র সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কথাকার। সরলাদেবীর সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাস নাম গোপন করে যখন বেরিয়েছিল তখন সকলে ধরে নিয়েছিলেন যে এই লেখা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু পরে যখন রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলে গল্পটি পড়লেন তখন মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—"এঁকে টেলিগ্রাম করে বর্মা থেকে নিয়ে এসো। এমন লেখক চুপচাপ বর্মায় পড়ে থাকবেন, ভালো কথা নয়।"[১৭৮]

জীবনের নানা সময়ে নানা জনকে লেখা চিঠিতে তিনি শরৎচন্দ্রকে বড়ো লেখক বলে, মহৎ লেখক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিককে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রশস্তি করে লিখেছেন—"শরতের লেখা অধিকাংশ গল্পই আমার খুব ভালো লাগে।...পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতায় শরতের তহবিল ভরা—সে তহবিল সে পুরোপুরি খাটাইতেও জানে।..."[১৭৯] আবার প্রবোধকুমার সান্যালকে লেখা চিঠিতে শরৎ সাহিত্যের পাঠ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন—"বিস্মিত আনন্দে

দূরের থেকে পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়দিদি। মনে হচ্ছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল, মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"[১৮০]

রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করলেও তাঁর দুটি বইয়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন। প্রথম 'ষোড়শী' ও দ্বিতীয় 'পথের দাবি'। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী'। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় এই নাটক সেইসময় বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এর নাট্যবস্তুতে খুশি হননি। তাঁর মতে এই নাটকে শরৎচন্দ্র বর্তমান কালের রুচি অনুযায়ী দর্শকদের মন জুগিয়ে চলেছেন। একটি দীর্ঘ চিঠিতে তিনি নিজের মনোভাব বর্ণনা করেছেন—

> ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েছ, এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেছ। যে ষোড়শীকে এঁকেছ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাইরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এইরকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারতো, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারতো, সে এ কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তারূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনের আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম।[১৮১]

আসলে 'সেন্টিমেন্ট' শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাতেই আছে। কিন্তু সেটা কতখানি মাত্রায় ব্যবহার করে শিল্পরূপ অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তা শরৎচন্দ্র জানতেন। 'ষোড়শী' নাটকের কাহিনিতে মেলোড্রামার অনেক উপাদান আছে, সে কথা সত্য। ভৈরবী রূপে ষোড়শী নানা দুর্নাম মাথা পেতে নিচ্ছে, তবুও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের স্বপক্ষে তার অবস্থান। গ্রামের মদ্যপ জমিদারই হল তার পালিয়ে যাওয়া স্বামী। তাকে নিয়ে জেগে উঠেছে তার দ্বন্দ্ব। সেই মদ্যপ জমিদারের মৃত্যু-শয্যায় অবশেষে সে নিজেকে সমর্পণ করে দিল। ষোড়শী গ্রামের ভৈরবী। এই কথাটা যেন একটা রিপোর্টের মতো। নাটকে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। এখানে ষোড়শীর ভৈরবী পরিচয় বাহুল্য মাত্র। ভৈরবী ছাড়াও একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনি হতেও এর কোনও বাধা

ছিল না। আর প্রজাদের পক্ষ নিয়ে ভৈরবীর নাটকীয় আত্মপ্রকাশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন—'লোকরঞ্জনের আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেন্ট।' রবীন্দ্রনাথের মতে এই ফর্মুলায় কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করা যায় না।

শরৎচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই এই সমালোচনা মানতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেছেন—

> আপনি লিখেছেন 'তুমি যদি উপস্থিতকালের দাবি ও ভিড়ের অভিরুচিকে ভুলতে না পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।' আমার ভারী ইচ্ছা হয় আপনার কাছে গিয়ে ঠিকমতো এই জিনিসটা জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবি মানব না বল্লে সেও যে শাস্তি দেয়...[১৮২]

দ্বিতীয় মতভেদ ঘটে, 'পল্লীসমাজ' নিয়ে। ১৯২৬ সালে 'পথের দাবি' বই হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার সেটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। বইটি বাজেয়াপ্ত হলে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এর প্রতিবাদ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজি হননি। কেন রাজি হননি, সে যুক্তি একটি চিঠিতে জানিয়েছেন। চিঠিটি এই—

> তোমার পথের দাবী পড়ে শেষ করেছি। বইখানা উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্তব্যের হিসেবে সেটা দোষের নাও হতে পারে—কেননা লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হনীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করা চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম একমাত্র ইংরেজ গভর্নমেন্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্নমেন্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না।...কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে।...শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।[১৮৩]

বলা বাহুল্য, এই চিঠিটি খুবই বিতর্কিত। চিঠির বক্তব্য ও যুক্তিকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। এই চিঠিতে ইংরেজ রাজকে সহিষ্ণুতা গুণের জন্য রবীন্দ্রনাথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন কিন্তু **১৯১৯** সালে জালিওয়ানাবাগের প্রতিক্রিয়ায় এই ইংরেজ সরকারকে চরম নিষ্ঠুর বলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই দুই অবস্থানকে মেলানো যায় না। আমরা জানি না, কোন্ মানসিকতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন চিঠি লিখেছেন। ইংরেজ সরকারকে আঘাত করতে গেলে প্রত্যাঘাত পেতে হবে, এ জানা কথা। কিন্তু সেই প্রত্যাঘাত কি কর্মফল বলে মুখ বুজে মেনে নেব? তারও তো প্রতিবাদ আবশ্যক। সেই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের কুণ্ঠা কেন, তা বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিটি প্রকাশ না করে শরৎচন্দ্র সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কেন তিনি চিঠিটি প্রকাশ করেননি, সে সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে লিখেছেন—

> তিনি(রবীন্দ্রনাথ) জবাবে আমাকে লেখেন: পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরাজ রাজশক্তির মতো সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই।...তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যাতা নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা। ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এতবড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপবার জন্যই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এতবড় সার্টিফিকেট এখুনি স্টেটসম্যান প্রমুখ ইংরেজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে, এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।[১৮৪]

রবীন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে আর একটি চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা তিনি পাঠাননি। এই না পাঠানো চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যথার্থ ক্ষোভ ধরা পড়ে। তিনি লিখেছিলেন—

> আপনার(রবীন্দ্রনাথের) পত্র পেলাম।...আপনি লিখেছেন ইংরেজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যা আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয়, করতেই হবে।...কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়?...ইংরেজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justification ও তেমনি

আছে। আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়।[১৮৫]

এই মনান্তর পেরিয়েও উভয়ের প্রীতির সম্পর্ক ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন সর্বত্র। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন দিলীপকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথ সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা সেখানে লেখেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কথায়—

> The latest of the leaders who, through this path of liberation, has guided Bengali novels nearer to the spirit of modern world literature is Sarat Chandra Chatterjee. He has imparated a new power to our language and in his stories has shed the light of a fresh vision upon the two familier region of bengal's heart revealing the living significance of the obscure trifles in people's personality. He has achieved the best reward of a novelist, he has completely won the hearts of Bengali readers.[১৮৬]

অন্যদিকে নানা মতান্তর ও মনান্তর সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র তাঁর হৃদয়ের কতখানি উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অমল হোমকে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি পড়লে। যেখানে তিনি লিখেছেন—

> কবির সম্বন্ধে আমি কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই, আমার চাইতে তাঁকে কেউ মানেনি গুরু বলে—আমার চাইতে কী বেশি মকসো করেনি তাঁর লেখা।...আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা পড়ে ভালো বলে, সে তাঁরই জন্য। এ সত্য পরম সত্য।[১৮৭]

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৩৭ সালে তাঁর একষট্টি বছরের জন্মতিথি পালনের জন্য এক জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়। সে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে একটি লিখিত ভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব

দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন যার দ্বারা বাঙালি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে নিজেকেই প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরেছে। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছেন কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পাননি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি বাংলার সব সাহিত্যিকের ঈর্ষাভাজন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে ছোট্ট চার লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন, তাতে সর্বসাধারণের মনে শরৎচন্দ্রের অবাধ অধিকারের কথাই ছিল—

“যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তাকে রাখিয়াছে বরি।”[১৮৮]

সমসময়ে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি স্মরণীয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—“লেখার মধ্যে দিয়ে আমি শরৎচন্দ্রকে বুঝেছি। যে শক্তিতে দেশের হৃদয় তিনি জয় করেছিলেন, সে শক্তি আমার ছিল না। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।”[১৮৯] শরৎচন্দ্রের লেখনীপ্রতিভাকে স্বীকার করেও তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফাঁকটুকু ধরা আছে এই চিঠিতে।

নারী সাহিত্যিকদের রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বাংলাদেশের নারী সাহিত্যিকদের রচনাপ্রতিভা ও নৈপুণ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি খুব উদার ছিল না। অবশ্য উনিশ শতকের বাংলায়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে মেয়েদের সাহিত্য রচনা সমাজে বেশ ব্যতিক্রমী বলে গণ্য হত। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—“তখন দৈবাৎ যে দু-একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত।”[১৯০] লেখালেখি বা সাহিত্য-সৃষ্টির জগৎ যে তাঁর সমসময়ে মেয়েদের পক্ষে

খুব একটা অনুকূল ছিল না, এমন একটা ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল। নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন—

> আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কবিত্বশক্তি থাকিলেও তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। তাঁহারা অন্তঃপুরে যে পারিবারিক গণ্ডিটুকুর মধ্যে বদ্ধ থাকেন সেখানে জীবনের অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ এবং সেখানে কল্পনাবৃত্তি প্রসারতা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া নানা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যরচনার সহিত পরিচয়ের দ্বারা চিত্তবৃত্তির যে স্ফূর্তি ঘটে আমাদের মেয়েদের সে সুযোগও অতি অল্প। এইজন্য আমাদের লেখিকাদের কবিতা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে দুর্ব্বলভাবে বিচরণ করে—তাহার মধ্যে সরলতা ও কোমলতা থাকে কিন্তু যথেষ্‌ট শক্তি থাকে না।[১৯১]

কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) সমসময়ের একজন বলিষ্ঠ মহিলা কবি। 'আলো ও ছায়া' তাঁর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু কামিনী রায়ের কবিত্বশক্তি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে কিন্তু তাতে আগুন ধরে নি।"[১৯২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কামিনী রায়ের কবিতার ভাষায় শক্তি ও বলিষ্ঠতার বেশ অভাব ছিল। মেয়েদের সাহিত্য-প্রতিভা ও রচনাশক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনেকক্ষেত্রেই পুরুষালি আত্মম্ভরিতা (Male Chauvinism) এর পর্যায়ে পড়ে। যেমন রাণী চন্দকে একবার তিনি বলেছিলেন "পুরুষের ব্রেন আর শক্তি ঢের বেশি মজবুত। ধর না কেন আমি যদি আমার ন-দিদি হতুম তবে কি এমনি করে আমার জায়গায় আমি উঠতে পারতুম?"[১৯৩]

রবীন্দ্রনাথের ন-দিদি অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল বিচিত্র। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিভা, তাঁর গল্প লেখবার মুন্সিয়ানা রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীর 'লজ্জাবতী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে সপ্রশংস সমালোচনা করেন। বলেন, "এ রচনাটি ছোটোগল্পের আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি একটি বাঙালী অন্তঃপুরবাসিনীদের জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনোপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গী করিয়া বসান হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে।"[১৯৪] কিন্তু পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী সম্বন্ধে একেবারে বিপরীত অবস্থান নেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ার পর স্বর্ণকুমারী ওঁর 'ফুলের

মালা' উপন্যাসটির অনুবাদ ও বিলেতে এই অনুবাদটি প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য চাইলে তিনি পত্রপাঠ সেই অনুরোধ খারিজ করে দেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই ধরণের উপন্যাস পাশ্চাত্যের পাঠকেরা কখনোই গ্রহণ করবে না। এ সম্বন্ধে ভাইঝি ইন্দিরাকে তিনি চিঠিতে লেখেন, "নদিদি আমাকে তাঁর 'ফুলের মালা'র তর্জ্জমাটা পাঠিয়েছিলেন। এখানকার সাহিত্যের বাজার যদি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এসব জিনিস এখানে কেন কোনোমতেই চলতে পারে না। এরা যাকে reality বলে সে জিনিসটা থাকা চাই।"[১৯৫] কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস যে বিলেতি পাঠকসমাজ গ্রহণ করেনি তা নয়। স্বর্ণকুমারী তাঁর 'কাহাকে' উপন্যাসটি 'An Unfinished Song' নামে নিজেই অনুবাদ করেন এবং লন্ডনের প্রখ্যাত প্রকাশক সংস্থা সেটি প্রকাশ করেন। এমনকি উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল, যা বিলেতি পাঠকসামজে তাঁর জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।[১৯৬] তবে রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁর আপন দিদির উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে এতখানি অসহিষ্ণু হয়েছিলেন তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে দুষ্কর ; ব্যক্তিগত সম্পর্কের নেপথ্যলোকেই সে কারণ নিহিত আছে।

স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলা দেবীকেও (১৮৭২-১৯৪৫) সাহিত্যচর্চায় গভীরভাবে উৎসাহিত করেছিলেন মামা রবীন্দ্রনাথ। সরলার রচনার প্রশংসা করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন। সরলা দেবীর আত্মকথা 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে জানা যায়, 'ভারতী' পত্রিকায় সরলা 'প্রেমিক সভা' বলে একটি অসাক্ষরিত হাস্যরসাত্মক লেখা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ সরলাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিলেন—"নতুন হাতের লেখার মত নয়, এ যেন পাকা প্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা। এ যদি আমারই লেখা লোকে ভাবত আমি লজ্জিত হতুম না। এত বড় সমাদরে আমি [সরলা দেবী] লজ্জায় আহ্লাদে মৌন হয়ে গেলুম।"[১৯৭] পরবর্তীকালে পারিবারিক নানা জটিলতায় সরলার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি দূরত্ব তৈরি হয়।

রাধারানী দেবীর (১৯০৩-১৯৮৯) রচনার গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাধারানী অনেক লেখাই অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে লিখতেন। রাধারানীই যে অপরাজিতা রবীন্দ্রনাথ তা কোনওদিন জানতে পারেননি। রাধারানীর কলমে বাংলা প্রেমের কবিতা যে নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে ফুটে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিল। রাধারানীকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—"তোমার লেখার যে ভঙ্গী, যে রঙ্গ, যে কটাক্ষ, হাসির যে কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র

নাট্যলীলা, বাংলাসাহিত্যে আর কারো কলমে সেটা এমন করে চঞ্চল হয়ে ওঠে নি।"[১৯৮] তবে নির্ভেজাল প্রশংসাই শুধু নয়, অন্য একটি চিঠিতে সেই সঙ্গে তাঁকে এই কথাও স্মরণ করিয়েছেন—"এইরকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাইটি ভার্সেস। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প...তোমার কাব্যে পাখার লীলা দেখলাম কিন্তু পাখীর গানও শুনতে চাই।"[১৯৯] পাখার লীলা ও পাখির গান এই দুটি কথার মধ্যে দিয়ে আসলে রবীন্দ্রনাথ রচনার এক বিশেষ শ্রেণিচরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রচনার কৌশলের পাশাপাশি রচনার গভীরতাই রাধারানীর থেকে তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর (১৮৭৩-১৯৬৭) কবিতা ও গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছোটোগল্পের সংকলন 'দেহলি'র নামকরণ করেন তিনি। লেখেন—"বাংলাদেশের ছোটো বড়ো নানা গ্রামে পল্লীতে তুমি ভ্রমণ করেছ, সেই উপলক্ষ্যে তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার অভিজ্ঞতাকে বিচিত্র করে তুলেছে, তোমার গল্পগুলি সেই অভিজ্ঞতার চিত্রপ্রদর্শনী।"[২০০]

অনিন্দিতা দেবী (১৮৭৬-১৯৪১) গল্প-কবিতা লেখেননি। তিনি প্রাবন্ধিক। বঙ্গনারী ছদ্মনামে তিনি বলিষ্ঠ নারীবাদী প্রবন্ধ লিখতেন।.১৯২১ থেকে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা প্রবন্ধগুলি 'আগমনী' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ-সংকলনকে অভিনন্দিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—"তুমি বোধ হয় জানো মেয়েদের দুঃখ ও অবমাননায় চিরদিন আমি বেদনা ও লজ্জা বোধ করি।... কিন্তু এই দুর্গতির যথার্থ প্রতিকার মেয়েদের হাতে। তারা যেদিন নিজের অধিকারের মর্যাদা সমস্ত মন দিয়ে অনুধাবন করবে সেদিন সে মর্যাদা কেউ খর্ব করতে পারবে না। তাই মনে করি তোমার লেখার আগমনী আমাদের দেশের মেয়েদের মনে আত্মশক্তির উদ্বোধনের কাজ করবে।"[২০১]

প্রসন্নময়ী দেবীর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫) রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা ছিলেন। সমসাময়িক নারী-লেখিকাদের মধ্যে তাঁর রচনার স্বকীয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁর কবিতার বই 'চম্পা ও পাটল'এর ভূমিকায় প্রিয়ম্বদার রচনার সেই বিশেষ দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"বিশ্বপ্রকৃতির সংস্পর্শে প্রিয়ম্বদার সচেতন মন যে আনন্দ পেয়েছিল কাব্যে সে প্রতিফলিত হয়েছে জলের উপরে যেন আলোর বিচ্ছুরণ, আর জীবনে যত সে পেয়েছে দুঃসহ বিচ্ছেদ বেদনা, কাব্যে তার একান্ত আবেগ দেখা দিয়েছে নারীর অবারণীয়

অশ্রুধারার মতো। বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ম্বদার কবিতা স্বকীয় আসন রক্ষা করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।”[২০২]

আশালতা সিংহের (১৯১১-১৯৮৩) রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটেছিল ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায়। আশালতার প্রথম উপন্যাস ‘অমিতার প্রেম’ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এই লেখাটির বিস্তারিত সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই বলেন পুরুষ লেখকের দৃষ্টিতেই নারীচরিত্রকে দেখতে ও বিচার করতে সাধারণ বাঙালি পাঠক অভ্যস্ত কিন্তু নারীলেখক আশালতা যেভাবে তাঁর উপন্যাসের নায়িকা অমিতাকে এঁকেছেন তা পুরুষবুদ্ধির অতীত। অমিয় ও অমিতার মধ্যে যখন বিচ্ছেদ ঘটেছে, তখন অমিয় তার বাবাকে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিল। অমিতা সেইসব চিঠি লুকিয়ে পড়তে গিয়ে দেখল প্রতি চিঠিতেই অমিতার জন্য অমিয়র মনে প্রবল উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। এই দেখে অমিতার মনে তীব্র ধিক্কার জন্মেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন, “এটা সম্ভব কিনা তা বিচার করব কী করে? নিজেকে অমিতা বলে কল্পনা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি যদি অমিতা হতুম তবে ওইটেতেই আমাকে প্রবল আনন্দ দিত। যে-কোনো ভদ্র পুরুষ তার সম্বন্ধে অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা বোধ করছে এটা কোনো মেয়ের পক্ষেই বিতৃষ্ণাজনক হতে পারে বলে তো মনে হয় না।”[২০৩] মনস্তত্ত্বপ্রধান এই উপন্যাসে অমিতার মনের আগুনকে জ্বালিয়ে তোলার জন্য যে পৌরুষের দরকার, অমিয়র মধ্যে প্রথম থেকে সে পৌরুষ লেখিকা আনেন নি, তাই মনস্তত্ত্বের সঙ্গে চারিত্র্য-বাস্তবতার পুরোপুরি সামঞ্জস্য ঘটেনি বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন।

অবশ্য আশালতার এটি প্রথম উপন্যাস। এরপর তাঁর কলমের শক্তি আরও বেড়েছে। আশালতার সাহিত্যিক বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বা আর্টের কলা-কৌশল নিয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। একটি চিঠিতে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে তিনি আশালতাকে লিখেছেন—“সাহিত্যের প্রধান কারিগরি তার বাছাই কাজে, তার পরিমাণে, তার সংস্থান নৈপুণ্যে, তার সমগ্রতার সংঘটনে। উপকরণের মূল্যে বা নির্বিকার আড়ম্বরে যে লোক ভোলাতে চায় তার আভিজাত্যবোধ নেই। বিজ্ঞানের আভিজাত্য সত্যের বিশুদ্ধিতে আর সাহিত্যের আভিজাত্য রসের বিশুদ্ধিতে।”[২০৪] রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচারের এইটিই মূল অভিজ্ঞান।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সরযূবালা দাশগুপ্তের শোক-আখ্যান ‘বসন্ত প্রয়াণ’, মৈত্রেয়ী দেবীর কাব্যগ্রন্থ ‘উদিতা’, উমা দেবীর কাব্যগ্রন্থ ‘বাতায়ন’ এর ভূমিকা রচনা করেন। ব্যক্তিগত স্নেহ-সম্পর্কের আবরণ পড়ে সেগুলিতে সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় খুব একটা পাওয়া যায় না; সত্যের খাতিরে সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃ-৭৮।

২. তদেব, পৃ-৭৮।

৩. তদেব, পৃ-৭৭।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্য সাধক চরিতমালা,* খণ্ড-৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫১ ব, পৃ-১৫।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৭৭।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘গীতিকাব্য’, *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-৬২০।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২১, পৃ-২১৫।

৮. তদেব, পৃ-২১৫।

৯. তদেব, পৃ-২১৫-২১৬।

১০. তদেব, পৃ-২১৬।

১১. এঁর পুরো নাম হিপ্পোলাইট টেইন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসকার। ফরাসি ভাষায় লেখা এঁর মূল বইটির নাম ‘Historie De La Literature Englaise’।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা...’, পূর্বোক্ত, পৃ-২১৬।

১৩. তদেব, পৃ-২১৭।

১৪. তদেব, পৃ-২১৭।

১৫. তদেব, পৃ-২১৭।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ-৭২-৭৩।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভুবনমোহিনীপ্রতিভা···’, পূর্বোক্ত, পৃ-২২০।

১৮. তদেব, পৃ-২২০।

১৯. তদেব, পৃ-২২০

২০. তদেব, পৃ-২২০

২১. তদেব, পৃ-২২১

২২. তদেব, পৃ-২২১

২৩. অলোক রায়, *উনিশ শতকের নবজাগরণ, স্বরূপ সন্ধান*, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৯, পৃ-৩৬৯।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রাজা রামমোহন রায়’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ-৪২৯।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, *আধুনিক সাহিত্য*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩০।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘চারিত্রপূজা’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৯।

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রাজা রামমোহন রায়’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৮, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩০।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামমোহন রায়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* শতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১, একাদশ খণ্ড, পৃ-৩৯৬-৩৯৭।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০০।

৩০. তদেব, পৃ-৩০০।

৩১. রামমোহন রায়, *রামমোহন রচনাবলী,* হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ-৭।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামমোহন রায়', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* একাদশ খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৬১, পৃ-৪১৬।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতপথিক রামমোহন', *চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১১।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩১।

৩৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন,* শৈব্যা পুস্তকালয়, ১৯৫৮, পৃ-১০।

৩৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', *চারিত্রপূজা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮২।

৩৭. তদেব, পৃ-৮১।

৩৮. রামমোহন রায়, *রামমোহন রচনাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', পূর্বোক্ত, পৃ-৮১।

৪০. তদেব, পৃষ্ঠা-৮২।

৪১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মেঘনাদবধ কাব্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৩।

৪৩. তদেব, পৃ-২২৬।

৪৪. তদেব, পৃ-২৫৪।

৪৫. দ্রষ্টব্য, ‘ভারতী’, আশ্বিন, ১২৮৯ ব, পৃ-৯৬।

৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, পূর্বোক্ত, পৃ-২২৬।

৪৭. তদেব, পৃ-২৫৪।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মেঘনাদবধ কাব্য *সমালোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-২০৩।

৪৯. তদেব, পৃ-২০৪।

৫০. তদেব, পৃ-২০৪।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৫।

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যসৃষ্টি’, *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯৬।

৫৩. তদেব, পৃ-২৯৬।

৫৪. দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বউ ঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৮, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৯।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বঙ্কিমচন্দ্র’, *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩২।

৫৬. তদেব, পৃ-৩৩২।

৫৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-৬৭।

৫৮. দ্রষ্টব্য, ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন, *বঙ্কিম রচনাবলী,* খণ্ড-২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৫, পৃ-৫৭২।

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২০।

৬০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২২।

৬১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রাজসিংহ’, *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৯।

৬২. তদেব, পৃ-৩৮০।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘অবতরণিকা’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১, বিশ্বভারতী, ১৩৪৬, পৃ-১২।

৬৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘হিন্দুধর্ম্ম’, *বঙ্কিম-রচনাবলী,* খণ্ড-৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৬।

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ-৯৭৬।

৬৬. সরলা দেবী, *জীবনের ঝরাপাতা,* রূপা এন্ড কোম্পানি, ১৯৫০, পৃ-৩৪-৩৫।

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কৃষ্ণচরিত্র’, *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬৪।

৬৮. তদেব, পৃ-৩৭৪।

৬৯. তদেব, পৃ-৩৭২।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ব্যক্তি প্রসঙ্গ’, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* খণ্ড-৩১, বিশ্বভারতী, ১৪০৭ ব, পৃ-২১৩।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৪।

৭২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সঞ্জীবচন্দ্র’, *আধুনিক সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫৫।

৭৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বিহারীলাল’, তদেব, পৃ-৩৩৭।

৭৪. তদেব, পৃ-৩৩৭-৩৩৮।

৭৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘মন্দ্র’, তদেব, পৃ-৩৯৪।

৭৬. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *মন্দ্র,* কুন্তলীন প্রেস, ১৩০৯ ব, পৃ-৬৩।

৭৭. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা) *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ-৩৯।

৭৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আষাঢ়ে', *আধুনিক সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৯৩।

৭৯. তদেব, পৃ-৩৯২।

৮০. দ্রষ্টব্য: দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা) *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩১-৩২।

৮১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ফুলজানি', *আধুনিক সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৪।

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যুগান্তর', তদেব, পৃ-৩৮২।

৮৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শুভবিবাহ', তদেব, পৃ-৩৯৬।

৮৪. তদেব, পৃ-৩৯৫।

৮৫. তদেব, পৃ-৩৯৭।

৮৬. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *বেণু ও বীণা,* সমাজপতি ও বসু কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৩ ব, পৃ-১।

৮৭. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* নিউ এজ, ২০০৯, পৃ-৫৭।

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৪, বিশ্বভারতী, ১৪০৭ ব, পৃ-১৫৩।

৮৯. তদেব, পৃ-১৫৪।

৯০. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, *কাব্যসঞ্চয়ন,* প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১২, পৃ-১৪।

৯১. কালীচরণ মিত্র, 'কবি সত্যেন্দ্রনাথ', 'বিচিত্রা', ১৩৩৭ আষাঢ়, পৃ-৯০-৯১।

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৪, পূর্বোক্ত, পৃ-১৫৫-১৫৬।

৯৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত', *পূরবী, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৬৩।

৯৪. দ্রষ্টব্য : বিশ্বনাথ রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', কোরক, বইমেলা ১৪০৫ সংখ্যা, পৃ-১৩-২১।

৯৫. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৪-১৪৫।

৯৬. তদেব, পৃ-১৪৫।

৯৭. 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী ছাপা হয়েছিল।

৯৮. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *যাত্রী,* অভিযান পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৭ ব, পৃ-১৪৪।

৯৯. গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্র পত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী,* আশাদীপ, ২০১৮, পৃ-১০৪।

১০০. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯।

১০১. গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্র পত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী,* পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৩।

১০২. যতীন্দ্রমোহন বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য,* বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, ১৩৫৪ ব, পৃ-১১২।

১০৩. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৩।

১০৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আশীর্বাদী', *পরিশেষ (সংযোজন অংশ), রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৮৮।

১০৫. গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্র পত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী,* পূর্বোক্ত, পৃ-৭২১।

১০৬. বলাইলাল মুখোপাধ্যায়, 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ও কবি করুণানিধান', *করুণা আরতি,* শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৩০।

১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৩, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৯।

১০৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ,* ডি এম লাইব্রেরি, ১৩৫৭ ব, পৃ-১৩১।

১০৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবির অভিভাষণ' *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ ব, পৃ-১৯৬।

১১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যধর্ম', তদেব, পৃ-৮২-৮৩।

১১১. দ্রষ্টব্য, 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ব, পৃ-১৫।

১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৬, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ-৯।

১১৩. দ্রষ্টব্য : দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃ-১৪।

১১৪. দ্রষ্টব্য : 'পূর্বাশা', রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৯৪১, পৃ-৩০।

১১৫. তদেব, পৃ-৩১।

১১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১১, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪, পৃ-৩৬০।

১১৭. তদেব, পৃ-৩১২।

১১৮. তদেব, পৃ-৩৬৭।

১১৯. তদেব, পৃ-৩৬৮।

১২০. তদেব, পৃ-৩৭২।

১২১. 'বিচিত্রা', কার্তিক সংখ্যা, ১৩৩৮ ব, পৃ-৯৭।

১২২. তদেব, পৃ-৯৮।

১২৩. তদেব, পৃ-৯৮।

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৬, বিশ্বভারতী, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৫।

১২৫. তদেব, পৃ-৩৭০।

১২৬. তদেব, পৃ-১২০।

১২৭. তদেব, পৃ-১২৭।

১২৮. তদেব, পৃ-১২১।

১২৯. দ্রষ্টব্য : বুদ্ধদেব বসুকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৪ নম্বর চিঠি। *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৬, বিশ্বভারতী, পূর্বোক্ত, পৃ-১২২-১২৩।

১৩০. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৮৭।

১৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৬।

১৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১১, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৯।

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-৩২।

১৩৪. তদেব, পৃ-৬৬-৬৭।

১৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-১১, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৪।

১৩৬. বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল,* নিউ এজ, ২০১০, পৃ-৭৮।

১৩৭. বুদ্ধদেব বসু, *সব পেয়েছির দেশে,* কবিতা ভবন, ১৯৪১, পৃ-৮।

১৩৮. দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব বসু (সম্পা) 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪২, পৃ-৯-১১।

১৩৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৩।

১৪০. তদেব, পৃ-২১৫-২১৬।

১৪১. তদেব, পৃ-২১৭।

১৪২. তদেব, পৃ-২১৯।

১৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* খণ্ড-১১, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬০।

১৪৪. তদেব, পৃ-২৬৫।

১৪৫. এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা পাওয়া যাবে *চিঠিপত্র* ষোড়শ খণ্ডের (বিশ্বভারতী, ১৪০২) সম্পাদকীয় টীকায়। দ্রঃ পৃ-৪৩৮-৪৪৫।

১৪৬. দ্রষ্টব্য : 'শারদীয় দেশ', ১৩৮১, পৃ-১০।

১৪৭. দ্রষ্টব্য : 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২, পৃ-২২।

১৪৮. কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *মৈনাক,* কবিতা ভবন, ১৯৪০, পৃ-৯।

১৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র* খণ্ড-১৬, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪৮।

১৫০. তদেব, পৃ-২৪৬।

১৫১. হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয় এর প্রকাশ', *উত্তরসূরী,* শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৯ ব, পৃ-৬২।

১৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '১০ সংখ্যক কবিতা', *জন্মদিনে, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯৩।

১৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '২৫ সংখ্যক কবিতা', *খাপছাড়া, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৪, পূর্বোক্ত, পৃ-৫০৭।

১৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পা), 'ভূমিকা', *বাংলা কাব্যপরিচয়,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৩৮। পৃ-৪।

১৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যধর্ম', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮১।

১৫৬. তদেব, পৃ-৮৬।

১৫৭. দ্রষ্টব্য : 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ ব, পৃ-১৪৭।

১৫৮. দ্রষ্টব্য : 'কল্লোল', বৈশাখ, ১৩৩৬ ব, পৃ-৭।

১৫৯. জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী,* গ্রন্থালয়, ১৩৬৫ ব, পৃ-৬৩৭-৩৮।

১৬০. তদেব, পৃ-৬৩৮।

১৬১. তদেব, পৃ-৬৪০।

১৬২. তদেব, পৃ-৬৪১।

১৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* খণ্ড-৮, বিশ্বভারতী, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৮।

১৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানবপ্রকাশ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৪৯।

১৬৫. অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, *অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৩৬০ ব, পৃ-৩।

১৬৬. 'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ ব, পৃ-১৬০।

১৬৭. তদেব, পৃ-১৬০।

১৬৮. দ্রষ্টব্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শতবর্ষ সংস্করণ, ১৪শ খণ্ড, ১৯৬১, পৃ-৯৬০।

১৬৯. দ্রষ্টব্য: 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৭৫, পৃ-১৭৬।

১৭০. দ্রষ্টব্য: 'পরিচয়', বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৪০ ব, পৃ-৬১।

১৭১. দ্রষ্টব্য: 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২ ব, পৃ-৯।

১৭২. তদেব, পৃ-৯।

১৭৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্যজীবন,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬০ ব, পৃ-১২২।

১৭৪. তদেব, পৃ-১২৩।

১৭৫. দ্রষ্টব্য: 'দেশ সাহিত্য সংখ্যা', ১৩৮২ ব, পৃ-১০।

১৭৬. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯।

১৭৭. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্যজীবন,* পূর্বোক্ত, পৃ-১২১।

১৭৮. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি,* শিশির পাবলিশিং হাউস, ১৩৬৪ ব, পৃ-৯৭।

১৭৯. ১৯১৯ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে এই চিঠি লেখেন। দ্রষ্টব্য: গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্রপত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী,* পূর্বোক্ত, পৃ-৩১২।

১৮০. দ্রষ্টব্য: 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৪৪ ব, পৃ-৫৮৫।

১৮১. দ্রষ্টব্য: 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৩৫৬ ব, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, পৃ-৯৭।

১৮২. গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), *শরৎ-পত্রাবলী,* পারুল প্রকাশনী, ২০০০, পৃ-১৯৭।

১৮৩. দ্রষ্টব্য: 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৩৫৬ ব, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, পৃ-৯৬।

১৮৪. গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), *শরৎ-পত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৫।

১৮৫. তদেব, পৃ-৪১৯।

১৮৬. পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ,* পূর্বোক্ত, পৃ-৫৬।

১৮৭. গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), *শরৎ-পত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃ-২০১।

১৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ব্যক্তিপ্রসঙ্গ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৩১, বিশ্বভারতী, ১৪০৭ ব, পৃ-৩২২।

১৮৯. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫০ ব, পৃ-৯৭।

১৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৭, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯০।

১৯১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র,* ৭ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯ব, পৃ-১৬১।

১৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৭০।

১৯৩. রানী চন্দ, *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ,* বিশ্বভারতী, ১৩৪৯ব, পৃ-৪১।

১৯৪. দ্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *সাধনা,* অগ্রহায়ণ ১২৯৮ব, পৃ-৮৪।

১৯৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র, খণ্ড-৫,* পূর্বোক্ত, পৃ-২৫।

১৯৬. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ-৩৫৫।

১৯৭. সরলা দেবী, *জীবনের ঝরাপাতা,* পূর্বোক্ত, পৃ-১০০।

১৯৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, *কথাসাহিত্য,* আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭৬ব, পৃ-১২৭৬।

১৯৯. তদেব, পৃ-১২৭৫।

২০০. মনস্বিতা সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক নারী-সাহিত্যিক,* প্যাপিরাস, ২০২১, পৃ-৩৫।

২০১. *কথাসাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ-১২৭৯।

২০২. বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা,* বিশ্বভারতী, ১৪০৯ব, পৃ-১০৪।

২০৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অমিতার প্রেম', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৫০।

২০৪. দ্র: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিচিত্রা,* জৈষ্ঠ্য ১৩৪০ব, পৃ-৫৮২-৫৮৩।

পঞ্চম অধ্যায়: বিদেশি সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বিশ্বমানবমন' বলেছেন, তাঁর জন্মের সময়ে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ছিল অনেকটা সেইরকমই। দেবেন্দ্রনাথ ও আদি-ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে সেই ঔপনিবেশিক যুগেও মাতৃভাষাকে গুরুত্বদান, মাতৃভাষায় চিঠিপত্রাদি লেখা এবং সাহিত্য ও গানের চর্চার একটা পরিমণ্ডল প্রস্তুত হয়েই ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এক খোলা আঙিনা। ১৮৬৪ সালে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে আই.সি.এস হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তিন। সত্যেন্দ্রনাথ শুধু আই.সি.এস হয়ে আসেননি, সেই সঙ্গে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়। জ্যোতিদাদা সেকালের নাম করা ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষের কাছে ফরাসি শিখেছিলেন। ম্যলিয়ের ও শেকসপিয়রের চর্চা একইসঙ্গে চলত ঠাকুর বাড়িতে। কৈশোরোত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বিশ্বসাহিত্যে 'সাত সমুদ্রের নাবিক' প্রিয়নাথ সেনের, ইংরেজি সাহিত্যের রসিক আলোচক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর এবং বিলেতে ছাত্রাবস্থায় সাহিত্যরসিক সহপাঠী লোকেন্দ্রনাথ পালিতের। এই সব সঙ্গ ও সান্নিধ্যগুণে ছোটোবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনন কেবলমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলে আটকে না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মণি-মাণিক্যের সন্ধানে। এরই ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় বিশ্বসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ও সমালোচনা।

ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি শিক্ষা ও চর্চার গোড়ার কথা বলতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক এবং 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদের কথা। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথ 'ম্যাকবেথ' নাটকের তর্জমা করেন। সেই তর্জমার কিছুটা অংশ 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল।[১] রবীন্দ্রনাথের ম্যাকবেথ অনুবাদ ও সেইসূত্রে শেকসপিয়র সমালোচনা বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। ধারাক্রম রক্ষার্থে তারও পূর্বে

ইংরেজি সাহিত্যের একেবারে প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং লেখালেখির দিকটি খতিয়ে দেখা দরকার।

১৮৭৮ সালের মাঝামাঝি, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ঠিক সতেরো, তখন সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন যে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে করে তিনি বিলেতে নিয়ে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়াতে। পিতা দেবেন্দ্রনাথের সম্মতি লাভের পর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথমে নিয়ে এলেন আমেদাবাদে। এই আমেদাবাদের বাড়িতে নির্জনতার অবকাশে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার নীরন্ধ্র অবকাশ পেলেন। মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে দুটি গ্রন্থপাঠের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। প্রথমটি "বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবি-ওয়ালা একখানা টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ"[২] এবং অপরটি "ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ।"[৩] রবীন্দ্রনাথ পরে টেনিসন অনুবাদ করেছিলেন, একটি ছোটো প্রবন্ধও লিখেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রথম টেনিসন পড়া সম্ভবত সেই সময়ে। এর পাশাপাশি শুরু করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের রীতিমতো চর্চা। 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এ সম্পর্কে বিশদ উল্লেখ আছে। মেজদার সঙ্গে বিলেত যাওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধান ভাবনা ছিল যে তিনি ইংরেজিতে নেহাত কাঁচা। তাই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে শুরু করলেন ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থপাঠ—

> মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার সামনে টেন প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমনকি, অ্যাংলো স্যাকসন ও অ্যাংলোনর্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের যে ইতিহাস 'ভারতী'তে প্রকাশ করেছিলেন, তার তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলেন যে-বইটির ওপর সেটি হল 'History of English Literature' by 'H.A Taine'. টেইনের মূল বই অবশ্য ফরাসি

ভাষায় লেখা। রবীন্দ্রনাথ এর ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলেন। টেইনের মতে, ইংরেজি সাহিত্যের গঠন ও কাঠামো ইংরেজের বিশেষ ধরণের ভৌগোলিক প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও সেই ভাবে ভাবিত হয়ে অনুধাবন করেছিলেন, সাহিত্যের রূপ, রীতি ও ভাববস্তুর পিছনে থাকে একটি বিশিষ্ট জনপদের জীবনপ্রবাহ, তার ধর্ম, শিক্ষা ও ঐতিহ্যের স্থূল বা সূক্ষ্ম প্রভাব। এই মনোভাব থেকেই বাংলা ভাষায় ইংরেজি ইতিহাস লেখবার সচেতন চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারই ফলশ্রুতি ইংরেজি সাহিত্যের উদ্ভব কালের দুটি বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ। 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য' ও 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য'।

প্রথম প্রবন্ধ **'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য'** প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকায়, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায়। সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে জানিয়েছেন—

> এই প্রবন্ধে স্যাক্‌সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির ওপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাঙ্গলো স্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্‌সনদের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিড্‌মন, বিউল্ফ, মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।[৫]

এরপরে তিনি টেইনের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে ইংলণ্ডের ইতিহাসে রোমান বিজয়, অ্যাংলো স্যাকসনদের আগমন বর্ণনা করে মূলত 'Beowulf' মহাকাব্যের সংক্ষিপ্তসার ও কিডমন রচিত কিছু কবিতার অনুবাদ করে সেই যুগের সাহিত্যের পরিচয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। মোটের ওপর খ্রিস্ট-পরবর্তী পঞ্চম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালপর্ব অ্যাংলো স্যাকসন যুগ নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অ্যাঙ্গলস্, স্যাকসনস, জুটস প্রভৃতি উপজাতীয়রা তাদের জার্মান স্বদেশভূমি ত্যাগ করে দলে দলে গ্রেট ব্রিটেনের দ্বীপভূমিতে অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপন করতে থাকে। এরপর আইরিশ মিশনারিদের উদ্যোগে শুরু হয় 'খ্রিস্টিয়করণ'। এই উভয় ভাবধারার জোড়মিলনেই জেগে ওঠে প্রাচীন

ইংরেজি সাহিত্যের ঊষাকাল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছেন তারও আগে থেকে। যখন স্যাকসন জাতির আগমনের আগে ব্রিটনের দ্বীপভূমি রোমকদের অধীনস্থ ছিল। খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করে। সেই সময়ে একদল কেল্‌ট তাদের বশ্যতা স্বীকার না করে ওয়েলস এবং হাইল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশে আত্মগোপন করে। বাকিরা রোমকদের শাসনাধীনে রয়ে যায়। সুদীর্ঘ চারশো বছর ব্রিটনের ওপর আধিপত্য কায়েম করে রোমকেরা নিজের দেশ ইতালিতে ফিরে যায় কারণ গথেরা ইতালি আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণ প্রতিহত করা রোমকদের পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রোমকেরা ব্রিটেন ত্যাগ করলে দ্বীপরাষ্ট্রে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। আশেপাশের জলদস্যুরা আক্রমণ শুরু করে। সেই অবস্থায় ব্রিটনের গোষ্ঠীপতিরা জার্মান থেকে সৈন্যবাহিনি ভাড়া করে নিয়ে আসতে থাকে। হেঞ্জেস্ট ও হর্সার নেতৃত্বে ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান সেনারা দ্বীপভূমিতে অনুপ্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"ইহারাই অ্যাঙ্গল্‌স্ (Angles)। ব্রিটনেরা ও রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাক্সন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce spraec অর্থাৎ English Speech"[৬]। এই স্যাক্সনেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা ও রক্তপাতে এদের জুড়ি ছিল না। ব্রিটেনের আদি অধিবাসীরা স্যাক্সন প্রভুর দাস হয়ে রইল। অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ স্যাক্সনদের সীমানা ছাড়িয়ে ওয়েলস এবং হাইল্যান্ডের দুর্গম প্রদেশে পালিয়ে যায়। যে জাতিরা অ্যাংলো স্যাক্সন দলভুক্ত নয়, তাদেরকেই স্যাক্সনেরা wealhas বলত। তা থেকেই Walse নামের উৎপত্তি হয়েছে। স্যাক্সন আধিপত্য বহির্ভূত কেল্‌ট উপজাতির ভাষার প্রভাব ইংরেজি ভাষায় কমই এসেছে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল কেল্‌টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন স্যাক্সন বিজয়ের আগে রোমক অধিকৃত ইংলণ্ডের রাজভাষা ছিল ল্যাটিন। কিন্তু পরবর্তী স্যাক্সন ভাষায় ল্যাটিনের চিহ্ন সেভাবে পড়েনি। কেবল দু একটি শব্দের ক্ষেত্রে এই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেছেন—"স্যাক্সন munt (পর্বত) কথা বোধ হয় ল্যাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে।"[৭] পর্বতের মতো নৈসর্গিক বস্তুনাম যে স্যাক্সনেরা অন্য ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিল তার কারণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- "জর্মান সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে একটিও পর্বত নাই। সুতরাং সে দেশবাসীরা যে পর্বতের নাম না জানিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই।"[৮]

স্যাক্‌সন অধিকার ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খ্রিস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে প্রবেশ করল। পোপ গ্রেগরি সেন্ট অগাস্টিনকে ইংলণ্ডে খ্রিস্টানধর্ম প্রচার করতে পাঠিয়ে দিলেন। সেন্ট

অগাস্টাইন ইংলণ্ডে আসেন ৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তী একশ বছর ধরে ধর্মান্তকরণের কাজ চলতে থাকে।[৯] খ্রিস্টধর্মের প্রচারের মধ্যে দিয়েই অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হল। নর্দামব্রিয়ান, মার্সিয়ান, ওয়েস্ট স্যাক্সন, কেন্টিশ প্রভৃতি নানা নামে উপজাতিগুলি বিভক্ত ছিল। খ্রিস্টধর্ম এই বিভিন্নতার মধ্যে অনেকখানি ঐক্যের সূত্র গেঁথে দিয়েছিল। ধর্ম প্রচারের অনুষঙ্গ হিসেবেই অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক অনূদিত হতে শুরু হল। এরই মধ্যে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটল। যুদ্ধ এবং হানাহানিতে মত্ত থেকে স্যাক্সনেরা বিদ্যাচর্চার দিকে মনোযোগ দিতে পারেনি। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের শান্তি ও ঐক্যের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে তাদের মন উচ্চতর সৃষ্টিশীলতার দিকে স্থির হতে পেরেছিল। এই ভাব সমন্বয় থেকেই জেগে উঠেছিল স্যাক্সন সাহিত্য। প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাকসন ভাষায় লিখিত যে-সকল বই পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে Beowulf প্রধান। তিন হাজারেরও বেশি পংক্তিবিশিষ্ট দীর্ঘকায় রচনা এটি। বিওউলফ নামে এক জার্মান উপজাতীয় বীরের সঙ্গে এক দানব ও পরে এক এক ভয়ানক ড্রাগনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের বীরত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর কাহিনি বিওউলফ। এই কাহিনির ঘটনাস্থল ডেনমার্ক-স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল। এই বীরগাথা অ্যাঙ্গলসরাই বহন করে নিয়ে এসেছিল তাদের জার্মান স্বদেশভূমি থেকে। এই কাব্যে প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বীরধর্মের এক আদর্শায়িত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বিওউলফ কাব্যের পাণ্ডুলিপি এক হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন হলেও এর আখ্যান আরও পুরনো বলেই অনুমিত হয়। এই কাব্যের রচয়িতার নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের মূল কাহিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ডহাম গ্রেণ্ডেল নামক রাক্ষসের সঙ্গে বিওউলফ এর লড়াই ও তাকে আহত ও নিহত করার ঘটনা অনেকটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান 'সাগা'র ধরণে লেখা। গ্রেণ্ডেলের মৃত্যুর পর তার মা প্রতিশোধপরায়ণা হয়ে রাত্রে লুকিয়ে রাজপুরীতে প্রবেশ করে এক জন যোদ্ধাকে বিনাশ করে। তখন রাজা বিওউলফ সেই রাক্ষসীকে বধ করতে প্রবৃত্ত হল। তার যাত্রাপথের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পর্বতের সামনে নেকড়ে বাঘ পরিকীর্ণ এক বিস্তীর্ণ গহ্বর পেরিয়ে বিওউলফ এসে পৌঁছলেন পর্বতের আড়ালে লুকনো এক নদীর সামনে। অদ্ভুত আকৃতির পিশাচ ও সাপেরা সেই স্রোতে ভাসছে। অকুতোভয় বীর সেই স্রোতে ডুব দিলেন, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সেই রাক্ষসীর কাছে পৌঁছোলেন ও তাকে বধ করলেন। এই ভাবে রাজ্যকে শত্রুর হাত থেকে নিষ্কন্টক করে পঞ্চাশ বছর বিওউলফ রাজত্ব করলেন। অবশেষে এক ড্রাগনের সঙ্গে লড়াইয়ে

তার প্রাণ যায়। উইগলাফ নামে তার এক সহচরের সহায়তায় বিওউলফ সেই ড্র্যাগনকে হত্যা করে। কিন্তু যুদ্ধে রাজার ক্ষতস্থান বিষিয়ে ওঠে। মৃত্যুর আগে বিওউলফ বীরের মতো তার শেষ কথা বলতে লাগলেন। বললেন যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর তিনি সততার সঙ্গে তার প্রজাদের পালন করেছেন। এমন কোনও রাজা ছিল না যে তাকে ভয় দেখাতে বা তার কাছে সৈন্য পাঠাতে সাহস করেছে। তিনি নিজে কোনও বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। অন্যায় শপথ করেননি। তাই মৃত্যুর সময়েও তার মনে আনন্দ। তিনি তার প্রিয় সহচর উইগলাভকে সারা জীবন ধরে সঞ্চিত ধনরাশি দিয়ে গেলেন, যা তার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগবে। তিনি যে প্রজাদের কল্যাণের জন্য ধন সংগ্রহ করতে পেরেছেন সে জন্য অন্তিম সময়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিলেন। গোটা কাব্যের কাহিনি বর্ণনা করে কাব্যের নায়কের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার চরিত্রে প্রতি পদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সংকুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।[১০]

অ্যাংলো-স্যাকসন কবিতার লক্ষণাবলী বিচার করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, এই কবিতা হৃদয়ের নেহাত আটপৌরে প্রকাশ মাত্র। চিন্তার কোনও সংস্রব এখানে নেই। কবিতাগুলো যেন ভাঙা ভাঙা কথার সমষ্টি এবং ছন্দও তেমনই ভাঙা ভাঙা। এই ছন্দে মিল বা অন্য কোনও নিয়ম নেই, শুধু প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুটো তিনটে এমন কথা থাকবে যার প্রথম অক্ষর এক। প্রেমের কথা এইসব কবিতায় প্রায় নেই। কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। স্যাকসনদের মতো বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত জাত বিরল।

অ্যাংলো স্যাকসন খ্রিস্টান কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে যাঁর কথা বলেছেন তিনি কিডমন (Ceadmon)। প্রথমদিকে কিডমন কবিতা রচনা করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি গান গাইবার জন্য স্বপ্নাদেশ পান। একদিন অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে কিডমন ঘুমিয়ে পড়লে তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেন যে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে গান গাইতে বলছে। তখন কিডমন তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—‘সে হোক! তুমি

গাইতে পারবে।' ঘুম ভাঙার পর কিডমন এই কথা জনৈক 'আবেস হিলডার'কে বললে তিনি জানান যে কিডমন দৈবাদেশ পেয়েছেন এবং তাকে দেবালয়ের সন্ন্যাসী-দলভুক্ত করে নেন। এই ঘটনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে কবিদের স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনার মিল পেয়েছেন। তাঁর কথায়—

> কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিডমনকে বাইবেল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিডমনের স্বপ্ন-আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।[১১]

এরপর রবীন্দ্রনাথ কিডমনের রচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর তিনটি কবিতার পদ্যানুবাদ করেছেন। অনূদিত তিনটি কবিতা—'গুহা অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই', 'ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল', 'কেন বা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে'—যথাক্রমে Genesis A, Exodus ও Genesis B এর নির্বাচিত অনুবাদ। এই কবিতাগুলি মূলে কিডমনেরই লেখা বলে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। Taine রচিত ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও তাই বলা আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে Genesis ও Exodus এর paraphrase কিডমনের রচনা বলে মনে করা হয় না। এগুলি কিডমনের অনুসরণকারী অজ্ঞাত কবিদের রচনা হিসেবেই চিহ্নিত।[১২]

কিডমন ছাড়াও অ্যাংলো স্যাকসন যুগের ইতিহাসে রাজা অ্যালফ্রেডের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে আছে। অ্যালফ্রেডের রাজত্বকালে নবম শতাব্দী নাগাদ অ্যাংলো স্যাকসন ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। তিনি ছিলেন প্রধানত একজন অনুবাদক এবং বিদ্যাচর্চার একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। অ্যাংলো-স্যাকসন গদ্যের জনক হিসেবে রাজা অ্যালফ্রেডের কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, রাজা অ্যালফ্রেড বলবান যোদ্ধা ছিলেন আর তখনকার ইংলণ্ডের অন্যান্য রাজ্যও ছিল অতি বিশৃঙ্খল ; তাই তিনি চাইলেই সমস্ত ইংলণ্ড নিজের বশে আনতে পারতেন। অথচ সেদিকে তার নজর ছিল না। রাজ্যে শান্তিস্থাপন, সুশাসন ও নিজের প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল মৃত্যুর পর তিনি যেন তাঁর সৎকাজের স্মরণচিহ্ন রেখে যেতে পারেন। তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাস মনে রেখেছে। ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষার অবনমন দেখে তাঁর মনে ক্ষোভ জাগত। তিনি মনে ভাবতেন একসময়ে লোকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে আসত, এখন ইংলণ্ডের লোককেই

বিদেশির কাছে বিদ্যা শিখতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অ্যালফ্রেড যদিও নিজে খুব ভালো ল্যাটিন জানতেন না, তবুও তিনি ল্যাটিন থেকে গ্রন্থ অনুবাদের বিস্তর চেষ্টা করেছেন। এই বিষয়ে তিনি সরল স্বীকারোক্তি করে গেছেন এইভাবে—'যদি আমার চেয়ে কেউ ল্যাটিন বেশি ভালো জানো, তবে আমায় দোষ দিও না কারণ প্রত্যেক মানুষ তার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা বলবে ও কাজ করবে।' তিনি অনুবাদ যথাসম্ভব সরল ভাষায় করার চেষ্টা করেছেন। সেই সময়ের অজ্ঞ লোকদের বোঝানোর জন্য তিনি এক ছত্র ল্যাটিন ভেঙে দশ ছত্র লিখেছিলেন। অ্যালফ্রেডের অনুবাদকর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র 'Chronicle' এর উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে এই অনুবাদ একেবারেই সুখপাঠ্য নয়। তাঁর কথায়—

> সে [Chronicle] অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণমাত্র লিখিত আছে।[১৩]

কিন্তু এটা ছাড়াও পোপ গ্রেগরির 'কিউরা প্যাস্টোরালিস' (Cura Pastoralis), বোথিয়াসের 'কনসোলেশন অফ ফিলজফি' (Consolation of philosophy) ও সেন্ট অগাস্টাইনের 'সলিলোকিয়া'ও (Soliloquia) রাজা অ্যালফ্রেডের অনুবাদ বলে মনে করা হয়।[১৪]

স্যাকসন জাতির ভাষা-সাহিত্য ও শিল্পগৌরবের মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের তুলনা করেছেন। স্যাকসনেরা যখন ইংলণ্ডে স্থায়ি বাসস্থান পেল, তখন বিলাসের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ল। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের শাসনামলে বিলাসের সঙ্গে যে সুকুমার বিদ্যা ও কলার সংস্রব ছিল, স্যাকসন জাতির মধ্যে তা দেখতে পাওয়া যায় না। তাদের শিল্প প্রায় নেই বললেই চলে, কবিতায় শুধু রক্ত ঝরানোর কথা। কবিতার ছন্দও অতি বিশৃঙ্খল। ল্যাটিন সাহিত্যের আদর্শ পেয়েও তাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। এই তুলনার মধ্যে, আমাদের মনে হয়, ঔপনিবেশিক যুগের লেখক রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ শাসকদের কিছু খোঁচা দিয়েছেন। কারণ এই প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন, আজকের সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর যে ইংরেজ জাতি, তাদের অতীত কেমন ছিল

তাই-ই এই প্রবন্ধে দেখাবেন। ইংরেজি সভ্যতার সেই ঊষাকালের সঙ্গে ভারতীয় আর্য সভ্যতার তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্যেরা (আর্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল ; সে উপায়টি—দিনরাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মতো অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না—অসভ্য সংগীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়।[১৫]

স্যাকসন জাতির সাহিত্য ও শিল্পের এই অপ্রতুলতা দেখিয়ে পক্ষান্তরে তিনি তাদের চরিত্রের স্বাধীনতাপ্রিয়তা, পৌরুষ ও বীরত্বগুণের প্রশংসা করেছেন। তাদের প্রভুভক্তি অসামান্য। স্যাকসনেরা যাঁকে প্রধান বলে মানে তার জন্য করতে পারে না এমন কিছু নেই। প্রধানকে না নিয়ে যে সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরে সমাজে তার বড়ো অখ্যাতি। যে প্রধানের (গোষ্ঠীপতি অথবা রাজা) গৃহে তারা মদ্যপান করেছে, যার কাছ থেকে বিশ্বাসের চিহ্নস্বরূপ তরবারি ও বর্ম পেয়েছে তার জন্য প্রাণ দান করতে তারা কাতর নয়। তাদের কবিতার মধ্যেও এই ভাবটি সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। স্যাকসন জাতির কল্পনা ও সৌন্দর্যপ্রীতি ছিল না ঠিকই কিন্তু তাদের চরিত্রে কার্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্রায় ছিল, এমনটাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের সাত মাস পরে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্যের প্রাক্-ইতিহাস বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ—**'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য**। অ্যাংলো-স্যাকসন আধিপত্যের শেষের দিকে নবম শতকের মধ্যভাগে স্ক্যানডিনেভিয়ান আক্রমণ শুরু হয় ইংলণ্ডে। সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন একমাত্র রাজা অ্যালফ্রেড। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে স্ক্যানডিনেভীয় রাজা ক্যানিউট ইংলণ্ডের সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু সেই শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক হেস্টিংসের যুদ্ধে জয়লাভ করে নরম্যানডির ডিউক উইলিয়ম ইংলণ্ড বিজয় করেন। শুরু হয় অ্যাংলো-নর্ম্যান যুগ। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের দুটি অংশ। প্রথমটি রচিত হয়েছিল ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। এই প্রবন্ধে

মূলত নর্ম্যান জাতির ইতিহাস, তাদের বিজয় কাহিনি, তাদের শাসনামলে ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ আছে। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবে (প্রকাশ ১২৮৬ এর জৈষ্ঠ্য) প্রকৃতপক্ষে নর্ম্যান জাতির সাহিত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে। আমরা প্রথম প্রস্তাবটি সংক্ষেপে বলে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি নিয়েই বিস্তারিত বিশ্লেষণ করব।

প্রথম প্রস্তাবের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন নর্ম্যান জাতি ইংলণ্ড অধিকারের পর তারা তাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পেরে স্যাকসনদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এর কারণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্যাকসন জাতির ইংলণ্ড বিজয়ের সঙ্গে নর্ম্যানদের অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য ছিল। প্রথমত স্যাকসনেরা আদিম, অ-সভ্য জাত। তারা নিজেদের অনুর্বর দেশ ত্যাগ করে ইংলণ্ডে এসেছিল এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে। তাই উন্মত্ত হিংসা ও রক্তপাতের দ্বারা তারা আদিম কেলটদের নিধন করে অথবা তাদের উৎখাত করে তাদের স্থান দখল করেছিল। কেলটিশদের সঙ্গে তাদের স্বভাবগত প্রভেদ ছিল বিস্তর। তাই তারা আদিম কেলটদের সঙ্গে মিশতে না পেরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। কিন্তু নর্ম্যানেরা ইংলণ্ড বিজয় করেছিল সেখানে শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। বিজেতা হিসেবে তারা ইংলণ্ডে এসে আর নিজের দেশে ফিরে যায়নি ফলে তারা সে-দেশের সঙ্গে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত স্যাকসনদের থেকে নর্ম্যানেরা বহু ক্ষেত্রে উন্নত ছিল ঠিকই কিন্তু তাদের রীতি-নীতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে স্যাকসনদের প্রভূত মিল ছিল। এই সব কারণে নর্ম্যানেরা স্যাকসনদের সঙ্গে কালক্রমে নিজেদের মিশিয়ে দিতে পেরেছিল। যদিও প্রথমে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। নর্ম্যানেরা স্যাকসনদের ঘৃণা করত, স্যাকসনদের সামাজিক সম্মান কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু কালক্রমে উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু হয় এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়।

ইংল্যাণ্ড অধিকার করার আগে নর্ম্যানরা ফ্রান্স বিজয় করে। ফলে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের অঙ্গীভূত হয়। ফ্রান্স বিজয়ের এক শতাব্দী পর নর্ম্যান্ডির রাজা উইলিয়ম ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ও জয় করেন। তবে নর্ম্যানরা স্যাক্সনদের তুলনায় অনেক বেশি শিল্পবোধসম্পন্ন ছিল। নর্ম্যান অধিকারের পর ইংল্যাণ্ডে প্রচুর সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হয়। Lanfrenc প্রতিষ্ঠিত 'বেকের বিদ্যালয়'(School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল। উইলিয়মের পুত্র হেনরির বিদ্বান বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নর্ম্যানদের অন্তরে প্রাচীন

টিউটনিক ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতার ভাব জাগ্রত ছিল। সেই রাজত্বে শাস্তি প্রদান যে কত নিষ্ঠুর ছিল, নর্ম্যান শাসকেরা কর আদায়ের জন্য প্রজাদের কী নৃশংস উৎপীড়ন করত, বিজিত দাসদের সঙ্গে কী জঘন্য ব্যবহার তারা করত তার বিস্তারিত পরিচয় এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করলেই নর্ম্যানদের অত্যাচারের সীমা বোঝা যাবে। নর্ম্যান রাজা রিচার্ড স্যারাসিনদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের নগর অধিকার করলে পর স্যারাসিনরাজ বন্দিদের মার্জনা প্রার্থনা করে রিচার্ডের কাছে দূত প্রেরণ করে। রিচার্ড ত্রিশজন স্যারাসিন বন্দির মাথা কেটে প্রত্যেক মাথায় নিহত ব্যক্তির নাম লিখে প্রত্যেক দূতের সামনে আহারার্থে রাখতে নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তা অতি উপভোগ্য খাদ্যের মতো আহার করেছিলেন। ষাট হাজার বন্দি তার আনীত হলে রিচার্ড তাদের কেমন শাস্তি দিয়েছিলেন, তা নর্ম্যান কবির মুখে প্রাবন্ধিক আমাদের শুনিয়েছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দিগণ সবে,

দেবতারা স্বর্গ হতে কহিলেন তবে।

'মারো মারো, কাহারেও ছেড়ো না, ছেড়ো না,

কাটো মুণ্ড, একজনে কোরো না মার্জনা।'

শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার

ঈশে ও পবিত্র ক্রসে কৈলা নমস্কার"

> এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার মানসেই ইহা কীর্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না?[১৬]

উপরে উল্লিখিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ সরাসরি Taine এর গ্রন্থের (History of English Literature (vol-1), H. A. Taine) দ্বিতীয় অধ্যায় 'The Normans' থেকে সরাসরি ভাবানুবাদ করেছেন।[১৭]

আলোচ্য প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ নর্ম্যান জাতির রাজত্বকালে সাহিত্যের অবস্থা কেমন ছিল, তার বিবরণ দিয়েছেন। নর্ম্যানেরা প্রথম যখন ইংল্যান্ডে এল, তখন স্যাকসন ভাষা ও

স্যাকসনভাষীদের ঘৃণা করতে লাগল। সেই সময়ে ফরাসি ভাষাই ইংল্যান্ডের রাজভাষা, প্রধান ভাষা ও লিখিত ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যালয়ে ও উচ্চতর শিক্ষা প্রাঙ্গনে সকলকেই ফরাসি বা ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার করতে হত। স্যাকসনদের সঙ্গে মিশে নিজেদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা কলুষিত হয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় নর্ম্যানেরা তাদের ছেলেমেয়েদের ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিত। সেই সময় মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তাই বই বা পুস্তক খুব বেশি লোক পড়ত না। যাঁরা পড়ত ফরাসি বা ল্যাটিন ছেড়ে গ্রাম্য স্যাকসন ভাষায় লেখা বই পড়তে সংকোচ ও অরুচি অনুভব করত। এই অবস্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের তুলনা দিয়ে লিখেছেন, আমাদের দেশেও যে-সময়ে ইংরেজি ভাষা প্রথম চলতি হয় তখন দেশীয় যুবকেরা দু'কলম ইংরেজি লিখতে পারলে যেমন নিজেদের বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হল বলে মনে করত, তেমনই সেই সময়ে স্যাকসন যুবকদের কাছেও ল্যাটিন ও ফরাসি মর্যাদার ভাষা হিসেবে বিবেচিত হত। কোনও কোনও কবি ফরাসি এবং স্যাকসন মিশিয়ে লিখতেন। এমন করলে এই বোঝা যেত যে কবি আর কিছু না হোক, শিক্ষিত ; কেননা তিনি ফরাসি জানেন। রবীন্দ্রনাথ সে-যুগের দু-একটি ফরাসি ও স্যাকসন মিশ্রিত কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এমন একটি কবিতা নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম—

“Len puet fere et defere

Ceo fait-il trop sovent

It nis nouther wel ne faire

Therefore England is shent.

Nostre prince de Englatere

Par le consail de sa gent

At westministr after the feire

Made a gret parlement.”[১৮]

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে যে যখনই দুটি ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ঘটে তখন তাদের ভাষাও কোনওটা বিশুদ্ধ থাকতে পারে না। পরস্পরের প্রভাবে দুটিই বিকৃত হয়ে পড়ে।

স্যাকসনের প্রভাবে ফরাসি ভাষা ও ফরাসি ভাষার প্রভাবে স্যাকসন দুটোই আমূল বদলে যেতে থাকল। নর্ম্যান অভিজাত ব্যক্তিবর্গ স্যাকসনমিশ্রিত ফরাসি বলত আর সাধারণ অধিবাসীরা ফরাসিমিশ্রিত স্যাকসন বলত। কিন্তু কালপ্রবাহে এই দূরত্ব কমে আসে। ধীরে ধীরে উভয় জাতির সামাজিক মিশ্রণ ঘটতে লাগল, উভয় পরিবারে বিবাহ প্রথা চলতি হল। তখন স্যাকসন এবং ফ্রেঞ্চ দুটি ভাষা মিশ্রণের পথেও আর কোনও বাধা রইল না। এই মিশ্রণের কালের যে ভাষা তাই-ই Semi-saxon সাহিত্য নামে খ্যাত। এই সেমি-স্যাকসন ভাষাই হল প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি ভাষার বাল্যাবস্থা।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের বেশ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। সেইসব কবিতা পড়ে মনে হয় তার বর্ণনা অতি সরল। “অতি পরিষ্কারভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলো কথা ও ঘটনা জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।” অর্থাৎ আমাদের অলংকারশাস্ত্রে যাকে স্বভাবোক্তি বলে, এই সব বর্ণনা অনেকটা সেইরকম। ‘Kyng Alisaunder’ কাব্যগ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ এমন দুটো কবিতা উদ্ধার করেছেন, তার একটি নিম্নরূপ—

“জলহস্তী বড়োই আশ্চর্য জানোয়ার
হাতিও তেমন নহে কী কহিব আর
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ জানি
লেজ তার বাঁকা আর খাটো শুঁড়খানি।
পিচের মতন তার রঙ বড়ো কালো
যত কিছু ফল খেতে বড়ো বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সবচেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে!”[১৯]

ভাষার আদিম অবস্থায় কৌতূহলী বর্ণনাধর্মিতাই এই কবিতাগুলির একমাত্র সম্পদ।

তখনকার সাহিত্যে রোমান্সধর্মিতার কিছু বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'Geste of kyng Horn' নামক গ্রন্থের একটি উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন। রাজা 'মারে'র পুত্র হর্ন এই উপাখ্যানের নায়ক ও রাজা এমারের একমাত্র কন্যা রিমেনহিলড নায়িকা। রাজকন্যা ভালোবেসে হর্নকে একটি মায়াময় আংটি উপহার দেন। সেই আংটির আশ্চর্য প্রভাবে হর্ন স্যারাসিনদের যুদ্ধে পরাজিত করে রাজা এমারের সভায় ফিরে আসেন কিন্তু এমার হর্নের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন ও হর্নকে নির্বাসিত করেন। তারপর প্রতিকূল নানা পরিস্থিতি কাটিয়ে উভয়ের বিয়ে হয়। বিবাহের পর হর্ন তাঁর মাতৃভূমি সুডিন (Suddine)কে শত্রুমুক্ত করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন। সেই অবসরে হর্নের কপট বন্ধু ফাইকনিল্‌ড হর্নের পরিণীতা রিমেনহিল্‌ডকে বলপূর্বক বিয়ে করতে চায়। কিন্তু হর্ন ফাইক্‌হিলডের দূর্গে অত্যন্ত গোপনে বীণাবাদকের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে তাকে নিহত করে এবং অবশেষে তার প্রণয়িণীর সঙ্গে মিলিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের আখ্যান অংশের প্রশংসা করলেও কাব্য হিসেবে একে খুব উৎকৃষ্ট বলেননি।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 'Chivalry' সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা দিয়েছিল। মধ্যযুগে ইওরোপে যখন বলশালিতাই ছিল ন্যায় ও ধর্ম তখন সেই নির্দয় বলপ্রাধান্যের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করাই ছিল Chivalry র প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল মেয়েদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যা কখনও কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে মহিলা-পূজায় পর্যবসিত হত। নর্ম্যানেরা এই Chivalryর ধারণা ইংল্যান্ডে নিয়ে আসে। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের মধ্যেও এই ভাব আত্মপ্রকাশ করে। খ্রিস্ট মাতা মেরীর স্তবও এই সূত্রে সাহিত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ Taine এর গ্রন্থ থেকে তেমনই একটি মেরী-স্তব সিভ্যালরিয়াস কবিতার নিদর্শন হিসেবে উদ্ধার করেছেন।[২০] সিভ্যালরির পাশাপাশি রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, কপট-যুদ্‌ধ, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, উৎসব-আনন্দ, বিলাস ও প্রমোদের নানা ছবি নর্ম্যান কবির কলমে এসেছে। 'গাড়ি করে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়', 'হেঞ্জিস্ট করিল চেষ্টা প্রাণপণ করি' কবিতাদুটির ভাবানুবাদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নর্ম্যান সাহিত্যের এই দিকটি আমাদের দেখিয়েছেন।

নর্ম্যান সাহিত্যের একটি বিশেষ পর্বে যখন স্যাকসন ও ফরাসি ভাষার স্বাভাবিক বিমিশ্রণে এক নতুন ভাষারূপ জেগে উঠল, তখন সাহিত্যও আগের থেকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হল। ফরাসি আদর্শ অনুসরণ করার একান্ত ঝোঁক তখন আর রইল না। লেখকেরা নিজেদের বুদ্ধি ও

হৃদয়ের নির্যাস সাহিত্যে ফোটাতে লাগলেন। সেই সময়ে একদল লেখক পুনরায় প্রাচীন অ্যাংলো স্যাকসন রীতিতে কবিতা লেখবার দিকে ঝুঁকলেন। যেমন ল্যাংল্যান্ডের 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্য। অনেকে তখন আবার ল্যাংল্যান্ডকে দেখাদেখি পুরনো ধারার অনুবর্তন করতে শুরু করলেন কিন্তু সেই ধারা বেশিদিন চলল না কারণ নর্ম্যান সাহিত্যে ফরাসি আদর্শ বিদেশাগত হলেও তা ততদিনে বেশ চলতি হয়ে গিয়েছিল। ফলে পুরনো প্রথায় প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব হল না। তবে ল্যাংল্যান্ডের 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' আরেকটি ঐতিহাসিক কাজ করেছিল। তখন রোমান চার্চের অধিকার নিয়ে নানা দলাদলি ও ক্ষমতা দখলের লড়াই চলেছিল। ল্যাংল্যান্ডের এই কাব্যে তখনকার চার্চ, ধর্মাচার্য ও অন্যান্য কুনীতির প্রতি বিদ্রুপ আছে। মহাত্মা উইক্লিক অনেক পরে ধর্মসংস্কার করেন। রোমীয় চার্চের নিগড় থেকে ইংল্যান্ডকে মুক্ত করেন কিন্তু ল্যাংল্যান্ডের এই কাব্য সেই পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ ল্যাংল্যান্ডকেই সেমি-স্যাকসন যুগের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর পরেই গাওয়ার (Gower) ও চসার (Chaucer)এর কাল। চসারের সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি সাহিত্যের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চা করে সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তি কিছু আনন্দ পাবেন না। কারণ সাহিত্য হিসেবে তা উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক চর্চার দিক থেকে এই যুগের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বিভিন্ন বিপরীতমুখী ঘাত-প্রতিঘাতে কীভাবে একটি সচল ভাষার জন্ম হয়, তা এই সময়কার ভাষা খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে। তখন সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়ে ওঠেনি কারণ ভাষা ছিল অপরিণত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে বুঝিবার বড়ো গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্‌শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত।...অবশেষে কত প্রকার ঘাত-সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইল।[২১]

১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়মের ইংল্যান্ড দখলের মধ্যে দিয়ে নর্ম্যান বিজয়ের সূচনা ও ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে চসারের জন্ম। এই দুইয়ের মধ্যে যে কমবেশি তিনশো বছরের ব্যবধান, সেই সময়টুকুর মধ্যেই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের নির্মাণ।

রবীন্দ্রনাথ টেইনের গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সংকল্প করেছিলেন। সেই অনুযায়ী অ্যাংলো-স্যাকসন ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্যের ওপর দুটি বৃহদাকার প্রবন্ধ লিখে এই সংকল্পের নান্দীপাঠ করেছিলেন কিন্তু চসার ও তার পরবর্তী যুগগুলি নিয়ে আর ধারাবাহিকভাবে লেখেননি। যদি লিখতেন তবে বাংলা ভাষায় প্রথম ইংরেজি সাহিত্যের সার্থক ইতিহাস রচনার গৌরব রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য হত।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে টেনিসন

ইংল্যান্ডের ভিক্টোরীয় যুগের অন্যতম প্রতিনিধিস্থানীয় কবি আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২)। বাংলাদেশে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়। ১৮৫০ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে তিনি 'পোয়েট লরিয়েট' সম্মানে ভূষিত হন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত টেনিসনকে নিয়ে একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। বাঙালি কবির টেনিসন চর্চার সেই বোধহয় শুরু। মধুসূদনের চতুর্দশপদাবলী প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬তে। ফলে উক্ত সনেটটি নিশ্চিতভাবে তার আগেই লেখা। উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষদিকে বিলেত যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়ির পাঠ-গৃহে ছবিওয়ালা টেনিসনের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয় হয়। তারপর বিদেশ থেকে ফিরে এসে 'ভারতী' পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) টেনিসনের 'ডি প্রোফান্ডিস' নামক একটি দীর্ঘ কবিতার বিস্তৃত আলোচনা করে সমনামেই একটি প্রবন্ধ লেখেন। টেনিসনের এই কবিতাটি নিয়ে প্রবন্ধ লেখবার একটা নেপথ্য ঘটনা আছে। সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে সেই ঘটনাটি যুক্ত বলে আমরা এখানেই তা আলোচনা করছি। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধে একটি দীর্ঘ পাদটীকা ছিল। সেখানেই প্রথম 'দি প্রোফান্ডিস' কবিতাটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় বোধে পাদটীকাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল—

অল্পদিন হইল একজন শ্রদ্ধাস্পদ কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, Tennyson এর De Profundis নামক কবিতাটি এক-তাল-আড়ম্বর করা এক-তিল বিষয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর অতখানি গম্ভীর কবিতাটি লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়টি যথোপযুক্ত হয় নাই—এই বোধ করি তাহার বলিবার তাৎপর্য। বিষয়টি আর কিছু নহে, কবি তাঁহার সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিতেছেন। বোধ করি শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয় মনে করিয়াছেন যে একটি সন্তানের জন্মলাভ হইল, তাহা লইয়া অত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিবার তৎপর্য্য [তাৎপর্য] কি? কিন্তু একজন কবির চক্ষে ইহা বড় একটা সামান্য বিষয় নহে। যে মহা-অতীতের মহা-কারখানায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব্বকারণ সমূহ অযুত যুগ ধরিয়া সংঘৃষ্ট, একত্রিত, ঘুর্ণিত [যদ্দৃষ্টং], বিচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অনাদি অতীতের রাজ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া গঠিত, পরিবর্ত্তিত, সংস্কৃত হইয়া অবশেষে একটি শিশু আজ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে সে কেহই ছিল না, আর আজ পৃথিবীর সহিত আমার সহিত তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইল। বিষয়টি অতি গভীর, অতি মহান্। এই কবিতাটির বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিবার বাসনা রহিল।[২২]

রবীন্দ্রনাথের মনে যে-কথা জমে উঠেছিল, দু-মাসের মধ্যেই প্রবন্ধের রূপে তা প্রকাশ পেল। ‘ভারতী’তে ১২৮৮ এর আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হল ‘ডি প্রোফান্ডিস’ নামে একটি নাতিক্ষুদ্র প্রবন্ধ। পূর্বোদ্ধৃত পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, এই প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে গোটা কবিতাটিই উদ্ধৃত করে সেই বক্তব্যকে আরও বিশদীভূত করলেন। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য কেন ইংরেজি সমালোচকমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়নি তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, এই কবিতার যে ভাব, যে দর্শন তা একেবারেই প্রাচ্যদেশীয়, প্রতীচ্যের লোকেরা সেই ভাব যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারবেন না। নিজের সন্তান হ্যালামের জন্মোপলক্ষে লেখা এই কবিতার দুটি অংশ। একটি অংশে পিতা তাঁর সন্তানকে পার্থিব মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে আসার জন্য জন্মকালীন অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। আবার অন্য অংশে দেখাচ্ছেন কীভাবে শিশুর জন্মের সূত্র ধরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে থেকে ‘সৃষ্টি’ রূপে, মানুষ রূপে তার আবির্ভাব ঘটছে। অনন্ত ‘শূন্য’ থেকে এই পৃথিবী একদিন যে-ভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিল, এই মানবসন্তানও সেইভাবে এক অনন্ত ‘শূন্য’ থেকে রূপ পরিগ্রহ করেছে। Tennyson কবিতাটিকে বলেছেন ‘Two Greetings’। নিজের সন্তানকে তিনি দুইভাবে সম্ভাষণ করছেন। প্রথমটি আত্মভাবে,

তার নিজের সন্তান হিসেবে আর দ্বিতীয়টি অনাত্মভাবে, শিশুটির মধ্যে এই অনন্ত বিশ্বচরাচরের প্রকাশ রূপ দেখে। বৈদিক ঋষিরা যেমন দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রগর্ভে তরুণ সূর্যকে উঠতে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ কোথা থেকে এল? নবজাত শিশুটির প্রতিও তার পিতা কবির সেই একই জিজ্ঞাসা। "কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহামরুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল"[২৩] এই সন্তান সেখান থেকেই এসেছে, এই অর্থে সে পৃথিবীর সহোদর, মহা সৌরজগতের যমজ ভ্রাতা।

"Out of the deep, my child, out of the deep,

Where all that was to be, in all that was,

Whirl'd for a million aeons thro' the vast

Waste dawn of multitudinous-eddying light--..."[২৪]

দ্বিতীয় অংশে কবি দেখছেন শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে। তাঁর স্ত্রীর এবং তাঁর মুখ ও গঠন যেন শিশুটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত হয়েছে। শিশুটির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন কবি-দম্পতির প্রতিকল্পস্বরূপ। এমন যে শিশু তাকে আশীর্বাদ করে কবি বলছেন—

"Live, and be happy in thyself, and serve

This mortal race thy kin so well, that men

May bless thee as we bless thee, O young life

Breaking with laughter from the dark..."[২৫]

আর কবিতাটি শেষ হচ্ছে এইভাবে—

"We feel we are nothing—for all is Thou and in Thee;

We feel we are something—that also has come from thee;

We know we are nothing—but thou will help us to be.

Hallowed be Thy name—Halleluiah!"[২৬]

অনন্ত ‘পরম’এর মধ্যে যখন প্রাণসত্তা ভাবরূপে ছিল, তখন অতীত। এখন যখন সে ব্যক্তরূপে প্রতিভাত হচ্ছে, কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছে নিজের অস্তিত্ব, এটা বর্তমান। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রাণসত্তা তাঁর সাহায্যে আরও ব্যক্ততর, মহত্তর, পূর্ণতর হয়ে উঠবে, এটা ভবিষ্যৎ। ‘We feel we are nothing’ থেকে ‘We feel we are something that also has come from thee’। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ‘Thou will help us to be’—কেবলই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলা। এই এগিয়ে চলা, এই ‘হয়ে ওঠা’র আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করব। এই বিবর্তনের মহিমা খ্রিস্টান সমালোচকরা পছন্দ করেননি। এই কবিতার তত্ত্বরূপকে, এর ভাবনার মহত্ত্বকে ইংরেজ সমালোচকেরা যদি যথার্থ বুঝতে পারতেন তবে এই কবিতাটিকে ‘প্যারাডাইস লস্ট’এর চেয়েও উঁচুদরের কাব্য বলে তারা স্বীকৃতি দিতেন। এটা অত্যুক্তি হতে পারে, তবে কুড়ি বছরের উত্তীর্ণ-কৈশোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সেদিন এমনটাই ভেবেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের সমগ্র কবিতাটিই ছোটো ছোটো উদ্ধৃতিতে বিভাজিত তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে চন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে তিনি এই কবিতার নির্বাচিত অংশ বাংলায় অনুবাদ করে দেন।[২৭] সেই অনুবাদ অনেকখানি মূলানুগত। মূল কবিতার দুটি উপবিভাগ। প্রথমটি ‘The Two Greetings’ দ্বিতীয়টি ‘The Human Cry’। দুটো উপবিভাগের প্রতিটি আবার দুটো উপচ্ছেদে বিভক্ত। তার মধ্যে ‘The Two Greetings’ এর দ্বিতীয় উপচ্ছেদটি আবার দুটি আলাদা স্তবকে বিভক্ত। এর মধ্যে ‘Two Greetings’এর প্রথম উপচ্ছেদে প্রথম দশ ছত্র ও দ্বিতীয় অংশের প্রথম ভাগটুকুই মাত্র অনুবাদ হয়েছে দেখা যাচ্ছে।[২৮]

‘ডি প্রোফান্ডিস’ ছাড়াও টেনিসনের জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশ পেলে, সেই বইটির সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’এ। প্রবন্ধটির নাম ‘কবিজীবনী’ (প্রকাশ আষাঢ়, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। ১৮৯৭ সালে টেনিসনের ছেলে তার পিতার জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন দুটি খণ্ডে। (আলফ্রেড, লর্ড টেনিসন: আ মেমোয়্যার)। এই দুই খণ্ড জীবনী পড়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এটা কবির জীবনী হয়ে ওঠেনি। টেনিসনের জীবনীতে অজস্র তথ্যপুঞ্জের ভিড়ে তাঁর কবিত্বগুণের উৎস ও প্রকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কর্মবীরেরা তাঁদের কর্ম দিয়েই তাদের জীবন রচনা করেন। ঠিক তেমনই কবিজীবনের মূল সম্পদ তাঁর কাব্য। “কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব

নিবিড়তর হইয়া উঠে।"[২৯] দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সেক্ষেত্রে দান্তের জীবন ও তাঁর কাব্য একত্রে পড়লে দুটিরই মর্যাদা বেশি করে বোঝা যায়। কিন্তু টেনিসনের জীবনী সেভাবে লেখা হয়নি। তাঁর জীবনের যে অংশে বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলিতি সভ্যতার বাণিজ্যিক গন্ধ আছে সেই অংশেরই বিবরণ আছে তাঁর জীবনীতে। কিন্তু যে অংশে তিনি বিরাট, যে ভাবে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষকে, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টাকে উদার কাব্যসংগীতে একাত্ম করে দেখেছেন, সেই অংশের প্রমাণ তাঁর জীবনীতে নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত। বাস্তবজীবনের পক্ষে তা অমূলক হতে পারে কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত এই জীবনীকে 'সত্য' করে তোলা যাবে না। আমরা জানি, রসতাত্ত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবসত্য ও কাব্যসত্যকে পৃথক বলে মনে করতেন। কাব্যগত সত্য, যার সঙ্গে কাব্যকারের বিস্ময়, প্রেম ও কল্পনা মিশে আছে, তাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'অধিকতর সত্য'। এই 'অধিকতর সত্য' টেনিসনের জীবনী কেমন হতে পারত, তারও একটা আভাষ রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে দিয়েছেন। তাঁর কথায়—

> তাহাতে [টেনিসনের রবীন্দ্রপ্রত্যাশিত জীবনীতে] লেডি শ্যালট ও রাজা আর্থারের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে, তাহাতে মার্লিনের জাদু ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল—সেখানে প্রাচীনকালের ভগ্নদূর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদীনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল, কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ বহন করিয়া তিনি বর্তমান কালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই। যদি হইত তবে একজনের সঙ্গে আর একজনের লেখার ঐক্য থাকিত না, টেনিসনের জীবন ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করত।[৩০]

জীবনী রচনার তাত্ত্বিক হিসেবে এখানে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলতে চেয়েছেন, তা খুব স্পষ্ট। সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবনকে দেখতে হবে। না হলে জীবনীর নামে কতকগুলি তথ্যের বস্তুপিণ্ড জড়ো হবে মাত্র ; তাতে কবিকে পাওয়া যাবে না। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করে মাটিকেই পাওয়া যায়; শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর আত্মজীবনী লেখবার সময়ে এই ধারণায় স্থিত ছিলেন। 'আত্মপরিচয়' সম্পূর্ণতই তাঁর

কবিজীবনের অন্তর্লোকের ইতিবৃত্ত আর ‘জীবনস্মৃতি’র গোড়াতেই তিনি পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর ঠিকুজি এবং জন্মকাল। সেইসঙ্গে এও বলেছেন, এরপরে কেউ যেন তার কাছ থেকে সন-তারিখ প্রত্যাশা না করেন। টেনিসনের জীবনীনির্ভর এই সমালোচনাটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এতে রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনার তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণটি সুচারুভাবে উদঘাটিত হয়েছে।

চ্যাটার্টন—বালক-কবি

টমাস চ্যাটার্টন (১৭৫২-১৭৭০) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের এক ভাগ্যহত কবি। তাঁর প্রতিভা ছিল যথেষ্ট কিন্তু পাঠকমহলের থেকে যতখানি যশ ও স্বীকৃতি তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, তার কিছুই পাননি। সেই হতাশা নিয়ে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। চ্যাটার্টনের অদ্ভুত প্রতিভা ও অদ্ভুত জীবনের গল্প রবীন্দ্রনাথ প্রথম শোনেন অক্ষয় চৌধুরীর কাছেই। ‘জীবনস্মৃতি’তে বর্ণনা আছে—

> ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। তাঁহার কাব্য যে কীরূপ তাহা জানিতাম না—বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিলে বোধহয় রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালক কবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন।[৩১]

ওই আত্মহত্যার অংশটুকু বাদ দিয়ে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হওয়ার ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ছদ্মনামে প্রাচীন ব্রজবুলি ভাষায় কবিতা রচনার সূত্রপাত। ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বেরোয় ১২৯১ বঙ্গাব্দে। কিন্তু কবিতাগুলি তারও অনেক আগে লেখা। এই কাব্যগ্রন্থের মোট ২২ টি কবিতার মধ্যে ১৩টি প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভারতী’ পত্রিকায়। এদের মধ্যে ‘ভারতী’তে প্রকাশিত প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল ১২৮৪ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ও শেষটি ১২৮৮ এর শ্রাবণ সংখ্যায়। অর্থাৎ অক্ষয়বাবুর মুখে চ্যাটার্টনের

রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনেই রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হয়ে ভানুসিংহের কবিতা লিখতে শুরু করেন। তখনও সম্ভবত চ্যাটার্টনের মূল রচনা রবীন্দ্রনাথ পড়েননি। এর দেড় বছর পর অর্থাৎ ১২৮৬ এর আষাঢ়ে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্টনকে নিয়ে এই প্রবন্ধটি রচনা করে। এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিলেতবাস করছেন। প্রশান্ত পাল অনুমান করেছেন, এই প্রবন্ধটি লেখবার কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো ব্রিস্টলে গিয়েছিলেন। কারণ উক্ত প্রবন্ধে চ্যাটার্টনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ব্রিস্টলের রেডক্লিফ গির্জার যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তা হয়তো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই উদ্ভুত। চ্যাটার্টনের স্মৃতি বিজড়িত ব্রিস্টলের গির্জা ও তাঁর মৃত্যুর সত্তর বছর পরে ১৮৪০ এ নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ স্বচক্ষে দেখে তিনি তাঁর জীবনকাহিনি বর্ণনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এমন ভাবনা অযৌক্তিক নয়।[৩২] তবে ভানুসিংহের কবিতা লেখবার আগে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্টনের মূল কবিতা না পড়লেও এই প্রবন্ধটি লেখবার আগে তিনি তা পড়েছিলেন নিশ্চিত কারণ চ্যাটার্টনের দুটি কবিতার তিনটি অংশের বঙ্গানুবাদ তিনি এই প্রবন্ধে যুক্ত করেছেন। এর মধ্যে প্রথম কবিতাটি—'উপর হইতে দেখো আসিছেন মেঘে'—খ্রিস্টের মর্ত্যে আগমন বিষয়ক কবিতা। দশ বছরের বালক চ্যাটার্টনের লেখার নমুনার সঙ্গে 'ভারতী'র পাঠককুলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবিতাটি রচিত। মূল কবিতাটির নাম 'On The Last Epiphany (or Christ coming to Judgement)[৩৩] আর দ্বিতীয় কবিতাটি Thomas Rowley এর ছদ্মনামে চ্যাটার্টনের সতেরো বছর বয়সে লেখা একটি গাথা। এর নাম 'Elinoure and Juga'।[৩৪]

চ্যাটার্টনের প্রতি কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মমত্ব ছিল, তা বোঝা যায়। চ্যাটার্টনের যথেষ্ট কবিপ্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পাঠকসমাজ তাঁর প্রতি অনুকূল ব্যবহার করেনি। দিয়েছিল কেবল উপেক্ষা আর ঔদাসীন্য। রবীন্দ্রনাথেরও চ্যাটার্টনের বয়সে কাব্যচর্চার অভিজ্ঞতা অতখানি তিক্ত না হলেও অনুকূল ছিল না। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমি কবিতা লিখি, এ-খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না।...এই কবিতার দ্বারায় শ্রোতাদের মনে কিছুমাত্র সদ্‌ভাবসঞ্চার হয় নাই। অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয়ই আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে।[৩৫]

দ্বিতীয়ত, যা কিছু প্রাচীন তাঁর প্রতি বালক চ্যাটার্টনের এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। তাঁর পিতা যখন গির্জার কর্মচারী ছিলেন তখন মাঝে মাঝে গির্জার সিন্দুক থেকে রাশি রাশি পুরনো লিখিত পার্চমেন্ট নিয়ে এসে রান্নাঘর সাফ করতেন ও গৃহকর্মে সেগুলোকে ব্যবহার করতেন। বালক কবি চ্যাটার্টন সেই সব কাগজপত্র তাঁর পড়বার ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করতে চেষ্টা করতেন ও সেই সকল প্রাচীন অক্ষর অনুকরণ করতেন। এই ভাবে প্রাচীন ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁর দখল হয় এবং প্রাচীন কবিদের নকল করে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। পার্চমেন্ট কাগজ কীরূপ করলে প্রাচীনের মতো দেখতে হয় তা নিয়েও তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এইভাবে প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখে তিনি সেগুলিকে ব্রিস্টলের প্রাচীন এক ধর্মযাজক Thomas Rowley এর নামে প্রকাশ করতেন। কারণ সাধারণ কবিতাপাঠকদের মনস্তত্ত্ব এই যে কোনও ভালো কবিতা যদি অল্পবয়স্ক বালকের রচনা বলে তাদের সামনে আসে তবে তারা সেগুলোকে নেহাত উপেক্ষা করে কিন্তু সেইসব কবিতাই যদি কোনও প্রাচীন কবি লিখেছেন বলে তাদের প্রতীতি জন্মায় তবে ভাবে গদগদ হয়ে তারা প্রশংসার বন্যা ছুটিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত ‘প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ’এর ব্রজবুলি ভাষা মকশো করে রবীন্দ্রনাথ যখন ভানুসিংহের কবিতা লেখেন ও তার বন্ধুকে বলেন ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরি খুঁজতে খুঁজতে বহুকালের পুরনো জীর্ণ এক কাব্যপুথি পাওয়া গেছে, সেইখান থেকে ভানুসিংহ নামে এক প্রাচীন কবির পদ তিনি কপি করে এনেছেন। এই শুনে সেই কবিতা পড়ে তার বন্ধু প্রশংসার অতিরেক করে বলে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়েও নাকি এত সুন্দর কবিতা বের হতে পারত না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন পরক্ষণেই সেই কবিতাগুলির রহস্য এবং কবির পরিচয় সেই বন্ধুর সামনে তুলে ধরলেন, তখন বন্ধু “গম্ভীর হইয়া কহিলেন “নিতান্ত মন্দ হয় নাই”[৩৬]। কাকতালীয় হলেও চ্যাটার্টনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ঘটেছিল আরেকভাবেও। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সে কথা। ব্যারেট নামক এক ঐতিহাসিক ব্রিস্টলের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে চ্যাটার্টনের বেনামে লেখা রাউলির কবিতাকে প্রাচীনত্বের নিদর্শন হিসেবে অব্যর্থভাবে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী ইতিহাস রচনা করেছিলেন। চ্যাটার্টন শেষটায় নিজের পরিচয় দিলেও ব্যারেট তা অস্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে দেখা যায়, ভানুসিংহের পদাবলী ‘ভারতী’তে প্রকাশ হতে থাকলে এক জনৈক ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বাংলাদেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একটা চটি-

বই লিখেছিলেন। সেখানে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে ভানুসিংহ ঠাকুরকে যে সম্মান দিয়েছিলেন, কোনও আধুনিক কবির ভাগ্যে তা সহজে জোটে না।[৩৭] এইভাবে ব্রিস্টলের সপ্তদশবর্ষীয় বালক-কবি চ্যাটার্টনের অভিমান, যশোলিপ্সা ও মনোবেদনার সঙ্গে প্রায় সমবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার মিল হয়ে যায় অনেকখানি। তাই ব্রিস্টলের সেই হতভাগ্য বালক-কবির প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও মমত্ববোধই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনকাহিনি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করার প্রণোদনা জুগিয়েছিল বলে মনে হয়।

রবীন্দ্র বীক্ষণে শেকসপিয়র

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতায় যখন রবীন্দ্রনাথ বড়ো হয়ে উঠছেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে শেকসপিয়র পরম আদরে গৃহীত। ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালির প্রথম পরিচয় যাঁর মাধ্যমে, সেই বঙ্কিমের লেখায় শেকসপিয়রের প্রশস্তি, কলকাতার রঙ্গমঞ্চগুলিতে শেকসপিয়রীর নাটকের সীমাহীন জনপ্রিয়তা, ঠাকুর পরিবারের নিজস্ব ভাবধারায় শেকসপিয়র অনুবাদ ও চর্চা বালক রবীন্দ্রনাথের মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। সত্যেন্দ্রনাথ শেকসপিয়রের Cymbeline নাটক অবলম্বন করে 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক রচনা করেন ১৮৬৮ সালে, রবীন্দ্রনাথ তখন সাত বছরের বালক।[৩৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথও শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকটি সমনামে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। এই অনুবাদ সেই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়।[৩৯]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষা পর্বে শেকসপিয়র ছিলেন অপরিহার্য। চোদ্দ বছর বয়সে অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ ম্যাকবেথ অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদের অংশবিশেষ 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ও বিদ্যাসাগরের মতো গুণীজনের প্রশংসা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> তিনি(জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য) খানিকটা করিয়া ম্যাকবেথ আমাকে বাংলায় মানে করিয়া বলিতেন এবং যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।[৪০]

হয়তো রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক জ্ঞানবাবুর মনে এই কথা ছিল যে, একজন বাঙালি ছেলে ম্যাকবেথ বাংলায় অনুবাদ করে নাটকটি যতখানি বুঝবে, বিজাতীয় ভাষায় রাশি রাশি সমালোচনা পড়েও ততখানি বুঝবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য ম্যাকবেথ অনুবাদের সেই খাতাখানি হারিয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যে একেবারে অপাংক্তেয় হয়নি, তার প্রমাণ 'জীবনস্মৃতি'তেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত শিক্ষক রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য 'ম্যাকবেথ' এর অনুবাদটি পড়ে খুশি হয়েছিলেন।

তিনি(রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য) একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন।...ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই—অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম। মনে আছে, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অন্যান্য অংশের অপেক্ষা ডাকিনীর উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত।[৪১]

ম্যাকবেথ নাটকে Hecate নামক ডাকিনীর সংলাপ অনুবাদের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ পরিহাসরসপ্রিয়তায় কাদম্বরী দেবীকে Hecate Thacroon আখ্যা দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। অত অল্প বয়সে একখানি পুরো নাটক অনুবাদ করা, বিদ্যাসাগরকে তা পড়ে শোনানো, অনুবাদকার্য বিষয়ে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ পাওয়া, এই সবকিছুই রবীন্দ্রনাথকে শেকসপিয়র সম্বন্ধে কতখানি উৎসাহিত করে তুলেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ম্যাকবেথ অনুবাদ করলেও গীতিকাব্যের রসে মজে থাকা রবীন্দ্রনাথের মনে শেকসপিয়রকে প্রতিগ্রহণের পথ বড়ো সহজ ছিল না। এর কারণ প্রতিভার বৈপরীত্য। গীতিকাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম পক্ষপাত তাঁকে শেকসপিয়রীয় প্রতিভার সমধর্মিতা থেকে কিছুটা দূরে রেখেছিল কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রমনে শেকসপিয়রের নাট্যভাবনার যে ছাপ পড়েছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা নাটকগুলিতে সেই ছাপ আরও গভীরভাবে ধরা দিয়েছিল। পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট, উপকাহিনিযুক্ত, বিষাদকরুণ ট্র্যাজেডিনির্ভর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের প্রধান দুটি নাটক 'রাজা ও রানী' ও 'বিসর্জন'এ শেকসপিয়রের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। 'রাজা ও রানী'(প্রকাশকাল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ)তে রানী সুমিত্রার প্রতি রাজা বিক্রমদেবের সংযমহীন আসক্তি সচেতন পাঠককে 'এ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকের কথা

স্মরণ করিয়ে দেয়। রোমসম্রাট এন্টনি রাজ্যের কল্যাণ-কর্ম অপেক্ষা ক্লিওপেট্রার উষ্ণ সান্নিধ্যকেই অধিক মাত্রায় কামনা করেছেন। অনুরূপভাবে বিক্রমদেবও সুমিত্রার উদ্দেশে বলেছেন—"থাক গৃহ, গৃহকাজ।/সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি/অন্তরে তোমার গৃহ, আর গৃহ নাই—"[৪২] এমনকি কঞ্চুকি রাজাকে গুরুতর রাজকার্যের বিষয়ে পরামর্শ প্রার্থনার কথা বলতে এলে বিক্রমদেব অস্বস্তির সঙ্গে বলেছেন—"ধিক তুমি! ধিক মন্ত্রী! ধিক রাজকার্য!/রাজ্য রসাতলে যাক মন্ত্রী লয়ে সাথে!"[৪৩] । প্রণয়-আসক্তির দিক থেকে বিক্রমদেব এন্টনির সঙ্গে তুলনীয় আবার অসংযত হৃদয়াবেগের দিক থেকে তার সঙ্গে ওথেলোর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। সুমিত্রা প্রাণত্যাগ করলে বিক্রম যে ভঙ্গিতে অনুশোচনা করেছে, যথা—

"দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহ জন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব; তাহারো দিলে না অবকাশ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর—
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!"[৪৪]

এর সঙ্গে ডেসডিমোনার মৃত্যুতে ওথেলোর হাহাকার ও অনুতাপ যেন সমস্বরে গ্রথিত। বিক্রমদেব ছাড়াও এই নাটকের 'রেবতী' চরিত্রটির ওপর সুস্পষ্টভাবে 'ম্যাকবেথ' নাটকের 'লেডি ম্যাকবেথ' চরিত্রটির প্রভাব পড়েছে। দুটি চরিত্রই তীব্র উচ্চাভিলাষের পর্দায় গাঁথা। ম্যাকবেথের মতোই চন্দ্রসেনও স্ত্রীর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পাপকার্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

'বিসর্জন' নাটকের প্লট ও চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রমনে শেকসপিয়রের প্রচ্ছন্ন প্রভাব কাজ করেছে, তা অত্যন্ত স্পষ্ট। রঘুপতির তীব্র ব্রাহ্মণ্য-গর্বের সঙ্গে রাজশক্তির যে বিরোধ 'বিসর্জন' নাটকের মূল প্লট, তার সঙ্গে শেকসপিয়রীয় ট্রাজেডির প্রভূত সাদৃশ্য চোখে পড়ে। জয়সিংহের কথার উত্তরে রঘুপতি যখন বলেন—

“পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা

আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ।

এ জগত মহাহত্যাশালা...”[৪৫]

--রঘুপতির এই উক্তিতে শেকসপিয়রের ট্রাজেডির নায়ক যেমন ইয়াগো অথবা ম্যাকিয়াভেলির ছায়া লক্ষ করা যায়। রাজাকে হত্যা করে রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের রাজা হওয়ার ইচ্ছা ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে লেডি ম্যাকবেথ ও ডাইনিদের কথায় ম্যাকবেথের মনে জেগে ওঠা উচ্চাভিলাষকে স্মরণ করায়। ‘জয়সিংহ’ চরিত্রের যে দ্বিধা ও দোলাচলতা, তার সঙ্গে ‘হ্যামলেট’ নাটকের হ্যামলেট চরিত্রের গভীর আনুরূপ্য আছে। রাজা হ্যামলেটের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে ‘রাজা ও রানী’র কুমারসেন ও ‘বিসর্জন’এর জয়সিংহ চরিত্রে। রাজা হ্যামলেটের উচ্চ মণীষা এদের নেই ঠিকই, কিন্তু হ্যামলেটের আবেগ এবং দুর্বলতা এই দুটি চরিত্রে সমানমাত্রায় আছে।

শুধু ট্র্যাজেডিই নয়, ‘চিরকুমার সভা’ বা ‘শেষরক্ষা’র মতো কমেডিতে As you like It এবং ‘গোড়ায় গলদ’এর মতো হাস্যরসাত্মক নাটকে The Comedy Of Errors এর ছায়া যেকোনো সচেতন পাঠকের চোখে ধরা দেবে। এই পর্বে নাট্যরচনায় তাঁর আদর্শ যে শেকসপিয়র, একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন ‘মালিনী’ নাটকের ভূমিকায়—“শেকস্পীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।”[৪৬]

১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু লোকেন পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে শেকসপিয়রের মানবচিত্রচিত্রণ ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানুষ কাটাছেঁড়াভাবে নয়, যাবতীয় সামগ্রিকতা নিয়ে ধরা পড়েছে শেকসপিয়রের রচনায়। “ফল্স্টাফ ও ডগবেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যামলেট পর্যন্ত শেকস্পীয়র যে মানব-লোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই”[৪৭]। তাঁর মতে, সোসাইটি নভেলগুলি হতে পারে বাস্তব জীবনের অবিকল চিত্রণ কিন্তু সাহিত্যের চিরকালীন সত্য শেকসপিয়রে আশ্রিত। আজকের সোসাইটি নভেলগুলি কাল মিথ্যা হয়ে যাবে কিন্তু শেকস্পিয়র কখনও মিথ্যা হবে না।[৪৮] ১৯০৬ সালে গ্যেটে সৃষ্ট Weltliteratur এর আদর্শে ‘বিশ্বসাহিত্য’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ

যেভাবে “বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য”[৪৯] স্থির করেছেন এবং “প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ”[৫০] আবিষ্কার করতে চেয়েছেন, লোকেন পালিতকে লেখা পূর্বোক্ত পত্রে শেকসপিয়রের চরিত্রচিত্রশালায় রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সেই বিশ্বমানবকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকে এসে রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা পুরোপুরি বদলে যায়। ‘শারদোৎসব’ থেকেই রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারার যে নতুন দিক খুলে যায়, সেখানে শেকসপিরিয়ান নাট্যভাবনার প্রভাব আর নেই বললেই চলে। শেকসপিয়রের জগৎ থেকে রবীন্দ্রসৃষ্টির জগৎ অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়ে। ১৮৭৫ সালে যে ‘শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা’ প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রথম কালিদাস ও শেকসপিয়রের তুলনামূলক আলোচনা করে উভয়ের সাদৃশ্য দেখান ও শেকসপিয়রের প্রশস্তি করেন, রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে ‘নবপর্যায় বঙ্গদর্শন’এ বঙ্কিমের নামোল্লেখ না করে ওই একই বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন এবং বঙ্কিমের মতের বিরোধীতা করে টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলার বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে কালিদাসকে শেকসপিয়রের উচ্চে স্থান দেন। শেকসপিয়রের নাটকের মধ্যে তিনি দেখতে পান প্রবৃত্তির নিদারুণ অসংযম, বিপরীতে তাঁর মনে হয় “শকুন্তলার মতো এমন শান্ত গভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেকস্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।”[৫১] এটা কি শুধুমাত্র সাহিত্যচিন্তার বদল নাকি প্রাচ্য তথা ভারতীয়ত্বের প্রতি অভিমান? কালিদাসের সঙ্গে প্রতিতুলনায় টেম্পেস্ট নাটকের প্রতি একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও কতটা যৌক্তিক, তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে সাময়িক নয়, স্থায়ী তার প্রমাণ আছে, ১৯১২ তে প্রকাশিত ‘জীবনস্মৃতি’তে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বলছেন, তরুণ যৌবনে তাঁদের “সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেকসপিয়র, মিলটন ও বায়রন।”[৫২] কিন্তু তিনি এঁদের লেখা থেকে যে পরিমাণ মাদক পেয়েছেন, সে পরিমাণ খাদ্য পাননি। ‘হৃদয়াবেগের একান্ত আতিশয্যই’ সেই সাহিত্যের একটি স্বভাব বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে, তার তুলনায় প্রাচ্য সাহিত্যের শান্ত, গভীরতা অনেক বেশি স্বস্তিপ্রদ বলে পরিণত বয়সে মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের।

পরিণত বয়সে সাহিত্যাদর্শ বদলে গেলেও শেকসপিয়রকে অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ। শেকসপিয়রের মৃত্যুর ত্রিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লণ্ডনের Shakespeare Society-র উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ একটি ষোলো লাইনের কবিতা লেখেন। কবিতাটি নীচে উদ্ধৃত করা গেল—

"যেদিন উঠিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংল্যাণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারই তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্প বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখা-পুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।[৫৩]

কবিতাটি প্রশস্তি হিসেবে ভালো হলেও শেকসপিয়রের প্রতিভার গভীরতা এ কবিতায় ধরা পড়েনি। পরবর্তীকালে সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষত ট্র্যাজেডির আলোচনায় শেকসপিয়রের প্রসঙ্গ বারবার এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। দুঃখের কাব্য, শোকের কাব্য কখন নান্দনিক ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে অর্থাৎ ট্র্যাজেডির সাহিত্যমূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন দুঃখকে যদি আমরা ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্কা বাঁচিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখি, তবে সেই দুঃখকে বলা চলে সুন্দর।“ঘরের পাশে যদি খুন হয় অনিষ্টের আশঙ্কায় আমরা পুলিশ ডেকে বসি, কিন্তু ওথেলো যেখানে ডেসডিমোনার প্রাণ নিল সেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই, বেদনার তীব্রতা সেখানে আমাদের প্রোজ্জ্বল অনুভূতির দীপ্ততেজে সমস্ত চৈতন্যকে উদ্ভাসিত করে তোলে।”[৫৪] ওই একই কারণে হ্যামলেট নাটকের গভীর নৈরাশ্য-বেদনার মধ্যেই তার পূর্ণ সার্থকতা।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে শেলি

রোমান্টিক কবিদের মধ্যে পার্সি বিশি শেলি (১৭৯২-১৮২২) সম্ভবত একমাত্র কবি যাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি মিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের আধ্যাত্মিকতা, কিট্‌সের উজ্জ্বল কলানৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চিত কিন্তু শেলির নির্বস্তুক ভাবের জগতের প্রতি যে আসক্তি, এক অখণ্ড বোধের মধ্যে জগৎ এবং জীবনকে দেখবার যে আততি, তার সঙ্গে রবীন্দ্রমননের অনেকখানি মিল হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা গীতিকাব্যের সঙ্গে শেলির মিল লক্ষ করে সেকালের সাহিত্যরসিকরা রবীন্দ্রনাথকে ‘বাংলার শেলি’ আখ্যা দিয়েছিলেন। ‘জীবনস্মৃতি’তে সে কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ সকৌতুকে বলেছেন, সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসস্বরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ শেলির একাধিক কবিতা ও কাব্যাংশ অনুবাদ করেছেন। ‘ছিন্নপত্রাবলী’র বেশ কিছু চিঠিতে শেলি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য করেছেন। ‘ভারতী’ পত্রিকাতে প্রকাশিত ‘অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি’ (অগ্রহায়ণ, ১২৮৮) নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শেলিকে ‘অদ্বৈতবাদী’ আখ্যা দিয়েছিলেন কেননা শেলি জগৎ ও জীবনের যে অখণ্ডতা, যে oneness এর কথা ভেবেছিলেন তার সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের অনেক মিল রয়েছে। ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আধুনিক ইংরেজ কবিদেগের মধ্যে সেলীই প্রথম তাঁহার কবিতার মধ্যে অদ্বৈতবাদের অবতারণা করেন। যাঁহারা যথার্থ কবি...তাঁহারা প্রকৃতিকে জড় বলিয়া কোন মতেই মনে

করিতে পারেন না। তাঁরা যাহা-কিছু-সকলেরই মধ্যে প্রাণ দেখিতে পান, যাহা-কিছু সকলেরই মুখে কথা শুনিতে পান। এক মহা চৈতন্যে তাঁরা সমস্ত পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত দেখেন।...[৫৫]

'ছিন্নপত্রাবলী'র একটি চিঠিতে (২০ শে মার্চ, ১৮৯৫) এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন, অন্যান্য মণীষীদের অপেক্ষা শেলি তার বেশি প্রিয় কারণ তার চরিত্রে কোনও রকম দ্বিধা ছিল না। তাঁর ছিল এক অখণ্ড প্রকৃতি। অন্যরা মনের বিতর্ক অথবা থিয়োরির দ্বারা নিজেদের ভেঙেচুরে গড়েন কিন্তু শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক-বিতর্ক বা আলোচনার লেশমাত্র নেই। সে যা হয়েছে, নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। বাইরের প্রকৃতির মতোই সে উদার এবং সুন্দর এবং নিজের বা পরের সম্বন্ধে চিন্তা বা দ্বিধাহীন। শেলির অন্তরের এই নিবিষ্ট ধ্যানমগ্নতা ও সারল্যই তাঁর কবিস্বভাবের মূল বৈশিষ্ট্য বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে। তাঁর কথায়—

এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে—কোনও দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদমের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যই এক হিসেবে পরম রহস্যময়। এরা এখনও জ্ঞান বৃক্ষের ফল খায়নি বলে নিত্য সত্যযুগে বাস করছে।[৫৬]

ঘরোয়াভাবে আলাপের ঢঙে লেখা এই চিঠি কেজো সমালোচনা নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যে হয়তো খানিক অত্যুক্তি আছে, তবে এ কথা ঠিক যে শেলীর অন্তর্মুখীন প্রবণতা ও বস্তুজগত নিরপেক্ষ এক আদিম সারল্য তাঁর কাব্যকে, তাঁর বিশ্বাসের জগতকে পৃথকভাবে নির্মাণ করেছিল।

শেলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সমালোচনাটি একটি অভিভাষণ। ৮ই জুলাই ১৯২২ তারিখে শেলির মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ এটি। ভাষণটির লিখিত রূপ 'ভারতী'তে প্রকাশ হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। আরও পরে অভিভাষণটি পুনর্মুদ্রিত হয় 'রবীন্দ্রবীক্ষা' পত্রিকায়।[৫৭] এই অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ শেলির জীবন ও তাঁর কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা করেন। শুরুতেই তিনি বলেন, পৃথিবীতে জন্মে যাঁরা বড়ো ধরণের সৃষ্টিশীল

কাজ করেছেন, তাঁরা কোনও বিশেষ দেশের অধিবাসী নন, বিশেষ কালেরও নন। তাঁরা সব দেশের, সব কালের। মনকে সজীব ও সচল করে রাখতে গেলে আমাদের নিজেদের দেশের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। বিশ্বমনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাকে আপন করে নিতে হবে। উপনিষদে মৈত্রেয়ী যে অমৃতের অধিকার চেয়েছিলেন, তা কেবল আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষেত্রেও পূর্ণমাত্রায় সত্য। সাহিত্যের অমরাবতীতে দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন নিত্যত্বে অবস্থান করছেন কালিদাস ও শেকসপিয়র-শেলির মতো কবিরা। সেই অমরাবতীর সামনে দাঁড়িয়ে সাহিত্যভাবুককে হাত পাততে হবে বিশ্বসাহিত্যের অমৃত লাভ করার জন্য। এখানে দেশ-কাল ও মনের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে হবে। এই একই ধরণের কথা রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বসাহিত্য' (প্রকাশ মাঘ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে অনেক আগেই বলেছিলেন। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটা নিত্যকালীন আদর্শ আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তাই—

> সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব।...যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে।[৫৮]

এই দেশকালের সীমাছিন্ন নিত্যত্বের আদর্শেই শেলি বিশ্বসাহিত্যের কবি। তাই তাঁর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে কলকাতায় অন্য ভাষাভাষীর মহলেও তাঁর জয়ন্তী পালনের আয়োজন হতে পেরেছে।

ইংরেজ সমালোচকদের উক্তি ধার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শেলি হচ্ছেন কবিদের কবি। কবিদের কবি বললে এই কথাই বোঝায়, অন্য কবিরা যে উপাদানগুলি ব্যবহার করে কবিতা লেখেন, সেই উপাদানগুলির উপরে শেলির প্রভুত্ব ছিল অপরিসীম। শেলি ভাষার শক্তিকে মন্ত্রবলে যেন তাঁর রচনায় খাটিয়ে নিতে পারতেন। শব্দের মাধুর্য তাঁর কাব্যকলার একটি বিশেষ গুণ। তা বিদেশি হলেও, অন্যভাষী হলেও আমরা অনুভব করতে পারি। দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র কাব্য রচনার বেলাতেই নয়, তাঁর সমগ্র জীবন কবিত্বের অনুপ্রেরণায় গঠিত। তিনি তাঁর

জীবনচারণের ষোল আনা ভাগকেই কবিত্বের দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। একপ্রকার ভাব বা কল্পনার জগৎ, যাকে Imagination শব্দের দ্বারা পুরোপুরি বোঝা যায় না (অথচ সেটি ছাড়া অন্য শব্দ নেই) সেই জগতে শেলি ছিলেন আদ্যন্ত নিমগ্ন। তাই সাধারণ লোকে তাঁকে ক্ষেপা বলে উপহাস করেছে কারণ সংসারী লোকের বিচক্ষণ বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর জীবনচারণ পুরোপুরি খাপ খায়নি।

এরপর শেলির কবিচরিত্রের তিনটি দিককে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট করেছেন। প্রথমত, তিনি তাঁর কালের যা কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত করেছিলেন। এই দুর্গতির মূলত দুটি রূপ— রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র। শেলি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে এই দুই তন্ত্রকে আঘাত করেছেন সবচেয়ে বেশি। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে কীভাবে একেবারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। বাইরে থেকে মানুষকে দাসত্বে বদ্ধ করেছে রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্মতন্ত্র তার আত্মাকে সংকীর্ণ করেছে, মুগ্ধ করে রেখেছে। এই দাসত্বের বন্ধন ও মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেননি। এই যে দুই তন্ত্রের বিরুদ্ধে শেলির লড়াই, তার পাপ আজও আমাদের দেশ বহন করছে। ধর্মের নামে অন্ধ আচারকে বিচারহীন আনুগত্যের সঙ্গে মানতে মানতে আমরা নিজেদের কতখানি খর্ব করে ফেলেছি, সে আর বলার নয়। বাইরের থেকে এই শাসনশক্তি ও ভিতরের থেকে অন্ধমোহের শক্তিকে যে পরাস্ত করতে যাবে তাকেই শেলির মতো নির্যাতন সহ্য করতে হবে। কিন্তু সেই নির্যাতন সত্ত্বেও মানুষের মুক্তিকামী অংশ এই দুই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। ইংরেজ কবি শেলি তাঁর কাব্যের মধ্যে দিয়ে ও তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই সকল মানুষের হয়ে প্রচার করেছেন। আবার এ কথাও ঠিক তিনি তাঁর ‘Revolt of Islam’ প্রভৃতি যে-সব কাব্যে এই মতগুলিকে উদ্যতভাবে প্রকাশ করেছেন, সেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য নয় অন্যদিকে ‘Prometheus Unbound’ এর মতো নাটকে সেই একই বিদ্রোহ অনেক বেশি শিল্পসম্মতভাবে ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে দেবরাজ জিউসের আধিপত্যবাদ, পীড়ন ও পাপাচারের বিরুদ্ধে বীর-বিদ্রোহী প্রমিথিউস সকল মানব সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হিসেবে সংগ্রামে অগ্রণী। অনমনীয় বিদ্রোহের শেষে জিউস ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং মুক্ত প্রমিথিউস মিলিত হয় এশিয়ার সঙ্গে। পীড়নকারী শাসনের মেয়াদের শেষে শুরু হয় প্রেম ও আনন্দের যুগলপ্লাবন। এই নাটকের বিষয়বস্তু শেলির কলম থেকে নির্গত হলেও তা দেশদেশান্তর ও কালকালান্তর ছাড়িয়ে সমগ্র মানবসমাজের কথাই ঘোষণা করছে।

দ্বিতীয়ত, শেলির মধ্যে গভীর একটা ধর্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল। এইটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শেলির 'Alaster' কাব্য বিশদে আলোচনা করেছেন। পরম সৌন্দর্যময় একটা আত্মিক সত্তা বিশ্বের বাহ্যরূপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাকে জানার জন্য শেলির মনে গভীর বেদনাপূর্ণ একটা আকূতি ছিল। সেই সন্ধানের বেদনাই 'Alaster' কাব্য। 'মেঘদূত'এ বিরহী যক্ষের হৃদয় ব্যথা যেমন প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে পর্যটন করে অবশেষে অলকায় চরম সৌন্দর্যকে লাভ করল তেমনই 'Alaster' কাব্যে সৌন্দর্যবোধে প্রাণিত এক যুবক কবি তাঁর স্বপ্নে দৃষ্ট এক অবগুণ্ঠিতা নারীর (Veiled maid) সন্ধানে বিশ্বপরিক্রমায় রত হয় কিন্তু অবশেষে ভগ্নমনোরথ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই অনন্ত সৌন্দর্যের খোঁজে অনন্ত যাত্রার যে কথা শেলি তাঁর কাব্যে বলেছেন তা সারা বিশ্বের রসিক হৃদয়ে আলোড়ন তুলবে।

তৃতীয়ত, সুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকে শেলি যেন একটা পর্দার মতো (যাকে Veil চিত্রকল্পে বারবার প্রকাশ করেছেন) করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা, এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রয়েছে। এই কুহেলিকার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের নির্মল মূর্তি দেখবার জন্য শেলির অন্তরে ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল। এইখানে ভারতীয় অদ্বৈতবাদী দর্শনের সঙ্গেও তাঁর মনের গভীর মিল লক্ষ্যগোচর হয়। এই পরমকে কতবার তিনি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই 'পরম'কেই 'Hymn to Intellectual Beauty'তে শেলি বলেছেন 'the awful shadow of some unseen power'। এলাস্টারে শেলি কেবল সন্ধানের কথা বলেছেন। সেই সন্ধান শেষপর্যন্ত যে উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছে তাই-ই হল 'Hymn to Intellectual Beauty'। এই কবিতাটি বিশদে বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষণ শেষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কথিত এই কবিতার মূল কথাই হল, এক অদৃশ্য শক্তি আমাদের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তাকে আমরা জানি না বা দেখতেও পাই না। এই বিচিত্র জগৎকে সে তার চঞ্চল পাখনা দিয়ে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকেই শেলি Intellectual Beauty বলে সম্ভাষণ করেছেন।

সুতরাং সার্বিক বন্ধন থেকে মুক্তিপিপাসু শেলি যেমন রাজতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনই মানুষের জীবনের খণ্ডচেতনা যে বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের মনকে গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে, তাও তিনি সহ্য করতে পারেননি। ফলে একদিকে

প্রথামুক্তি ও বন্ধনমুক্ত স্বাধীন মন আবার অন্যদিকে সৌন্দর্যময় আত্মিক সত্তার প্রতি আকূতি ও মৃত্যুর আবরণকে ভেদ করে অখণ্ড সত্তার জ্যোতির্ময় রূপকে অবলোকনের আকাঙ্ক্ষা শেলির কবিস্বভাবের তিনটি মূল সূত্র। যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সর্বতো মিল। এই কারণেই বোধহয় ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলির সঙ্গেই তাঁর সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তা।

ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে শেলিকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, কিট্স, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং এঁদের সম্বন্ধেও তাঁর বিক্ষিপ্ত ও অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। টেনিসন প্রসঙ্গ আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। **ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রসঙ্গ (১৭৭০-১৮৫০)** রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন লোকেন পালিতের সঙ্গে পত্রালাপে। ফরাসি কবি গোতিয়ের সঙ্গে প্রতিতুলনায় তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যেকার সৌন্দর্যচেতনার আধ্যাত্মিক বিকাশকে বিশেষ প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। গোতিয়ের কাব্যের নায়ক যেখানে হৃদয় এবং অন্তর্দৃষ্টিকে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করছে। যেন সৌন্দর্য কোনও বহুমূল্য রত্নের মতো অন্ধকার খনিগর্ভে লুক্কায়িত। যেন চারপাশের সজীবতার মধ্যে তার কোনও সাড়া নেই। সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এই ফরাসি কাব্যে সাহিত্য-সত্যের অভাব লক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেইদিক থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে সৌন্দর্যভাবনা অনেক বিস্তৃত ও উদার। পুষ্পপল্লব, নদী-নির্ঝর, পর্বতপ্রান্তর সর্বত্র শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়, একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পেয়েছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এতে তাঁর কাব্য অনন্ত বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেছে। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে—

> এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি, তৃপ্তি, বিরক্তি নেই; ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব ও স্থায়িত্ব।[৫৯]

জন কিট্স (১৭৯৫-১৮২১) এর কাব্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে লিখেছেন, তিনি যত ইংরেজ কবিকে জানেন সকলের মধ্যে কিট্সের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা বেশি অনুভব করেন। কিট্সের থেকে বড়ো কবি অনেক থাকতে পারে কিন্তু অমন মনের মতো কবি আর নেই। কারণ কিট্সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটা আন্তরিকতা আছে। টেনিসন, সুইনবার্ন প্রমুখ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে—তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার মধ্যে

প্রচুর সৌন্দর্য আছে। কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্য পাঠ লিখে দেয় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে কিট্সের কাব্য বানিয়ে তোলা নয়, তা সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই উৎসারিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তা মনকে মোহিত করে। কিট্সের কাব্যে শিল্পগত দুর্বলতা আছে, সম্পূর্ণতার অভাব আছে। তবুও তা মনকে আলোড়িত করে। কারণ—

> কিট্সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলা-নৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারি আকর্ষণ করে। কিট্সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনও কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে।[৬০]

এই একই চিঠিতে **টেনিসনের (১৮০৯-১৮৯২)** ‘মড’ কবিতায় লিরিকের উচ্ছ্বাস “সুতীব্র হৃদয়বৃত্তির দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে”[৬১] কিন্তু তার অপেক্ষাও **মিসেস ব্রাউনিং (১৮০৬-১৮৬১)** এর সনেটগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে “ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য”[৬২] বলে মনে হয়েছে। সেই তুলনায় **সুইনবার্নকেও (১৮৩৭-১৯০৯)** তাঁর কিছুটা কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে সুইনবার্নের তুলনা করে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে সুইনবার্ন প্রমুখেরা ‘জগতের কবি নয়, কবিত্বের কবি’। এমন কথার তাৎপর্য এই যে, কাব্যের প্রসাধনকলার দিকে অত্যন্ত নজর দেওয়ার ফলে জগতের সঙ্গে কবির মনের যে এক সরল সম্বন্ধ, তা এইসব কবিতায় অনুপস্থিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> যাঁহারা জগতের কবি নহেন, কবিত্বের কবি, সুইন্‌বর্ন্‌ তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভায় অগ্রগণ্য। কথার নৃত্যলীলায় ইঁহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে। ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন সুতায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টক্‌টকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন, সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি, কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে।[৬৩]

তুলনায় **উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯)** কে তাঁর অনেক বেশি স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। ১৯১২ সালে লন্ডন বাসকালে রবীন্দ্রনাথ ‘কবি য়েট্স্’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে সেটা ‘পথের সঞ্চয়’ গ্রন্থভুক্ত হয়। যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ইংরেজ কবিদের মধ্যে ইয়েটস ইংল্যান্ডের সর্বশেষ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, যাঁর কবিধর্মের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন

রবীন্দ্রনাথ। এ-কথা সকলেরই জানা যে এই প্রবন্ধ যে সময়ে লেখা হয় (অর্থাৎ ১৯১২ সালে) তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটসের সরাসরি যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পেছনে ইয়েটসের ভূমিকাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। তাই ইয়েটসের কবিধর্মের আলোচনা করে লেখা এই প্রবন্ধে ইয়েটসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রীতিপূর্ণ পক্ষপাত বা অনিরপেক্ষতার কথা তোলা যেতেই পারে তবুও ইয়েটসের কবিতা ভালো লাগবার পেছনে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তিগুলি হাজির করেছেন, তা বুঝে নেওয়া দরকার। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ব্যাখ্যামূলক কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'সাহিত্যের তাৎপর্য' নামক প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—"সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।"[৬৪] অর্থাৎ কবি বিশ্বের উপর যতখানি নিজের হৃদয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, তত তাঁর কবিতা অকৃত্রিম হবে। ইয়েটসের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের মতে, এই গুণে গুণী। বৈদিক কবিরা যে সরল চোখে অসীম কৌতূহলের সঙ্গে জগতকে দেখেছেন, তার সঙ্গে ইয়েটসের কবিদৃষ্টির মিল আছে। তাঁরা জল, মাটি, আগুনকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে নয়, প্রকৃতির আনন্দলীলার ইচ্ছাময় প্রকাশ হিসেবেই দেখেছিলেন। এইভাবে দেখার মধ্যে দিয়ে জগতের মধ্যে তারা বড়ো আকারে নিজেদের পরিচয়ই পেয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন যা তাঁর নিজের মধ্যে নেই, জগতের মধ্যেও তা নেই। অর্থাৎ জগতের সমস্ত কিছুই তারই মধ্যে বর্তমান। যে-সব কবিরা এইভাবে সম্যক চোখে জগৎকে দেখেন তাদের ভাষার সঙ্গে মানুষের বহুকালের পুরনো ও চিরকালের নবীন সংবেদনার আন্তরিক যোগ তৈরি হয়। তখন সেই কবি পুরাতন ঐতিহ্যকে নবীন করে উপস্থাপন করতে পারেন। যে-ভাবে ইয়েটসের কাব্যে তাঁর মাতৃভূমি আয়ার্ল্যান্ড সজীব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পোলিটিকাল জাগরণের ভিতর দিয়ে একটি দেশের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রকাশ পায়, তেমনই দেশের সর্বজনীন অনুভূতি প্রকাশ পায় কাব্যে। ইংল্যান্ডের শাসন আয়ার্ল্যান্ডকে সবদিক থেকে চেপে রেখেছিল। পোলিটিকাল বিক্ষোভের দ্বারা সে মর্যাদার অধিকার পেল, কিন্তু নিজের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ফিরে পেল ইয়েটসের কাব্যে। তুলনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেশের কথা এনেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ পোলিটিকাল বিক্ষোভের দ্বারা স্বায়ত্বশাসন চাইল কিন্তু সেইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশের পরাধীন হৃদয়ের অনুভূতিকেও ভাষা দিলেন। অর্থাৎ তাঁর নিজের জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে

ইয়েটসের কাব্যের মহৎ অবদানকে স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মহৎ কল্পনা ও নিজের দেশের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের যোগ তাঁকে যথার্‌থ দেশপ্রেমী, যথার্থ 'কেলটিক' করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইয়েটস সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেছেন—

> সমালোচক লিখিতেছেন—It was with the publication of The Wanderings of Oisin—in 1889, if I remember aright—that Yeates sprang into the front rank of contemporary poets, and thrented to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded—and exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say?) supernatural manifestations—he was typically celtic." এই imaginative conviction কথাটা য়েট্‌স্ সম্বন্ধে অত্যন্ত সত্য।[৬৫]

কেননা, কল্পনা, রবীন্দ্রনাথের মতে, ইয়েটসের কবিত্বের একটি উপকরণমাত্র ছিল না, তা তার জীবনের সামগ্রী। এই কল্পনা সহায়ে তিনি বিশ্বজগতের কাছ থেকে তাঁর আত্মার খাদ্‌য-পানীয় আহরণ করেছেন, আবার পুনরায় তা বিশ্বকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। হীরে যেমন আলোকে প্রকাশ করার দ্বারা নিজেকেই প্রকাশ করে, তেমনভাবে কবি ইয়েটস নিজ আত্মপ্রকাশের দ্বারা মাতৃভূমিকেও আলোকিত করেছেন।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবিদের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক আধুনিক বিদেশি কবিদের কাব্য নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম 'আধুনিক কাব্য' (প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাকে বুঝতে এই প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একটি প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ এটি। এই প্রবন্ধে নিজের বক্তব্যকে তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ এক ঝাঁক ইংরেজ কবি ও একজন চিনা কবির কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধার ও অনুবাদ করেছেন। এঁরা হলেন 'ওরিক জন্‌স', 'এমি লোয়েল', 'এজরা পাউণ্ড', 'টি এস এলিয়ট', 'এডওয়ার্ড রবিনসন' ও চীনা কবি 'লী পো'। এই প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক' কাকে বলা উচিত সেই প্রশ্ন তুলেছেন। তার উত্তর 'আধুনিক' মানে সাম্প্রতিক নয়। আধুনিকতা কালগত নয়, এটা একটা মনোভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্য। সময়ের

প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের গড়ন ও প্রত্যাশা দুইই পাল্টায়। এই পাল্টানোর মুহূর্তেই জন্ম হয় আধুনিকতার। রবীন্দ্রনাথ নদীর উপমা দিয়েছেন:

> নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।[৬৬]

আধুনিকের সঙ্গে চিরন্তনের কোনও বিরোধিতা নেই রবীন্দ্রনাথের কাছে। কালিদাসের কাব্য, শেকসপিয়রের নাটক তাঁর কাছে একইসঙ্গে আধুনিক ও চিরন্তন। প্রথম জীবনে তাঁর মন পুষ্ট হয়েছিল যে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের দ্বারা, তাঁদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন প্রকৃত আধুনিকতার স্বাদ। রোমান্টিক কবিদের কলমে যে সৌন্দর্যকল্পনা ও আনন্দবোধের প্রকাশ ঘটেছিল—তাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনে 'আধুনিকতা' বলে জেনেছিলেন। "তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়"। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিট্স এঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকে কাব্যে তুলে ধরেছিলেন। তখনকার কালের সেইটেই আধুনিকতা। কিন্তু বিশ শতকে এসে পরিস্থিতি বদলে গেল। উনিশ শতকের কাব্যে ছিল 'বিষয়ীর আত্মতা' ; বিশ শতকে তা হল 'বিষয়ের আত্মতা'। কাব্যের আত্মগত জগৎ হল বস্তুগত। বিশ্বজুড়ে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার, পণ্যায়ন, বিশ্বযুদ্ধ ইত্যাদি নানা সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এই পালাবদল ঘটিয়েছিল। এই পালাবদলের ফল সাহিত্যে যে-ভাবে ফলে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা মানতে পারেননি। তাঁর কথায়—

> পশ্চিম মহাদেশের এই কায়াবহুল অসংগত জীবনযাত্রার ধাক্কা লেগেছে সাহিত্যে। কবিতা হয়েছে রক্তহীন, নভেলগুলো উঠেছে বিপরীত মোটা হয়ে। সেখানে তারা সৃষ্টির কাজকে অবজ্ঞা করে ইন্‌টেলেকচুয়েল কসরতের কাজে লেগেছে। তাতে শ্রী নেই, তাতে পরিমিতি নেই, তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড। অর্থাৎ এটা দানবিক ওজনের সাহিত্য, মানবিক ওজনের নয় ; বিস্ময়কররূপে ইন্‌টেলেকচুয়াল ; প্রয়োজনসাধকও হতে পারে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণবান নয়।[৬৭]

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কাব্য বা সাহিত্য অনুভূতিআশ্রয়ী, হৃদয়সংবেদ্য, কিন্তু আধুনিক কবিতায় হৃদয়ের সংস্রব ততটা নেই। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ এবং প্রকাশের কৌশলটাই তার মূল ভরকেন্দ্র। এমন সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে। এই কলা-কৌশলের

দিক থেকে আগেকার কবিদের থেকে সমসাময়িক মডার্ন কবিতার আরও একটি পার্থক্য রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন। আগেকার কবিরা নিজেদের আত্মানুভবকেই বিশেষ অভিব্যক্তির দ্বারা বিশ্বগত করে তুলতেন। যা কবিরা ব্যক্তিগতভাবে সত্য বলে অনুভব করতেন জগতের পাঠকদের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে নানা সাহিত্যিক কল-বল আশ্রয় করতেন। চিত্র, সংগীত, অলংকার এই সবই হচ্ছে সেই উপাদান, যার দ্বারা কবিরা কাব্যে এক বিশেষ জগৎ রচনা করতেন। একেই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'মায়া'। দেখিয়েছেন আধুনিক কবিতায় এই মায়া বা মোহের স্থান দখল করেছে বস্তুতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহল :

> বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার করে দেখেছে ; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিয়লজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার করে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ কথা কবুল করতেই হবে।[৬৮]

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে রয়েছে তাড়াহুড়ো, সময়ের অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। আধুনিক কবিতায় যে ব্যয়সংক্ষেপ দেখা দিয়েছে তাতে প্রধানভাবে ছাঁটা গেছে প্রসাধন। আগেকার কবিরা যে-ভাষায় ও উপকরণে কাব্যদেহকে প্রসাধিত করতেন, অতীত যুগের মোহ কাটানোর জন্য তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিকতার দস্তুর। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন 'Orrick Johns' (১৮৮৭-১৯৪৬) এর 'Songs of Deliverence' এর অন্তর্গত 'No prey Am I' কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম চার ছত্র :

"I am the greatest laughter of all

Greater than the sun and the oak-tree

Than the frog and Apollo;

I laught all day long!"[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের মতে, এখানে অ্যাপোলো দেবতার পাশে ব্যাঙকে আনা হয়েছে জোর করে পুরনো প্রথার মায়া কাটানোর জন্য। “ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া। এইটেই হালের কায়দা।”[৭০]

উনিশ শতক যে মোহের আবরণ সাহিত্যে পরিয়েছিল, তাকে উদ্ধতভাবে ও বিদ্রোহীভঙ্গিতে নস্যাৎ করার চেষ্টা আধুনিক কবিদের মধ্যে দেখা গেছে। এই উদ্ধত, বিদ্রোহী, কালাপাহাড়ি মন “নব্যতার মদিররসে মত্ত, কিন্তু এই নব্যতাই এর ক্ষণিকতার লক্ষণ।”[৭১] এই নব্য তরুণ মন কেমন করে সাবেকিয়ানাকে অস্বীকার করছে তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন একজন ইঙ্গমার্কিন মহিলা কবি ইমেজিস্ট আন্দোলনের প্রথম সারির মুখ ‘Amy Lowell’ এর ‘Sword Blades and Poppy Seed’(1914) কাব্যগ্রন্থের কবিতা ‘A Lady’। এই কবিতায় বিগত শতাব্দীর এক সুন্দরীর রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করা হয়েছে এই ভাবে—

“তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি—

যেন পুরনো একটা যাত্রার সুর

বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।

...

আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা

তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।

ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,

তার ঝকমকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।”[৭২]

বিষয়ীর বদলে বিষয়ের আত্মতাই আধুনিক কাব্যের লক্ষণ। এমি লোয়েলের আর একটি কবিতা ‘Red Slipper’। কবিতার মূল বর্ণিতব্য বিষয় রাজপথের দোকানে পালিশ করা কাচের পিছনে সার দিয়ে ঝুলছে লাল চটি-জুতোর মালা। সেই চটি-জুতোগুলো“like stalactites of blood, flooding the eyes of passers-by with dripping colour, jamming their

crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas....”[৭৩] এই কবিতার বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন শুধুমাত্র সেই লাল চটি জুতো। নৈর্ব্যক্তিকতা এবং বিষয়ের আত্মতা কেমন করে আধুনিক কাব্যের লক্ষণ হয়ে উঠছে, তা দেখাতে রবীন্দ্রনাথ এই উদাহরণ ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কাব্যের সঙ্গে আধুনিক চিত্রকলারও মিল খুঁজে পেয়েছেন। সেই মিল ‘ক্যারেক্টারের’ প্রাধান্যে। কোনও ‘রূপ’এর যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে তা আপন সৃষ্টিতত্ত্বের জোরেই অনন্য, প্রচলিত মাপকাঠিতে সে নাই বা সুন্দর হল! বিষয়বস্তু শিল্পীর হাতে যদি যথার্থই ‘রূপ’ ধরে ওঠে, তবে তার আর কৌলিন্যের বিচার নেই। তখন আধুনিক শিল্পের দৃষ্টিতে ‘সুন্দরী মেয়ে’ এবং ‘সার্ডিন মাছ’ সমান উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এর দৃষ্টান্ত হিসেবে এজরা পাউণ্ডের ‘The study in Aesthetics’ একটি সারানুবাদ উদ্ধার করেছেন। যে কবিতার মূল বক্তব্য: একটি মেয়ে চলছিল রাস্তা দিয়ে। একটি দরিদ্র ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, মেয়েটিকে দেখে তার মন জেগে উঠল বলে উঠল—‘দেখ চেয়ে রে, কী সুন্দর!’ তিন বছর পর সেই ছেলেটির সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ ধরা পড়েছিল বিস্তর। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, ‘স্থির হয়ে বোস’। তখন ছেলেটি সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, ‘কী সুন্দর!’ সে কথা শুনে কবি বললেন—‘I was mildly abashed.’ অর্থাৎ বিষয় নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিকতার প্রতি ঝোঁক আধুনিক কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এখানে যে কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আধুনিক কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণটিকে সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, এতদিন যা উলটো করে বলেছেন, এখন সময় এসেছে তা সোজা করে বলবার। এতদিন বলেছেন, সুন্দর আনন্দ দেয়, তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[৭৪] অর্থাৎ সৌন্দর্যের বোধটাই প্রকৃত, তার মূলে যে বিষয় সুন্দর কি অসুন্দর সেকথা গৌণ।

তাই সাবেক কালের কৌলিন্যের লক্ষণ সাবধানে বাঁচিয়ে চলাই আধুনিক কাব্যের লক্ষ্য ও লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ টি এস এলিয়টের বহুখ্যাত 'preludes' কবিতার অংশবিশেষ মূল ইংরেজি ও বাংলা তর্জমায় উদ্ধার করেছেন। কবিতাটির শেষ তিন ছত্রের রবীন্দ্রনাথকৃত বাংলা অনুবাদটি নিম্নরূপ:

"মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।

দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে, যেন বুড়িগুলো

ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।"[৭৫]

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে এই ঘুঁটে-কুড়নো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবি এলিয়টের আন্তরিক অনভিরুচিই এই কবিতার মূল কথা। সাবেক কালের মতো রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসার এটা নয়। কবি যেন কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই তার কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছেন। সে কাদার ওপর অনুরাগ আছে বলে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে বলেই। সুতরাং আধুনিক কালের নৈর্ব্যক্তিকতার লক্ষণকে রবীন্দ্রনাথ যেন মেনেই নিচ্ছেন। বিশুদ্ধ আধুনিকতা কাকে বলে এই প্রশ্নের একটি প্রয়োজনীয় উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তা এই :

> আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।[৭৬]

কিন্তু আধুনিক কাব্য যেখানে বিশ্বকে তদ্‌গত ভাবে দেখার পরিবর্তে তার এক-ঝোঁকা ভাঙাচোরা, কাদামাখা চেহারাকেই তুলে ধরে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি। বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টিও তাঁর কাছে আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার বলেই মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—"ইনফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না ইনফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।"[৭৭] এই ব্যক্তিগত চিত্তবিকারের উদাহরণ

হিসেবে তিনি তুলে এনেছেন এলিয়টের ‘Aunt Helen’ কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমা[৭৮] সে কবিতায় আছে, এক সম্ভ্রান্ত ঘরের বুড়ি মারা গেল। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নামিয়ে দেওয়া হল। শববাহকেরা সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ-দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খানসামা ডিনার টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, এমন কবিতা লেখবার উদ্দেশ্য কী? এ কবিতা পাঠক পড়তেই বা যাবেন কোন্ গরজে? যদি উত্তর হয়, এই ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক, তাই তা কবিতায় এসেছে। এই ঘটনার বাস্তবতা মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করবেন, চারপাশে যে-সব স্বাভাবিক ঘটনা ঘটে, তা সবই কি রসসাহিত্যের বিষয় হওয়ার যোগ্য? তিনি বেশ মজা করেই বলেছেন—

> একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিস্ট এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে, কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে।[৭৯]

যদি আগেকার কবিদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওঠে যে তাঁরা বেছে বেছে অলীক কল্পনাকে কবিতায় স্থান দিয়েছে তবে সেই সঙ্গে এই কথাও বলতে হবে আধুনিকরাও বাছাই কাজে সমভাবেই দোষী। কেননা তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায় খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। এই দ্বিতীয় দলভুক্ত লোকেদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সাহিত্যের অঘোরপন্থী। কারণ অঘোরীদের মতো বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস, দূষিত জিনিসের প্রতিই এদের পক্ষপাত। এখানে অবশ্য একটি কথা বলা আবশ্যক, বিষ্ণু দে তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা’ নামক প্রবন্ধগ্রন্থে বর্তমান প্রবন্ধভুক্ত রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু অনূদিত কবিতার প্রেক্ষাপট বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি এ কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতাংশ উল্লেখ বা অনুবাদ করেছেন, তা খুব নিরপেক্ষতার সঙ্গে উদ্ধৃত হয়নি। কবিতাগুলির ওপর সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গদৃষ্টি ও

অসূয়া এগুলিকে পাঠকের চোখে (যে-সব পাঠক মূল কবিতা পড়েননি) অতিরিক্ত দোষাবহ করে তুলেছে।[৮০] এলিয়টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও পরে পরিবর্তিত হয়েছিল।[৮১]

সন্ন্যাসী-বৈরাগীরা পার্থিব জগতের মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মনে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়ার জন্য জগৎ ও জীবনের অনিত্যতার কথা নানাভাবে কীর্তন করেন কিন্তু কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু কালের প্রভাবে "সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া—এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ বলে মনে করি সে ঘুণে-ধরা, যাকে সুন্দর বলে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা?"[৮২] এর দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তুলে এনেছেন Edwin Arlington Robinson (1869-1935) এর 'The Children of The Night' এর কবিতা 'Richard Cory'। এই কবিতার রিচার্ড কোরি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর বিলাসী জীবনযাত্রা ধনগৌরব দেখে সবাই তাঁকে ঈর্ষা করেন কিন্তু একদিন শান্ত বসন্তের রাতে—

"রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,

মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।"[৮৩]

হয়তো এই কবিতা এই কথা বলতে চায়, যা সুস্থ ও সুন্দর বলে প্রতিভাত হচ্ছে, তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী বলে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে উপবাসী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে জগৎকে এমনভাবে দেখানোর মধ্যেও এক অতিরেক আছে, পক্ষপাত আছে। তাঁর কথায়—

> বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেন্টালিজম, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে।...মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়।[৮৪]

মনে হয়, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যুগলক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান না। যা শাশ্বত ও কালোত্তীর্ণ, তাই-ই তাঁর কাছে সেরা সাহিত্য। তাই দেখি সমকালীন হলেও আধুনিক ইংরেজি কবিদের বিপ্রতীপে তিনি তুলে আনছেন চীনা কবি 'লী পো' এর কবিতা। 'লী পো' প্রাচীন কবি। তিনি কবিতা লিখেছিলেন আজ থেকে হাজার বছর আগে। কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি

ছিলেন আধুনিক। কিন্তু সেই আধুনিকতা নির্দিষ্ট কালের নয়। তাই হাজার বছর পেরিয়ে এসেও সেই কবিতা একইভাবে মন টানে। অথচ “চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না।”[৮৫]

কিন্তু আধুনিকতার ধারণা নিয়ে, আধুনিক সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও একপ্রকার আত্মবিরোধ ছিল। বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি জানিয়েছেন, তিনি যখন জীবন শুরু করেছিলেন তখন ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের কবিতা তাঁর ভালো লেগেছিল, কারণ সেই কাব্যে কবিরা নিজেকেই মেলে ধরেছিলেন। তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ ছিল ‘ব্যক্তিগত খুশির দৌড়’। অর্থাৎ কাব্যের সাবজেকটিভ দিকটাই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল বেশি। লিখেছেন—

> প্রথম-বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখছিলেন ; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত।[৮৬]

আবার এই একই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, আধুনিকতার অর্থ হল “বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্গতভাবে দেখা।”[৮৭] তাহলে অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন ওঠে যদি ‘ব্যক্তিগত খুশির দৌড়’ ছিল বলেই রোমান্টিক কবিদের কবিতা তাঁর ভালো লেগে থাকে, তাহলে আধুনিক কবির কাছে তিনি ‘নিরাসক্ত দৃষ্টির আনন্দ’ প্রত্যাশা করেন কেন? তাহলে কি তিনি এ-কথা বলতে চান, উনিশ শতকে কাব্যের আধুনিকতার লক্ষণ আর বিশ শতকের আধুনিকতার লক্ষণ পৃথক? কিন্তু এই প্রবন্ধের শুরুতেই তো আধুনিকতার স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আধুনিকতা কালগত নয়, মনোভঙ্গিগত ব্যাপার। সুতরাং আধুনিক কাব্যের সাহিত্যিক বিচার নিয়ে একটা আপাত-বিরোধ রবীন্দ্রনাথের ছিলই তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আধুনিক ইংরেজি কবিতাকে তিনি মন থেকে নির্বাসিত করেননি। এর কলাকৌশলগত, মনোভঙ্গিগত দুর্গমতাকে অতিক্রম করেও তাঁর রসগ্রাহী মন আধুনিক কাব্যকে যথার্থ অর্থে অনুধাবন করতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠিতে লিখেছেন—

> আধুনিক ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু অনুভব করি সে আমার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, তার অনেকখানিই হয়তো অজ্ঞতা। এ সাহিত্যের অনেক অংশের

সাহিত্যিক মূল্য হয়তো যথেষ্ট আছে, কালে কালে তার যাচাই হতে থাকবে।...আমি বিদেশীর তরফ থেকে বলচি—অথবা তাও নয়—একজন মাত্র বিদেশী কবির তরফ থেকে বলচি—আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে আমার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত বাধাগ্রস্থ।...ইংরেজের প্রাক্তন সাহিত্যকে তো আনন্দের সঙ্গে মেনে নিয়েছি, তার থেকে কেবল যে রস পেয়েছি তা নয়, জীবনের যাত্রাপথে আলো পেয়েছি। তার প্রভাব আজও তো মন থেকে দূর হয়নি। আজ দ্বাররুদ্ধ য়ুরোপের দুর্গমতা অনুভব করচি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে।[৮৮]

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মন বাধা পাচ্ছে ভাষাগত কারণে নয়, মনোভঙ্গিগত কারণেই। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধোত্তর ইংরেজি সাহিত্য যে বিষয় ও ভঙ্গিকে অবলম্বন করেছে, রবীন্দ্রনাথের মনের গড়ন ও তাঁর কাব্যরুচির সঙ্গে তার মূলগত অমিল।

রবীন্দ্র বীক্ষণে ইতালীয় কবি দান্তে ও পেত্রার্ক

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিলেত যাওয়ার পূর্বে আমেদাবাদে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সাহচর্যে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের বইপত্র নিবিড়ভাবে পড়তে শুরু করেন। তারই ফলশ্রুতিতে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ ছাড়া আরও তিনটি প্রবন্ধ লেখা হয় ও 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই তিনটি প্রবন্ধ হল যথাক্রমে 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'(ভাদ্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দ), 'পিত্রার্কা ও লরা' (আশ্বিন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ) ও 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' (কার্তিক, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ)। মাত্র সতেরো বছর উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথ পরপর তিন মাসে এই তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনটি প্রবন্ধেরই বিষয়বস্তু তিন কবির ব্যক্তিগত প্রেম এবং তাঁদের কাব্যে সেই প্রেমের ভূমিকা।

ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখেন দান্তেকে নিয়ে। দান্তে প্রাচীন ইতালির কবি। তাঁর পুরো নাম Dante Alighieri (1265-1321 AD)। রবীন্দ্রনাথ দান্তে পড়েন মূলত ইংরেজি অনুবাদে। যদিও অনুবাদে এই কাব্য পড়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে খুব বেশি তৃপ্তি দিতে পারেনি। পরিণত বয়সে সে কথা স্মরণ করে তিনি লিখেছেন—

I myself have tried to get at the wealth of beauty in the literature of the European languages, long before I gained a full right to their hospitality. When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through an English Translation, I failed utterly, and felt it my duty to desist. Dante remained a closed book to me.[৮৯]

হয়তো রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, মূল ভাষায় না পড়লে দান্তের কাব্যের পূর্ণ রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। যদিও ইংরেজি অনুবাদের ওপর ভিত্তি করেই সেই ন্যূনাধিক সাড়ে সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ দান্তের 'La Vita Nuova' ও 'Divina Commedia' কাব্যের অংশবিশেষ অনুবাদ করেন এবং অনুবাদ সহযোগে দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। ডি. জি. রসেটি ইতালীয় কবিদের কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি-পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'The Early Italian Poets' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষ অর্থাৎ ১৮৬১ সালে তাঁর অনূদিত 'লা ভিতা নুওভা' 'The New Life' নামে প্রকাশিত হয়। এ দেশে রসেটির অনুবাদটিই জনপ্রিয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুবাদটিই পড়েছেন বলে মনে হয়।

দান্তের ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্যজীবনের সঙ্গে তাঁর মিউজ বিয়াত্রিচের অপ্রতিহত বন্ধনের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ শুরু করেছেন। "ইটালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবনকাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবনকাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে।"[৯০] অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তে ও লরার প্রতি পেত্রার্কের প্রেমকে ত্রুবাদুর-প্রেমের দোসর বলে মনে করেন।[৯১] 'ত্রুবাদুর' হল দক্ষিণ ইউরোপের এক চারণ কবিসম্প্রদায়, যাঁরা প্রেমসংগীত রচনা করে দেশে দেশে গেয়ে বেড়াতেন। 'ত্রুবাদুর' শব্দের অর্থ হল সন্ধান করা বা আবিষ্কার করা। ত্রুবাদুরদের প্রেমসংগীত প্রাথমিক অবস্থায় পরকীয়া দেহজ কামনার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। পরে তা দেহকামনামুক্ত শুদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়েছে। দান্তে এবং পেত্রার্কার আবির্ভাবের আগে ত্রুবাদুররাই এই অঞ্চলের বিস্তৃত পরিসরে স্থানীয় কথ্যভাষায় প্রেমসংগীত রচনা করত। এই ভাষা এবং এই প্রেমসংগীতের ঐতিহ্যই দান্তে ও পেত্রার্ক গ্রহণ করেছেন। ত্রুবাদুরদের

প্রেমকাব্যকে সাধারণভাবে বলা হত ক্যানসো। এই ক্যানসোই ইতালিয় ভাষায় ক্যানৎসোনে হয়েছে।

বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমকে দান্তে অমরত্ব দিয়েছেন 'Vita Nuova' বা 'নবজীবন' গ্রন্থে। দান্তে তাঁর আঠারো বছর বয়স থেকে এই গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন এবং সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রেমস্বপ্নের কথা এই কাব্যে লিখে চলেন। 'Vita Nuova' প্রকৃত অর্থে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত রচনা। পদ্যাংশ মুখ্যত সনেটে লেখা, তবে অন্যান্য পদ্যরীতিও এখানে রয়েছে। আর বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিমালা গদ্যভাষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। গদ্যভাষ্যগুলি যেন কবিতার প্রেক্ষাপটকেও প্রকাশ করছে। এই কাব্যে রয়েছে পঁচিশটি সনেট, পাঁচটি কানৎসোনে এবং একটি বালাদ্। গোটা কাব্যটিই কবির আত্মবিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের সমস্ত আখ্যান অংশকেই সরল বাংলায় লিখেছেন এবং কিছু নির্বাচিত কবিতাংশ অনুবাদ করে মধ্যে মধ্যে স্থাপন করেছেন। প্রথম কানৎসোনেতে বর্ণিত হয়েছে দান্তের মনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ ও তার প্রতিক্রিয়া। বিয়াত্রিচের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার কোনও সুযোগ দান্তের হয়নি। নয় বছর বয়সে বিয়াত্রিচেকে দূর থেকে প্রথমবার দেখেন তিনি এবং প্রথম দর্শনেই বালিকা বিয়াত্রিচে নয় বছরের বালকের প্রাণ-মন হরণ করে নেয়। প্রথম সাক্ষাতের নয় বছর পর, অর্থাৎ দান্তের বয়স যখন আঠারো তখন তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয়। এই দ্বিতীয় সাক্ষাতে বিয়াত্রিচে তাঁকে একটিমাত্র 'শ্রীপূর্ণ নমস্কার' উপহার দেন। তারপর তৃতীয় বার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন দান্তের নামে কিছু কলঙ্ককথা বিয়াত্রিচের কানে উঠেছিল। তাই সেবার বিয়াত্রিচে দান্তের বহুপ্রার্থিত সেই নমস্কারটুকু থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেন। এরপর বিয়াত্রিচে লোকান্তরিত হন। ইহলোকে তাঁদের আর দেখা হয়নি। বিয়াত্রিচের সঙ্গে এইটুকুমাত্র পরিচয়ের সুখস্মৃতি দান্তে সারা জীবন তাঁর জীবনে ও কাব্যে লালন করেছেন। 'ভিটা নুওভা' কাব্যটিকে মোটের ওপর তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে, বিয়াত্রিচের সঙ্গে দান্তের সাক্ষাৎকার, প্রথম দর্শনে দান্তের মনে প্রণয়ের সঞ্চার, দান্তেকে বিয়াত্রিচের নমস্কারের দ্বারা অভিবাদন, পরে তা থেকে বঞ্চিতকরণ, দান্তের প্রেমজর্জর হৃদয়ের দুই মহিলার উপহাস বর্ণিত হয়েছে। প্রথম কানাৎসোনেতেই এই ঘটনাগুলি স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের মুখ্য ঘটনা, বিয়াত্রিচের মৃত্যু। অবশ্য তাঁর আগে কঠিন অসুস্থতায় জ্বরের বিকারে দান্তে এক মৃত্যুস্বপ্ন দেখেন। সেই স্বপ্নে তিনি দেখেন, তাঁর প্রিয়তমার মৃত্যুতে পৃথিবী প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে—

> Then the sun went out, so that the stars showed themselves, and they were of such a colour that I knew they must be weeping : and it seemed to me the birds fell dead out of the sky, and that there were great earthquakes.[৯১]

সমালোচকেরা বলেন, এখানে যে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা আছে, তার অনুরূপ নৈসর্গিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ে। অর্থাৎ দান্তের মনে বিয়াত্রিচে-প্রেম সেই Divine Eros যার সঙ্গে প্রিয়তমার সঙ্গে যিশুর অভেদত্ব কল্পিত হয়েছে। কাব্যের তৃতীয় ভাগ শুরু হয়েছে বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর কবি-প্রেমিকের বিষণ্ণতার বেদনা নিয়ে। বিয়াত্রিচের বিরহ ভুলবার জন্য দান্তে সহসা আকৃষ্ট হলেন এক 'বাতায়নবর্তিনী' নারীর প্রতি। সে দান্তের দিকে এতই মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল যেন দান্তে অনুভব করলেন যেন সেই রমণীর দুচোখ থেকে 'দয়া' ঝরে পড়ছে। একদিকে এই নবপ্রেমের আসক্তি, অন্যদিকে বিয়াত্রিচের স্মৃতি—এই দোলাচল দান্তের মনে প্রেয় আর শ্রেয়ের দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে তুলল। অবশেষে বিয়াত্রিচের অলৌকিক প্রভাবে কেমন করে তিনি এই দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হলেন, তা ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে। অবশেষে তাঁর উপলব্ধি হল, বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য আরও মহত্তর ও গভীরতর কাব্যভাষার প্রয়োজন। বিয়াত্রিচের সম্বন্ধে আরও যোগ্যতর কাব্য রচনা করবেন, যা এর আগে কোনও নারীর প্রতি কেউ লিখতে পারেননি, এই সংকল্পবাক্য দিয়ে তিনি এই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

> It was given unto me to behold a very wonderful vision wherein I saw things which determinded me that I would say nothing further of this most blessed one, until such time as I could discourse more worthily concerning her. And to this end I labour all I can, as she well knoweth. Wherefore if it be his pleasure through whom is the life of all things, that my life continue with me a few years, it is my hope that I shall yet write concerning her what hath not before been written of any woman.[৯৩]

যেভাবে প্রেমের স্তোত্র আগে কেউ রচনা করেননি, তা রচনা করার জন্য দান্তে দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর জীবনে দেখা দিল নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়। যখন তাঁর বয়স ৩৫ সেই সময়ে তিনি ফ্লোরেন্স নগরের 'প্রিয়র' পদে অধিষ্ঠিত হলেন—কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক দলাদলির স্বীকার হয়ে তিনি ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হলেন। অপরাধ স্বীকার করে ও জরিমানা দিয়ে তাকে ফ্লোরেন্সে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করেননি। তখন তাঁর নির্বাসন দণ্ড স্থায়ি হল এবং পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়লে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার কঠিন দণ্ডাদেশ ধার্য হল। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয় তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি। দান্তে ছিলেন ক্যাথলিক খ্রিস্টান। তাই ইহজীবনে যে নির্বাসন দণ্ড ও অবিচার তিনি ভোগ করলেন পরলোকে 'ঈশ্বরের রাজ্যে' তা থেকে মুক্তি মিলবে, এই খ্রিস্টিয় বিশ্বাস শিরোধার্য করে, রূপক-কল্পনা আশ্রয়ে তিনি লিখলেন 'Divina Commedia'। যে বিয়াত্রিচের সঙ্গে ইহলোকে তাঁর মিলন সম্ভব হয়নি, মৃত্যুর পর পরলোকে তাঁর সঙ্গে মিলনকামনার সুখস্বপ্ন খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের রূপকের মধ্যে দিয়ে তিনি এঁকেছেন এই কাব্যে। ইহজীবনের প্রেম-কামনায় তিনি ত্রুবাদুর প্রেমের উত্তরাধিকার বহন করেছেন, একথা সত্য কিন্তু তাকে স্বর্গীয় স্তরে উন্নীত করে তিনি মানবীয় প্রেমকে দিব্যত্বে পরিণত করেছেন। সমালোচক বলেন—

> It is true that the more profound spirituality of Dante gives the love element in his poetry an unfathomable profundity—a significance beyond the grasp of purely human relations, but no one question that it is a truly divine significance.[১৪]

তবে একথাও ঠিক যে 'Divine' কথাটি প্রথম থেকেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। দান্তে নিজে তাঁর কাব্যের শিরোনাম দিয়েছিলেন—'The Comedy of Dante Alighieri—The Florentine'। গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'Divine' কথাটি যুক্ত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। গ্রন্থখানি প্রেতলোক, প্রায়শ্চিত্তলোক ও স্বর্গলোক ('Inferno', 'purgatorio', 'Paradiso') এই তিনভাগে বিভক্ত হলেও অধ্যাত্মজীবনের উপলব্ধি এই কাব্যের বিষয় নয়। মানবীয় প্রেম ও প্রত্যাশাকে খ্রিস্টিয় রূপকের মধ্যে দিয়ে তিনি স্বর্গীয় জীবনের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। কাব্যের শুরুতেই তিনি বলেছেন—

“In the midway of this our mortal life,

I found me in a gloomy wood, astray

Gone from the path direct: and e’en to tell

It were no easy task, how savage wild

That forest,...”[১৫]

এই গহন অরণ্য আসলে কবির হৃদয়-অরণ্যেরই রূপক। তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য আপন মানসী-প্রিয়া বিয়াত্রিচের উদ্দেশে যোগ্যতর প্রেমসংগীত রচনা কিন্তু তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের আবর্তে পড়ে সেই সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এমন সময়ে তিনি দেখলেন প্রাচীন রোমান কবি ভার্জিলের (রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ‘কবি বর্জিল’) প্রেতাত্মা। সে কবিকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে বিয়াত্রিচের অনুরোধেই তিনি দান্তেকে ভ্রষ্ট পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে এসেছেন। এরপর কবি ভার্জিলের সঙ্গে দান্তে প্রথমে নরক অর্থাৎ ইনফার্নো, পরে পারগেটরি অর্থাৎ যাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা আছে তাদের বাসভূমি এবং পরে স্বর্গ পরিভ্রমণ করেন। পারগেটরি অধ্যায়ের শেষ ভাগে বিয়াত্রিচের সঙ্গে দান্তের সাক্ষাৎ হয়। অলৌকিক সেই আবির্ভাব। বিয়াত্রিচে যেন স্বর্গের দেবী। তিনি এক আশ্চর্য রথে আসীন। সুরবালারা চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সহসা ভার্জিল অন্তর্ধান করেন। ভার্জিলের অন্তর্ধানে দান্তে ব্যথিত হলে বিয়াত্রিচে তাকে প্রথমে আশ্বস্ত করেন ও পরে ভর্ৎসনা করে বলেন বিয়াত্রিচে যখন মর্ত্যভূমিতে ছিলেন, তখন তাঁর প্রতি দান্তের প্রেম ছিল একান্ত। কিন্তু যখন বিয়াত্রিচে মর্ত্যকায়া পরিত্যাগ করে অমরলোকে গেলেন তখন তাঁর প্রতি দান্তের সেইরূপ ভালোবাসা কমে গেল। এই তীব্র ভর্ৎসনায় দান্তে প্রথমে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করে স্বর্গের নদীতে স্নান করে পাপমুক্ত হলেন। শেষে তিনি তাঁর প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সঙ্গে স্বর্গ দর্শন করলেন। পরিশেষে বললেন তাঁর এই মানস-ভ্রমণ হয়তো এক স্বপ্ন, কিন্তু মধুর স্বপ্ন দেখার পর তার রেশ যেমন মনের মধ্যে লেগে থাকে, এই প্রেম-সংগীতের মাধুর্যও তেমনই কবির মনে জেগে থাকবে। ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে এই কাব্য রচনা শেষ করেই দান্তে পৃথিবী থেকে বিদায়গ্রহণ করেন। তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

The Divine Comedy is indeed a song—a song to a woman who was loved (all poets think so) as no other woman ever was or will be, and a song to the purification of love in the heart of the poet.[৯৬]

পিত্রার্কা ও লরা

দান্তের পাশাপাশি ইতালির অপর একজন জগদ্বিখ্যাত কবি Francesco petrarca (১৩০৪-১৩৭৪)। সারা বিশ্ব তাঁকে চেনে সনেট রচনার স্থপতি হিসেবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর তরুণ বয়সে পেত্রার্কাকে নিয়ে যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে পেত্রার্কার কাব্যজীবনের প্রেরণাদাত্রীরূপে তাঁর মিউজ Mrs Madonna Laura র ভূমিকার কথা। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা।"[৯৭] দান্তের মতো লরাও পেত্রার্কার কাছে অপ্রাপ্য। লরা পরস্ত্রী, তাই লরার সঙ্গে কোনওদিনও তাঁর ভালো করে কথাবার্তা বা আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। ইহজীবনে লরার কাছ থেকে তিনি তাঁর প্রেমের কোনও প্রত্যুপহার পাননি। তবে লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু কোনওকিছুই পেত্রার্কার প্রেমকে বিচলিত করতে পারেনি। এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লরা যখন দেহের সঙ্গে সমাজবন্ধনকেও পরিত্যাগ করে গেলেন, তখন পেত্রার্কা অসংকোচে লরার চরণে তাঁর প্রেম অর্ঘ্যস্বরূপ উপহার দিতেন এবং লরা তা গ্রহণ করছেন ভেবে পরিতৃপ্ত হতেন।

আগেই বলেছি, দান্তে এবং পেত্রার্ক উভয়ের প্রেমচেতনাই ত্রুবাদুর প্রেমের সহোদর। ত্রুবাদুররা সম্ভোগমূল পরকীয়া রতিরই সংগীতোপাসক। অবশ্য তার সঙ্গে পেগান ধর্মচেতনার একটা আলগা সম্পর্ক ছিল। পেত্রার্কের ছেলেবেলা কেটেছিল ত্রুবাদুরদের দেশ প্রভাঁসে (দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রাচীন নাম)। পেত্রার্কাকে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পাঠানো হয়, কিন্তু আইনের পাঠ তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারেনি। বলোঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্জিল, সিসেরো ও সেনেকার রচনাবলীই তাঁর কবিকল্পনার প্রেরণা জোগাত। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ বছর বয়সে এভিগ্ননের সেন্ট ক্ল্যারা গির্জায় তিনি প্রথমবার লরাকে দেখেন। লরার বয়স তখন ১৭, তিনি সম্ভ্রান্ত গৃহবধূ। লরার অনুপ্রেরণাই তাঁর কবিত্বের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। পেত্রার্কার শ্রেষ্ঠ বই 'Canzoniere' এর অনেকগুলি কবিতা সরাসরি লরার প্রতি তাঁর প্রেমগীতি। ত্রুবাদুরদের মতোই পেত্রার্কার মিউজ বা মানসসুন্দরী লরা, তাঁকে পেত্রার্কা পেতে চেয়েছেন ইহলৌকিক

বাসনারঞ্জিত মানবীয় প্রেমের মধ্যে। দান্তের মতো প্রেমকে তিনি খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের নির্মোক পরিয়ে 'দিব্য' করে তোলেননি। এখানেই দান্তের সঙ্গে তাঁর তফাৎ। দান্তে তাঁর প্রেমকল্পনাকে মরলোক থেকে অমরলোকের দিকে নিয়ে গেছেন কিন্তু পেত্রার্কা পার্থিব জীবনেই মিলনের প্রত্যাশা করেছেন। কিন্তু লরা অভিজাত ঘরের পরস্ত্রী। তাঁকে ইহজীবনে কাছে পাওয়ার প্রধান অন্তরায় সমাজবিধি। ফলে তাঁর অন্তর্লোকে ঘনিয়ে উঠেছিল দ্বন্দ্ব। বাসনালোকের সঙ্গে বাস্তবতার এই দ্বন্দ্বই পেত্রার্কার সনেটের মধ্যে শিল্পগুণে রূপায়িত হয়েছে।

'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদ থেকে একটি বিস্তারিত অংশ জুড়ে মৃত্যুর পরে লরার সঙ্গে পেত্রার্কার কাল্পনিক সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা বর্ণিত হয়েছে। কল্পনাদৃষ্টিতে পেত্রার্ক যেন শুনছেন লরার কথা। লরা যেন বলছেন তাঁর মনেও পেত্রার্কার প্রতি অনুরাগ ছিল কিন্তু তিনি কখনও তা উচ্চারণ করেননি। লরাকে নিয়ে কবিতা রচনা করে প্রেত্রার্ক লরার নামকে যেভাবে অমরত্ব দিয়েছে তাতে লরা পুরস্কৃত হয়েছেন। পেত্রার্কা চেয়েছিলেন প্রেমকে প্রকাশ করতে, লরা চেয়েছেন গোপন করতে। উভয়ের প্রেমের সাধনা এইরকম বিপরীতরূপ। পেত্রার্কার জীবনের এই অন্তরঙ্গতম উপলব্ধি ও কথাবার্তা রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত Thomas Campbell সম্পাদিত 'Life of Petrarca' বইটি থেকে। এমনকি এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কার Canzone এর পাঁচটি কবিতার যে বঙ্গানুবাদ করেছেন তার মূল পাঠ এই বইটি থেকেই নেওয়া বলে মনে হয়।[৯৮] পরবর্তী সংস্করণে অবশ্য বইটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে। Campbell সম্পাদিত বইটির বর্তমান সংস্করণের নাম 'The sonnets, Triumphs, and Other Poems of Petrarch'(1879)। রবীন্দ্রনাথ এই বইটির পূর্ববর্তী সংস্করণের ওপর ভিত্তি করেই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে জার্মান কবি গেটে

দান্তে ও পেত্রার্কের পাশাপাশি জার্মান মহাকবি গেটের (১৭৪৯-১৮৩২) সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় হয় আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে অবস্থানকালে। গেটেকে নিয়ে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচিত হয় এখানেই। প্রবন্ধটির নাম 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ'। প্রবন্ধটির নাম থেকেই স্পষ্ট যে গেটের সাহিত্যকর্ম বরং তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমজীবনই কিশোর রবীন্দ্রনাথের আলোচনার বিষয়। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২৮৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। এটি সরাসরি সম্পর্কিত এর আগের দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের সঙ্গে। সেই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি ; 'বিয়াত্রীচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা'। এই সিরিজের তৃতীয় প্রবন্ধ এটি। পূর্বোক্ত দুটি প্রবন্ধের বিপরীত দৃষ্টান্তস্থল হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। বিয়াত্রিচের প্রতি দান্তের বা লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেমের যে একনিষ্ঠতা, তা গেটের মধ্যে পাওয়া যায় না। উপরন্তু সেই একনিষ্ঠতার বিপরীত ছবিই পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত দুই কবির প্রেম একান্ত, গেটের প্রেম অনেকান্ত—এই নিয়ে কিশোর-সমালোচক রবীন্দ্রনাথের একটু মৃদু অভিযোগও যেন প্রবন্ধটির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রিচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।[৯৯]

গেটের জীবনকে আজ পূর্ণভাবে দেখলে সেদিনের কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই কথা অবান্তর বলে মনে হবে। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর সেদিনের মানসিকতা খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

প্রেমে হৃদয়বত্তা ও একনিষ্ঠতাকেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন বিশুদ্ধ বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু গেটে প্রেমকে কাটাছেঁড়া করে পরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। প্রেম সম্পর্কে গেটের ছিল এমন নিরীক্ষামূলক অনাসক্ত দৃষ্টি, তাকে তিনি হৃদয়ের সামগ্রী করেননি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ গেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। গেটে বলেছেন, ছেলেবেলায় তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দেখতেন পাপড়িগুলো কীভাবে বোঁটার সঙ্গে লেগে থাকে। এমনকি পাখির গা থেকে পালক ছিঁড়ে ছিঁড়েও দেখতেন পাখনার সঙ্গে সেগুলো কীভাবে গ্রথিত আছে। গেটের অন্যতম প্রণয়িনী বেটিনা বলেছেন, রমণীদের হৃদয় নিয়েও গেটে সেইরূপ পরীক্ষা করতেন। গেটের জীবনে এক একটি প্রেমপর্ব শেষ হত, অমনি তা নিয়ে তিনি নাটক লিখে ফেলতেন। পেত্রার্কার মতো কবিতা লিখতেন না। এর কারণ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নাটক লেখা হয় আর কবিতায় চিত্রিত হয় আদর্শের জগৎ। গেটের কাছে প্রেমে পড়া এবং প্রেম ভেঙে যাওয়া দুটোই একান্ত বাস্তব ঘটনা। তাই এগুলি তাঁর কল্পনা এবং রচনাকে উদ্দীপিত করত মাত্র। এর বেশি মূল্য গেটে প্রেমকে দেননি।

এরপর গেটের জীবনে গ্রেশেন, অ্যানসেন, ফ্রেডরিকা, এমিলিয়া, শারলোট, লিলি প্রমুখ একাধিক রমণীর প্রেমের অভিজ্ঞতা চিত্রিত করে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে একমাত্র ফ্রেডরিকার সঙ্গে গেটে যে ব্যবহার করেছিলেন, তা নিয়ে পরে তাঁর কিছু অনুতাপ হয়। স্ট্রাসবর্গের এক পাদরির কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন ফ্রেডরিকা। গেটে তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। ফ্রেডরিকা ও তাঁর আত্মীয়েরা ভেবেছিলেন উভয়ের বিবাহ হবে কিন্তু গেটে মনে মনে জানতেন তিনি বিবাহ করবেন না। একথা জেনে বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে অন্যায় হয়েছিল নিশ্চিত কিন্তু ফ্রেডরিকা গেটেকে এর জন্য কোনোরকম তিরস্কার বা দোষারোপ করেনি। পরে এ সম্পর্কে গেটের জবান উদ্ধার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> গ্রেশেন আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল—অ্যানসেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অবসানে সেই অতি আরামদায়ক প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমনকি তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।[১০০]

গেটের এই উক্তিতে অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বিষয়ে তাঁর পল্লবগ্রাহী মনের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে গেটের এই প্রেমকাহিনির দ্বারা যে মহাকবি গেটের হৃদয়ের ছবিই পাওয়া যায় তা নয়, প্রেমের রূপ কত বিচিত্র তাও জানা যায়। গেটের জীবনের এই অন্তরঙ্গ প্রেমসমূহের ছবি সাড়ে সতেরো বছরের কিশোর সমালোচক কীভাবে জানলেন, কোন্ বই তাঁর অবলম্বন হয়েছিল, এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুর কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্থিরভাবে এই বিষয়ে কিছু বলার বাধাও আছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে গেটে বিষয়ক যে-সব বইপত্র পাওয়া গেছে, তার কোনওটাই এই প্রবন্ধটি লেখবার আগে সংগৃহীত নয়। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে সাধনা পত্রিকায় (বৈশাখ সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথ বিশিষ্ট জার্মান কবি হেনরিখ হাইনের কবিতা অনুবাদ করেন। যদিও সেই অনুবাদ সম্পর্কে পত্রিকায় লেখা হয়েছে 'জর্ম্মান্ হইতে অনুবাদিত', তা সত্ত্বেও এই অনুবাদ মূল জার্মান থেকে নাকি হাইনের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে হয়েছে, তা নিয়ে সংশয় আছে। 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' শীর্ষক বইয়ের গ্রন্থকার অধ্যাপক সুজিতকুমার মণ্ডল যুক্তিসহ দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যতটা ইংরেজি অনুবাদনির্ভর, ততটা মূল জার্মাননির্ভর নয়। এই অনুবাদের উৎস গ্রন্থ হিসেবে তিনি যে দুটি বই নির্দেশ করেছেন, সেই দুটিই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরচিহ্নিত। প্রথমটি মূল জার্মান ও দ্বিতীয়টি অনুবাদ। দুটি বই যথাক্রমে ১) Heinrich Heine, 'Poetisch Worke Von H. Heine', 51st edition, Hamburg, Hoffman and Campe, 1885. ২) Edgar Alfred Bowring : 'The Poems of Heine', London, G.B and Sons. 1884.[১০১] এছাড়াও ১২৯৪ সাল (বঙ্গাব্দ) স্বাক্ষরিত গেটের 'ফাউস্ট' এর একটি ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ মেজো বৌঠান জ্ঞানদানন্দিনীকে উপহার দেন। এছাড়াও ফাউস্টের আরও দুটি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল বলে জানা গেছে।[১০২] কিন্তু এর কোনওটিই এই প্রবন্ধ লেখার আগে সংগৃহীত বা প্রকাশিত নয় অথবা এই প্রবন্ধের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। এই প্রবন্ধটি লেখবার নেপথ্যে যে-বইটি পড়বার অভিজ্ঞতা কাজ করেছে, আমরা মনে করি, সেটা জার্মান বই নয়, গেটে সংক্রান্ত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ এই বই পড়েছিলেন আমেদাবাদে। হয় কলকাতা থেকে আনিয়ে, নয়তো সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পঠিত বইটি যে ইংরেজি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ সাড়ে সতেরো বছর বয়সে তিনি জার্মান জানতেন না। পরে হাইনের অনুবাদ করার সময়ে তাঁর জার্মান শেখার

স্পৃহা জন্মায় কিন্তু খুব ভালো শিখেছিলেন, এই আত্মবিশ্বাসও তাঁর ছিল না। এ বিষয়ে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> I also wanted to know German Literature and by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted. Which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language, --which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.[১০৩]

একইভাবে তিনি গেটে পড়বারও চেষ্টা করেছেন। ফাউস্ট-রাজপ্রাসাদের দেউড়ি পেরিয়ে অতিথিশালা পর্যন্ত তিনি ঢুকতে পেরেছিলেন, অন্দরমহলে প্রবেশের চাবিকাঠি পাননি। তাঁর নিজের বক্তব্য পুনরায় উদ্ধার করি—

> Then I tried Goethe. But that was too ambitions. With the help of the little German I had learnt, I did not go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate. Properly speaking, I do not know my Goethe, and in the same way many other great luminaries are dark to me.[১০৪]

এবার তবে প্রশ্ন, গেটেকে নিয়ে অন্তরঙ্গ জীবনীভিত্তিক প্রবন্ধটির উৎসগ্রন্থ কী? এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই, তবে অনুমান করা চলে। নিশ্চিত বলার উপায় নেই কারণ আমেদাবাদে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী কী বই পড়েছিলেন, তা আজ আর জানা যায় না। এ ব্যাপারে জীবনীকার প্রশান্ত পাল জানিয়েছেন—

বইগুলি আমেদাবাদ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে কিনে পাঠানো হয়। বইগুলির নাম এখানে উল্লিখিত হয় নি, ফলে কি ধরণের বই রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে পড়তেন তা জানার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।[১০৫]

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে গেটের অন্তরঙ্গ জীবনী ইংরেজি ভাষায় যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন George Henry Lewes। বইটির নাম 'Life of Goethe'। বইটি প্রকাশ পায় লন্ডন থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশ পাওয়ার ১৪ বছর পর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেই সময়ে গেটের ইংরেজি বায়োগ্রাফিগুলির মধ্যে Lewes কৃত বইটিই এদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়। দ্বিতীয়ত, উক্ত প্রবন্ধে গ্রেশেনসহ রবীন্দ্রনাথ গেটের যে প্রণয়িনীদের নাম ও বিবরণ পেশ করেছেন, সেগুলি এই বইতে বিস্তারিত পাওয়া যায়। তাই আমাদের অনুমান রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ্ সহায়ে উক্ত প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন।

সাড়ে সতেরো বছর বয়সে লেখা প্রবন্ধটি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গেটে চর্চা তথা জার্মান সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। এই চর্চা পরবর্তীকালে আরও বর্ধিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য ব্যতিরেকে বিশ্বের যে-কজন ক্লাসিক সাহিত্যিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র গেটের রচনাই তিনি মূল ভাষায় পড়তে চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরবিশিষ্ট 'ফাউস্ট' এর কপি দেখতে পাওয়া গেছে। (The First part of GOETHE's FAUST Together with the prose translation, notes and appendices of the Late Abraham Hayward, Q.C) 'ছিন্নপত্রাবলী'র বেশ কয়েকটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের গেটে পড়বার পাঠ-প্রতিক্রিয়ার সন্ধান মেলে। ১৮৯৪ এর ১২ ই অগাস্ট ইন্দিরা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার বিষয়বস্তু গেটে। চিঠির শুরুতেই আছে—

গেটের জীবনীটা তোর [ইন্দিরা দেবী] ভালো লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসেবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল।[১০৬]

এই বক্তব্যের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ হের্ডের, শ্লেগেল, শিলার, কান্ট প্রমুখ জার্মানীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের কথা তুলে ধরে বলতে চেয়েছেন সূক্ষ্ম ভাবের চর্চায় জার্মানী একসময় কত সমৃদ্ধ ছিল। শিলারের বন্ধুত্ব ও সঙ্গগুণ গেটের জীবনের প্রধান সম্পদ। সেইরকম যাঁরা সূক্ষ্ম ভাবের

চর্চাকারী তাদের পক্ষে উপযুক্ত মননের সঙ্গী কত আবশ্যিক, সে কথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। ২৩৬ নম্বর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গেটের একটি উক্তির কথা তুলে ধরেছেন। যে অনুষঙ্গে এই উক্তির অবতারণা, তা হল বাইরের প্রাচুর্য ত্যাগ না করলে অন্তরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করা যায় না। গেটের কথাটি প্রথমে মূল জার্মান ও পরে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : "Entbehren sollst du, sollst enbehren, Thou must do without, must do without"[১০৭]। শুধু এখানেই নয় 'সোনার তরী' কাব্যের পাণ্ডুলিপিতেও রবীন্দ্রনাথ এই লাইনটি লিখে রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গেটে উভয়েই কাব্যরচনার প্রেরণারূপে এক ধরণের অন্তর্শক্তির কথা কল্পনা করেছিলেন। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অন্তর্শক্তির সেই লীলাকেই কাব্যরচনার মুখ্য নিয়ন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে 'অহংকারী' বলে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের জবাবে রবীন্দ্রনাথ আয়ুধ করেছিলেন গেটের উক্তিকে। লেখাটি নিম্নরূপ—

> আমি মনে জানি, অহংকার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। বহুদিন হইল জর্মন কবিশ্রেষ্ঠ গেটের কোনও রচনার ইংরেজি তর্জমাতে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, যতদূর মনে পড়ে তাহার ভাবখানা এই যে, বাগানের মধ্যে যে শক্তি গোলাপ হইয়া ফোটে সেই একই শক্তি মানুষের মনে ও বাক্যে কাব্য হইয়া প্রকাশ পায়। এই বিশ্বশক্তিকে নিজের জীবনের মধ্যে ও রচনার মধ্যে অনুভব করা অহংকার নহে। বরঞ্চ অহংকারের ঠিক উলটা। কেননা, এই বিশ্বশক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নহে, তাহা সকলের মধ্যেই কাজ করিতেছে।[১০৮]

স্মৃতি থেকে গেটের যে উক্তি তুলে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তার মূল পাওয়া যাবে গেটের 'Reflections and Maxims' এর মধ্যে :

> There are many thoughts which come only from general culture, like buds from green branches. When roses are in bloom, you find them blooming everywhere.[১০৯]

গেটের 'Weltliteratur' বা বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে ধারণাও রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গেটে বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর

ধারণাকে বিস্তৃত করেন। একারমানের সঙ্গে আলোচনায় গেটে বলেন, জাতীয় সাহিত্য ক্রমশই অর্থহীন হয়ে পড়ছে, বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসছে। সেই যুগকে দ্রুত এগিয়ে আনার জন্য সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।[১১০] গেটের ধারণায় বিশ্বসাহিত্য সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বিপণন-ক্ষেত্র। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিভেদ আছে, বিশ্বসাহিত্য সেই বিভেদ দূর করতে পারে। শাশ্বত মানবতার আদর্শে পৌঁছনোর জন্যেও বিশ্বসাহিত্যের সহায়তা আবশ্যক। প্রাণীজগতে যেমন আদিরূপ আছে, বিভিন্ন প্রাণী সেই আদিরূপ বা আর্কেটাইপের বিচিত্র প্রকাশ, তেমনি শিল্প-সংস্কৃতির জগৎকেও আর্কেটাইপ রূপে কল্পনা করা যায়। বিভিন্ন জাতি ও ব্যক্তির সাংস্কৃতিক প্রকাশ সেই আর্কেটাইপেরই রূপভেদ। বিশ্বসাহিত্যের মূল কাজ মানুষের সেই আদিরূপকে স্পষ্টতর করে বিস্তৃততর মানবতাবোধকে উদ্বুদ্ধ করা।[১১১]

এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরে প্রকাশ করেছেন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আহ্বানে 'বিশ্বসাহিত্য' শীর্ষক ভাষণে। তাঁর কথায়—

> পৃথিবী যেমন আমার খেত তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা তোমার রচনা এবং তাঁহার নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ-চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।[১১২]

গেটের অনুসারী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সর্ব-দেশকালের ভিত্তিতে সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিশ্বমানব সন্ধান। বিশ্বমানবতায় পৌঁছনোর একটি উপায় নিশ্চিতভাবে হতে পারে বিশ্বসাহিত্যের চর্চা। বিশ্বসাহিত্য বিশ্বের মহৎ সাহিত্যের সামগ্রিক রূপ, সব দেশের সব সাহিত্যের সমষ্টি নয়। এই মহৎ সাহিত্যই মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বমানবতার দিকে এগিয়ে দেবে।

জার্মান সাহিত্যে একমাত্র গেটেকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'হেনরিখ হাইনে' নামক জার্মান কবির ন'টি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা) 'গেটের

উক্তিসংগ্রহ' নামে গেটের কিছু টুকরো মন্তব্যের অনুবাদ পাওয়া যায়। এটি গেটের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'The Maxims and Reflections of Goethe' গ্রন্থ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া কান্ট, শিলার প্রমুখ জার্মান দার্শনিকগণের উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু জায়গায় করেছেন। কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-সমালোচনামূলক লেখা নয় বলে এখানে উল্লেখ করা হল না।

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে ফরাসি সাহিত্য

ফরাসি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার আবহাওয়া রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ঠাকুরবাড়িতেই পেয়েছিলেন। দাদাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই ফরাসি জানতেন। ফরাসি নাট্যকার ম্যলিয়ের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খুব প্রিয়, তিনি ম্যলিয়েরের নাটক বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ম্যলিয়েরের নাটক ইংরেজি অনুবাদে কিছু কিছু পড়েছেন বলে নিজেই জানিয়েছেন—

> মলিয়্যারের বিষয়ে একরকম অনভিজ্ঞ; তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান, তা জ্যোতিদাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েছে; আর বোধ হয় মলিয়্যার-এর ইংরিজি অনুবাদও কিছু কিছু পড়েছি।[১১৩]

আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও প্রিয়নাথ সেন—রবীন্দ্রনাথের এই তিন বন্ধুই ফরাসি সাহিত্যরসিক। পরবর্তীকালে এই দলে যুক্ত হন প্রমথ চৌধুরী। ফরাসি সাহিত্যের মধ্যে বালজাক, জোলা, মোপাসাঁ, দোদে, গোতিয়ের প্রমুখের বই অনুবাদ মারফত তিনি পড়েছিলেন। ভিক্টর হুগোর কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করেন। কিন্তু তিনি নিজে ফরাসি জানতেন বলে মনে হয় না।[১১৪]

রবীন্দ্রনাথের লেখা ফরাসি সাহিত্যের সমালোচনামূলক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের মধ্যে 'জুবেয়ার' প্রবন্ধটি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ কথিত জুবেয়ারের পুরো নাম **Joseph Joubert (1754-1824)**। ইনি একজন ফরাসি ভাবুক, যিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ হিসেবে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেন। জুবেয়ার তাঁর জীবৎকালে কোনও গ্রন্থ বা লেখা প্রকাশ করেননি। আত্মমগ্ন এই মানুষটি সর্বদা সঙ্গে একটি নোটবই রাখতেন এবং সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে নিজের চিন্তাকণিকাগুলিকে সেই নোটবইয়ে টুকে রাখতেন। আমাদের দেশে যাকে সুভাষিতবচন বলে

অনেকটা সেইরকম aphoristic স্টাইলে ছোটো ছোটো ভাবগুলিকে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। ফরাসি ভাষায় এই রচনাগুলিকে পঁসে (Pensees) বলা হয়। তাঁর মৃত্যুর চোদ্দ বছর পর তাঁর বিধবা পত্নী ও বন্ধুর উৎসাহে এই লেখাগুলি মুদ্রিত হয়। ফরাসি ভাষায় মুদ্রিত এই গ্রন্থটির পুরো নাম 'Recueil des pensees de M. Joubert (Collected thoughts of Mr Joubert)। অনেকেই এই বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ম্যাথু আর্নল্ডের দ্বারা জুবেয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ম্যাথু আর্নল্ডের মূল বইটির নাম 'Essays in Criticism'(1869)। এই বইতে 'Joubert' শীর্ষক যে অধ্যায়টি আছে, সেটি পড়েই সম্ভবত জুবেয়ার সম্বন্ধে জানেন ও এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি শুরু করেছেন সেই কথা বলে—"রসজ্ঞ ম্যাথু আর্নল্ড ফরাসি ভাবুক জুবেয়ারের সহিত ইংরাজি-পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দেন।"[১১৫] জুবেয়ারের মন যেন ফসলের খেত। ধর্ম, কলাবিদ্যা, সাহিত্য ইত্যাদি নানা চিন্তাবীজ সেই খেতে কর্ষিত হয়ে ফসল ফলিয়েছে। জুবেয়ারের পঁসে থেকে কিছু নির্বাচিত রচনা রবীন্দ্রনাথ বেছে নিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। জুবেয়ারের বচনগুলির সংকলন ও মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের সামান্য কিছু বিবৃতি—এই নিয়েই এই মাঝারি মাপের প্রবন্ধটি গড়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে দু'একটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন জুবেয়ার নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন, রবীন্দ্র-অনুবাদে তা এইরকম—

> যাহা জানিবার ইচ্ছা ছিল তাহা শিক্ষা করিতে বৃদ্ধবয়সের প্রয়োজন হইল, কিন্তু যাহা জানিয়াছি তাহা ভালোরূপে প্রকাশ করিতে যৌবনের প্রয়োজন অনুভব করি।[১১৬]

রচনাকলা সম্বন্ধে জুবেয়ারের একাধিক বচন রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছেন। প্রতিটিই মনোগ্রাহী। তার মধ্যে একটি প্রতিভাশালী লেখক ও লিপিকুশল লেখকের প্রভেদ বিষয়ক। জুবেয়ার বলেছেন, প্রতিভাশালীর রচনায় সংগতি এমন স্বাভাবিক ও অখণ্ড যে তাকে বিশ্লেষণ করাই শক্ত। অন্যদিকে লিপিকুশল লেখকের রচনায় সংগতি ইটের উপরে ইটের মতো গাঁথা ও সাজানো। প্রথমটি অজ্ঞাতসারে মুগ্ধ করে, দ্বিতীয়টি বিন্যাস নৈপুণ্যে বাহবা বলায়।

শিল্প ও সাহিত্যের সমালোচনা বিষয়ে জুবেয়ারের বচনগুলি আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ এই উক্তিগুলির সঙ্গে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল। যেমন জুবেয়ার বলেছেন, ১) লেখকের মনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হয়েছে কিনা তার খবরদারি করা তার ব্যাবসাগত কাজ বটে কিন্তু সেটাই সবচেয়ে কম

দরকারি। ২) ব্যাবসাদার সমালোচকেরা আকাটা হীরে বা খনি থেকে তোলা সোনার ঠিক দর যাচাই করতে পারে না। ট্যাকশালের চলতি টাকাপয়সা নিয়েই তাদের কারবার। তাদের সমালোচনায় দাঁড়িপাল্লা আছে কিন্তু নিকষপাথর অথবা সোনা গলিয়ে দেখবার মুচি নেই।

এই একই কথা সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাষান্তরে বলেছেন। তাঁর কথায়—

> সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য-বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সেরকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।[১১৭]

উপরের রবীন্দ্রকথন যদি জুবেয়ারের সমালোচনা বিষয়ক প্রথম উক্তির সঙ্গে মেলে, তবে দ্বিতীয় উক্তির সঙ্গে মিলবে 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন—

> আবার ব্যাবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।[১১৮]

এমন সাদৃশ্য আরও দেখানো যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ জুবেয়ারের যে উক্তিগুলি নির্বাচন করে এই প্রবন্ধে সাজিয়েছেন, তার বেশিরভাগই সাহিত্য ও শিল্পরীতির লক্ষণ বিষয়ক। উদ্ধৃত বচনগুলির অধিকাংশই যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্পচেতনার সঙ্গে মিলে যায়, তা বলাই বাহুল্য। ফলে শিল্প ও সাহিত্যের রসভোক্তা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি কেমন ছিল তার একটা আভাস এই প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যেতে পারে। এইখানেই প্রবন্ধটির বিশেষ মূল্য।

হেনরি ফ্রেডেরিক আমিয়েল (১৮২১-১৮৮১) একজন ফরাসি দার্শনিক ও লেখক। তাঁর বিখ্যাত বই 'Journal Intime' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর। এই জার্নাল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, মনন-চিন্তন, বই পড়ার প্রতিক্রিয়া, ধর্মবিশ্বাস, জীবনদর্শন এই সমস্ত কিছু নিয়ে গড়ে উঠেছে বইটি। সব কিছুর সঙ্গেই মিশে রয়েছে লেখকের আত্মতা। আমিয়েলের নির্জন ভাবুক সত্তা, প্রকৃতিচেতনা, ঈশ্বরচেতনা সব মিলে অধ্যাত্ম মননের সঙ্গে এই মধুর সাহিত্যিক রসের আমেজ এই বই থেকে পাওয়া যায়।

এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্নপত্র’ অথবা ‘ছিন্নপত্রাবলী’র সঙ্গে আমিয়েলের বইটির নিকট সাদৃশ্য আছে। মাঝেমধ্যে কিছু মানুষী দুর্বলতা যেমন সন্দেহ, ভয়, হতাশা, দুর্বলতার পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে, যার দ্বারা পাঠক কোনও সর্বজ্ঞতা নয় বরং বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করার মতো এক নিভৃত পরিসর এই বই থেকে পেতে পারেন। গ্রন্থের এই বিশেষ গুণটিই রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ‘ছিন্নপত্রাবলী’র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি। যখনই সময় পাই সেই বইটা উলটে-পালটে দেখি ; ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো।[১১৯]

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃজনশীল লেখাতেও (যেমন ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস) আমিয়েলের জার্নালের উল্লেখ আছে, দেখতে পাওয়া যায়।

এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২)র উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেননি, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, মানবচরিত্রের সমগ্রতা উপেক্ষা করে একটি মাত্র দিককে (মিথুনাসক্তি?) জোলা উদগ্র বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞান খণ্ডাংশের বিশ্লেষণ করে কিন্তু সাহিত্যে চাই পূর্ণ মানুষ। সেই পূর্ণাঙ্গ মানবসত্যকে জোলার উপন্যাস খণ্ডভাবে তুলে ধরে। এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পায়নি। তাঁর কথায়—

> সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তাহলে জোলার নভেলে কোনও দোষ দেখতুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোনও অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ড জিনিসকে খণ্ড ভাবেই দেখায়। আবার, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোনো-একটা অংশের অবতারণা তখন তাকে একটা বৃহতের, একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায়।...[১২০]

সৌন্দর্যকে জীবনবিবিক্ত করে দেখেছেন বলেই **থিয়োফেল গোতিয়ে (১৮১১-১৮৭২)**র উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা চিঠিতে তিনি গোতিয়ের ‘মাদমোয়াজেল দ্য মোপাঁ’ গ্রন্থটি পড়ার পাঠপ্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বইটি ইংরেজি অনুবাদেই পড়েছিলেন। পড়ে তাঁর মনে হয়েছে এখানে যেন জগৎকে সীমাবদ্ধ করে

দেওয়া হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক-যুবক সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ ভোগের বস্তু বলে মনে করেছে এবং সেই সন্ধানেই ঘুরে মরেছে। এর দৃষ্টিতে সৌন্দর্য যেন খনিগর্ভে থাকা মণিমানিক্যের মতো লুকনো কোনও জিনিস যা পেয়ে কৃপণের মতো সিন্দুকে তুলে রাখতে হয়। আমাদের মরজীবনের চারপাশে যে সৌন্দর্য বিরাজ করছে, তা একে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করেনি। তাই এই গ্রন্থের সংকীর্ণ সীমায় হৃদয় অনেকক্ষণ বাস করতে পারে না। "রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলো দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য এই তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে।"[১২১]

বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যকে খণ্ড করে সংকীর্ণ করে আনায় এই ফরাসি বইটিতে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও "সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা" রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে।

'সাহিত্যের গৌরব' প্রবন্ধ ও দুটি বিদেশি উপন্যাস

১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের গৌরব' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে দুজন কন্টিনেন্টাল ঔপন্যাসিক ও তাঁদের উপন্যাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন। এদের মধ্যে একজন হাঙ্গেরিয়ান। নাম মৌরিয়স য়োকাই। আর একজন পোলিশ। নাম জোসেফ্ ইগনেশিয়াস ক্রাসজিউস্কি। এই দুই সাহিত্যিকের সাহিত্যরচনার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দুই দেশের জাতীয় উৎসবের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। তা পড়ে রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুই ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়ে 'সাধনায়' সমালোচনা লেখেন। অবশ্য এ ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা নয়। জাতীয় সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত উক্ত দুটি দেশের সঙ্গে নিজের দেশের প্রতিতুলনাই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলির সাহিত্য তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে সাহিত্যের সঙ্গে জনসাধারণের তেমন ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। ভিক্টর হুগোর মৃত্যুর পর সমগ্র ফ্রান্স যেভাবে শোকাকুল হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে (এই প্রবন্ধ লেখবার কিছুদিন আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে) বাংলাদেশের হৃদয় সেভাবে আলোড়িত হয়নি। এর কারণ ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে যে জাতিগত একতা গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে বা বাংলায় তখনও তা দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত,

রবীন্দ্রনাথ কথিত এই দুই সাহিত্যিক য়োকাই এবং ক্রাসজিউসকি যথাক্রমে হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনকে তাঁদের রচনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। দুই দেশের স্বাধীনতা-বিপ্লবে এই দুই লেখকই মনপ্রাণ ঢেলে যোগ দিয়েছেন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁরা দেশীয় ভাষারই মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এঁদের রচনার মধ্যে দিয়েই হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের সাধারণ মানুষ মাতৃভাষাকে ভালোবেসেছে, শোকে সান্ত্বনা পেয়েছে, বিপদে আশা পেয়েছে, লজ্জায় ধিক্কার দিয়েছে ও গৌরবে জয়ধ্বনি করেছে। বিদেশি ভাষার আধিপত্য থেকে স্বদেশি ভাষাকে এঁরাই মুক্তি দিয়েছে। এককালে হাঙ্গেরি ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হয়ে ল্যাটিন ও জার্মান ভাষার অধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পরে তাঁদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বিকাশ হয় ও গোটা দেশ জুড়ে হাঙ্গেরি ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা চালু হয়। ভাষার প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ বেড়েছে বলেই দেশে এই পরিবর্তন সম্ভবপর হয়েছিল। আর এই পরিবর্তন সাধনের জন্য হাঙ্গেরি 'য়োকাই' এর কাছে ঋণজালে বদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই যে কেবল লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বয়ং তরবারি হস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ-নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।[১২২]

সুতরাং হাঙ্গেরির জাতীয় জীবনস্রোত ও কর্মপ্রবাহের মধ্যে সাহিত্য এবং সাহিত্যিক বীরের আসনে অধিষ্ঠিত। তুলনায় বাংলাদেশের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ হতাশ মনে লিখেছেন—

"আমাদের দেশে কোনও উদ্দেশ্য নাই, কোনও কার্য নাই, কোনও জীবনের গতি নাই—তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি শখ আছে মাত্র, আপাতত সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়।"[১২৩]

এরপর প্রাবন্ধিক য়োকাই-এর 'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' (Eyes like the Sea) উপন্যাসের সামান্য গল্পাভাস দিয়েছেন এবং উপন্যাসের মূল নায়িকা চরিত্র 'বেসি'র কথাই প্রধানত বলেছেন। উপন্যাসটি পড়লে জানা যায় 'বেসি' মেয়েটি দুঃসাহসী ও কিছুটা মানসিক বিকারগ্রস্থ। পাঁচবার সে বিয়ে করেছে। শেষ স্বামীটিকে সে হত্যাও করেছে। 'বেসি'র এই পাঁচ স্বামী হাঙ্গেরির জাতীয় জীবনের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। সাধারণ চাষি থেকে অভিজাত শ্রেণি—সমস্ত ধরণের

মানুষদের সঙ্গেই একে একে তাঁর দাম্পত্য জীবন কেটেছে। বেসির এই উন্মত্ত অথচ প্রাণচঞ্চল জীবনকে লেখক নিজে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। যৌবনে বেসি লেখকের ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অন্তরালে বেসি লেখকের প্রতি অনুভব করত এক গভীর, গোপন টান। এরপর লেখক নিজে জড়িয়ে পড়েন জাতীয় আন্দোলন ও বিপ্লবে। এরই মধ্যে এক অভিনেত্রীকে ভালোবেসে বিয়ে করেন তিনি। তার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটালেও সমুদ্রের মতো নীল চোখের মেয়ে 'বেসি'কে কোনোদিনই ভুলতে পারেননি লেখক। তার দুর্মর স্মৃতি নীলচোখের ব্যঞ্জনা নিয়ে বারবার ডাক দিয়ে গেছে তাকে।

'বেসি'কে ঠিক শাস্ত্র মিলিয়ে 'সতীসাধ্বী' বলা চলে না অথচ অথচ তাঁর মতো সজীব অথচ প্রাণময়ী মানবী চরিত্র বঙ্গদেশের সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষ যে কেবল মানুষরূপেই কত বিচিত্র, বলিষ্ঠ ও কৌতুকাবহ তা আমরা অনুভব করি না। আমাদের এই "ক্ষীণপ্রায়, কৃশহৃদয় দেশে মানুষ জিনিসটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহার স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জীব তুলাদণ্ডে প্রাণহীন বাটখারা দ্বারা তাহাদের গুরু-লঘুত্ব পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি।"[১২৪] তাই 'বেসি'র মতো নায়িকা বাংলাদেশে দেখা দিলে সমালোচকমহল বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

য়োকাইয়ের মতো ক্রাসজিউস্কিও পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনে বীরের সম্মান পেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাস রচয়িতা। তাঁর যখন আঠারো বছর বয়স তখনই পোল্যান্ডের স্বাধীনতা কামনায় সহপাঠীকে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। সেই অপরাধে তার দুবছর কারাবাসের শাস্তি হয়। কারাগারে বসেই তিনি পোলীয় ভাষার প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সাহিত্যজীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পোল্যান্ডে জাতীয় উৎসবের চেহারা নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাধি দান করে, কার্পাথীয় গিরিমালার একটা শিখর তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন ও দেশের জনসাধারণ সমবেতভাবে তাঁকে ছয় পাউণ্ড মুদ্রা উপহার হিসেবে দান করেন। তাঁর রচিত 'ইহুদী'(The Jew) উপন্যাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে সামান্যই বলেছেন। সেই সামান্য কথা এই—

এই লেখক রচিত 'ইহুদি'-নামক একটি উপন্যাস গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।[১২৫]

'The Jew' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে ক্রাসজিউস্কি পোল্যান্ডের জাতীয় জীবনের কাহিনিই লিপিবদ্ধ করেছেন। উপন্যাসটির ভাববস্তু এইরকম : জিন হুবা নামে একজন নির্বাসিত পোলিশ একটা পান্থশালায় ঢুকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। পান্থশালার মালিক ফিরপো তাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। মালিক ভাবেন, সে হয়তো মারা যাবে কিন্তু ঘটনাচক্রে সে বেঁচে যায়। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তখন সে দেখল একটা ছোটো টেবিলের চারধারে নানা জাতের মানুষ বসে পানাহারে মেতে আছে। তার মধ্যে রুশ, ইটালিয়ান, পোলিশ, ইহুদি, জিপসি সকলেই আছে। সেই গুলজারের মধ্যে একটা লোকের সঙ্গে তার আলাপ জমে গেল। তার নাম জেকব হারমান। সে জাতে ইহুদি। হারমান হুবার সঙ্গে রাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে তাকে ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করে নিতে চায়। এরপর তারা পোল্যান্ডে ফিরে আসে। পোল্যান্ডে ইহুদিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয় তারা। কিন্তু অচিরেই দুজনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় তাদের জীবনে প্রেম আসে। রাজনৈতিক ডামাডোলে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয় তারা। তাদের নির্বাসিত জীবনে প্রেমের স্পর্শ স্মৃতি হয়ে থেকে যায়।

বলা বাহুল্য, শুধু গল্প-রসিকের জন্য এই উপন্যাসটি রচিত নয়, এই উপন্যাসের সঙ্গে মানুষের নৈতিক এবং জাতিতাত্ত্বিক সমস্যাও জড়িয়ে আছে। উপন্যাসটি উপস্থাপনার বলিষ্ঠতা ও সারল্যের জন্য সেকালের সমালোচকদের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল।[১২৬]

হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের এই দুই সাহিত্যিক স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে কেমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন, তা দেখানোই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। সেই দুই দেশের জাতীয় জীবনে এই দুই সাহিত্যিক বীরের মতো পূজ্য বলে গণ্য হয়েছেন। তুলনায়, এ-দেশে সাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের অজ্ঞতা ও অবহেলা দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. এই তর্জমার জন্য দ্রষ্টব্য : *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ৬ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৬১।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ১৭ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৭, পৃষ্ঠা-৮৭।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি* (প্রথম পাণ্ডুলিপি), তদেব, পৃষ্ঠা-৭২৬-৭২৭।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ২০ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২১, পৃষ্ঠা-১৩।

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪।

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫।

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬।

৯. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস,* রত্নাবলী, ২০১২, পৃষ্ঠা-৯।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৮।

১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯।

১২. দ্রষ্টব্য: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত) *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* প্যাপিরাস, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৮৪।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২।

১৪. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১।

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৩।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ২০ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪-৫৫।

১৭. দ্রষ্টব্য: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত) *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, প্যাপিরাস, ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৮৩।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৭।

১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭।

২২. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১২২-১২৩।

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ডি প্রোফন্ডিস', *আধুনিক সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, ১৩১৪ ব, পৃষ্ঠা-১৬২।

২৪. Charles Howard Johnson (Ed), *The Complete Works of Alfred Lord Tennyson,* Frederick.A.Stokes, London, 1891, p-211

২৫. Ibid

২৬. Ibid

২৭. দ্রষ্টব্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, 'ষোড়শ খণ্ড' [গ্রন্থপরিচয় খণ্ড], পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃষ্ঠা-৯৬৩।

২৮. অনুবাদ ও মূল দুটোই পাওয়া যাবে সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪১০-৪১৩।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কবিজীবনী', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃষ্ঠা-৩২৪।

৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২৫।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৭, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭৮-৮৯।

৩২. রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল এমনটাই অনুমান করেছেন। দ্রষ্টব্য: প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, খণ্ড-২, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭।

৩৩. মূল কবিতা ও অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য; সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯।

৩৪. দ্রষ্টব্য: Donald Tayson & Benjamin B Hoover (Ed) *The Complete Works of Thomas Chattarton* (vol-1), A Bicentenary Edition, Oxford press, 1971, page-291-293.

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬।

৩৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯।

৩৭. নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বইটির নাম *The Yatras : The Popular Dramas of Bengal*। অবশ্য এই বইতে ভানুসিংহ ঠাকুর প্রসঙ্গ নেই। সম্ভবত অন্য কোনও রচনার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন।

৩৮. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী,* খণ্ড-১, আনন্দ, ১৯৮২, পৃষ্ঠা-৮৪।

৩৯. সনৎকুমার মিত্র, *শেকসপিয়র ও বাংলা নাটক,* সাহিত্যপ্রকাশ, ১৩৬০ ব, পৃষ্ঠা-৫৬।

৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

৪১. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৫।

৪২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজা ও রানী, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৮৮।

৪৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০।

৪৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬৮।

৪৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিসর্জন,* তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৬।

৪৬. দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মালিনী* নাটকের ভূমিকা, তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮৪।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘লোকেন পালিতকে লেখা চিঠি’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪৪।

৪৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪৪।

৪৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বিশ্বসাহিত্য’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮।

৫০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭৮।

৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘শকুন্তলা’, তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৬।

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০০।

৫৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ’৩৯ সংখ্যক কবিতা’, *বলাকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-৩, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘রূপকার’, *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা-২২৯।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি’, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ ব, পৃষ্ঠা-৩৫৫।

৫৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী,* বিশ্বভারতী, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-২০৪-২০৫।

৫৭. দ্রষ্টব্য, *রবীন্দ্রবীক্ষা-৪,* বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৯০।

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বিশ্বসাহিত্য’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৬।

৫৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘লোকেন পালিতকে লেখা পত্র’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪০।

৬০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১৩-৫১৪।

৬১. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১৩।

৬২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১৩।

৬৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কবি য়েট্‌স’, *পথের সঞ্চয়,* বিশ্বভারতী, ১৩৪৬ ব, পৃষ্ঠা-১০২।

৬৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৬।

৬৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘কবি য়েট্‌স’, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১০-১১১।

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০১।

৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের মাত্রা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯৫।

৬৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৪।

৬৯. কবিতাটি দীর্ঘ, এর অননূদিত অংশের জন্য দ্রষ্টব্য: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৪১-৫৪২।

৭০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০৬।

৭১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে আধুনিকতা', *সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫৯৯।

৭২. অনুবাদসহ মূল কবিতাটি একত্রে দেখার জন্য দ্রষ্টব্য: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২২-২২৩।

৭৩. Amy Lowell এর মূল কবিতাটি পাঁচ স্তবকবিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন।

৭৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভূমিকা', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮।

৭৫. মূল কবিতাটি পাওয়া যাবে : Eliot T.S, *Selected Poems*, Faber & faber Limited, London, 1931, P-22-24.

৭৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৩।

৭৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩।

৭৮. মূল কবিতাটি অনুবাদসহ পাওয়া যাবে: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭১।

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৬-১১৭।

৮০. এই বিষয়ে বিষ্ণু দের যুক্তি ও অভিমত বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে এই বইতে : বিষ্ণু দে, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা,* প্রতিভাস, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৭০-৮১।

৮১. এই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, খণ্ড-১৬, বিশ্বভারতী, ১৪০২ ব, পৃষ্ঠা-৪৪৪-৪৪৫।

৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৮-১১৯।

৮৩. রবীন্দ্রনাথকৃত সম্পূর্ণ অনুবাদ মূলসহ পাওয়া যাবে: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২১৬-২১৭।

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১১৯।

৮৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৬।

৮৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১০৩।

৮৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩।

৮৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, খণ্ড-১১, বিশ্বভারতী, ১৩৮১, পৃষ্ঠা-১৩৫।

৮৯. Tagore Rabindranath, *Talks in China, English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol-2, Sahitya Akademi, 1996, P-587-588।

৯০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-২৩।

৯১. জগদীশ ভট্টাচার্য, *সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ*, ভারবি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৩২।

৯২. Rossetti D.G (Translated), *The New Life*, Ellis and Elvey, London, 1899, p-91

৯৩. Ibid, p-159.

৯৪. Ward A.C, *Landmarks in Western Literature*, Methuen, London, 1932, P-92.

৯৫. Dante Alighieri [translated by Henry Francis Cary], *Dante's Inferno*, Caesell publishing, New York, 1818, P-9.

৯৬. Maritain Jacques, *Creative intuition in Art and Poetry*, Priceton University press, New Jersey, 1978, P-278.

৯৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পিত্রার্কা ও লরা', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।

৯৮. দ্রষ্টব্য: সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮১-৪৮২।

৯৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩।

১০০. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮।

১০১. সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৯০।

১০২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯৬।

১০৩. Tagore Rabindranath, *Talks in China, English Writings of Rabindranath Tagore*, Vol-2, Sahitya Akademi, 1996, P-587.

১০৪. Ibid, P-587-588.

১০৫. প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, খণ্ড-২, আনন্দ, ১৩৯১ ব, পৃষ্ঠা-৬।

১০৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩১০।

১০৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৮৫।

১০৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রবাবুর বক্তব্য', *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক* (পুলিন বিহারী সেন সংকলিত), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৭-৩৮।

১০৯. Goethe Johannwolfgang Von, *The Maxims and Reflections*, translated by Thomas Balley Saunders, Macmillan, London, 1908 P-157.

১১০. Fritz Strich, *Goethe and World Literature*, Routledge and Kegan Paul Ltd, London, 1949, P-36.

১১১. Ibid, P-81.

১১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্বসাহিত্য', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭৮।

১১৩. দ্রষ্টব্য: *রবীন্দ্রবীক্ষা-৪,* বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৮৭।

১১৪. সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পা), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৫১০।

১১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জুবেয়ার', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪০৫।

১১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৪০৬।

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যবিচার', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১০০।

১১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পৃষ্ঠা-২৫৫-২৫৬।

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী,* পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৫১-২৫২।

১২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানবপ্রকাশ', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৯৪৯-৯৫০।

১২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য' (লোকেন পালিতের সঙ্গে পত্রোত্তর), তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪০।

১২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের গৌরব', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩২।

১২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩২-৩৩৩।

১২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৩।

১২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩৪।

১২৬. দ্রষ্টব্য: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন,* একুশ শতক, ২০১২, পৃষ্ঠা-১৫৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়: উপসংহার: রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার সামগ্রিকতা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনার এক বিস্তৃত অঙ্গন আমরা পরিক্রমা করেছি। লোকসাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, পুরনো ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বিদেশি সাহিত্য-- নানা ধরণের, নানা স্বাদের সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, মতামত দিয়েছেন। এই সুপ্রচুর লেখার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সমালোচনাসাহিত্য। যে বিপুল পরিমাণ প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, গ্রন্থ-সমালোচনা প্রভৃতি একত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য নির্মাণ করেছে, রবীন্দ্রনাথকৃত সেই সমালোচনার মূল সূত্রগুলো কী, সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্ব কোথায় তা এই অধ্যায়ে আমরা নির্ধারণ করব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন-মানসিকতা ও সাহিত্যভাবনা বদলেছে অনেকখানি। কৈশোরে বা তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাহিত্যকে দেখেছেন বা বিচার করেছেন তার সঙ্গে মধ্যবয়সে বা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তার চিন্তা-ভাবনায় অনেকখানি বদল ঘটেছে। ফলে বদলেছে সাহিত্য-সমালোচনার পদ্ধতি ও আদর্শ। সেই বদলের রূপরেখাটিকেও আমরা এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে সাহিত্যজিজ্ঞাসা ও সাহিত্যসমালোচনার যে ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা বহমান তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্যসমালোচনার যোগ কোথায় ও কতটা, তাও অনুসন্ধান করব।

এ কথা সকলেই জানেন, আজকের দিনে সাহিত্য-সমালোচনা বলতে আমরা যা বুঝি; আমাদের দেশে ও পাশ্চাত্যে বহু পুরনো কাল থেকেই তার চর্চা চলে আসছে। মিথুনবদ্ধ ক্রৌঞ্চের মৃত্যুতে আদিকবির শোকাভিভূত হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছিল পৃথিবীর আদিতম শ্লোক। সেই শ্লোক উচ্চারণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জিজ্ঞাসু মনে দেখা দিল বিস্ময়—'কিমিদং ব্যহৃতং ময়া!' অর্থাৎ যা আমি (অর্থাৎ বাল্মীকি) উচ্চারণ করলাম তার অর্থ কী, কীভাবেই বা তা উচ্চারিত হল! এই জিজ্ঞাসা থেকেই জন্ম নিল সাহিত্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব। সৃজনশীল সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সাহিত্যের সংজ্ঞা, স্বরূপ, বিচার-পদ্ধতি, সামাজিক মূল্য ইত্যাদির নির্ণায়ক এই যে শাস্ত্র এরই পারিভাষিক নাম আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্র বা কাব্যতত্ত্ব, পাশ্চাত্যে এসথেটিক্স

বা পোয়েটিক্স। সাহিত্যসমালোচনাও এরই অঙ্গীভূত। অবশ্য বাংলা ভাষায় 'সমালোচনাসাহিত্য' বলতে আমরা যা বুঝি পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে মুখ্যত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-আশ্রয়ে তা বিকশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তৈরি সাহিত্য-সমালোচনার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ আরও পুষ্ট করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার মূল সূত্র অনুসন্ধান করবার পূর্বে প্রতীচ্য-বিশ্বের সাহিত্য-ভাবনা ও সাহিত্যসমালোচনার রূপরেখাটিকে সংক্ষিপ্তাকারে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

পাশ্চাত্যে সাহিত্যের স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নিয়ে সর্বপ্রথম আলোড়নকারী বক্তব্য শুনিয়েছিলেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ খ্রিঃপূঃ)। অবশ্য তারও আগে হোমার সাহিত্যরচনার প্রেরণা হিসেবে ঐশ্বরিক প্রণোদনার কথা বলেন। প্লেটোর পূর্বসূরী হিসেবে আরও একজনের নাম উল্লেখ্য, তিনি হলেন গ্রিক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস। তাঁর 'ফ্রগ্‌স' নাটকে তিনি বলেন, স্কুল মাস্টার যেমন বালকদের নীতিশিক্ষা দেন, তেমনি কবিরাও প্রাপ্তবয়স্কদের নীতিশিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্লেটোর সাহিত্যভাবনায় খুব কড়া নীতিবাদ লক্ষ করা যায়। কবিরা কাব্যরচনার সময়ে অ-লৌকিক শক্তির (theia dunamis) প্রভাবে সাময়িকভাবে মোহগ্রস্থ হন এবং কাব্য সৃষ্টির নামে নকলের নকল করেন। তাই 'প্লেটো' কবিদের সম্মান করলেও তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্রে স্থান দিতে চাননি। কিন্তু প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিঃপূঃ) সাহিত্যকে যুক্তির সাহায্যে সম্মানের স্থান দিয়েছেন। প্লেটোর মতের অনুসরণ করেও অ্যারিস্টটল গুরুর সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করতে পেরেছিলেন। তিনি প্লেটোর মতোই শিল্প ও সাহিত্যকে 'প্রকৃতির অনুকরণ' বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু mimesis তত্ত্বকে নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করে তিনি এটাও দেখালেন যে শিল্প বা সাহিত্য বস্তুর আইডিয়ার অনুকরণমাত্র নয়, তার দ্বারা বস্তুজগৎ শিল্পজগতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ এ কেবল নকলনবিশী নয়, সারস্বত সৃষ্টি। প্লেটো বলেছিলেন, কবিরা প্রতিভাবান হলেও পরিত্যজ্য কারণ তাঁরা সামাজিকের মনে বিপরীত ভাবের বীজ বপন করেন, যাদের দ্বারা তাদের হৃদয় দুর্‌বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অ্যারিস্টটল এই মতকে খণ্ডন করে বললেন, সাহিত্যভোগের দ্বারা সামাজিকের মনের মধ্যে যে catharsis ঘটে, তার দ্বারা সাহিত্যভোক্তার মন থেকে অতিরিক্ত আবেগ নিষ্কাশিত হয়ে ঝরে যায় এবং মন সাত্ত্বিক ধর্ম ফিরে পেয়ে সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে ওঠে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল দুজনেই উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। প্লেটোর মতে কাব্য বা

নাট্য সমাজের পক্ষে উপযোগী নয়, অতএব পরিত্যজ্য কিন্তু অ্যারিস্টটল কাব্য ও নাট্যকে মানবসমাজের পক্ষে উপযোগী ও উপকারী রূপে প্রতিষ্ঠা করে এর গৌরব রক্ষা করেছেন।

রোমান যুগে ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-সমালোচকের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে হোরেস (৬৫-০৮ খ্রিঃপূঃ), সিসেরো (১০৬-৪৩ খ্রিঃপূঃ), লঞ্জাইনাস (২১৩-২৭৩ খ্রিঃ), প্লটিনাস (২১০-২৭০ খ্রিঃ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। হোরেসের ‘Ars Poetica’ পত্রাকারে লিখিত কাব্য-সমালোচনা। এখানে কবির কর্তব্য সম্পর্কে তিনি খুব স্পষ্টাক্ষরে ‘Dulse et utile’ কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ কাব্যে চিত্তবিনোদন ও নীতিপ্রচার এই দুইয়ের সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ আনন্দদানের সাহায্যেই কবিতা পাঠকের মনকে শিক্ষিত করে (poetry is to instruct, or to delight)। সিসেরো তাঁর ‘De Oratore’ গ্রন্থে বলছেন, শিল্পী ও সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য বস্তুর নকল করা নয়, বরং শিল্পীর মনের মধ্যে যে সৌন্দর্য রয়েছে তাকে ফুটিয়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। প্লটিনাসও তাঁর ‘Enneaw’ গ্রন্থে বলছেন, প্রকৃতির মধ্যে যেখানে শূন্যতা ও সৌন্দর্যের অভাব সেখানে সৌন্দর্য সঞ্চার করে তাকে ভরিয়ে তোলাই সাহিত্য ও শিল্পের উদ্দেশ্য। দেখা যাচ্ছে, সিসেরো এবং প্লটিনাস উভয়েই শিল্প ও সাহিত্যে শিল্পীর মনোবাসী ‘সৌন্দর্যবোধকে’ ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন। লঞ্জাইনাসের ‘Peri Hupsous’ (On the Sublime) ইউরোপীয় সাহিত্যবিচারে এক মহৎ তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, মহৎ সাহিত্য শ্রোতাকে শুধু বোধের জগতেই আবদ্ধ করে রাখে না, তাকে বোধাতীত আনন্দময় রাজ্যে নিয়ে যায়। তাঁর মতে কাব্য বা সাহিত্যে এমন কিছু উপাদান থাকে যেমন মহৎ বিষয়বস্তু, উদ্দীপনা বা আবেগ, ছন্দ বা অলংকারের উৎকর্ষ, রচনার প্রসাদগুণসহ পাঁচটি উপাদান[১] একত্রিতভাবে সমাবেশিত হয়ে পাঠককে আত্মচৈতন্যের ঊর্ধ্বতর লোকে নিয়ে যায়। এর সঙ্গে ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ধ্বনিবাদ বা রসবাদের অনেকখানি মিল রয়েছে, দেখা যায়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ও লঞ্জাইনাসের ‘সাবলাইম’ তত্ত্ব দুই-ই দেখায়, স্থূল বাস্তবতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে কাব্য বা সাহিত্য মানুষের বোধ এবং আবেগকে কেমনভাবে ঊর্ধ্বতর আনন্দলোকে নিয়ে যায়। লঞ্জাইনাসের সাহিত্য-ভাবনার এই উত্তরাধিকার ভারতীয় কাব্যবিচার প্রক্রিয়ায় এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাতেও ছায়া ফেলেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

> শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি বা বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়েও

আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি, শুনছি, তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয়, তখন তাকেই আমরা বলি রস।[২]

তখন 'অনির্বচনীয়' বলতে যা তিনি নির্দেশ করতে চান, ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে তাকেই 'রস' বলা হয়েছে আর লঞ্জাইনাস তাকেই 'Sublime' তত্ত্বের দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

মধ্যযুগ পেরিয়ে এসে রেনেসাঁসের প্রভাব দেখা দিল ইতালীয় ও ইংরেজি সমালোচনার জগতে। রেনেসাঁসের পর ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম স্যার ফিলিপ সিডনি (১৫৫৪-১৫৮৬)। সিডনির পূর্বে পিউরিটান গোষ্ঠী কাব্য, নাট্যসহ সমস্ত ধরণের আমোদ-প্রমোদের বিরোধী। স্টিফেন গসন নামে জনৈক পিউরিটান 'The School of Abuse' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে গসন কাব্য এবং সাহিত্য-শিল্পকে কাঠগড়ায় তুলে মন্তব্য করেন সেগুলি ধর্ম এবং পৌরুষের পক্ষে হানিকর। অনেকটা প্লেটোর মতোই উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেছেন কাব্য, নাটক ও সংগীতের উদ্দেশ্য মানুষকে নির্বীর্য ও নাস্তিক করে তোলা।

গসন তাঁর গ্রন্থখানি সিডনিকে উৎসর্গ করেন কিন্তু সিডনি গসনের তীব্র বিরোধিতা করে কাব্যের পক্ষই সমর্থন করেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত পাওয়া যাবে 'An Apology for Poetry'তে। সিডনির মতে, কবি শুধু বাস্তবের প্রতিচ্ছবিই আঁকেন না। তিনি স্বাধীন স্রষ্টা। জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক সকলেই প্রকৃতির জগতের অধিবাসী কিন্তু কবিই একমাত্র প্রকৃতির জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। অ্যারিস্টটলও বলেছিলেন, কবি নিছক অনুকরণকারী নয়, তিনি স্রষ্টা। সিডনি তার থেকেও আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন, স্বয়ং বিধাতার চেয়েও কবি বড়ো কারণ বিধাতা জগৎ সৃষ্টি করেছেন মেপে মেপে। কিন্তু কবি ঔদার্যের প্রতীক। তাই তাঁর রচনায় বিশ্ব সুন্দরতর ও মহত্তর হয়ে উঠেছে। সিডনির এই মতের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে ভারতীয় মতবাদ, যেখানে বলা হয়েছে "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ/যথা বৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে"(অগ্নিপুরাণ, ১০/৩৪৫) অর্থাৎ অপার কাব্যজগতের প্রজাপতি ব্রহ্মা হচ্ছেন কবি নিজে। এই বিশ্ব তাঁর কাছে যেমন রুচিকর মনে হয়, তিনি তেমনভাবে বিশ্বকে সৃষ্টি করে নেন। এ কথা বললেও সিডনি কাব্যের উদ্দেশ্য হিসেবে নীতিবাদকে গভীরভাবে মেনেছেন।

‘Defense of Poesie’ সহ অন্যান্য পুস্তিকাতেও তিনি কাব্যের উদ্দেশ্য হিসেবে আনন্দবর্ধনের পাশাপাশি নীতিশিক্ষাকেও রেখেছেন। তাঁর কথায়, শুধু ছন্দোবদ্ধ রচনাই কাব্য নয়, ভালোমন্দের রূপ নির্মিতি ও তার দ্বারা আনন্দময় শিক্ষা প্রচার সৎ কাব্যে ফুটে ওঠা চাই।

Restoration তথা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগে সমালোচক জন ড্রাইডেন (১৬৩১-১৭০০) ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচনার জগতে নিও-ক্লাসিসিজমের প্রধান কাণ্ডারি। তাঁকে কেউ কেউ আধুনিক ইংরেজি সমালোচনার জনক বলেছেন। ফরাসি সমালোচকদের দ্বারা তিনি বেশ কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৬৬৮তে প্রকাশিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ ‘Essay of Dramatic Poesy’ কথোপকথনের আঙ্গিকে লেখা সাহিত্য সমালোচনার এক উৎকৃষ্ট দলিল। ফরাসি ও ইংরেজি নাটকের তুলনামূলক পর্যালোচনাই ছিল এই dialogueধর্মী রচনার বিষয়। এই ধারারই আরও একজন প্রখ্যাত নাট্যকার ও সমালোচক বেন জনসন (১৫৭২-১৬৩৭)। সুষমা ও পরিমিতিকেই সাহিত্য সমালোচনার প্রধান মানদণ্ড হিসেবে তিনি প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করেছেন। রেস্টোরেশন পরবর্তী ‘অগাস্টান যুগ’এর নিও-ক্লাসিস্ট ধারার অন্য দুজন প্রখ্যাত সমালোচক হলেন আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) ও স্যামুয়েল জনসন (১৭০৯-১৭৮৪)। পোপের লেখা ‘An Essay on criticism’ বইতে ধ্রুপদী সাহিত্যের নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলার সূত্রগুলি পুনর্জ্ঞাপিত হয়েছে। স্যামুয়েল জনসন মানবপ্রকৃতির রূপায়নে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও নীতিবাগীশতা ও ধ্রুপদীয়ানার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর সমালোচনার মূল কথা। দেখা যাচ্ছে, পরিমিতি, রচনার শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতি ও নৈতিকতাবোধ নিও-ক্লাসিসিজমের মূল চরিত্র।

ক্লাসিক ও নিও-ক্লাসিক সমালোচনার মানদণ্ডকে সূত্রাকারে সাজালে যা পাই তা হল, প্রথমত, সাহিত্য হল জগৎ সংসারের শিল্পিত অনুকরণ। বহিপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র সেই অনুকরণের বিষয়। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য একটি সচেতন নির্মাণপদ্ধতি। এই নির্মাণ যুক্তি ও কৌশল আশ্রয়ী। বাগবিধি, অলংকৃত বাক্য, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি সহায়ে সাহিত্যিক তার নির্মাণকর্মকে দর্শক ও পাঠকের মনোগ্রাহী করে তোলেন। তৃতীয়ত, সত্য প্রচার ক্লাসিক সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য।এটি যে শুধুমাত্র ঘটনার সত্য হবে তা নয়, ঘটনার অন্তর্নিহিত মর্মসত্যও হতে পারে। সাহিত্যিক মোটের ওপর বাস্তবনিষ্ঠ হবেন। চতুর্থত, নীতিবাদ ক্লাসিক সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজকল্যান ও সামাজিক উপযোগবাদের সঙ্গে ক্লাসিক সমালোচনার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু প্রবন্ধে (যেমন ‘সাহিত্যের তাৎপর্য, ‘সাহিত্যের বিচারক) সাহিত্যসৃষ্টিকে বিশ্বসৃষ্টির অনুকরণ বলেছেন। সেখানে তাঁর চিন্তা ক্লাসিক মতানুসারী।

ক্লাসিসিজমের বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় জেগে ওঠে রোমান্টিসিজম। ১৭৭০ থেকে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপের সর্বত্র সাহিত্যে ও শিল্পে রোমান্টিসিজমের প্রসার ঘটে। সেখান

থেকে তা মোটামুটিভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তবে একথাও ঠিক রোমান্টিক আন্দোলন সমগ্র ইউরোপ জুড়ে একই সময়ে দানা বেঁধে ওঠেনি। এর অর্থও সব জায়গায় সমান নয়, বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে এটি নানা বিচিত্র রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও রোমান্টিক আন্দোলনের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যরূপে মোটামুটিভাবে যা নির্দেশ করা যায় তা নিম্নরূপ:

> A literary movement, and profound shift in sensibility, which took place in Britain and throughout Europe roughly between 1770 and 1848. Intellectually it marked a violent reaction to the enlightment. Politically it was inspired by the revolutions in America and France...Emotionally it expressed an extreme assertion of the self and the value of individual experience...together with the sense of infinite and transcendental. Socially it championed progressive causes...The stylistic keynote of Romanticism is intensity, and its watchword is 'Imagination'.[৩]

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে একইসঙ্গে রোমান্টিকতার ধারণা অনুভূত হতে শুরু করেছিল, তবু এই ব্যাপারে প্রথমেই বলতে হবে জার্মান দার্শনিকদের কথা। শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়—এ.ডবলু শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) এবং তাঁর ভাই ফ্রিডরিক শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯)কে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যাঁদের লেখায় রোমান্টিসিজমের নানা লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে। কল্পনার বিস্তার, অসীমের প্রতি কৌতূহল ও নিজস্ব উপলব্ধির পূর্ণতাবোধ তাঁদের রচনায় দেখা দিতে থাকে। ফ্রান্সে মাদাম ডি স্তাল (Madam De Stael) কঠোরভাবে ক্লাসিসিজমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ইংল্যান্ডে রোমান্টিসিজমের আন্দোলন প্রত্যক্ষ গতি পেয়েছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) ও কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪) এর কবিতা সংকলন 'লিরিকাল ব্যালাডস'এর প্রকাশের সময় থেকে। কিন্তু তারও আগে স্কটল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডের দুজন কবির রচনায় রোমান্টিসিজমের লক্ষণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। এঁরা হলেন রবার্ট বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬) ও উইলিয়াম ব্লেক (১৭৫৭-১৮২৭)। এঁদের রচনায় স্কটল্যান্ড ও আয়ার্ল্যান্ডের স্থানীয় প্রকৃতি, সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন প্রাঞ্জল স্থানীয় ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হল। যা ক্লাসিসিজমের সুদূরপ্রসারী আবহে কিছুটা ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়। সেই ধারাকেই আরও প্রতিষ্ঠা দেয় লিরিকাল ব্যালাডস। কবিতায় নীতি, তত্ত্ব ও আভিজাত্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আত্মমগ্ন হৃদয়ানুভব এবং নিজস্ব বোধের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করাই রোমান্টিক সাহিত্যের লক্ষণ বলে ঘোষিত হয়। এরপর বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), শেলি (১৭৯২-১৮২২) ও কিটস (১৭৯৫-১৮২১)এর রচনায় ইংল্যান্ডের

রোমান্টিক আন্দোলন আরও বেশি সুদৃঢ় ভিত্তি পায়। রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বে ব্যক্তি-হৃদয়ের নিজস্বতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তাই চরম মূল্য পেয়েছে। আরোপিত অনুশাসনের শেকল থেকে মুক্তিই এই কাব্যতত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো দান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যমননের পরিমণ্ডল অনেকটাই গড়ে উঠেছিল রোমান্টিক সাহিত্যের পরিমণ্ডলেই। তাঁর নিজের কথায়—

> আমরা প্রথম যখন ইংরেজি সাহিত্যের সংস্রবে আসি তখন সেটা ছিল ওদের প্রসারণের যুগ। য়ুরোপে ফরাসী বিপ্লব মানুষের চিত্তকে যে নাড়া দিয়েছিল সে ছিল বেড়া ভাঙবার নাড়া।...আমাদের সৌভাগ্য এই যে, ঠিক সেই সময়েই য়ুরোপের আহ্বান আমাদের কানে এসে পৌঁছল—তার মধ্যে ছিল সর্ব্বমানবের মুক্তির বাণী। আমাদের তো সাড়া দিতে দেরি হয়নি। সেই আনন্দে আমাদেরও মনে নবসৃষ্টির প্রেরণা এল।[৪]

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইংরেজি সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সেই আবাল্য চেনা পরিমণ্ডল থেকে এতখানি বদলে গেল যে সেই বদলে যাওয়া ইংরেজি সাহিত্যকে তিনি আর ততখানি আপন করতে পারেননি। সাহিত্য বা আর্টের যা নিত্যত্বের লক্ষণ বিশ শতক উত্তীর্ণ ইংরেজি সাহিত্য তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল। পোস্ট রোমান্টিক ইংরেজি সাহিত্যে মানুষের আস্তিক্যবোধ, প্রকৃতি-পারম্য ও সৌন্দর্যবোধ বিপুলভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হল। যাকে টি.এস.এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ব্যাখ্যা করলেন নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্ব এনে। রোমান্টিক সাহিত্যে বিষয়ের সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মতা আর ততখানি থাকতে পারে না। বিশ্বকে আধুনিক কবি দেখবেন নিস্পৃহ, তদগত দৃষ্টিতে। তবেই তৈরি হবে যথার্থ শিল্পরূপ। এলিয়টের কথায়— "Poetry is not a turning loose of emotion but the escape from emotion ; it is not the expression of personality, but an escape from personality."[৫] 'আধুনিক কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একইভাবে আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের যুগলক্ষণ নির্দেশ করে বলেছেন, বিষয়ী নয় বিষয়ের আত্মতাই এর স্ব-ভাব। সেই সঙ্গে বলেছেন: "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্ব্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।"[৬] বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আধুনিক ইংরেজি কবিতার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ এভাবেই এলিয়টের সমপন্থী।

রসতাত্ত্বিক হিসেবে ইউরোপের দুজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক লিও টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) ও বেনেদেত্তো ক্রোচের (১৮৬৬-১৯৫২) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন।[৭] টলস্টয় সমালোচনা-সাহিত্যে 'Theory of infection' বা সংক্রমণতত্ত্বের এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসেন, যা বিংশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপে বেশ

আলোড়ন তোলে। তাঁর বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক বই ‘What is Art’ বইতে তিনি সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে সংক্রমণ বা Trasmission এর ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায়—

> not only infection is a sure sign of art, but the degree of infectiousness is also the sole measure of excellence in art...And the degree of the infectiousness of art depends on three conditions:--
>
> (1)On the greater or lesser individuality of the feeling transmitted; (2) on the greater or lesser clearness with which the feeling is transmitted; (3) on the sincerity of the artist, i.e. on the greater or lesser force with which the artist himself feels the emotion he transmits.[৮]

অর্থাৎ অনুভবের স্বাতন্ত্র্য, স্পষ্ট ও ঋজু প্রকাশভঙ্গি ও স্রষ্টার আন্তরিকতা—এই তিনটি মাপকাঠিতে সাহিত্য ও শিল্পের আবেদন ভোক্তার মনে সঞ্চারিত হয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে এই সঞ্চরণধর্মের কথা এত স্পষ্ট করে না হলেও রবীন্দ্রনাথও বলেছেন। ‘সাহিত্যের সামগ্রী’ প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য—

> রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায় ; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।...ভাব মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্তি।...যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।[৯]

টলস্টয় যাকে ‘transmission’ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকেই সঞ্চরণধর্ম বলেছেন। যে-সব গুণে সাহিত্য স্রষ্টার মনোভূমি থেকে পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়, সেগুলিকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামগ্রী বলেছেন।

টলস্টয় সমালোচক হিসেবে ছিলেন ভীষণভাবে নীতিবাদী। ক্রিশ্চিয়ান আর্টকেই তিনি বিশুদ্ধতম আর্টের মর্যাদা দিয়েছিলেন ; ঈশ্বরমুখীনতা ও মানব কল্যাণই যার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁর গ্রন্থে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন:

> The art of the present age must transmit only the progressive religious emotions of this age, those that related to the universal brotherhood of man.[১০]

টলস্টয় মনে করেন, কয়েকটি ব্যতীত এ যুগের উপন্যাস, চিত্র ও ভাস্কর্য পাপের পঙ্কিলতায় পূর্ণ। বর্তমানে আর্ট নামে যা প্রচলিত তা মানব জাতির উন্নতির সহায়ক না হয়ে সৎ-প্রকৃতি সমূহের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১১] তিনি অভিজাতদের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি। সমর্থন করেছেন চিরন্তন বিশ্বজনীন সাহিত্যকে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মতো অতখানি গোঁড়া নন ঠিকই, তবুও এক বিশেষ মত ও পথের মতাদর্শভিত্তিক সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনাস্থা ছিল। ত্রিশের দশকের নতুন ধারার 'আধুনিক' নামধারী কবি ও লেখকদের সাহিত্যরুচির সঙ্গে তাঁর অমিল হয়েছিল। তিনিও কোনও নির্দিষ্ট সময় বা দল বা মতভিত্তিক সাহিত্য অপেক্ষা চিরন্তন বিশ্বজনীন সাহিত্যকেই ধ্রুব বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এদিক থেকে উভয়ের চিন্তায় কিছু সাদৃশ্য ছিল।

ইতালীয় মণীষী বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাধারার বেশ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রোচের ধারণায়, শিল্পসৃষ্টির মূল কথা হল 'প্রতিভান'(Intuition)। শিল্পী তাঁর প্রতিভানকেই শিল্পাকারে প্রকাশ করে থাকেন। শিল্পের সবচেয়ে বড়ো কথাই হচ্ছে 'প্রকাশ'; "Every true intuition or representation is also expression."[১২]

সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী নীতির অধীন ; এ কথা মেনে নিয়েও ক্রোচে শিল্পের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে পরিহার করেছেন। শিল্পে সুন্দর-অসুন্দর বাস্তবের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। ক্রোচের মতে, যার প্রকাশ সুন্দর নয়, তাই হল অসুন্দর। সৌন্দর্যের মধ্যে আছে ঐক্য আর অসুন্দরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আর বিশ্লিষ্টতা। সুন্দরের মধ্যে থাকবে সমগ্রতার পরিচয়। [টীকা-পৃ-১৩৯] রবীন্দ্রনাথও শিল্পে এই সমগ্রতার ধারণার সমর্থক। তাঁর কথায়—

> রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময় টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে তার বিচার করা চলে না—অন্তত সেটা আর্টের বিষয় নয়।[১৩]

গোলাপের প্রত্যেকটি পাপড়িকে বিশ্লিষ্ট করে যাচাই করা উদ্ভিদতত্ত্বের বিষয় হতে পারে, শিল্পের নয়। গোলাপ ফুলের যে সৌন্দর্য তা এর প্রতিটি অংশের সুষম মিলনের ঐক্য, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাইই আমাদের মন ভোলায়। ক্রোচেও সেই কথাই বলেন। অংশসমূহ বিশ্লিষ্ট বলে সুন্দর নয়, সমগ্রের সঙ্গে সমন্বিত হলে তা হয়ে ওঠে সুন্দর।

ক্রোচের মতে, শিল্পীর প্রতিভান বা Intuition প্রকাশ পায় উপাদানকে অবলম্বন করে। এই উপাদান যদি বিশুদ্ধ ধারণাত্মক জ্ঞান (Concept) হয়, তবে তার সঙ্গে আর্টের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে উপাদান যদি আবেগপ্রধান হয় বা কোনও না কোনও আবেগকে অবলম্বন করে তবে নিশ্চিতভাবেই তা একটি রূপের কাঠামো (Form) তৈরি করে। এই আবেগদীপ্ত 'রূপবন্ধ'ই মানুষের নান্দনিক বোধকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। ক্রোচের কথায়, "The aesthetic fact, therefore is form and nothing but form."[১৪] অর্থাৎ ক্রোচের সাহিত্যতত্ত্বে বিষয় অপেক্ষা রূপকৌশলের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে বেশি। একইভাবে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথও আর্টে বিষয়গৌরব অপেক্ষা রূপদক্ষতাকে মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন---"রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যে নূতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয়।"[১৫] দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উদাহরণ টেনে বলেছেন, মধুসূদনের প্রতিভা আত্মপ্রকাশের জন্য একটা নতুন রূপের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। রূপটিকে মনের মতো গাম্ভীর্য দেবেন বলেই তিনি বেছে বেছে ধ্বনিবান সব শব্দ জড়ো করেছিলেন। যদি বিষয়ের গাম্ভীর্যই যথেষ্ট হত, তবে এর কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

এইভাবে বিচার করলে পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে একমাত্র ক্রোচের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার প্রভূত সাদৃশ্য চোখে পড়বে।

এর পাশাপাশি ভারতীয় বা প্রাচ্য নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তার সাদৃশ্য বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ না করে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মূল দুই প্রস্থান ধ্বনিবাদ ও রসবাদ শেষাবধি আনন্দবাদেই পর্যবসিত হয়েছে। শিল্প বা সাহিত্যনিষ্পন্ন রসানুভূতি বিশুদ্ধ নির্বিকল্প আনন্দানুভূতি ভিন্ন আর কিছু নয়। ব্রহ্মস্বাদসহোদর রসানন্দে পৌঁছনোই ভারতীয় চিন্তায় সাহিত্য বা শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য হিসেবে এই আনন্দবাদকেই স্বীকার করেছেন। "আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের কোন উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।"[১৬] এদিক থেকে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের সাদৃশ্যে রবীন্দ্রনাথকে আনন্দবাদী বলা যেতে পারে।

(২)

এবারে রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ও সূত্রগুলিকে একত্রে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই যা বলা দরকার, একজন সৃজনশীল স্রষ্টার মতোই সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের সন্ধিস্থলে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল। দেশ তথা পৃথিবীর প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই সময়পর্বে নানা ভাবদ্বন্দ্বের সংঘাত ও সম্মিলনে বড়ো বড়ো পরিবর্তনের ঢেউ জেগে উঠেছিল। যা আর পাঁচজন বুদ্ধিজীবী মানুষের মতো রবীন্দ্রমননকেও নানাভাবে আলোড়িত করে। সাহিত্য-সমালোচনাও এই বৃত্তের বাইরে নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তায় যে পরিবর্তন নানা পর্বে ধরা পড়েছে তার অন্যতম নির্ধারক 'সময়'। সংস্কৃতিমনস্ক ঠাকুরপরিবারে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম জীবন আরম্ভ করেছিলেন তখন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্যের মৌতাত শেষ হয়ে গীতিকাব্যের সুরভি জেগে উঠতে শুরু করেছে। কাদম্বরী দেবীসহ কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সঙ্গীরা সকলেই গীতিপ্রাণতার রসে আচ্ছন্ন। এই গীতিপ্রাণতা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনকেও জারিত করায় 'মেঘনাদবধ'এর মতো উৎকৃষ্ট মহাকাব্যকে তিনি নিন্দাবাদ করেছিলেন। প্রাচীন আর্ষ মহাকাব্যের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নতুন কালের নতুন চেতনার এই কাব্যের প্রতি সেদিনের কিশোর-সমালোচক সুবিচার করতে পারেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁর এই অভিমত বদলে যায়, যখন প্রাচীন মহাকাব্যের আদর্শে নয়, নবযুগ চেতনার প্রেক্ষাপটে তিনি এই কাব্যকে উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ১৯০১ থেকে ১৯০৭ অর্থাৎ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়পর্বটি নানা দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শে রবীন্দ্রনাথের মন ও বিশ্বাস গভীরভাবে নিমগ্ন হয়েছিল। সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনায় বিশেষ করে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত সমালোচনাগুলিতে তার ছাপ খুব স্পষ্ট। এই সময়ের রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষত মহাকাব্য এবং কালিদাসের কাব্য-নাটকাদিতে সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলবোধের এক গভীর পরিণাম-সামঞ্জস্যের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 'কুমারসম্ভব' কাব্যে উমা-মহেশ্বরের প্রণয় অপেক্ষা তপস্যা এবং মিলন অপেক্ষা কুমারজন্মকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন কারণ কুমারজন্মের দ্বারাই তারকাসুর নিধনের ফলস্বরূপ বিশ্বকল্যাণের উদ্বোধন। উমা-মহেশ্বরের প্রণয়, উমার প্রেমতপস্যা এই সব কিছুই যেন সেই মাঙ্গলিক কর্মের প্রেক্ষাপটকেই রচনা করেছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করছিলেন। একইভাবে 'রামায়ণ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র, এই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য রাম-সীতার দাম্পত্যপ্রেমকেই উজ্জ্বলতররূপে দেখানো। অর্থাৎ এই পর্বে নরনারীর প্রেমের নান্দনিক সৌন্দর্য অপেক্ষাও তাদের প্রেমের গৃহনীড়সন্ধানী কল্যাণী রূপটিকেই শাশ্বত ভারতবর্ষের আদর্শে মণ্ডিত করে রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছেন। সমালোচনার এই বিশিষ্ট অভিমুখ সমসাময়িক রবীন্দ্রমননকেই যেন প্রতিফলিত করছে, এমন বলা যায়।

শুধু চিন্তাধারাই নয়, সাহিত্যের মূল আদর্শও পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। তরুণ সমালোচক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পর্বে যে সাহিত্যভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন তাতে ধ্রুপদী রোমান্টিক আইডিয়ার অনুসারী সৌন্দর্যতত্ত্বই ছিল প্রধান। এই সময়ে সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্য বা

আর্টের মূল লক্ষ্য বলে স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভারতী' পর্বের প্রবন্ধ সংকলন 'আলোচনা' বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> কবিদের কী কাজ, এইবার দেখা যাইতেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মতো কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না।...অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—[১৭]

শুধুমাত্র এখানেই নয়, সমসাময়িক অন্যান্য লেখাতেও রবীন্দ্রনাথ একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত অপর একটি প্রবন্ধ 'বাঙ্গালী কবি নয়' তে কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাব্যে সৌন্দর্যবোধের হানি দেখে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় লেখেন—"কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদগার করিতেছে, ইহাতে এমন একটি পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্য জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত, সংযত , মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদগীরণ কোনমতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না।"[১৮] মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ যে স্বাধীন কল্পনার বলে এই চিত্রকল্পটি সংযোজন করেননি; বৃহদ্ধর্মপুরাণের একটি বহুকাল-প্রচলিত সিদ্ধ রূপকল্পকেই যে কবিকঙ্কণ এইস্থানে কাহিনির ঐতিহ্য অনুসারে গ্রহণ করেছেন মাত্র, এ কথা বোধহয় সেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনে জাগেনি। সে যাই হোক, এই পর্বে সৌন্দর্যসৃষ্টিই যে সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য এই মতেই রবীন্দ্রনাথ আস্থা রেখেছিলেন। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাধারায় এক বড়ো পরিবর্তন আসে। তিনি উপলব্ধি করেন যে আমাদের সমাজে সৌন্দর্যবোধের যে মাপকাঠি আছে, তার সঙ্গে সাহিত্যের সৌন্দর্য পুরোপুরি মেলে না। শেকসপিয়রের ফলস্টাফ, মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভাঁড়ু দত্ত প্রচলিত আদর্শে সুন্দর নয়। কিন্তু পাঠকের দৃষ্টিতে, রসের বিচারে এদের সুন্দর না বলে উপায় নেই। তাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে বলতে দেখি—

> একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলাম, সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ...তখন মনে এল, এতদিন যা উল্টো করে বলছিলুম তাই সোজা করে বলা দরকার। বলতুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুতঃ বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মানুষ সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[১৯]

অর্থাৎ পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, সৌন্দর্য নয়, আনন্দই সাহিত্যের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তায় প্রায় প্যারাডাইম শিফটিং এর মতোই এই বদল তাঁর সাহিত্যবিচারের অভিমুখকেই বদলে দিয়েছিল। এইভাবে পর্ব থেকে পর্বান্তরে রবীন্দ্রমননের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা ও সমালোচনাদর্শের নানা বিবর্তন ঘটেছে।

এবার রবীন্দ্রনাথকৃত সাহিত্য-সমালোচনার মূল সূত্রগুলিকে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, "সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।"[২০] সেইসঙ্গে তিনি এও বলেছেন, সাহিত্যের ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক কিংবা তাত্ত্বিক বিচারও হতে পারে, সেরকম বিচারের শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ যাঁরা সাহিত্যকর্মকে কেটে ছিঁড়ে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে চান, তাদের পন্থাকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার আদর্শ বলে স্বীকার করেননি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে রস।"[২১] সাহিত্য তথা আর্টের মূল উদ্দেশ্যই হল সেই একের স্বাদ, সেই অনির্বচনীয়ের স্বাদকে পরিবেশন করা। খড়-মাটি-বাঁশ দিয়ে যেমন প্রতিমা নির্মিত, রক্ত-মাংস-অস্থি দিয়ে মানবদেহ ঠিক তেমনই নানা ভাবগত উপাদান সংযুক্ত হয়ে লেখকের প্রতিভার যোগে নির্মিত হয় সাহিত্য। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করলে যেমন মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না ঠিক তেমনই সাহিত্যের উপাদানগুলিকে বিশ্লিষ্ট করলেই সৃষ্টিরহস্যকে বোঝা যায় না। সাহিত্যের উপাদানগুলিকে একত্রে জড়ো করলেই কি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে? উপাদানগুলি একত্রিত হওয়ার পর সাহিত্যিকের প্রতিভার যাদুস্পর্শে সেগুলি অখণ্ড সমগ্রতার সুষমা নিয়ে অভিব্যক্ত হয়। এই অখণ্ড সুষমাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'রূপরহস্য'। তাঁর কথায়—

> কারণ উপাদানকে একত্র করার দ্বারা সৃষ্টি হয় না, সমগ্র সৃষ্টি আপন সমগ্র অংশের চেয়ে অনেক বেশি। সেই বেশিটুকু পরিমাণগত নয়। তাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, সেটা হল রূপরহস্য, সকল সৃষ্টির মূলে প্রচ্ছন্ন। প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে সেটাই হল অদ্বৈত, বহুর মধ্যে সে ব্যাপ্ত অথচ বহুর দ্বারা তার পরিমাপ হয় না। সে-সকল অর্থাৎ তার মধ্যে সমস্ত অংশ আছে, তবু সে নিষ্কল, তাকে অংশে খণ্ডিত করলেই সে থাকে না। অর্থাৎ সাহিত্যে সমগ্রকে সমগ্র দৃষ্টি দিয়েই দেখতে হবে।[২২]

পশ্চিমী সমালোচকেরা খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মনোভাব নিয়ে শিল্প-সাহিত্যকে বিচার করতে চান বলেই হয়তো সমগ্রকে ছেড়ে অংশের প্রতি তাঁদের নজর বেশি। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিসিসের তত্ত্ব এ দেশের সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে এভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসহযোগে বিশ্লেষণ করাকে সমর্থন

করেননি। কারণ ফ্রয়েডীয় সাইকো-অ্যানালিসিস বলে মানুষের সমস্ত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির পেছনে অদৃশ্য হাতে সুতো চালনা করছে 'লিপিডো' নামক এক দুর্বার শক্তি। কিন্তু মানুষের দ্বারা রচিত শিল্প-সাহিত্যকে শুদ্ধমাত্র লিবিডোকেন্দ্রিক বলে দাগিয়ে দিলে অথবা লিপিডো বা যৌনশক্তিকে মানুষের সমগ্র সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মানুষের সমগ্রতার পরিচয় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাই এই পদ্ধতির প্রতি আপত্তি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আজকাল সাইকো-অ্যানালিসিসের বুলি অনেকের মনকে পেয়ে বসে।... মানুষের চিত্তের উপকরণে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে—কাম, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। ছিন্ন করে দেখলে যে বস্তুপরিচয় পাওয়া যায়, সম্মিলিত আকারে তা পাওয়া যায় না। প্রবৃত্তিগুলির গূঢ় অস্তিত্ব দ্বারা নয়, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভাবনীয় যোগসাধনের দ্বারা চরিত্রের বিকাশ। সেই যোগের রহস্যকে আজকাল অংশের বিশ্লেষণ লঙ্ঘন করবার উপক্রম করছে।"[২৩]

অবশ্য সাহিত্যের বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা পাঠক বা সাহিত্যের উপভোক্তার পক্ষে অনাবশ্যক। তাজমহলের পাথরের মাপজোক বা পূর্তবিদ্যাবিষয়ক খুঁটিনাটি ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিকের জানা প্রয়োজন কিন্তু যে সাধারণ রসভোক্তা তাজমহলের মধ্যে বিরহী-সম্রাট সাজাহানের ধ্যান ও স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে চান, তার কাছে উক্ত তথ্যাদি অনাবশ্যক। তেমনই যিনি পাঠক তিনি সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দ লাভ করেই খুশি কিন্তু সমালোচক শুধু সেখানেই থামেন না। তাঁর মনে রসভোগের পাশাপাশি রস-বিশ্লেষণের বৃত্তিও জেগে ওঠে। তিনি শুধু আনন্দ লাভ করেই তৃপ্ত নন, সেই আনন্দবোধ কেমন করে সৃজিত হল, তার অন্তররহস্যকে উদঘাটন করে দেখানোই সমালোচকের কর্তব্য। সাহিত্যের রসগ্রহণে সমালোচকের ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন সমালোচক রচনাকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিচার করবে, তবেই সমগ্রতার ঐক্যের মধ্যে যে রস রয়েছে তা প্রকাশ পাবে। আসল কথা, বিশ্লেষণের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে মানবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মানবদেহের লাবণ্য প্রকাশ পায় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দেহের সঙ্গে অন্বিত করে দেখলেই সেই লাবণ্য ফুটে ওঠে। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমালোচনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায় এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন, বিশ্লেষণ নয় ; ঐক্য, সমগ্রতা ও সংশ্লেষণই হচ্ছে শিল্প উপভোগের একমাত্র পথ। রাজা অশোকের কটা হাতি ছিল, টোডরমলের ক'জন নাতি ছিল এইসব তথ্যের উপরে ইতিহাস নির্ভর করলেও অশোক ও টোডরমলের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র তার উপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণেই বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বা তাত্ত্বিক বিচারের শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত, সাহিত্যের যথার্থ বিচারক হচ্ছেন কাল বা সময়। রামায়ণ-মহাভারতের মতোই কাল থেকে কালান্তরে যে সাহিত্য মানুষের মনে একইরকমভাবে আবেদন রাখতে সক্ষম, সাহিত্যের নিত্যলক্ষণের দাবি নিয়ে যা দীর্ঘকালস্থায়ী, তাই-ই যথার্থ সাহিত্য। সমকালীন বিচারকগণ তার স্বরূপ নির্ণয়ে ব্যর্থ হলেও সাহিত্যের ইতিহাসে তা বেঁচে থাকে ও ভবিষ্যতে একদিন তার মহিমা নিশ্চিতভাবেই প্রকাশ পায়। কিন্তু সাহিত্যবিচারে মহাকালের ওপর পূর্ণ নির্ভর করতে হলে বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেবে। “আপীলের শেষ মীমাংসা অতি দীর্ঘকালসাপেক্ষ ; ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।”[২৪] এই ‘মোটামুটি বিচার’ যিনি করবেন, তিনিই উপস্থিতকালের বিচারক এবং ‘অবিচার পাইলেও উপায় নেই’ কেননা উপস্থিতকালের বিচারকশ্রেণির মধ্যে ‘ব্যবসাদার’ বিচারকেরাও আছেন। যাঁদের যথার্থ সমালোচনার শিক্ষা-দীক্ষা নেই, সাহিত্যবোধ নেই, সহজাত বিশ্লেষণ শক্তি ও রসজ্ঞানও নেই অথচ যাঁরা তাল ঠুকে বলেন “আমিই সেই রসিক”[২৫] ; বিশেষ দল ও মতের প্রতিভূ হয়ে সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিষয়ে যাঁরা ফতোয়া জারি করেন তাঁরা কখনোই যথার্থ সাহিত্যবিচারের অধিকারী হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণির সমালোচকদের বলেছেন ‘ব্যবসাদার বিচারক’, যারা “সারস্বত রাজপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।”[২৬] এর বিপরীতে আর এক শ্রেণির সমালোচক আছেন যাঁরা স্বভাববশে এবং শিক্ষার দ্বারা মার্জিত বুদ্ধির অধিকারী হয়ে যথার্থ রসবিচারের দক্ষতা অর্জন করেছেন। যা ক্ষণিক, যা সংকীর্ণ তা এদের ফাঁকি দিতে পারে না, যা ধ্রুব ও চিরন্তন এক মুহূর্তেই তাঁরা তা চিনতে পারেন। “সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে ও শিক্ষায় তাঁহারা সমকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।”[২৭] এই দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত বিচারকদেরই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সাহিত্যের সমজদার বলেছেন। সাহিত্য-বিচারে এঁদের অবদান ও প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করেছেন।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞানে যেমন প্রমাণই শেষ কথা এবং প্রমাণসাপেক্ষ সত্য বা মিথ্যাই অন্তিম বিচার, সাহিত্যে তা নয়। এখানে ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগাই হল শেষ কথা। এখন একজনের যা ভালো লাগে, অপরজনের তা ভালো লাগে না আবার এক যুগে যা ভালো লাগে পরবর্তী যুগে তা পানসে হয়ে যায়। এর কারণ সাহিত্যে ভালো-লাগা বা না-লাগা রুচিবোধের বিষয় আর রুচি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রকম। তবে এক্ষেত্রে সমালোচকের ভূমিকা কী? এর উত্তরে বলা যেতে পারে রুচির ভিন্নতা থাকলেও বা সাহিত্যের আদর্শ যুগভেদে বদলে গেলেও সাহিত্যের এমন কতকগুলি নিত্যমূল্য আছে, যুগভেদে শেয়ার মার্কেটের মতো যার দাম ওঠানামা করে না।

প্রকৃত সমালোচক সাহিত্যের এই নিত্যলক্ষণগুলিকে তুলে ধরে পাঠরুচিকে নির্মাণ করবেন যার দ্বারা মার্জিতবুদ্ধি পাঠকের মনোদর্পণে উৎকৃষ্ট সাহিত্য যথার্থভাবেই ধরা দেবে।

চতুর্থত, রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই সাহিত্যই উৎকৃষ্ট যা যুগোত্তীর্ণ। সমালোচককে লক্ষ রাখতে হবে সাহিত্য কেবলমাত্র যুগের দ্বারা আবিষ্ট কিনা। সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণের অভিপ্রায়ে একটি বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, "রচনার বিষয়টি কালোচিত, যুগোচিত, এইটেই যাঁর একমাত্র গৌরব তিনি উঁচুদরের মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।"[২৮] এ কথার অর্থ সম্ভবত এই বর্তমান যুগের হুযুগে যা একান্ত সত্য বলে অনুভূত হচ্ছে, কালাবসানে তার চিহ্নমাত্রও থাকবে না। যা কিছু মানুষের ও মানবসমাজের নিত্য লক্ষণের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ নয়, ভাবীকালের সম্মার্জনীর আঘাতে তা ধুলোর মতো বিলীন হয়ে যাবে। বর্তমানকালের উত্তেজক সাময়িক ঘটনা অনেক সময়েই লোকরুচির দ্বারা প্রশংসিত হয় কিন্তু জনতার হাততালি অনেক সময়েই সাহিত্যকে নিত্যমূল্যে অভিষিক্ত করতে পারে না। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' পড়ে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলিই তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন। [দ্রষ্টব্যঃ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৩৫৬ ব, কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, পৃ-৯৭।] এই একই কারণে জনতা জনার্দনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও তিনি তাঁদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করতে পারেননি। একটি বক্তৃতায় বলেছেন,

> জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিত দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি—সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না।[২৯]

তাই দেখা যায় অনেক সময়েই যুগরুচি অথবা যুগের উত্তেজনা নিয়ে লেখা কাব্য বা গল্প বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করলেও পরবর্তীকালে সেইসব বই কীটদষ্ট ভবিতব্যকেই মেনে নেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের স্থির সিদ্ধান্ত যুগরুচি কবিকে নির্মাণ করে না বরং কবি বা সাহিত্যিক নিজেরাই যুগের নির্মাতা। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিকদের এই বলে সতর্ক করেছেন যে যুগপ্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁরা যেন নিজেদের সাহিত্যকে নানা মত ও পথের উলকি পরিয়ে আসরে না নামান। কারণ সাহিত্য মূলত দলছুট ব্যাপার। দল বেঁধে ভালোমন্দ অনেক কাজ হয়েছে ঠিকই

কিন্তু রসসৃষ্টি যার মূল লক্ষ্য তা কোনওদিন দল বেঁধে হয়নি। তবে মত এবং তত্ত্ব সাহিত্যে ঠাঁই পেতে পারে, যদি তা রসসৃষ্টিতে সার্থক হয়।

পঞ্চমত, 'জুবেয়ার' প্রবন্ধে সমালোচকদের কর্তব্য বিষয়ে ফরাসি দার্শনিক জুবেয়ারের বচন উদ্ধৃত করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা তাঁর নিজের কথাও বটে। তিনি বলেছেন,-- "লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য। লেখায় বিশুদ্ধ নিয়ম রক্ষা হইয়াছে কিনা তাহারই খবরদারি করা তাহার ব্যবসাগত কাজ বটে, কিন্তু সেইটেই সবচেয়ে কম দরকারি।"[৩০] অর্থাৎ জুবেয়ারের মতো রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যবিচারে রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেই বড়ো করে দেখেছেন। রসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য হল ভোক্তার আনন্দলাভের ওপরে চরম নির্ভরতা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিষয়ক যে শতাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে ঘুরেফিরে যে কথাটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তা হল, সাহিত্য বা শিল্পকলার মূল লক্ষ্য আনন্দ এবং সে আনন্দ নিত্যস্থায়ী, তাই তা অমৃত। সাহিত্যের উপভোগ অথবা সাহিত্যের বিচার বা সমালোচনা সব কিছুরই চূড়ান্ত লক্ষ্য আনন্দের প্রকাশ, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন চিরদিনই নিঃসন্দিগ্ধ। সুতরাং পাঠক এবং সমালোচক উভয়েই রসভোগের আনন্দকেই অন্বেষণ করেন। এমন অবস্থায় সমালোচকের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? সমালোচক সুসাহিত্যপাঠজনিত আনন্দকেই পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেবেন। যুক্তি, বুদ্ধি বা বিশ্লেষণ নয়, সমালোচক শুধুমাত্র বিস্ময়বিমুগ্ধ আনন্দের বশবর্তী হয়ে গ্রন্থসমালোচনায় হস্তক্ষেপ করবেন এবং সেই আনন্দকেই নানামুখী ব্যাখ্যার দ্বারা পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত করে দেবেন। পাশ্চাত্যে এমন সমালোচনাকে impressionist criticism বলা হয়। বাংলায় একে আমরা বলতে পারি রসবাদী সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের সেরা সমালোচনাগুলি এই গোত্রের এবং তাঁর সমালোচক সত্তাও মূলত এই গোত্রটিকেই স্বীকার করে নিয়েছে। যদিও ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্য ধরণের সমালোচনারও নানা দৃষ্টান্ত আছে ; এই অধ্যায়ের শেষে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

(৩)

সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের নেপথ্যে সমসময়ের সাহিত্য-বিতর্কগুলির গভীর যোগ আছে। উনিশ ও বিশ শতকের নানা সাহিত্যপত্রিকায় কখনও

সাধারণভাবে আবার কখনও রবীন্দ্রনাথেরই কোনও বিশেষ রচনাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের অবতারণা হত, রবীন্দ্রনাথ সেই বিতর্কে প্রতিবাদীপক্ষে মসীযুদ্ধ চালাতেন। সেইসব বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কিত নিজস্ব চিন্তাধারা যেমন প্রকাশ পেত তেমনই এই বিতর্কগুলি রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তা গঠনেও গভীর ভূমিকা নিয়েছিল, দেখতে পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের শেষার্ধে, রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ ও সাহিত্যক্ষেত্রে উদীয়মান, সেই সময়ে 'ভারতী', 'নবজীবন', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্রিকায় যে-সব সাহিত্যতত্ত্বমূলক অথবা সাহিত্যবিচারমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ পেত, তার মধ্যে বেশ কয়েকটির প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ পাল্টা প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলি তাঁর নিজস্ব সাহিত্যবোধের পরিচায়ক। যেমন ১২৮৯ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় (আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায়) অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের মূল কথা হল, আধুনিক কবিদের রচনায় সমাজবিরুদ্ধ ভাবের প্রকাশ দেখে অক্ষয় চৌধুরী ব্যথিত হন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের প্রতিনিধিস্বরূপ 'ভারতী'র পরবর্তী (ভাদ্র) সংখ্যায় 'প্রত্যুত্তর' শিরোনামে এই মতের প্রতিবাদ লেখেন 'শ্রী র' স্বাক্ষরে। এই 'প্রত্যুত্তর'ই পরিমার্জিত হয়ে পরে 'সমালোচনা' বইতে 'সত্যের অংশ' নামে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের মতের প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পুরনো বাংলা সাহিত্যের দুর্বল দিকগুলো উদঘাটিত করে দেখান এবং আধুনিক কবিরা যে প্রাচীনদের তুলনায় হীনকল্প নন, নানা উদাহরণসহ তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন কবিদের গুণগ্রাহী ছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু আধুনিককালে কাব্যের অপকর্ষ ঘটেছে, এই মত তিনি মানতে পারেনি। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরুচির বদল ঘটেছে। এই বদল তাঁর মতে অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীন কবিদের ভাব যেমন একালের কবিদের লেখায় থাকা সম্ভব নয়, তেমন আধুনিক কবিরা যা অনুভব করেন পুরনো সময়ের কবিরা তা ভাবতেই পারতেন না। এই কালে বসে প্রাচীন কালের কবিদের অনুরূপ লিখলে দেশ-কাল ও পাত্রের ব্যভিচার করা হয় বলে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যকে স্বীকার করেও যুগোপযোগী সাহিত্যের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

'বান্ধব' পত্রিকায় (মাঘ ১২৮১) কালীপ্রসন্ন ঘোষের লেখা 'নীরব কবি' ও পরের বছর 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত (পৌষ ১২৮২) 'বাঙ্গালী কবি কেন' প্রবন্ধ দুটির প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

‘ভারতী’ পত্রিকায় (ভাদ্র ১২৮৭) ‘বাঙ্গালী কবি নয়’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ‘বাঙ্গালী কবি কেন’ প্রবন্ধের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ এটি। পরে এই প্রবন্ধটি পরিমার্জিত করে ‘নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি’ শিরোনামে গ্রন্থভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ কথা বলেছেন, যা সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, প্রবল কল্পনা থাকলেই সার্থক কবি হওয়া যায় না। ভালো কাব্য রচনা করতে হলে সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণির কল্পনার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় এটি একটি স্থির সিদ্ধান্ত। পরবর্তীতে ‘বঙ্কিমচন্দ্র’ শীর্ষক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বললেন—

> কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত আমাদের ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের ‘Imagination’ এবং ‘Fancy’র মধ্যেকার তফাৎ মনে করিয়ে দেয়। ১৮১৭ সালে কোলরিজ তাঁর ‘Biographia Literariya’ বইয়ের তেরোতম অধ্যায়ে লেখেন—

> Imagination I consider as an echo of the former, co-existing with the conscious will, yet still as identical with the primary in the kind of its agency, and differing only in the degree, and in the mode of operation. It dissolves, diffuses, dissipates in order to recreate...
>
> The Fancy is indeed no other than a mode of memory emancipated from the order of time and space; while it is blended with and modified by the empirical phenomenon of the will, which we express with the word CHOICE. But equally with the ordinary memory the Fancy must receive all its meterials ready made from the law of association.[৩২]

‘নবজীবন’ পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই পত্রিকাতেই ১২৯৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘কাব্যিসমালোচনা’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে অত্যন্ত ব্যঙ্গভরে তিনি শেলির কবিতার অস্পষ্ট ছায়াময়তা এবং ‘বাংলার শেলি’রূপে খ্যাত রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও অস্পষ্টতা, ধোঁয়াশা ও জীবনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ তোলেন। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর দুঃখী জীবনে তিনি যে মৃত্তিকালগ্ন বাস্তবতার খোঁজ পেয়েছেন, শেলি বা রবীন্দ্রনাথের অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কবিতায় তার চিহ্নমাত্র না দেখে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ‘কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট’ (প্রকাশ ‘ভারতী ও বালক’, চৈত্র ১২৯৩ব) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অভিযোগের উত্তর। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, যা তথ্যগত বিষয় তা সম্পূর্ণ স্পষ্টতা দাবি করে। কিন্তু কাব্য বা সাহিত্য যতটুকু প্রকাশ করবার ততটুকুই করে। তার বেশি করলে শিল্পের দাবি ক্ষুণ্ণ হয়, তা রিপোর্তাজ হয়ে পড়ে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য চিরকালই ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে কথা বলেছে। এর মধ্যে কিছু অংশ সরাসরি ভাষায় প্রকাশিত হয়। আর কিছু অংশ ভাষায় অনতিব্যক্ত রয়ে যায়। যতটুকু অনতিব্যক্ত, ততটুকুই এর সৌন্দর্য। দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের ‘আধ চরণে আধ চলনি, আধ মধুর হাস’ পদাংশটি উদ্ধৃত করেছেন। “একে তো আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ। এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, উপরি-উদ্ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। ‘আধ চরণে আধ চলনি’ বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।”[৩৩] অর্থাৎ শব্দের বা ভাষ্যের তথ্যগত সীমাকে অতিক্রম করে কাব্য ব্যঞ্জনার কাছে পৌঁছতে চায়। এই ব্যঞ্জনাই সাহিত্যের প্রাণ। এটিই ভাবুকের মনে রসের বোধ জাগায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যভাবনায় কাব্যের যে ব্যঞ্জনাবৃত্তির পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তার পূর্বভূমিকা এই প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে।

তরুণ বয়স থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে যে একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা অনবরত শুনতে হয়েছে তা হল, তাঁর রচিত সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব। উনিশ শতকে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি থেকে শুরু করে বিশ শতকে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল আরও পরে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ সকলেই অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মৃত্তিকালগ্ন বাস্তবতা নেই। তা এতটাই ঊর্ধ্বচারী যা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় না। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকা প্রকাশিত হলে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

‘লোকশিক্ষক বা জননায়ক’ প্রবন্ধে (প্রকাশ জৈষ্ঠ্য, ১৩২১ব) রবীন্দ্র-সাহিত্য অবাস্তব এবং লোককল্যাণের অনুপযোগী এই অভিযোগ তোলেন। তিনি এও বলেন রবীন্দ্র-সাহিত্য সর্বজনীন নয়। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনেছেন, দৈন্যের মধ্যে বিশ্বাসের ছবি এঁকেছেন, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গেয়েছেন। কিন্তু সেই ছবি, সেই সংগীত জনসাধারণকে বা সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করতে পারেনি।[৩৪] রাধাকমলের এই অভিযোগের জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ‘বাস্তব’ প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’ বলতে সাহিত্যরসের নিত্যতাকেই বুঝিয়েছেন, বস্তুতন্ত্রের বাজারদরের মতো যা যুগভেদে ওঠানামা করে না। নিছক সাময়িক বাস্তবতাকে কাব্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলে তা কেমন হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তার একটা কৌতুককর কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তাঁর কথায়—

> কায়স্থেরা পৈতা লইবেই, আর ব্রাহ্মণসভা তাহার পৈতা কাড়িবে, এই ঘটনাটা বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপারের চেয়ে সবচেয়ে বড়ো, অতএব বাঙালী কবি যদি ইহাকে তাহার রচনায় আমল না দেয় তবে বুঝিতে হইবে বাস্তবতা সম্বন্ধে তাহার বোধশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। এই বুঝিয়া লিখিলাম পৈতা-সংহার কাব্য। তাহার বস্তুপিণ্ডটা ওজনে কম হইল না, কিন্তু হায় রে, সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে![৩৫]

অর্থাৎ শুধুমাত্র সমসাময়িক উত্তেজক ঘটনাকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করলেই তা বাস্তবতাসম্মত হয় না, মানবসমাজের নিত্যকালীন অংশের সঙ্গে তার যোগ কতটা সুদৃঢ় তার ওপর ভিত্তি করেই সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে। আর ‘লোকশিক্ষা’ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট অভিমত—“লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।” অর্থাৎ বিশুদ্ধ আনন্দ সঞ্চার করাই সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ; লোকশিক্ষা বা সমাজ-সংস্কার সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য রিয়ালিজম ও ন্যাচারিলিজমের আদলে প্রথমটা বিদেশি গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে ও পরবর্তীতে সরাসরি সমাজের নীচুতলার মানুষদের ক্লেদাক্ত দরিদ্র জীবন, নরনারীর দেহ-সংরাগের স্পষ্ট ছবি ও মনোবিকারের নানা কিসিমের আখ্যান আধুনিক বাংলা

সাহিত্য নামে প্রচল হয়। বাঙালির এতদিনের সাহিত্য-অভিজ্ঞতায় এক নতুন অভিঘাত জেগে ওঠে। স্বভাবতই যাঁরা রক্ষণশীল তাঁদের মধ্যে থেকে প্রতিক্রিয়া উঠল। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমল হোম, সজনীকান্ত দাশ প্রমুখেরা আধুনিক সাহিত্যের নামে এই 'কদর্যতা'কে মেনে নিতে পারলেন না। সজনীকান্ত দাশের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন ও এই নতুন জেগে-ওঠা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে লিখলেন দুটি প্রবন্ধ—'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব'। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বললেন, পাশ্চাত্য ন্যাচারিলজমের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যে বেআব্রু অলজ্জতার প্রকাশ দেখা গেছে তাকে আর্টের পৌরুষ বা সাহিত্যের নিত্যত্বের লক্ষণ বলে স্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথ। 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে আরও স্পষ্ট করে বলেন, যারা অদক্ষ রাঁধুনি তারা যেমন কম পরিশ্রমে এবং সহজে রান্না সারার জন্য 'কারি পাউডার' ব্যবহার করে ঠিক তেমনই যারা অপটু লেখক তারা নিজেদের বইকে বাজারে চলনসই করার জন্য রিয়ালিটি নামক 'কারি পাউডার' ব্যবহার করেন, যার প্রধান মশলা দুটি 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' ও 'লালসার অসংযম'।[৩৬] অর্থাৎ কৃত্রিমতাদুষ্ট ও ভঙ্গিসর্বস্ব লেখা লিখে কখনই সার্থক সাহিত্য রচনা করা যায় না, একথাই রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই কথায় তরুণ সাহিত্যিকেরা মনঃক্ষুণ্ণ হন। এরই প্রতিক্রিয়ায় অবশেষে রক্ষণশীল গোষ্ঠী ও তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী উভয় বিবদমান পক্ষের মধ্যে একটা রফা করবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথকে সভামুখ্য করে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা ভবন'এ এক সাহিত্যসভার আহ্বান করা হয়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের (১৯২৭ খ্রিঃ) ৪ ও ৭ই চৈত্র বিচিত্রা ভবনে অনুষ্ঠিত দুদিন ব্যাপী এই সাহিত্যসভা বাংলার সাহিত্য-আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এই সভা থেকেও সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার মূল কথা হল সাময়িক উত্তেজনার মোহাবেশে চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। "প্রতিক্রিয়া কখনোই প্রকৃতিস্থতা নয়। তা ক্ষণস্থায়ী অবস্থামাত্র প্রকাশ করে, তা চিরন্তন হতে পারে না।"[৩৭] দ্বিতীয়ত, কোনও একটা বিশেষ মত বা তত্ত্বের ছাপ মারা ভঙ্গিসর্বস্ব লেখা সকলে মিলে লিখলেই সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন করা যায় না। 'ওরিজিন্যালিটি' হচ্ছে যে-কোনও সাহিত্যের প্রধান সম্পদ এবং তা ব্যক্তিগত প্রতিভা ও নিগূঢ় অধ্যবসায়ের ফল। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকে না। তাই পরিশেষে তাঁর বক্তব্য : "আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে প'ড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উলকি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে মনে না করেন। তাঁদের শক্তির বিশুদ্ধ

স্বকীয় রূপটি জগতে জয়ী হোক।"[৩৮] আধুনিক সাহিত্য নিয়ে এই বিতর্কই আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং আপত্তি দুটি দিককেই স্পষ্ট করে তুলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমসাময়িক সাহিত্যবিতর্কগুলি রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে নানাভাবে উজ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করেছে।

(৪)

সাহিত্য রচনার মতোই সাহিত্য-সমালোচনাও কোনও স্থির বা অচঞ্চল বিষয় নয়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বা মানসিক নানা অভিঘাতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার আদর্শ ও নীতিতেও নানা পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সাহিত্য যে মূলত আনন্দের সৃষ্টি এবং পাঠকমনে আনন্দ সঞ্চারই এর প্রধান লক্ষ্য, এই মৌল বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা স্থির থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনার ভুবন পরিক্রমা করে আমাদের মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, পুরনো বাংলা সাহিত্য, বাংলার লোকজ সাহিত্য সমালোচনায় যে উত্তুঙ্গ প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তাঁর সমসাময়িক আধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় সেই প্রতিভা ও নিরপেক্ষতা সর্বদা বজায় রাখতে পারেননি। মহাযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা ও শরৎচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের রচনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত বিচার করলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। এর একটা সম্ভাব্য কারণ বোধহয় এই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকেন্দ্রিক নানা বিতর্ক ও পালাবদলের সঙ্গে তাঁর নিজের ঘনিষ্ঠ সংলগ্নতা ছিল। স্পষ্ট করে বললে, উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জায়মান প্রক্রিয়ায় সচল অংশী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সাহিত্যকে নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি মেলে দেখতে গেলে যে সময়গত দূরত্বের প্রয়োজন হয়, বাংলা আধুনিক সাহিত্যকে সেই দূরত্ব থেকে দেখবার সুযোগ তাঁর ছিল না। তাই খানিক দূরকালের সাহিত্য বিচারে যে স্থৈর্য তিনি দেখাতে পেরেছেন, সমসাময়িক সাহিত্যের বেলায় তা হয়নি। সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নেই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার

ভিতর একটা জিনিস আছে, যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা—এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে।...[৩৯]

এই আদর্শে বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই বোধহয় ইমপ্রেশনিস্ট বা রসবাদী সমালোচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। যদিও নানা ধরণের নানা আঙ্গিকের সমালোচনাই তিনি করেছেন। তিনি যেখানে ভগবানের জগতসৃষ্টির সঙ্গে কবির কাব্যরচনার সাদৃশ্য দেখান ('সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধ) সেখানে তাঁর ব্যাখ্যা ক্লাসিকাল, বৈষ্ণব সাহিত্য সমালোচনায় তিনি রোমান্টিক পন্থী, 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ'এর মতো পদসংকলন গ্রন্থের সমালোচনায় তিনি পাঠনির্ভর বা টেক্সটচুয়াল ক্রিটিক, 'বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য'এর মতো প্রবন্ধে তিনি বায়োগ্রাফিকাল সমালোচক আবার 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ছেলেভুলনো ছড়া' প্রবন্ধে শিশুমনে ছড়ার প্রভাবকে তিনি মনস্তত্ত্বনির্ভর সাইকো-অ্যানালিটিকাল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত 'মেঘদূত' অথবা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো প্রবন্ধে তিনি ইমপ্রেশনিস্ট সমালোচনার চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছেন। তাই কোনও একটি নির্দিষ্ট সমালোচনার প্যাটার্নে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তাকে আমরা বাঁধতে পারি না। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যেমন বহুব্যাপ্ত ও বিচিত্র, সমালোচনাও তাই।

পরিশেষে বলব, মুখ্যত বঙ্কিমের হাত ধরে আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের যে উদ্ভব ঘটেছিল ও বিকাশ সূচিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকেই আরও প্রসারিত ও পরিপুষ্ট করেন। সাহিত্যস্রষ্টা নিজেই যখন সাহিত্য বিচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখন রস আস্বাদনের এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, লোকসাহিত্য, বিদেশি সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনা বহুব্যাপ্ত ও বহুবিচিত্র। এর শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা উভয় নিয়েই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ অবদান, তাকেই আমরা আমাদের সাধ্যমতো নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. Lofty composition, Passionate feelings, Correct formation of figures of thought and speech, Nobility of Diction and Dignified Composition—এই পাঁচটি গুণের কথা বলা হয়েছে। দ্র: সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ-৪০।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দের অর্থ', *ছন্দ, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৯, পৃ-৪৬১।

৩. Drabble, Margarate edi. *The oxford companion to English Literature*, 5th Edition, oxford university press, 1985, p-842-843।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চিঠিপত্র*, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৮১ ব, পৃ-১৩২।

৫. Eliot, T.S, 'Tradition and Individual Talent', *The Sacred Wood*, Methuen and Company Ltd, London, 1920, p-45।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ব, পৃ-১১৩।

৭. দ্র: ভবানীগোপাল সান্যাল, 'টলস্টয় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ', *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৮০ব, পৃ-১৩১।

৮. Tolstoy, Leo, *What is art*, Funk & Wagnails Company, New York, 1904, P-153।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের সামগ্রী', *সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৬, পৃ-২৫১।

১০. Tolstoy, Leo, *What is art*, পূর্বোক্ত, P-157

১১. ভবানীগোপাল সান্যাল, 'টলস্টয় ক্রোচে ও রবীন্দ্রনাথ', পূর্বোক্ত, পৃ-১৩১।

১২. Croce, Benedetto, *The Aesthetic*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, P-8

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যসমালোচনা’ *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-২২০-২২১।

১৪. Croce, Benedetto, *The Aesthetic*, পূর্বোক্ত, P-16

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যরূপ’, *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৮-১৯৯।

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যতত্ত্ব’, *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-১২২।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আলোচনা*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ-১৪০।

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাঙ্গালী কবি নয়’, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০২১, পৃ-৭৬-৭৭।

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘ভূমিকা’, *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-৭-৮।

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যবিচার’, *সাহিত্যের পথে*, তদেব, পৃ-১০০।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘তথ্য ও সত্য’, *সাহিত্যের পথে*, তদেব, পৃ-৪৯।

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যবিচার’, পূর্বোক্ত, পৃ-৯৮।

২৩. তদেব, পৃ-৯৮।

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের বিচারক’, *সাহিত্য*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৫।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘বাস্তব’, *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-১৭।

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যের বিচারক’, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৬।

২৭. তদেব, পৃ-২৫৫।

২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘সাহিত্যরূপ’, *সাহিত্যের পথে*, পূর্বোক্ত, পৃ-২০৭।

২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যসম্মিলন', 'সাহিত্য গ্রন্থের সংযোজন', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৩৫।

৩০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জুবেয়ার', *আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-১৫, পূর্বোক্ত, পৃ-৪০৬।

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', *আধুনিক সাহিত্য,* তদেব, পৃ-৩৩৩।

৩২. Coleridge, S.T, *Biographia Literaria*, Oxford Clarendon press, London, 1907, P-202.

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কাব্য: স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট', *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* খণ্ড-২০, পূর্বোক্ত, পৃ-৩১২।

৩৪. দ্র: *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ। *সাহিত্যের পথে,* বিশ্বভারতী, ১৩৭৫ব, পৃ-২৭০।

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-১৮-১৯।

৩৬. দ্র: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যে নবত্ব', *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, পৃ-৮৮।

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যসমালোচনা', তদেব, পৃ-২২২।

৩৮. তদেব, পৃ-২২৪।

৩৯. তদেব, পৃ-২২০।

পরিশিষ্ট-১

সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নানা স্বাদের একাধিক বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন। এই ভূমিকাগুলি অনেকক্ষেত্রেই হয়তো কেজো অথবা অনুরোধ রক্ষার দায়ে পড়ে লেখা। সরাসরি সাহিত্য-সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা না হলেও রবীন্দ্র-রচিত এই ভূমিকাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার একটা পরিচয় নিশ্চিত রয়ে গেছে। এই বিবেচনায় সেই লেখাগুলির একটি তালিকা প্রকাশের ক্রমানুসারে নীচে দেওয়া হল।

বিভিন্ন বইয়ের রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভূমিকা: একটি তালিকা

নম্বর	বইয়ের নাম : লেখকের নাম	প্রকাশকাল
১।	মেয়েলি ব্রত: অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৩০৩ব
২।	সংস্কৃত প্রবেশ: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩১১ব
৩।	গুরুদক্ষিণা: সতীশচন্দ্র রায়	১৩১১ব
৪।	শিক্ষার আন্দোলন: কেদারনাথ দাশগুপ্ত	১৩১২ব
৫।	যুগলাঞ্জলি: স্নেহলতা সেন ও ললিতা গুপ্ত	১৩১৩ব
৬।	ঠাকুরমার ঝুলি: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	১৩১৩ব
৭।	সরল কৃত্তিবাস: যোগীন্দ্রনাথ বসু	১৩১৪ব
৮।	মেয়েলি ব্রতকথা: পরমেশপ্রসন্ন রায়	১৩১৫ব
৯।	শিবাজী ও মারাঠা জাতি: শরৎকুমার রায়	১৩১৬ব
১০।	শিখ গুরু ও শিখ জাতি: শরৎকুমার রায়	১৩১৬ব
১১।	খ্রিস্ট: অজিতকুমার চক্রবর্তী	১৩১৭ব
১২।	রাক্ষস রহস্য: উমেশচন্দ্র মৈত্র	১৩১৯ব
১৩।	বসন্তপ্রয়াণ: সরযূবালা দাশগুপ্ত	১৩২০ব
১৪।	মন্দির: কিরণচাঁদ দরবেশ	১৩২২ব

নম্বর	বইয়ের নাম : লেখকের নাম	প্রকাশকাল
১৫।	দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী	১৩২৪ব
১৬।	রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা: আশুতোষ বাজপেয়ী	১৩২৪ব
১৭।	ভূমিলক্ষ্মী	১৩২৫ব
১৮।	রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম: কান্তিচন্দ্র ঘোষ	১৩২৬ব
১৯।	বাগগুহা ও রামগড়: অসিতকুমার হালদার	১৩২৮ব
২০।	কান্তকবি রজনীকান্ত: নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১৩২৮ব
২১।	বেড়াল ঠাকুরঝি: বিভূতিভূষণ গুপ্ত	১৩৩০ব
২২।	সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা: কৃষ্ণকিশোর দাস সম্পাদিত	১৩৩২ব
২৩।	দাদূ: ক্ষিতিমোহন সেন	১৩৩২ব
২৪।	কাঠের কাজ: লক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৩৩২ব
২৫।	গড্ডলিকা: পরশুরাম	১৩৩২ব
২৬।	সরোজনলিনী: গুরুসদয় দত্ত	১৩৩২ব
২৭।	রাগশ্রেণী: ভীমরাও শাস্ত্রী	১৩৩৩ব
২৮।	রায়তের কথা: প্রমথ চৌধুরী	১৩৩৩ব
২৯।	সরল কৃষিশিক্ষা: সন্তোষবিহারী বসু	১৩৩৪ব
৩০।	হারামণি: মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন সংগৃহীত	১৩৩৪ব
৩১।	ইন্দ্রধনু: সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১৩৩৪ব
৩২।	উদিতা: মৈত্রেয়ী দেবী	১৩৩৬ব
৩৩।	ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা: ক্ষিতিমোহন সেন	১৩৩৬ব
৩৪।	বাতায়ন: উমা দেবী	১৩৩৭ব
৩৫।	কালিদাসের গল্প: রঘুনাথ মল্লিক	১৩৩৮ব
৩৬।	পরিচয় (পত্রিকা): সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত	১৩৩৮ব
৩৭।	লঘুগুরু: জগদীশচন্দ্র গুপ্ত	১৩৩৮ব
৩৮।	মাটির স্বর্গ: অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১৩৩৮ব
৩৯।	জাতীয় ভিত্তি: নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৩৩৮ব
৪০।	হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা: নরেন্দ্রনাথ লাহা ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৩৩৯ব
৪১।	জাতীয় সাহিত্য: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৩৩৯ব

নম্বর	বইয়ের নাম : লেখকের নাম	প্রকাশকাল
৪২।	ময়নামতীর চর: বন্দে আলী মিঞা	১৩৩৯ব
৪৩।	বঙ্গীয় শব্দকোষ: হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩৯ব
৪৪।	প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি: প্রিয়নাথ সেন	১৩৪০ব
৪৫।	ব্যাকরণিকা: জগৎমোহন সেন	১৩৪০ব
৪৬।	অমিতার প্রেম: আশালতা সিংহ	১৩৪১ব
৪৭।	রিয়ালিস্ট: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৩৪১ব
৪৮।	মৌন ও মুখর: মমতা মিত্র	১৩৪১ব
৪৯।	বঙ্গীয় মহাকোষ: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	১৩৪১ব
৫০।	হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ: কাজী আবদুল ওদুদ	১৩৪১ব
৫১।	দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য: হিমাংশুভূষণ সরকার	১৩৪২ব
৫২।	কাদম্বরী: প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর অনূদিত	১৩৪৩ব
৫৩।	গল্পসঞ্চয়: যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত	১৩৪৩ব
৫৪।	ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা: সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র	১৩৪৩ব
৫৫।	ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা: পশুপতি ভট্টাচার্য	১৩৪৩ব
৫৬।	সুন্দর গ্রন্থাবলী: হরিনারায়ণ শর্মা সম্পাদিত	১৩৪৩ব
৫৭।	সপ্তপর্ণ: রাখালচন্দ্র সেন	১৩৪৪ব
৫৮।	বাংলা কাব্যপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত	১৩৪৫ব
৫৯।	দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	১৩৪৫ব
৬০।	চম্পা ও পাটল: প্রিয়ম্বদা সেবী	১৩৪৫ব
৬১।	দেহলি: হেমলতা দেবী	১৩৪৫ব
৬২।	প্রাচীন হিন্দুস্থান: প্রমথ চৌধুরী	১৩৪৬ব
৬৩।	রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিচয়: শচীন সেন	১৩৪৬ব
৬৪।	মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস: আশুতোষ ভট্টাচার্য	১৩৪৭ব
৬৫।	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [প্রথম খণ্ড]: সুকুমার সেন	১৩৮৭ব
৬৬।	পাগলা দাশু: সুকুমার রায়	১৩৪৩ব
৬৭।	নিরুক্ত (পত্রিকা): প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত	১৩৪৭ব

নম্বর	বইয়ের নাম : লেখকের নাম	প্রকাশকাল
৬৮।	বিজ্ঞান পরিচয়: সর্বাণীসহায় গুহ সরকার সম্পাদিত	১৩৪৭ব
৬৯।	ইয়োরোপা: দেবেশচন্দ্র দাশ	১৩৪৭ব
৭০।	পৃথ্বী-পরিচয়: প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	১৩৪৭ব
৭১।	গল্পসংগ্রহ: প্রমথ চৌধুরী	১৩৪৮ব
৭২।	বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা: নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১৩৪৮ব
৭৩।	ঘরোয়া: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৪৮ব
৭৪।	আহার ও আহার্য: পশুপতি ভট্টাচার্য	১৩৪৮ব
৭৫।	পথ্যে পরমায়ু: কিরণচন্দ্র দাস	১৩৪৮ব

ঋণ: ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১।

২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড (গ্রন্থপরিচয়), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

৩। বিচিত্রা ওয়েবসাইট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। www.bichitra.jdvu.ac.in

পরিশিষ্ট-২

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় অনেক গ্রন্থের গ্রন্থ-সমালোচনা (বুক রিভিয়ু) লিখেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশকালের ক্রমানুসারে নীচে তালিকাকারে দেওয়া হল:

বিভিন্ন বইয়ের রবীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থ-সমালোচনা: একটি তালিকা

নম্বর	বইয়ের নাম: লেখকের নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল
১।	ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী: নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	১২৮৩ব
২।	মেঘনাদবধ কাব্য: মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ভারতী	১২৮৪ব
৩।	কবিতা-পুস্তক: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ভারতী	১২৮৫ব
৪।	রাবণ বধ ও অভিমন্যু বধ: গিরিশচন্দ্র ঘোষ	ভারতী	১২৮৮ব
৫।	ঊর্মিলা কাব্য: দেবেন্দ্রনাথ সেন	ভারতী	১২৮৮ব
৬।	ডি প্রোফন্ডিস	ভারতী	১২৮৮ব
৭।	মেঘনাদবধ কাব্য ২: মাইকেল মধুসূদন দত্ত	ভারতী	১২৮৯ব
৮।	মেঘদূত: কালিদাস	সাহিত্য	১২৯৮ব
৯।	লীলা: নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	সাধনা	১২৯৯ব
১০।	দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী: কালীপ্রসন্ন দত্ত	সাধনা	১২৯৯ব
১১।	কঙ্কাবতী: ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	সাধনা	১২৯৯ব
১২।	রাজসিংহ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধনা	১৩০০ব
১৩।	কৃষ্ণচরিত্র: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	সাধনা	১৩০১ব
১৪।	ফুলজানি: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার	সাধনা	১৩০১ব

নম্বর	বইয়ের নাম: লেখকের নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল
১৫।	আর্যগাথা: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	সাধনা	১৩০১ব
১৬।	যুগান্তর: শিবনাথ শাস্ত্রী	সাধনা	১৩০১ব
১৭।	হাসি ও খেলা: যোগীন্দ্রনাথ সরকার	সাধনা	১৩০১ব
১৮।	মনোরমা: শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র	সাধনা	১৩০১ব
১৯।	নূরজাহান: বিপিনবিহারী ঘোষ	সাধনা	১৩০১ব
২০।	নির্ঝরিণী: শ্রীমতী মৃণালিনী	সাধনা	১৩০২ব
২১।	বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম: হারাণচন্দ্র রক্ষিত	সাধনা	১৩০২ব
২২।	আষাঢ়ে: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	ভারতী	১৩০৫ব
২৩।	কাদম্বরী চিত্র: বাণভট্ট	প্রদীপ	১৩০৬ব
২৪।	কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা: কালিদাস	বঙ্গদর্শন	১৩০৮ব
২৫।	শকুন্তলা: কালিদাস	বঙ্গদর্শন	১৩০৯ব
২৬।	মন্দ্র: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	বঙ্গদর্শন	১৩০৯ব
২৭।	রামায়ণী কথা: দীনেশচন্দ্র সেন	--	১৩১০ব
২৮।	ধম্মপদং: চারুচন্দ্র বসু অনূদিত	বঙ্গদর্শন	১৩১২ব
২৯।	শুভবিবাহ: শরৎকুমারী চৌধুরানী	বঙ্গদর্শন	১৩১৩ব
৩০।	গড্ডলিকা: রাজশেখর বসু	প্রবাসী	১৩৩২ব
৩১।	লঘুগুরু: জগদীশ গুপ্ত	পরিচয়	১৩৩৮ব
৩২।	মাটির স্বর্গ: অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	প্রবাসী	১৩৩৮ব
৩৩।	রিয়ালিস্ট: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	পরিচয়	১৩৪১ব
৩৪।	স্বগত: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	প্রবাসী	১৩৪৬ব

ঋণ: ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১।

২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড (গ্রন্থপরিচয়), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১।

৩। বিচিত্রা ওয়েবসাইট, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। www.bichitra.jdvu.ac.in

গ্রন্থপঞ্জি

বিঃ দ্রঃ আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের রচনা ও উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলী থেকে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য রচনাবলী অথবা বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যখন যে গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে, অন্ত্যটীকায় তার বিবরণ যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থপঞ্জিতে সংস্করণ পৃথকভাবে উল্লেখিত না হলে সব ক্ষেত্রেই প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

আকর গ্রন্থপঞ্জি :

[আমাদের গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থিত ও এ যাবৎ অগ্রন্থিত প্রায় সব ধরণের লেখাই দেখতে হয়েছে। তাই সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীই আমাদের কাছে আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। তবুও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনাধর্মী বক্তব্য আছে এমন কিছু বই যা আমরা অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবহার করেছি সেগুলিকেই এখানে আকর গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হল]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আলোচনা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *বিবিধ প্রসঙ্গ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *রামমোহন রায়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *সমালোচনা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------ *য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি,* ১ম ও ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *পঞ্চভূত,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *ভারতবর্ষ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *বিচিত্র প্রবন্ধ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

----- *চারিত্রপূজা,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *প্রাচীন সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *লোকসাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

--- *আধুনিক সাহিত্য,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *সমূহ,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *শান্তিনিকেতন,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *শব্দতত্ত্ব,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

---- *জীবনস্মৃতি,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

---- *সঞ্চয়,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

---- *পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *জাভাযাত্রীর পত্র,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *ভানুসিংহের পত্রাবলী,* রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *রাশিয়ার চিঠি*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *মানুষের ধর্ম*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৯

---- *কালান্তর*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *বাংলা-ভাষা পরিচয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *পথের সঞ্চয়*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *ছেলেবেলা*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *আশ্রমের রূপ ও বিকাশ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-১৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২০

---- *সাহিত্যের স্বরূপ*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *ছিন্নপত্রাবলী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬০

---- *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

---- *ইতিহাস*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

---- *ছন্দ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২

---- *মহাত্মা গান্ধী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪৮

---- *বুদ্ধদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬০

---- *পারস্যযাত্রী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

---- *ব্যক্তি প্রসঙ্গ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড-৩১, বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র* ২, [রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র ৫,* [প্রমথ চৌধুরী ও অন্যান্যদের লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

---- *চিঠিপত্র ৮,* [প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৩

---- *চিঠিপত্র ৯,* [হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৪

----- *চিঠিপত্র ১০,* [দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬৭

----- *চিঠিপত্র ১১,* [অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৪

---- *চিঠিপত্র ১৪,* [সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

----- *চিঠিপত্র ১৬,* [জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র, বুদ্ধদেব বসু সহ আধুনিক কবিদের লিখিত] বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

---- *সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ,* [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা,* [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *গ্রন্থ সমালোচনা,* [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

---- *রবীন্দ্র প্রদত্ত অভিভাষণ,* [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

----- *রবীন্দ্র রচিত ভূমিকা,* [অগ্রন্থিত], রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড-২০, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০২১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ, ডি.এম.লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদিত), বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯

অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ কাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যজিজ্ঞাসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা, সৃষ্টি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

অনন্যা সেনগুপ্ত, সামাজিক ও সাহিত্যিক বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

অন্নদাশঙ্কর রায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

অনাথনাথ দাস/বিশ্বনাথ রায় (সম্পাদিত), ছেলেভুলানো ছড়া, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

অনিলকুমার রায়, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ,* চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪

অনির্বাণ রায় (সংকলিত ও সম্পাদিত), *রবীন্দ্র-রচনায় গ্রন্থ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়,* ছাতিম বুকস, কলকাতা, ২০১৩

অবন্তীকুমার সান্যাল, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, রূপলেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

---- ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

---- ঘরোয়া, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২

---- জোড়াসাঁকোর ধারে, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

অভীককুমার দে, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২

অমরেন্দ্রনাথ রায়, রবিয়ানা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা ১৩২৫ বঙ্গাব্দ

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সাধনা পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১১

---- নানা রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

---- রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য, দেজ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮১

অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রমানস ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

---- রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

---- বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

---- ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৬

---- রবীন্দ্র-সমীক্ষা, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৫৭

---- রবীন্দ্রবিতান, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

অলোক ভট্টাচার্য, আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৮০

অলোক রায়, উনিশ শতকের নবজাগরণ স্বরূপ সন্ধান, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা,২০১৯

অশোকবিজয় রাহা (সম্পাদিত) রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা-২, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৬৮

অশ্রুকুমার সিকদার, বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮১

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাহিত্যজিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

--------- পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৫৮

অসিতকুমার হালদার, রবিতীর্থে, অঞ্জনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

আদিত্য ওহদেদার, *রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা,* এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্র বিদূষণ ইতিবৃত্ত,* বাসন্তী লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

----- *সমালোচক রবীন্দ্রনাথ,* এভারেস্ট বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

আবু সয়ীদ আইয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭১

আশুতোষ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য,* এ মুখার্জী, কলকাতা, ১৯৭৩

ইন্দিরা দেবী, *পুরাতনী,* ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব,* চতুর্থ সংস্করণ, সংস্কৃত প্রেস, কলকাতা, ১৮৭৯,

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বমন,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০১২

----- *রাতের তারা দিনের রবি,* আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য,* বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮০

কানাই সামন্ত, *রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পরিচয়,* বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *মৈনাক,* কবিতা ভবন, কলকাতা, ১৯৪০

কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৫

ক্ষিতিমোহন সেন, *দাদূ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

ক্ষেত্র গুপ্ত, *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী,* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদিরাম দাস, *রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়,* পুথিঘর, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র কথা,* জয়শ্রী পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৯১

গোপালচন্দ্র রায়, *রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৯

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পা), *শরৎ-পত্রাবলী*, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

গৌরচন্দ্র সাহা, *রবীন্দ্রপত্রপ্রবাহ ও তথ্যপঞ্জী কালানুক্রমিক*, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৮

চন্দ্রনাথ বসু, *শকুন্তলাতত্ত্ব*, ক্যানিং লাইব্রেরি [যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত], কলকাতা, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবিরশ্মি*, ২য় খণ্ড, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ১*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

---- *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ২*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫

---- *রবীন্দ্র প্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬

চিত্রা দেব, *অনালোচিত রবীন্দ্রনাথ*, মডার্ন কলাম, কলকাতা, ১৯৮৫

চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী*, গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৮

----- *সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৬

----- *রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত*, ভারবি, কলকাতা, ২০০৮

----- *রবীন্দ্রকবিতাশতক তিন দশক*, ভারবি, কলকাতা ২০০১

জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, *অলংকার সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৬,

জীবেন্দ্র সিংহরায়, *কাব্যতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭

জ্যোতির্ময় ঘোষ, *রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *আমার সাহিত্যজীবন,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, *মন্দ্র,* কুন্তলীন প্রেস, কলকাতা, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ

দিলীপকুমার রায়, *তীর্থংকর,* জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

দেবকুমার বসু(সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী,* ২য় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮

দেবকুমার রায়চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল,* অধ্যয়ন, কলকাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র বিতর্ক,* রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯

দেবেশ কুমার আচার্য (সম্পাদিত), *কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল* (২য় খণ্ড), সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শাক্ত পদাবলী,* রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৯

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, *কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

নবেন্দু সেন (সম্পাদিত), *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১২

নরেশ গুহ (সম্পাদিত), *কবির চিঠি কবিকে,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

নরেশচন্দ্র জানা, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৮

নির্মলকুমারী মহলানবিশ, *কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

----- *কবির সঙ্গে য়ুরোপে,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

পুলিনবিহারী সেন, *রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস, *রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য*, কথাশিল্প, কলকাতা, ১৯৯৯

প্রত্যুষকুমার রীত (সম্পাদিত), *ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা পুণ্য*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯

পিনাকী ভাদুড়ী, *উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*, নিউ এজ, কলকাতা, ২০০৯

পিনাকেশ সরকার, *রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৫

প্রবোধচন্দ্র সেন, *ভোরের পাখি ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *কাদম্বরী*, রূপা এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

----- *রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক*, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

প্রমথ চৌধুরী, *আত্ম-কথা*, দি বুক এম্পোরিয়াম, কলকাতা, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ

প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী*, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

-------- *রবিজীবনী*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

--------- *রবিজীবনী*, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

--------- *রবিজীবনী*, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

--------- *রবিজীবনী*, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০

------- *রবিজীবনী*, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৩

--------- *রবিজীবনী*, সপ্তম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

--------- *রবিজীবনী,* অষ্টম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

--------- *রবিজীবনী,* নবম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৪

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* তৃতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* পঞ্চম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৬

------- *বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৭

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি,* শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, *রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

বিজন ঘোষাল (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রপত্র-সমগ্র কালানুক্রমিক ১*, লালমাটি, কলকাতা, ২০২৩

বিজন ঘোষাল, *রবিজীবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২১

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৫

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯১

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯

------ *সাহিত্যবিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯

------ *সাহিত্যবিবেক*, গ্রন্থমেলা, কলকাতা, তারিখ অনুল্লেখিত

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনূদিত, *বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৮

বিমানবিহারী মজুমদার, *রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান*, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

বিশ্বনাথ রায়, *পাঠক রবীন্দ্রনাথ*, সুজন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১

------ *রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭

বিষ্ণু দে, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৮৭

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ

------- *কাব্যকৌতুক*, বিচিত্রা, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ

বীণা মজুমদার, *চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ*, নাভানা, কলকাতা, ১৯৬৫

বুদ্ধদেব বসু, *কালের পুতুল*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০

----- *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৬৩

------ *কালিদাসের মেঘদূত*, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৫৯

----- *সব পেয়েছির দেশে*, কবিতাভবন, কলকাতা, ১৯৪৪

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়*, সাহিত্য-নিকেতন, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

-------- *সাহিত্য সাধক চরিতমালা*, খণ্ড-৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

ভবতোষ দত্ত (সম্পাদিত), *ঈশ্বর গুপ্ত রচিত প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনবৃত্তান্ত*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ

ভবানীগোপাল সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

মনস্বিতা সান্যাল, *রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক নারী সাহিত্যিক*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০২১

মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ: শিশুসাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০০

মানস মজুমদার, *রাম রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫

মৈত্রেয়ী দেবী, *স্বর্গের কাছাকাছি*, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮১

------ *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৬০

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, *রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য*, বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মিনী উপাখ্যান*, এ মুখার্জি এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পিতৃস্মৃতি*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদিত), *বাংলা কাব্যপরিচয়*, ভূমিকা ও তথ্যসংকলন সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০২

রানী চন্দ, *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ

----- *গুরুদেব*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৬২

রামমোহন রায়, *রামমোহন রচনাবলী*, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩

শঙ্করাচার্য্য (শ্রীমৎ), *ছান্দোগ্য উপনিষদ*, শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৩৬

শঙ্খ ঘোষ, *নির্মাণ আর সৃষ্টি*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৪

শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

শুভা চক্রবর্তী দাশগুপ্ত, *সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল, *সমালোচনা সাহিত্য*, এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত), *শনিবারের চিঠি রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা,* নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

সজনীকান্ত দাস, *আত্মস্মৃতি,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ

------ *রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

সরলাদেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৮৭৯ বঙ্গাব্দ

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, *পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা,* ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৬

সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ

------ *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : দর্শন চিন্তা,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯১

------ *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগত : সাহিত্য চিন্তা,* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৯৬

------ *সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩

সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য,* লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কলকাতা ২০০৩

সুকুমার সেন (সম্পা), *চৈতন্য ভাগবত (আদিলীলা),* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪,

সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯১

সুজিতকুমার মণ্ডল (সম্পাদিত), *বিদেশী ফুলের গুচ্ছ,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১১

সুদীপ বসু, *বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ধারা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

সুদীপ বসু (সম্পাদিত), *রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ২০১০

সুধীরচন্দ্র কর, *শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা,* ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ

সুনীল কুমার ওঝা (সম্পাদিত), *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল* সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২,

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য অনূদিত, *আনন্দবর্ধনকৃত ধ্বন্যালোকঃ,* এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, *বাংলা সমালোচনা পরিচয়,* এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

----- *শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য,* এ মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

----- *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬

সুপ্তি মিত্র সংকলিত, *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ শান্তিনিকেতন,* রবীন্দ্রচর্চা ভবন, কলকাতা, ১৯৮০

সুমিতা চক্রবর্তী, *আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০

সুমিতা চক্রবর্তী (ভূমিকা সংবলিত) *প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ সংগ্রহ,* প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩

সোমেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবাসী,* টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ১৯৭৬

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রস্মৃতি,* শিশির পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

স্বপন মজুমদার, *রবীন্দ্রগ্রন্থসূচি,* প্রথম খণ্ড/প্রথম পর্ব, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাদিত), *উপনিষদ গ্রন্থাবলী,* প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

হরনাথ পাল, *রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচীন সাহিত্য,* নিউ এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, ২০০৩

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ,* খণ্ড-৫, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৪

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, *হিন্দুদের দেবদেবী,* ২য় খণ্ড, কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *সমালোচনা-সাহিত্য,* গ্রন্থ-প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

পত্রপত্রিকা ও স্মারক-সংখ্যাপঞ্জি:

অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *উত্তরসূরী,* শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

অশোককুমার সরকার সম্পাদিত, *দেশ সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

----- *দেশ সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *বিচিত্রা,* আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

----- *বিচিত্রা,* কার্তিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

----- *বিচিত্রা,* জৈষ্ঠ্য, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

কানাই সামন্ত সম্পাদিত, *রবীন্দ্রবীক্ষা-8,* বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৮৪----শ্রাবণ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত, *কথাসাহিত্য,* আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

জলধর সেন সম্পাদিত *ভারতবর্ষ,* চৈত্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, *কোরক বইমেলা সংখ্যা* ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *ভারতী,* অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ

দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত, *কল্লোল,* বৈশাখ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, *লাঙল,* ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫

বলাইলাল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *করুণা আরতি,* শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, ১৯৭৭

বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, *কবিতা,* আশ্বিন ১৩৪২

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *বিশ্বভারতী পত্রিকা,* শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *ভারতী,* বৈশাখ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, *সাধনা,* চৈত্র ১৩০১ বঙ্গাব্দ

----- *সাধনা,* ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, *প্রবাসী,* ভাদ্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ

---- *প্রবাসী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

---- *প্রবাসী,* অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *পূর্বাশা,* রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা, ১৯৪১

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত, *শারদীয় দেশ,* ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত *দেশ সাহিত্য সংখ্যা,* ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়,* বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত, সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ

স্বর্ণকুমারী দেবী[?] সম্পাদিত, *ভারতী ও বালক,* শ্রাবণ সংখ্যা, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র-জন্মসার্ধশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা,* ১৪২২ বঙ্গাব্দ

মণিলাল খান সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা,* পঞ্চদশ সংখ্যা, ২০১০

মানস মজুমদার ও বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, চতুর্দশ সংখ্যা, ২০০৫

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, *রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ২০০৪

শেখর সমাদ্দার সম্পাদিত, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, ২০১৮

ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জি:

Andrews, C.F ed. *Letters to a friend.* George Allen and Unwin Ltd. London. 1928

Butcher Samuel Henry. *Aristotle's Theory Of Poetry And Fine Art.* Macmillan and co Ltd. London. 1907

Carolyn, Merchant. *Radical Ecology.* Routledge. New York. 2012

Chakravarty, Bikas ed. *Poets to a poet.* Visva-Bharati. Kolkata. 1998

Charles, Howard Johnson ed. *The Complete Works of Alfred Lord Tennyson.* Frederick.A.Stokes. London. 1891

Chatterjee, Ramananda ed. *The Golden Book of Tagore.* The Golden Book Committee. Calcutta. 1931

Coleridge, S.T. *Biographia Literaria.* Oxford Clarendon press. London. 1907

Croce, Benedetto. *The Aesthetic.* Cambridge University Press. Cambridge. 1992

Das, Sisir Kumar ed. *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-1.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1994

----- *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-2.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1996

----- *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-3.* Sahitya Akademi. New Delhi. 1996

Dante, Alighieri. [translated by Henry Francis Cary] *Dante's Inferno.* Caesell publishing. New York. 1818

Donald, Tayson & Benjamin, B Hoover ed. *The Complete Works of Thomas Chattarton vol-1.* A Bicentenary Edition. Oxford press. London. 1971

Drabble, Margarate ed. The Oxford Companion to English Literature. 5th Edition. Oxford University Press. Oxford. 1985

Eliot, T.S. *Selected Poems.* Faber & faber Limited. London. 1931

---- *The Sacred Wood.* Methuen and Company Ltd. London. 1920

Fiedler, Leslie. *Super Culture: American Popular Culture and Europe.* Bowling Green University Press. London. 1975

Fritz, Strich. *Goethe and World Literature.* Routledge and Kegan Paul Ltd. London. 1949

Ghosh, Nityapriya ed. *The English Writings of Rabindranath Tagore Vol-4.* Sahitya Akademi. New Delhi. 2007

Goethe, Johannwolfgang Von. [translated by Thomas Balley Saunders] *The Maxims and Reflections.* Macmillan. London. 1908

Home, Amal ed. *Tagore Memorial Special Supplement: The Calcutta Municipal Gazette.* Calcutta Municipality Publication. Calcutta. 1941

Jha, Ganganatha (translated). *The Chandogyopanishad.* Oriental Book Agency. Poona. 1942

Kripalani, Krishna. *Rabindranath Tagore/A Biography.* Visva-Bharati, Calcutta, 1980

Lago, Mary M. *Imperfect Encounter.* Harvard University Press. Massachuetts. 1972

Maritain Jacques. *Creative intuition in Art and Poetry.* Priceton University press. New Jersey. 1978

Mitra, Rajendralal. *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* Sanskrit Pustak Bhandar. Calcutta. 1971

Monier, Williams (Translated). *Sakuntala by Kalidasa.* Oxford University Press. London 1899

Nehru, Jawaharlal. *The Discovery of India.* Oxford University Press. Delhi. 1946

Pater, Walter Horatio. *Style.* Macmillan & co. London. 1944

Rice, Philip and Waugh, Patricia ed. *Modern Literary Theory : A Reader.* 3rd Edition. Arnold Publishing house. London. 1996

Rossetti, D.G (Translated). *The New Life.* Ellis and Elvey. London. 1899

Tagore, Rabindranath. *The Creative Unity.* Macmillan and Company Ltd, London, 1922

----- *Sadhana.* Macmillan and Company Ltd, London, 1947

----- *The Religion of Man.* George Allen and Unwin Ltd. London. 1949

Tagore, Rathindranath. *On the Edges of Time.* Orient Longman. Calcutta. 1958

Taine, Hippolyte. [translated by H. Vanlaun] *History of English Literature Vol 1.* 2nd Edition. Edmonston and Douglas. Edinburgh. 1872

Thomson, Edward. *Rabindranath Tagore/Poet and Dramatist.* Oxford University Press. Delhi. 1991

Tolstoy, Leo. *What is art.* Funk & Wagnails Company. New York. 1904

Ward, A.C. *Landmarks in Western Literature.* Methuen. London. 1932

Wilson, Horace (translated). *Mehga Duta or Cloud Messenger.* published by Upendralal Das. Calcutta. 1890

ইংরাজী পত্রপত্রিকা:

Chatterjee, Ramananda ed. The Modern Review. Vol 39. January 1926.

Mahalanobis, P.C ed. Visva-Bharati quarterly. Vol 1. April 1923.

ক্যাটালগ

Catalogue in progress. Vol 2, Rabindra Bhavan Archives. Visva Bharati. 1981

ওয়েবসাইট

১. http://bichitra.jdvu.ac.in/

২. https://www.tagoreweb.in/